সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত

এক প্রচ্ছদে তিনটি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

প্রাইমা পাবলিকেশনস্
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৬৫

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
প্রভাপরঞ্জন রায়
১৭, রামধন মিত্র লেন
রামকৃষ্ণ প্রেস
কলিকাতা-৪

সপ্তসিন্ধু
দশদিগন্ত

উন্মোচন

রাতের গাড়ি। একটা নিটোল ঘুমে কাটিয়ে দেওয়া যায় সময়টুকু, ঘুমোতে ঘুমোতে চলে আসা যায় পুরী থেকে কলকাতায়। কিন্তু মানসী ঘুমোয়নি। ট্রেনে ভিড় ছিলো বলে নয়, ভিড় বেশি ছিলো না। এমনিই ঘুমোয়নি। ঘুমোতে পারেনি।

অথচ জেগে জেগেই কি রাতটা কাটিয়েছে মানসী শরৎশুক্লা রাত্রির নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে? বলা শক্ত।...ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী একটা অনুভূতিহীন আচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে গেছে রাত্রির ঘণ্টাগুলো। ট্রেনের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দের সঙ্গে আরও একটা ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ যেন রাত্রিটাকে ধাক্কা দিতে দিতে ঠেলে ফেলে গেলো দিনের পদপ্রান্তে। কিন্তু কেন এই বিহ্বলতা?

মানসীর আটত্রিশ বছরের জীবনে, সংসার ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়া এই প্রথম বলেই কি ফিরে আসতে এমন বিধুর হয়ে পড়েছে সে? নাঃ বেদনা নয়। মানসীর চোখে মুখে মনখারাপের সেই স্বাভাবিক চিহ্ন দেখতে পেলে বরং খুশিই হয়ে উঠতেন সুখময়, স্বস্তি পেতেন। হ্যাঁ, সেটাই হতো স্বাভাবিক। কারণ ঠিক বেড়িয়ে ফেরা হিসেবে তো ফেরেননি তাঁরা। ফিরছেন ছুটির মেয়াদ থাকতে থাকতেই ছেলের অসুস্থতার খবরে।

একমাত্র ছেলে, বাপ মার চোখের মণি, তাকে একা বাড়িতে [illegible]লে রেখে নিজেরা বেড়াতে গেলেন এঁরা, এটা আশ্চর্য কথা! [illegible]ন্তত এঁদের পক্ষে আশ্চর্যই। তবু গিয়েছিলেন সে শুধু ছেলের উপর রাগ করেই। মোটে তো উনিশ বছরের ছেলে, লেখাপড়াতেই না [illegible]য় একটু বেশি এগিয়ে গেছে, কিন্তু বয়েসে তো সত্যি বাচ্চা মাত্র [illegible]ড়া সাত জন্মে কোথাও বেড়াতে যায়ও নি। সে কিনা যাওয়ার [illegible] অনায়াসে বলে বসলো, "ছুটিতে বাইরে গিয়ে হৈ হৈ করে [illegible] সময়ের অপব্যবহার! তোমরা যাওনা, আমি কেষ্টকে নিয়ে থাকতে পারবো। আরামে থাকবো।"

মনে করেন নি, বলেছিলেন, "তা হলেই হয়েছে! পুরী যাওয়া তোমার শিকেয় উঠলো গো! বুঝলে?"

মানসী হয়তো বা একটু ইতস্তত: করতো, কিন্তু সুখময়ের কথায় গেলো ক্ষেপে। বললো, "ফুলটুশ যাবে না বলে আমার যাওয়া শিকেয় উঠবে, এ যদি ভেবে থাকো ভুল ভেবেছো। পুরী আমি যাবোই। ছেলে বড়ো হয়েছে একলা থাকবে, তাতে ভাবনার কি আছে?"

"ভাবনার কিছু নেই? বাঃ! লোকে তাহলে বলবে কি?" এই কথা বলেছিলেন সুখময়, এর বেশি কোনো কথা আর জোগায়নি তাঁর। কথায় তিনি চিরদিনই অপটু। বাক্‌পটু মানসীর কাছে প্রতিপদে তাঁর হার!

ছেলের উপর অভিমান হওয়াটা মানসীরও অন্যায় নয়। কতো দিনের কতো ইচ্ছে, কতো স্বপ্ন, কতো চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে নানা অসুবিধেয় পড়ে পড়ে, সে সব ইতিহাস কি ফুলটুশের অজানা? কিন্তু বড়ো আত্মকেন্দ্রিক ছেলে! তাছাড়া—মাকে আলাদা করে একটা মানুষ বলেও যেন ভাবেনা।

মা তো মা! রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘরের সীমায় আবদ্ধ সাধারণ এক মেয়ে মাত্র। স্বামীপুত্রের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর, আর তাঁদের ত্রুটি আবিষ্কারে শ্যেনচক্ষু এবং বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য এইসব মেয়ে মাত্রদের ফুলটুশ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখে থাকে।...মানসী কি আর সে কথা বুঝতে পারেনা?

স্বামীর কথায় মানসী গম্ভীর হয়ে বলেছিলো, "লোকে কি বলে, আর কি না বলে, সে কথা কথামালায় লেখা আছে। ভুলে গিয়ে থাকো খুলে দেখতে পারো।"

ব্যস, এরপরে আর সুখময় না যাওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেননি, বাক্স বিছানা বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সুখময়ের ছুটি না ফুরোতেই ফুলটুশের অসুখের বার্তা গেলো। যদিও ফুলটুশ নিজে মান খুইয়ে লেখেনি "আমার কষ্ট হচ্ছে তোমরা এসো," তবু

না বাপ আর কোন প্রাণে মান নিয়ে বসে থাকবে?

চিঠি পেয়েই উৎকণ্ঠিত সুখময় নিজস্ব ঢিলেমি পরিত্যাগ করে একদিন তোড়জোড় করে পুরীর বাসা ভেঙে বেরিয়ে এলেন, অথচ মানসী যেন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে ঢিলে হয়ে গেলো। কোনো ব্যাপারেই ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিলো না।

চিরদিনের আত্মসমর্পিত সুখময় মানসীর এই নিষ্ক্রিয়তায় অসুবিধে বোধ করলে, ওটাকে ছেলের জন্য মায়ের মনের দুশ্চিন্তা বলেই মেনে নিতে চাইছিলেন, কিন্তু তাই বা মেনে নেওয়া যাচ্ছে কই? মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠার চিহ্ন মানসীর চোখে মুখে কোথায়?

এ আর কিছু। অন্য কোনো কিছু। যা সুখময়ের বোধের বাইরের জিনিস। এই যে স্তব্ধমূর্তি মানসী, একে যেন ধরা-ছোঁয়া যায় না।

তবু শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছেন সুখময়—কিছু নয়, ওই ছেলের উপর অভিমানেরই প্রতিক্রিয়া। ফুলটুশ যদি তাঁদের সঙ্গে আসতো, এসবের কিছুই তো হতো না। সত্যি, ভারী ইচ্ছে ছিলো মানসীর কোণারক যাবার। সমস্ত ঠিক ছিলো, মাত্র একটা দিনের জন্যে হলো না। সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন প্রফেসর সেন। তা—প্রফেসর সেনেরও একই অবস্থা, তাঁরও তো হঠাৎ কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম গেলো!

অবশ্য একই দিনে প্রফেসারেরও কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা হয়ে সুখময়ের যথেষ্ট সুবিধে হয়ে গেলো। সেই ভদ্রলোকই তো তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু তারপর আর দেখা হলো না। নিজে যে কখন কোন গাড়িতে উঠে পড়লেন! গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর যুৎ করে বসে সুখময় বললেন, "আচ্ছা হ্যাঁ গো, প্রফেসর কোন গাড়িতে উঠলো বলো তো? সব কামরাগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, কই? স্টেশনে এসে, গেলো কোথায় লোকটা? তোমাকে পৌঁছে দিয়েই একেবারে উধাও!"

মানসী কঠিন একটা হাসি হেসে বলেছে, "পৌঁছে দিয়েই গেছে তো? আমায় নিয়ে তো কোথাও উধাও হয়ে যায়নি? দুশ্চিন্তার কি আছে?"

সুখময় এ বিদ্রূপের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নি, কারণ লক্ষ্য করেছেন পুরীতে এসে ছেলের অনুপস্থিতির সুযোগেই হয়তো মানসী যেন একটু বেশি বাচাল হয়ে উঠেছিল, একটু বেশি চপল।

উত্তর না দিয়ে আবার নেমে পড়ে যতক্ষণ না গাড়ি ছেড়েছে ঘোরাঘুরি করে এসেছিলেন সুখময়, কিন্তু পাত্তা পান নি প্রবাসের নতুন আলাপী বন্ধুটির। গাড়ি ছেড়ে দিতে আর উপায় কি? ক্ষীণ আশা ছিলো হাওড়ায় নেমে দেখা হবে, তাও হলো না।

বিনি পয়সায় কোনো এক বন্ধুর একখানা বাড়ি পাওয়া গিয়েছিলো পুরীতে, তাই না জগন্নাথের ভাগ্যি ফিরেছিলো! ভারী চমৎকার বাড়ি, মায় আসবাবপত্র। বেশ ছিলেন সুখময়, সইলো না। একদিনের মধ্যে হঠাৎ সংসার উঠিয়ে চলে আসা, বাড়িওয়ালা বন্ধুকে জানাবার সময় পর্যন্ত হলো না। বন্ধুর এক ভাইপো না কে থাকে দু'মাইল দূরে চক্রতীর্থে, সুখময় ছুটেছিলেন তার কাছে চাবিটা দিয়ে দিতে, আর প্রফেসর সেনের ঘাড়ে যতো লটবহর আর মানসীকে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্টেশনে পৌঁছে দিতে। আশ্চর্য! পৌঁছে দিয়ে কোথায় যে গেলো ভদ্রলোক, একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত দেওয়া হলো না।

খানিকটা পর্যন্ত গল্প করবার চেষ্টা করে সুবিধে না হওয়ায় শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সুখময়, আর শ্লেটপাথরের মতো ভাবশূন্য মুখ নিয়ে বসে রইল মানসী, ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়।

চৈতন্য ফিরলো হাওড়া স্টেশনে নেমে।

জিনিসপত্র নিয়ে বেসামাল সুখময়কে দেখেই বোধকরি হঠাৎ করুণা ফিরলো, ফিরিয়ে আনলো মানসী নিজেকে নিজের মধ্যে। অভ্যস্ত নিপুণতায় সব সামলে ট্যাক্সীতে উঠে বসলো সুখময়কে নিয়ে।···দিনের আলোয় বুঝি নিজেকে ফিরে পাওয়া সহজ হয়, রাত্রি বড়ো ভয়ঙ্কর!

ট্যাক্সীতে উঠে বসে সুখময় বলেন, "যাক বাবা, এতক্ষণে বিশ্বাস হচ্ছে বাড়ি ফিরতে পারবো! উঃ ইচ্ছে ক'রে আবার মানুষে

বিদেশে যায়। এখন গিয়ে ছেলেটাকে কেমন দেখবো কে জানে!"

মানসীর দিক থেকে উত্তর এলো না।

ভারী অস্বস্তি হতে থাকে সুখময়ের। সাধাসিধে ভালোমানুষ, নীরবতাকে তাঁর বড়ো ভয়!

এবার বলে ওঠেন, "তোমার যা রাগ রাগ ভাব দেখছি এখনো। ছেলেটাকে যেন বেশি ইয়ে করো না।"

মানসী এবার কথা কইলো, "কিযে করো না"।

"আহা বুঝতে পারছো না? মানে আর কি ইয়ে"—

"আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি!"

"বুঝবে না আবার?" সুখময় একগাল হেসে বলেন, "হাঁ করলে পেটের কথা বুঝতে পারো তুমি! ওই জন্যেই তো নিশ্চিন্দি থাকি।"

হ্যাঁ এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন সুখময়।

বাড়িতে নেবেই সুখময় হৈ হৈ করে ওঠেন, "কি রে ফুলটুশ, কী কাণ্ড। এই ক'দিনেই জ্বর বাধিয়ে বসে আছিস? আমরা তো ভেবে-চিন্তে অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি—"

ফুলটুশ একেবারে মা বাপের প্রকৃতির বিপরীত! বিনা প্রয়োজনে কথা কয়না, যা কয় তাও ভাষার এবং স্বরের ওজন রেখে। তাই এই হৈ হৈ প্রশ্নের উত্তরে মৃদু অনুযোগের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, "এর জন্যে তাড়াতাড়ি চলে আসবার কি দরকার ছিলো?"

"দরকার ছিলো না? বলিস কিরে? আমার কথা না হয় ছেড়েই দে, আমি বেটাছেলে কিন্তু তোর মা? তোর মা পারতো এ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে?

ফুলটুশ মুচকে হেসে বলে, "মা ঠিকই পারতেন, পারতেন না আপনিই।"

"বাঃ আমি পারতাম না মানে? বেটাছেলের আবার অতো 'ইয়ে' কি? তোমার মার অবস্থা দেখোনা? চিঠি পেয়ে পর্যন্ত মুখে বাক্যিটি নেই, চুপচাপ গম্ভীর।"

ফুলটুশ ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে, "সেই জন্যেই তো খবর দিতে

চাইনি। কেষ্টা একেবারে 'চিঠি দাও চিঠি দাও' করে পাগল করতে লাগলো। ওরও জ্বর হয়েছিলো, পেরে উঠছিলো না—"

"হুঁ তাই তো বলি, ক'টা দিন আমরা বাড়ি নেই, ইতিমধ্যেই কেষ্টার জ্বর, তোমার জ্বর! সাধে কি আর বাড়ি ছেড়ে বেরোই না!"

গম্ভীর-প্রকৃতি ফুলটুশ আর একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "আপনারা থাকলেও এসব হ'তে পারতো, আটকাতে পারতেন না।"

পিতাপুত্রে কথা হোক, মানসী নিজের কাজে যায়। ক'দিন বাড়ি ছিলো না, সংসারের অবস্থা কি হয়ে আছে কে জানে।

কিন্তু প্রথম দরকার স্নানের। স্নান করতে কলঘরে ঢুকেই মনে হলো—উঃ কী শ্যাওলা পড়েছে! আর একটু হলেই পা পিছলোতো; তড়বড়ে মানুষ সুখময়, ভারী শরীর নিয়ে নির্ঘাত এক্ষুনি আছাড় খাবেন। এই দণ্ডে রগড়ে সাফ করে দিয়ে যাওয়া দরকার।

অভ্যাসের বশে তাকিয়ে দেখলো দেওয়ালে সাঁটা ব্র্যাকেট দেওয়া তাকটার উপর। হ্যাঁ ঠিক আছে ব্লীচিং পাউডারের বোতল আর মেঝে ঘসবার কড়া বুরুশটা। ঠিক না থাকবে কেন, কারো হাত তো পড়েনি! মানসী ছমাস বাইরে থাকলেই কি পড়তো?

মানসীর মতো এতো হুঁশিয়ার আর কে হবে? নিয়মী মানসীর সংসার করার পদ্ধতি ঘড়ির কাঁটার মতোই নির্ভুল। পৃথিবী উল্টে গেলেও মানসীর সংসার রাজ্যে অনিয়ম ঢুকতে পায় না। সপ্তাহে দুদিন করে কলতলা রগড়ানো, প্রত্যেক রবিবারে ঘরের ঝুল ঝাড়া, কাপড় ধোপাবাড়ি দেওয়া আর বালিশের ওয়াড়ে সাবান ঘসা, মাসে দুদিন করে কয়লার গুঁড়ো গুল্ পাকানো, আর দৈনিক দু'বার করে ভাঁড়ারের শিশিবোতল মোছা এর ব্যতিক্রম হয় না কখনো। কেষ্ট তো সহকারী মাত্র। মূল সম্পাদনার ভার মানসীর নিজেরই হাতে।

কে জানে হয়তো এই জন্যেই ছেলে তার মাকে সংসারগতপ্রাণা মেয়েমানুষ মাত্র ভেবে অবজ্ঞা করে!

বুরুশটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘসতে ঘসতে কেমন

অবাক হয়ে যায় মানসী। এইতো সেই চিরপরিচিত পরিবেশ, সেই চিরদিনের মানসী!

তবে সে মানসী কে? যে মানসী উচ্ছ্বসিত আনন্দে সমুদ্রের ধারে ছুটোছুটি করে ঝিনুক কুড়িয়েছে, আবার খানিক পরে উচ্ছল চঞ্চলতায় জড়োকরা ঝিনুকের রাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেসে কুটিকুটি হয়েছে! কে সে? সে কী একটি তরুণী মেয়ে? যে মেয়ে খুশিতে চঞ্চল আর অভিমানে ছলছল হয়ে উঠতে পারে, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যার হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়, আর যার সমস্ত মন উদগ্রীব হয়ে থাকে অজানিত কী এক দুর্লভের আশায়!

ঘুমন্ত-পুরীর রাজকন্যার মতো সেই মেয়ে কি ঘুমিয়েছিলো আটত্রিশ বছরের রোদে জলে মজবুত এই আবরণটার মধ্যে অজানা কোনো কক্ষে? হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে সে তাকিয়েছে খোলা জানালার দিকে? তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে এই জানালাটা কোথায় ছিলো? কে রেখেছিলো বন্ধ করে? এই যে রৌদ্রোজ্জ্বল আলোর ঝলক, এ তা'র ঘরে কোনদিন তো কই ঢোকে নি!

এতোগুলো কথা এতো পরিষ্কার করে ভাবতে পেরেছিলো মানসী, এ কথা বললে ভুল হবে। অস্পষ্ট এমনি একটা ভাব যেন ভেসে যাচ্ছিলো মনের মধ্যে, আর হাতটা চলছিলো দ্রুত—যেন কঠিন পণ করেছে একবিন্দু শ্যাওলা থাকতে দেবে না কোথাও। ঘসে ঘসে সমস্ত তুলে ফেলবে। দেখবে যাতে না পা পিছলোয়।

স্নান সেরে রান্নাঘরে এসে বসতেই বুঝি ফিরে এলো গৃহিণী মানসী। যে পাকাপোক্ত মানুষটি অতঃপর চাকরকে ডেকে বকাবকি করতে পারবে ঘর অপরিষ্কার করে রেখেছে বলে, রাগারাগি করতে পারবে দু'দুটো মানুষের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও একমাসের কয়লা সাতাশ দিনে ফুরিয়েছে ব'লে, লেগে যাবে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ক'দিনের বিশৃঙ্খলা সাফ করতে। মন নিয়ে বিলাস করবার কল্পনা করা চলে না এখন। এখন মনটা গৌণ!

হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে সুখময় বলেন, "হ্যাঁরে কেষ্ট, তোর মা অত বকাবকি করছিলো কেন রে?"

কেষ্ট মাথা চুলকে বলে, "বাসনের সিঁদুকের ডালা খোলা ছিলো, আরশুলো ঢুকে নোংরা করেছে তাই।"

সুখময় হেসে ওঠেন, "ইতিমধ্যেই বাসনের সিন্দুক দেখা হয়ে গেছে?"

"শুধু বাসনের সিঁদুক? হুঁ!" কেষ্ট মুচকি হাসি হেসে বলে, "ইদুরের গর্তগুলো পর্যন্ত দেখা হয়েছে কিনা, তাই বরং শুধোন বাবু।"

"তুই খুব বকুনি খাচ্ছিস তো?"

"আমি ছাড়া আর কোন্ ভাঙা কুলো বাড়িতে আছে?"

"তা তোর মায়ের কাছে আমারও নিস্তার নেই।" সুখময় পরিতৃপ্তিব হাসি হাসেন, "কিন্তু যাই বলিস কেষ্ট, তোর মা যে এই বকেঝকে রাগ-ঝাল করে, সেইটাই বেশ মানায় ওকে। চুপচাপ থাকলেই কেমন যেন আতঙ্ক হয়। হয় না রে?"

মা'র চুপচাপ থাকা! কেষ্ট স্মরণে আনতে পারে না। তবু কর্তা-বাবুর মান রাখতে বলে, "আজ্ঞে তা হয়।"

"ওই তো কথা! তোর দাদাবাবুর চিঠি যাওয়া মাত্র এমন গুম্ হয়ে গেলো, বুঝলি, আমার যেন ভয়ে হাত পা ছেড়ে আসছিলো!"

কেষ্ট গম্ভীরভাবে বলে, "মাকে যে ভয় না করবে সে এখনো তার মার গর্ভে আছে।"

হা হা করে হেসে ওঠেন সুখময় কেষ্টর তুলনা দেবার ভঙ্গীতে। হাসি থামলে বলেন, "ওরে সব সময় কিন্তু তা' নয়। পুরীতে গিয়ে যা হয়ে উঠেছিলো, সে আবার বিপরীত। একদম ছেলেমানুষ। সে যা রগড়, তুই আর তোর দাদাবাবু যদি দেখতিস্!...মনে কর—তোর মা বালির গাদায় লাফালাফি করে ঝিনুক কুড়োচ্ছে!"

"য্যাঃ!" কেষ্ট অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

"এই দেখ্ বিশ্বাস করছিস না তো? তবে আর বলছি কি! আমি তো তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম!"

কেষ্টর মাধ্যমে কথাগুলো বলতে থাকেন সুখময়, ছেলের অবগতির জন্যেই। একান্ত ইচ্ছে যে ফুলটুশের সঙ্গে প্রবাসের অভিজ্ঞতার গল্প করেন, গল্প করেন তা'র মায়ের বালিকাসুলভ চপলতার, কিন্তু ছেলে এমন রাশভারী, তা'র সঙ্গে গল্প চালানো যায় না। হয়তো সুখময়ের সমস্ত আগ্রহের উত্তাপের উপর একেবারে অবহেলাব শীতল জল ঢেলে দেবে! তা'র চাইতে এ মন্দ নয়, যাকেই শোনান হোক, কথাগুলো কেষ্টকে উদ্দেশ্য করে বলা! তা ছাড়া—এমনি স্বভাবও সুখময়ের! কোন কথা কার সামনে বলা চলে, অথবা সব কথাই সকলের সামনের বলা চলে কিনা, এ বোধ তাঁর নেই। আপন খুশিতেই সব কথা বলে চলেন, সামনে কাউকে পেলেই হলো।

কেষ্ট বোঝে বাবু এখন গল্প করতে ইচ্ছুক, তাই চোখ গোল গোল করে বলে, "মা ঝিনুক কুড়োবে! তা'হলেই হয়েছে! ততোক্ষণ বরং ঘরের ঝুল ঝাড়বে।"

"ওরে না রে না! তোর মা'র সে এক আলাদা মূর্তি। এক বন্ধু জুটেছিলো, সেও তেমনি হাসিখুশি। দু'জনে জমতো ভালো। তর্ক করতে করতে দু'ঘণ্টাই কাবার করে দিলো হয়তো! শেষে আমি সাবধান করে দিতাম, রাত অবধি সমুদ্দুরের হাওয়া লাগলে অসুখ করবে।"

"ও বাবা! ওখেনেও আবার বন্ধু জুটেছিলো?"

"হ্যাঁ সে এক ভারী চমৎকার লোক! কলেজের মাস্টার! বে থা করেনি। পুরীতে নিজেদের বাড়ি আছে, ছুটি হলেই একটা চাকরকে নিয়ে ওখানে পালায়। এমন হাসিখুশি ভাল লোক তুই সাতজন্মেও দেখিসনি কেষ্ট! আবার তেমনি পণ্ডিত লোক, বুঝলি?"

সুখময় নিজেও হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু সেই বোধহীন হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তির চাইতেও একখানি বুদ্ধিমার্জিত চিত্তের সরস প্রসন্নতা যে অনেক উপাদেয়, এটুকু ধরা পড়েছে তাঁর বোধের সীমানায়। মানসীর সঙ্গে কোনদিনই কথায় পেরে ওঠেন না তিনি, তাই ভারী মজা লাগতো প্রফেসর সেনের আবির্ভাব ঘটলে। নাঃ

মানসীকে তর্কে হারাতে পারে এমন লোকও তা'হলে আছে? আর কথা কইতে বসলেই তো তর্ক লেগে যেতো দু'জনায়!

কিন্তু এতো কথাই বা মানসী শিখলো কবে?

এক এক সময়ে ভারী অবাক লাগতো সুখময়ের! সমাজনীতি, রাজনীতি, মানুষের সুনীতি আর দুর্নীতি—কোনোটাই তো বাদ পড়তো না ওদের আলোচনায়। এছাড়া ছিল সাহিত্য আলোচনা। সত্যি, এতো সব কখন জেনেছে মানসী? গল্প আর তর্ক চালিয়েও তো যেতো সমানে!

অবিশ্যি ওদের ওই তর্ক-বিতর্ক, পরিহাসের পরিভাষা, সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা সুখময়ের হতো না, তবু পরিবেশটি লাগতো ভালো। মানসীর এতো ঔজ্জ্বল্য বুঝি আর কখনো দেখেন নি সুখময়। যদিও এমনিতে মানসী, রীতিমত 'একখানি' মেয়ের মত মেয়ে। সুখময়ের উভয়কুলে এমন একখানি ঝকঝকে বৌ খুঁজে পাওয়া শক্ত! সব কিছুতেই সে বিশিষ্ট! এদিকে আবার সংসার-অন্ত প্রাণ, সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সাফল্যেই সে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেয়ারার জেলিটাকে সোনার বরণ করে তুলতে পারলে, অথবা ঘরের মেঝেটাকে মুছে মুছে সিঁদুর বরণ করে তুলতে পারলেও আনন্দের অবধি থাকে না মানসীর। ওই নিয়েই থাকে, ওইতেই মুগ্ধ! আপন কর্মনৈপুণ্যে আপনিই মোহিত! ছোট্ট এই সংসারটুকুকে কেন্দ্র করে যেন নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে আছে মানসী!

কিন্তু সংসারের বাইরে গিয়ে দেখলেন সুখময় মানসীর আর এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য। এটা অপরিচিত। খুব ভালো লাগে, তবু একটু যেন ভয় ভয় করে।

কেষ্ট আর সুখময়ের আলাপের মাঝখানে পড়লো ছোট্ট একটি প্রশ্নের ঢিল।

"প্রফেসরটি কোথাকার?"

চুপ করে শুয়েছিল ফুলটুশ, চাদর একখানা গলা অবধি ঢাকা দিয়ে। হয়তো বা চোখও বুজে। এতোক্ষণে ছোট্ট এতটুকু সাড়া পাওয়া গেলো তার দিক থেকে।

কৃতার্থমন্য সুখময় তাড়াতাড়ি বলেন, "সেন্ট জেভিয়ার্সের। এমন অমায়িক আর ভদ্র, বুঝলি ফুলটুশ, বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক যতক্ষণ না আসতেন, আমাদের যেন জমতোই না। বিকেলের চা খাওয়াটা তো আমরা তুলেই রাখতাম তাঁর অপেক্ষায়।"

"খুব খাওয়ানো হতো বোধহয়?" নিরীহ মন্তব্য করে ফুলটুশ।

"সে আর বলতে!" সুখময় জোরে হেসে ওঠেন, "তোমার মায়ের কাণ্ড তো!"

"ঠিকই বুঝেছি। বিনি পয়সায় চা জলখাবারটা চলে গেলে সকলেই অমায়িক হতে পারে।"

ঠিক এই সময় মানসী ঘরে ঢোকে একটা ঝাড়ন হাতে করে। ছেলের কথার শেষাংশটুকু তা'র কানে গেছে কিনা বোঝা যায় না। আপনমনে জোরে জোরে ঝাড়তে থাকে টেবিল আলমারী খাট।

কিছুই হতো না। নিজের কাজ সেরে চলে যেতো সে। কিন্তু সুখময়ের এখন ভয় কেটেছে। তাই স্ত্রীকে উদ্দেশ করে সহাস্যে বলেন, "শুনছো, তোমার পুত্ুরটির কথা শুনছো একবার? প্রফেসারের কথায় বলে কিনা বিনি পয়সায় খেতে পেলে সকলেই অমায়িক হতে পারে।"

মানসী মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে রূঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে, "তা বলবে বৈকি! যেমন নীচ মন, সেই রকম কথাই বলবে তো!"

কথাটা বলে আবার ছপাৎ ছপাৎ করে ঝাড়নটা আছড়াতে থাকে এখানে সেখানে, কিন্তু সুখময় যেন আড়ষ্ট হয়ে যান। মুখে আর কথা যোগায় না। ছেলের কাছেই যেন লজ্জায় মরে যান তিনি। এ কী অদ্ভুত অকারণ রূঢ়তা মানসীর! ছেলেকে এমন কথা তো জীবনে বলেনি সে?

পাঁচজনকে খাওয়ানোর বাতিক মানসীর বরাবরের। আর বরাবরই তো ফুলটুশ এ নিয়ে মাকে ব্যঙ্গ করে। কই সেসব কথা তো মানসী কখনো ধর্তব্য করে না। অবহেলায় উড়িয়ে দেয়। ছেলের সঙ্গে তর্ক ক'রে বলে—"আরো বেশি করে খাওয়াবো! ভবিষ্যতের

খাওয়াগুলোও খাইয়ে রাখবো। নইলে তোর সংসারে এসে তো একবিন্দু জলও কেউ পাবে না?"

গম্ভীর ফুলটুশকে সুখময় বরং সমীহ করে চলেন একটু, কিন্তু মানসী তো গ্রাহ্যও করে না। এখনো ছেলের কান মলে দিতেও হাত বাড়ায় সে। কিন্তু আজকের মতো এমন কাঠিন্য কোনো দিন দেখা যায় না। এতো অগ্রাহ্য করা নয়, রীতিমত গ্রাহ্যই করা।

ম্রিয়মাণ মুখে পড়া-খবরের কাগজখানা আবার মুখের সামনে তুলে ধরেন সুখময়। মানসী নিজের কাজ সেরে নিঃশব্দে চলে যায়। আর ফুলটুশ চাদরটা মুখ অবধি টেনে ঢাকা দিয়ে বোধকরি ঘুমিয়েই পড়ে।

মনে হয় তিনটি মানুষের উপস্থিতি দিয়ে গড়া নিটোল ছোট্ট এই সংসার-পেয়ালাখানির কোথায় বুঝি একটু চিড় খেয়েছে। ঠিক খাপে খাপে আর বসবে না। সংসারের যে খাঁজটা ছিলো মানসীর জন্য নির্দিষ্ট. সে খাঁজটা কি হঠাৎ ছোট্ট হয়ে গেছে? তাই মানসীকে আর সেখানে আটকাবে না? নাকি বিরাট সমুদ্রের হাওয়া লেগে মানসীই বিরাট হয়ে উঠেছে, এই ছোট্ট পরিবারের মধ্যে নিজেকে আর ধরাতে পারবে না সে।

ভাঁড়ারঘরের বিশুদ্ধতায় যত্নশীল মানসীর ভাঁড়ারের শিশি-বোতল মোছার ঝাড়ন আলাদা। ও ঘর থেকে এসে অভ্যস্ত প্রথায় হাত ধুয়ে বিশেষ সেই ঝাড়নখানা হাতে নিতে গিয়েই সে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

কী দরকার! কী দরকার তার এই অর্থহীন পরিশ্রমে? কেন? মানসী আজীবন নিজেকে ক্ষয় করে এলো অকিঞ্চিৎকর কতকগুলো বস্তুর সেবায়? কী এসে যায়, যদি ওই শিশি-বোতল আর কৌটো-গুলোর আশেপাশে জমে ধুলো বালি আর মাকড়শার জাল? কী ক্ষতি হয় যদি কড়িবরগার কোণে কোণে জমে ওঠে ঝুল? কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, যদি বালিশের ওপর পড়ে তেলের ছাপ, আর ঘরের মেঝেটা হয়ে ওঠে ধুলিধূসর?

মানসী কি এমনই মূল্যহীন, যে তার সারাজীবনের ফসল শুধু ফিটফাট একখানি ছোট্টঘর। একটুকুর জন্যই সে লালায়িত? এই তার চরম পাওয়া? এর বাইরে, এর উর্ধ্বে, আর কোথাও কিছু পাবার নেই তার? যেখানে কেবলমাত্র মানসী বলেই তার মস্ত একটা মূল্য আছে, যেখানে সে কেবলমাত্র ফুলটুশের মা নয়, সুখময়ের গৃহিণী আর সংসারের কর্ত্রী নয়, শুধুই মানসী।

ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে যায় মানসী, ডুবে যায় আপন গভীরতায়। তখন আর কিছুই সে ভাবতে পারে না, শুধু লক্ষ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

আবার হঠাৎ এক সময় ঝট্ করে উঠে পড়ে বিলুপ্তির সেই নিঃসীম গভীরতা থেকে। শাড়ির আঁচলটা আরো আঁটো করে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যায়।

ছি ছি ভূতে পেয়েছে না কি তাকে, তাই চারিদিকে ছিষ্টির কাজ ছড়িয়ে রেখে আপনার মন নিয়ে খেলা করছে? ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত ধারালো গলায় ডাক দেয়, "ওরে ও কেষ্ট? অ মুখপোড়া বাঁদর, এখন কি রাজকার্য হচ্ছে শুনি? বাজারে যেতে হবে না?

কেষ্ট ওদিক থেকে বড়ো গলায় জবাব দেয়, "আমি এখন বাবুর জুতো সাফ করছি।"

"তবে আর কি, মাথা কিনেছিস! চট্‌পট্ হাত ধুয়ে নে বলছি।"

কেষ্ট অসন্তুষ্ট স্বরে বলে, "হুকুমটি তো হয়ে গেলো ইদিকে বাবুর জুতো জোড়াটির চেহারাখানা কেমন হয়েছে, তা দেখেছেন?"

"আমার দেখবার ভারী গরজ পড়েছে। তোর অত দরদ থাকে সারাদুপুর ধরে দেখিস। এখন মাছ তরকারিগুলো তাড়াতাড়ি এনে দিয়ে আমায় উদ্ধার কর দিকি।"

ছেলেবেলা থেকে আছে কেষ্ট, মনিবানীর আর তার মধ্যে বাক্য বিন্যাস প্রণালী এই রকম।

কেষ্ট গজগজ করতে করতে উঠে হাত ধুয়ে বলে, "কই টাকা

ঘরে ? এক দণ্ড যদি কাউকে স্বস্তি দেবে ! এইতো শুনলাম কচি ছেলের মতন বালির গাদায় দৌড়ে ঝিনুক কুড়োনো হয়েছে, এখানে এসেই একেবারে—”

মানসী নোটখানা ফেলে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে, “শুনলি বুঝি ? এতো ভালো কথা এখুনি কার কাছে শুনলি ?”

“কার কাছে আবার শুনবো, সঙ্গে কে এত নশো পঞ্চাশ জন গেছলো !···কি আনতে হবে কি ?”

“আমি জানিনা, যার কাছ থেকে এতো সব ভালো ভালো কথা শুনেছিস, তার কাছে কাজের কথাও শুনগে যা।” ব’লে মানসী ভাঁড়ার ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

এমনি করেই কয়েকটা দিন কাটে।

চলে আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা, চলে বাস্তব আর স্বপ্নর অদৃশ্য দ্বন্দ্ব। চলে সত্য আর মিথ্যার যাচাই। কে নিঃসংশয় করে দেবে মানসীকে এখন কি তার কর্তব্য ? কে তাকে নিশ্চিত করে বলে দেবে···তার আটত্রিশ বছরের এই আঁটসাঁট জীবনটা অর্থহীন মিথ্যা, সত্য শুধু সদ্য বিগত কয়েকটি দিন মাত্র ?

অথবা যদি কেউ চাবুক মেরে সচেতন করে দেয় মানসীকে, যদি বুঝিয়ে দেয় ‘তুমি কেউ নও, তুমি শুধু এ সংসারে কর্ত্রী অতি সাধারণ তুমি—যে তুমি স্বপ্নহীন, কুয়াশাহীন, রহস্যহীন, এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তর পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছো অনেকের মধ্যে একজন হয়ে, অনেকের মত একজন !’···তাহলেও বুঝি বেঁচে যায় মানসী।

সত্যিই বেঁচে যায়। আগের মত সংসার করে বাঁচে। বাঁচে বয়স্ক শিশু সুখময়ের প্রতি অপরিসীম মমতা নিয়ে, গম্ভীর প্রকৃতি ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে অনিচ্ছে আর রাগ অভিমানের কৃত্রিম দ্বন্দ্ব নিয়ে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিখুঁৎ কর্তব্যপালনের আত্মতৃপ্তি নিয়ে, সমস্ত দিনব্যাপী অনলস কর্মতপস্যা আর সারা রাত্রিব্যাপী নিশ্চিদ্র ঘুম নিয়ে যে ভাবে সংসার করে এলো এতদিন। যে জীবননির্ঝরিণী স্বচ্ছন্দ-গতিতে গড়িয়ে বয়ে গেলো অনেকগুলো বর্ষা আর বসন্তের উপলখণ্ড

অন্যমনস্কতা নেই, নেই কোন প্রশ্ন!

কিন্তু সত্যিই কি যায়? কোথাও কি বাধে না?

যে সম্পত্তির জন্য একবার কোথাও চড়াদরের আশ্বাস মেলে, সে সম্পত্তি সস্তাদরে বিকিয়ে দিতে মন চায় কি? দ্বন্দ্ব তো এই প্রশ্নের কাছে।

তবু আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসা চড়াদরের আশ্বাস, আবার যেন নিজেকে নিজের নির্দিষ্ট খাঁজে বসিয়ে নেয় মানসী। "মহাপ্রসাদ" বিতরণের ছুতায় পিসশাশুড়ী আর মামাশাশুড়ীর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গল্প করে, "আহা! এ ক'টা দিন যে কী আনন্দেই কাটিয়ে এলাম! চোখ তুললেই মন্দিরের চুড়ো, চোখ ফেরালেই নীল সমুদ্র! ইচ্ছে হতো না যে আর ফিরে আসি।"

চিরদিনের বাক্যবাগীশ মানসী, কথা জোগাতে আটকায় না তার।

পিসতুতো ছাওর সুকুমার হেসে বলে, "হুঁ, ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিলো না বৈ কি! আপনার যা সংসারে আসক্তি, নিশ্চয় জগন্নাথ দেখতে পুঁইমাচা দেখেছেন।"

"ইস, তা বলে তা নয় মশাই! আমরা মেয়েরা আঁকড়াতেও জানি, ছাড়তেও জানি।"

"ছাড়তে? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না। ক'খানা কটকী শাড়ি আর ক'বস্তা ক্ষেত্তরের কাঁসা কেনা হলো?"

শুনে ঝরঝর করে হেসে ওঠে মানসী—"সে দুঃখের কথা আর বোল না ভাই, শুনলে আবার নতুন করে দুঃখ উথলে উঠবে আমার! ওই ঝগড়া নিয়ে ফিরে আসার সময় তোমার দাদার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ।"

সুকুমার সজোরে হেসে ওঠে, "দাদার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ আপনার? ভাঁওতা আর দেবেন না বৌদি!"

মানসী আর সুখময়ের দাম্পত্যপ্রেম এদের কাছে আদর্শস্থল। তাই এহেন অবিশ্বাসের হাসি হাসে সুকুমার।

মানসী উদাসীন সুরে বলে, "বেশ বিশ্বাস না করো ভালোই।

ছটাকও ক্ষেত্তরের কাঁসা খুঁজে পাও কিনা।"

"বলেন কি! এমন অঘটনটা ঘটলো কিসে?"

"ওই তো কথা! প্রথমে তোমার দাদা বললেন—'ফেরার সময় কিনলেই হবে। আগে থেকে কতকগুলো জিনিস জড়ো করে লাভ কি? বাড়ি চাবি দিয়ে বেড়াতে যাওয়া হয়! আমিও ভাই সেই আশ্বাসে ছিলাম। ব্যাস, এদিকে ফুলটুশবাবু জ্বরে পড়লেন, আর ওদিকে ছ'ঘণ্টার নোটিশে সংসার উৎপাটন! কোথায় বা আমার কটকী শাড়ি, কোথায় বা মোষের শিঙের খেলনা, কোথায় বা সস্তা বাসন!"

এমন কথা অজস্র বলতে পারে মানসী, বলেও। যে ভাবে কাটিয়ে এসেছে এতদিন, যে ভাষায় কথা কয়ে এসেছে, তার পরিবর্তন যেন না হয়। যেটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো, সেটা যদি আজ চেষ্টাকৃতও হয়, তাও হোক! কোথাও কোনো ফাঁক না ধরা পড়ে। মানসীর নিজের কাছেই যে বস্তুর আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো, শাড়ি বাসন সংগ্রহের কথা যে মনেই পড়েনি, সে কথা স্বীকার করা সহজ নয়। তাই স্বামী সোহাগিনী সুখী গৃহিণীর মতো স্বামীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে কৌতুক করতেই হয়। ছন্দপতন হ'লে তো চলবে না।

হয়তো এমনি করে সঙ্গতি আর শোভনতার মুখ চেয়ে চলতে চলতে ক্রমশঃ জীবনের উপর যে স্তর পড়তে থাকতো, সে স্তর উত্তরোত্তর ঘন হয়ে উঠতো, কঠিন হয়ে উঠতো, আর সেই ঘন কঠিন স্তরটার নীচে চাপা পড়ে যেতো ক্ষণিক দুর্বলতার বিভ্রান্তি। চাপা পড়ে যেতো সহসা-আবিষ্কৃত এক নতুন সত্য। হয়তো আবার সহজ হয়ে যেতো মানসী! শীতের সময় ঘটা করে কুমড়ো বড়ি দিতো, আর গরমের সময় লাগাতো আমের আচারের ধুম। প্রতিটি রবিবারে ঘরের ঝুল ঝাড়তো, আর প্রতিটি বেস্পতিবারে বদলাতো লক্ষ্মীর ঘটের শুকনো নির্মাল্য! আর কিছুই নয়। শুধু হয়তো দৈবাৎ কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে একটা অর্থহীন দীর্ঘশ্বাস

নিঃশব্দে মিলিয়ে যেতো অন্তহীন ইথার তরঙ্গে। হয়তো কোনো কর্মহীন সন্ধ্যায় উলের কোনো নতুন প্যাটার্নের কৌশল নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে ঘরের আলো নিবিয়ে চুপচাপ খানিক বসে থাকতে ইচ্ছে হ'তো. হয়তো কোনো মেঘলা দুপুরে অকারণ একটা মনখারাপের ভারে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দৈনিন্দন কাজগুলো অর্থ-হীন মনে হতো, আর নিজেকে ভারী তুচ্ছ লাগতো! এ ছাড়া কিছুই নয়! কিন্তু নিবন্ত আগুনকে খুঁচিয়ে তুলে সেই আগুনকে নিজের ঘরের মটকায় লাগিয়ে বসে, এমন নির্বোধও যে জগতে মাঝে মাঝে মেলে। সুখময় তার একটি উদাহরণ।

অথবা ঘরের চালে আগুন লাগার ব্যাপারে সুখময়ের নির্বুদ্ধিতাই একমাত্র দায়ী নয়, তার গ্রহনক্ষত্রের কারসাজিও ছিলো।

নইলে—কিন্তু থাক সে কথা, ঘটনাটাই বলি।

আসন্ন শীতের সেই ক্ষণস্থায়ী বিকেলটুকুতে কি ঘটলো সেই কথাই হোক। বিকেলটা উত্তরোত্তর ছোট হ'তে হ'তে যখন পাঁচটা না বাজতেই পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামে, যখন দক্ষিণের জানালাটা খোলা থাকলে আঁচলটা গায়ে টেনে দিতে ইচ্ছে করে, যখন সন্ধ্যার হিম পড়ে সেঁতিয়ে যাবার ভয়ে ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো তুলে আনতে গিয়ে বুকটা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে, তেমনি এক ক্ষণস্থায়ী বিকেলে সুখময় বাইরে থেকে ফিরেই ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন, "কই গো কোথায় তুমি! গেলে কোথায়?"

রান্নাঘর থেকে মুহূর্তে বেরিয়ে এলো মানসী, পাতলা ঝিরঝিরে গড়নের হালকা শরীরখানির সুবিধেয়! এতো খাটতে পারে মানসী হয়তো এই গঠন সৌকুমার্যের গুণে! এই লঘুছন্দ দেহের উপর বয়েস যেন নিজের ভার চাপিয়ে চাপিয়েও দাগ বসাতে পারে নি। বেরিয়ে এসে অভ্যস্ত ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে হেসে বলে ওঠে মানসী, "যাবো আর কোথায়? যাবার জায়গা থাকলে কি আর তোমার রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আগলে পড়ে থাকি?"

"বটে নাকি?" সুখময় হেসে ওঠেন হাহা করে। হাসির সঙ্গেই

বলেন, "যাবার জায়গা থাকলে বুঝি আমার সংসার ফেলে পালাতে ?"

"বলা যায় কি ? মন না মতি !"

"যাক্ রক্ষে, ভাগ্যিস জায়গা নেই। কিন্তু এসো শিগ্গির দেখবে, কাকে ধরে এনেছি।"

ধরে এনেছি! ধ্বক্ করে উঠলো মানসীর বুকের ভিতরটা।

এ আবার কি অপ্রত্যাশিত সংবাদ! কা'কে ধরে এনেছে সুখময়, কা'কে ধরে আনা সম্ভব ? তবে কি···দূর, দূর! জগতে কি আর লোক নেই? আর সুখময়ের কাছে তো সকল আত্মীয়-বন্ধুই পরম মূল্যবান!

চিন্তার গতি বাতাসের মতোই দৌড়য়, তবু তার মধ্যেই মানসী অবহেলার ভানে বলে, "কোথায় কে এমন অভাগা ছিলো যে, তোমার কাছেও ধরা পড়লো ?"

"তার মানে ?" সুখময় নতুন এক রহস্যের হাসি হাসেন, "আমার কাছে কেউ ধরা পড়তে পারে না ? বুকে হাত রেখে কথাটা বলছো তো ?"

"খুব বলছি! ওই আনন্দেই আছো বুঝি ?"

"ওই আনন্দেই তো আছি। যাক গে, এসো এসো।"

"রোসো আমার এখন তরকারি চড়েছে, পুড়ে যাবে।"

"আরে রাখো তোমার তরকারি! এমন লোককে ধরে এনেছি যে তরকারি পুড়ে' গেলেও লোকসান নেই। এসো তুমি, আমি চললাম। একলা বসিয়ে রেখে এসেছি, না পালায়।"

সুখময় তাড়াতাড়ি চলে যান বাইরের ঘরের দিকে। আর মানসী ত্বরিৎ পায়ে রান্নাঘরে ঢুকে, শিথিল ভঙ্গীতে বসে পড়ে ছোট চৌকিদার উপর। আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি! যে ব্যক্তি মানসীর নিস্তরঙ্গ জীবনে এনেছে এক অপরিচিত উদ্বেল তরঙ্গ!

একটু বসে থেকে চোখ পড়লো উনুনের উপর। কড়াই চাপানো রয়েছে, ওটা নামানো দরকার। নামিয়ে রেখে হাত ধুচ্ছে, সুখময় ওদিক থেকে আসতে ফের হাঁক দিলেন, "কই কি হলো ?"

মানসী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে কণ্ঠস্বরকে সহজ সংযত করে বলে, "চারদিক কাজ পড়ে, এখন তোমার ম্যাজিক দেখতে ছুটি! কে এসেছে—তাতো বললে না?"

"ভাবলাম চমকে দেবো, তা হলো না! এসেছে আমাদের প্রফেসর! আসতে কি চায়? অনেক কষ্টে ধরে বেঁধে এনেছি।"

"তা এতো ধরপাকড়ের দরকারটাই বা কি ছিলো? তাঁর অভাবে তোমার ঘুম হচ্ছিলো না?"

"নাঃ তোমার দেখছি এখনো রাগ যায়নি। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—"

"কি বলেছে শাস্ত্রে!"

"আঃ সবসময় কি আর অতো শাস্ত্রবচন মনে থাকে? যাকগে, সামনাসামনি যেন অগ্রাহ্য ভাব দেখিও না বুঝলে? ও ভাববে এখনো সেই তুচ্ছু রাগ পুষে রেখে তুমি—"

"কিন্তু রাগটা কিসের?"

"রাগটা কিসের? বাঃ বেশ বলেছো? সেই ইস্টিশনে হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি কি কম রেগে গিয়েছিলে? বুঝিনি যেন আমি? যাকগে—চলো এবার? কতোক্ষণ রান্না চলবে?"

"রান্না তো শিকেয় উঠলো! চলো, তোমারও যেমন দুর্মতি—"

•

দেড়টা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত ক্লাস ছিলো।

ক্লাশের পর খানিকক্ষণ লাইব্রেরী ঘরে বসে থেকে উঠে পড়লেন প্রফেসর সেন। ভালো লাগলো না বই ঘাঁটাতে। আসন্ন শীতের নিরুত্তাপ সূর্য যেন এখন থেকেই বিদায় প্রার্থনা করছে।

এমন ছায়াচ্ছন্ন ম্লান বিকেল, মনটাকে যেন বিকল করে দেয়, ভালো লাগে না ঘরের কোণ, আবার ভালো লাগে না বাইরেটাও।

অন্যমনস্কের মতো বেরিয়ে পড়লেন প্রফেসর। আর যেই কলেজ গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়েছেন, পিছন থেকে পিঠের উপর একটি ভারী ভারী মসৃণ থাবার স্পর্শ পেলেন।

চমকে না উঠে উপায় কি? সেই চম্‌কানির সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার লোক চমকে উঠলো একটি বেপরোয়া হাসির শব্দে। হাসির সঙ্গে কথা।

"কেমন, ভয় খাইয়ে দিয়েছি তো? তুমি যেমন আমাদের ভয় খাইয়ে রেখেছিলে, তার শোধ নিলাম।"

খোলামেলা স্বভাবের লোক সুখময় পুরীতে সেই কয়েকদিনের আলাপেই বয়সের দাবীতেপ্রফেসরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলেন।

প্রফেসর সুখময়ের আকস্মিক আক্রমণের চোট সামলে নিয়ে হাত তুলে একটি নমস্কার ক'রে বলেন, "ভয় কিসের?"

"নয়ই বা কিসের? অকস্মাৎ স্টেশন থেকে উধাও হয়ে গেলে, তারপরই নোপাত্তা! ব্যাপার কি? তোমার বান্ধবী তো রাগের চোটে তোমার নামই মুখে আনেন না। যাই বলো, এটা কিন্তু তোমার উচিত হয়নি। তখন কাজে পড়ে চলে যেতে হলেও, এতোদিনের মধ্যে খবরাখবর করবে তো একবার?"

সরল আনন্দে বলেন সুখময়।

প্রফেসর বলেন, "আমার কথা মনে ছিলো আপনাদের?"

"মনে থাকবে না? বাঃ! অতো ভাব, অতো ইয়ে, ভুলে যাবো? মুশকিল এই, তোমার বাড়ির ঠিকানা জানি না, অথচ কলেজও তো বন্ধই ছিলো এপর্যন্ত। কী করে গ্রেপ্তার করবো সেই ভাবনায়—ইয়ে—ঘুমই নেই যেন!"

"কি মুশকিল! আশ্চর্য তো!"

"আশ্চর্য মানে? বলি ভায়া, সেই আড্ডা, সেই আমোদ, সেই ইয়ে, সে সব কথা একবার মনে করো তো? বাইরে থেকে খোঁজ নিয়ে গেছি কোন কোন বারে তোমার ক্লাশ থাকে। আজ তাক বুঝে ধরেছি।"

"অফিস ছিলো না আপনার?"

পথ চলতে চলতে প্রশ্নোত্তর চলে। প্রফেসরের ভিতরে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সুখময়ের ভিতরটা গঙ্গাজলে ধোওয়া। অমনি নির্মল আনন্দময় মন কি প্রফেসরেরই ছিলো না? দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো

চিহ্নই তো ছিলো না সেখানে।…শুধু ক্ষণিক এক অসতর্কতায় সে প্রশান্তি গেছে হারিয়ে!

সুখময়ের বুদ্ধি প্রখর নয়, বাক্‌পটুতাও নেই, কিন্তু রহস্য ক'রে কথা বলার সাধটা ষোলোআনা! তাই তুচ্ছ কথাকেও চোখ মুখের ভঙ্গীর সাহায্যে রহস্যঘন করে তোলবার চেষ্টা করেন। অতএব প্রফেসরের এই প্রশ্নে সুখময়ের চোখ ভুরু দুইই নেচে ওঠে, "অফিস আছে বৈকি, সে কি আর উঠে গেছে এখুনি? কিন্তু বড়োসাহেবটি যে এই শর্মার একেবারে হাতের পুতুল। যা বলবো যা করবো, সব 'অলরাইট!' বেরিয়ে এলাম দু'ঘণ্টা আগে…তারপর খবর কি? আছো কেমন?"

"ভালোই! আপনি?"

"আমি? দেখতেই পাচ্ছো, দিন দিন মোটা হচ্ছি। গিন্নী অবশ্য মানতে চান না। তোমার কি মনে হচ্ছে হে?"

"কই আমি তো কিছু বুঝছি না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বোঝাবুঝির পালা বাড়ি গিয়ে হচ্ছে। চলো—উঠে পড়া যাক।"

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে দ্রুতপদে এগিয়ে যান সুখময়। একখানা বাস এসে দাঁড়িয়েছে, প্রয়োজনীয় নম্বরের।

প্রফেসর কুণ্ঠিতভাবে বলেন, "আজ থাক না?"

"কেন? আজ থাকবেই বা কেন? আজকের বাধাটা কি?"

"আজ একটু কাজ ছিলো—"

"আরে বাবা, কাজ তো রোজই আছে, আড্ডা দেবার সময় আর কতোটুকু মেলে! এ কী পুরীর বাড়ি যে, সকাল সন্ধ্যা খালি আড্ডা আর আড্ডা! বেশ থাকা গিয়েছিলো ক'টা দিন, কি বলো?"

প্রফেসর আরো কুণ্ঠিতভাবে বলেন, আপনার ছেলেটির কি যেন হয়েছিলো, সেরেছে তো?"

"সারবে না মানে? তার মায়ের হাতে পড়লে রোগবালাই দাঁড়াতে পায়? সেবার হাতটি কেমন? নিজের গিন্নীটি ব'লে বাড়িয়ে

বলছি না ভায়া, পাশকরা নার্স হার মানে।"

পত্নীগতপ্রাণ সুখময়ের সব কথার মধ্যে পত্নীপ্রসঙ্গ এসে হাজির হবেই।

শেষ চেষ্টা করেন প্রফেসর, আজকের দিনটা থাক সুখময়বাবু, আমি কথা দিচ্ছি শিগগিরই একদিন যাবো।"

"হুঁ, যেমন এতদিন ধরে গিয়েছিলে? হাতে পেয়ে আসামী ছেড়ে দেবো, আমায় এমন কাঁচা পুলিস পাও নি হে? আজ তোমায় না নিয়ে গিয়ে ছাড়বোই না। চলো সেই আগের মতো তিনজনে জমিয়ে বসে চা খাওয়া যাক! সত্যি বলতে—ওখান থেকে ফিরে চায়ের সময়টা ভারী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। মনের মিল এমনি জিনিস, কি বলো? নইলে ক'দিনেরই বা অভ্যেস?"

সারাপথ সুখময় এমনি কথার স্রোতে হাবুডুবু খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যান প্রফেসরকে। প্রথমদিকে দু'একটা কথা বলার পর প্রফেসর চুপ করেই গেছেন। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে এ যাওয়া যেন শুধু সুখময়ের আগ্রহাতিশয্যে সহজভাবে বেড়াতে যাওয়া মাত্র নয়, এর পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্য অশুভের আকর্ষণ।

নিরুত্তাপ সূর্য পশ্চিমে হেলার আগেই আরো নিরুত্তাপ হয়ে আসে। বুকের ভিতর শিরশির করে। তারই তলায় তলায় ছোট ছোট প্রশ্নের ঢেউ।...ফাঁকা ফাঁকা লাগতো কি কেবলমাত্র সুখময়েরই? আর কোথাও কোনোখানে ধরা পড়ে নি শূন্যতার স্পর্শ? সহজভাবে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে? কী জুটবে ভাগ্যে? তাচ্ছিল্য? বিরক্তি? ব্যঙ্গ? সুখময়ের মতো শিশু তো সবাই নয়!

গ্রন্থকীট প্রফেসর সেনের চল্লিশ বছরের অবিবাহিত জীবনে এই প্রথম এসেছিলো এক বিপর্যয়! পড়েছিলো এক নারীর পদচিহ্ন! আশ্চর্য অঘটন! তরুণী নয়, কুমারী নয়, এক পরিণতযৌবনা বিবাহিতা নারী। যার দাম্পত্যজীবন সুখের, অপরের হৃদয়চাঞ্চল্য যার কাছে হাস্যকর।

হ্যাঁ, হাস্যকর বৈ কি! প্রফেসরের মুহূর্তের সেই দুর্বলতার পরিচয়ে

হেসেই উঠেছিল মানসী! বলিষ্ঠ একটি করতলের নীচ থেকে হালকা নরম হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে হেসে উঠে বলেছিলো, "আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ তো।"

পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সেই মৃদু ভৎ'সনা সহ্য করতে পারেন নি প্রফেসর, পালিয়ে গিয়েছিলেন তাই স্টেশন থেকে। না, সেদিন তার নিজের দরকার পড়েনি, কলকাতায় আসবার। ওটা ছল। ওটা বানানো কথা। স্টেশনে আসবার কৈফিয়ৎ সৃষ্টি।

স্টেশন থেকে ফিরে গিয়ে সমুদ্রের কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন রাত বারোটা অবধি। কিসে উতলা হয়েছিলেন সেদিন? হতাশায়? বেদনায়? ক্ষোভে? না, উত্তাল হয়েছিলো সেদিন শুধু তীব্র একটা ক্রোধ? হ্যাঁ ক্রোধ নিজের উপর! ক্ষণিক সেই দুর্বলতার জন্য নিজেকে নিজে চাবুক মারতে ইচ্ছে হয়েছিলো সেদিন।...তারপর শান্ত হয়ে গিয়েছিলো সেই অস্থিরতা, স্থির হয়ে গিয়েছিলো পূর্ণিমার উদ্বেল সমুদ্র। ঝাপসা হয়ে এসেছিলো লজ্জাজনক সেই স্মৃতি। কিন্তু আবার কেন?

সব তো শেষ হয়ে গেছে! শুরুর আগেই সারা! আবার কোন কোমল ব্যঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কে জানে? কি প্রয়োজন ছিলো এর? অথচ চলেও এলেন।

নিতান্ত সরল এই লোকটাকে আঘাত দেওয়া বড় কঠিন। সুখময়কেই বা উপেক্ষা করবেন কোন হৃদয়ধর্মে? এই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্মল ভালোবাসার মূল্যই কি কম? একে অবহেলা করা? সে যে নিতান্তই মানবধর্মের বিরোধী। আবার এও সত্যি, এমনি নির্ভেজাল ভাললোকগুলোই সংসারে সবচেয়ে অঘটন ঘটায়!

মনে মনে ভয় ছিলো সুখময়ের, মানসী প্রসন্নভাবে অভ্যর্থনা করবে কি না! আজকাল এক এক সময়ে ওকে যেন ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু মানসীর ব্যবহারে বুকের বোঝা নেমে গেল। চমৎকৃত হয়ে গেলেন সুখময় মানসীর কৌতুক স্বচ্ছন্দ অভ্যর্থনায়।

সুখময় আশা করেন নি, কিন্তু প্রফেসর সেনই কি এমনটা ধারণা করেছিলেন?

ঘরে ঢুকেই গললগ্নীকৃত বাসে হাতজোড় করে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানায় মানসী, "নমস্কার। আসতে আজ্ঞা হোক। গরীবের বাড়িতে পদধূলি পড়লো তা'হলে ?"

সুখময় তাড়াতাড়ি করে বলেন, "পড়লো কি আর অমনি ? কতো সাধ্যসাধনা করে তবে—"

"তাই বুঝি ? তা সাধ্যসাধনা করে ওঁকে অসুবিধেয় ফেলাটা কি খুব উচিত হয়েছে ? হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বে আসতে হলো ওঁকে !"

"হলো তো বয়েই গেলো ! আমি কারুর ইচ্ছে অনিচ্ছের ধার ধারি না।" সুখময় প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠেন, "আবার আমরা এখানে আড্ডা বসাবো ঠিক করেছি !"

"একেবারে ঠিক করে ফেলেছো ? ওঁনার মত নিয়েছো।"

প্রফেসরের আনত মুখের প্রতি কটাক্ষপাত করে মুখ টিপে হাসে মানসী।

"মত ? বলেছি তো, আমি অতো মতামতের ধার ধারি না, প্রফেসর কি বলো ?"

এতোক্ষণে প্রফেসর কিঞ্চিৎ সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন, মৃদু হেসে বলেন, "কিছু বলবার স্কোপ আর দিচ্ছেন কই ? এক তরফা বিচার তো হয়েই গেছে।"

"দেখলে ?" সুখময় সগর্বে মানসীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন— "বিশ্বাস হলো ? বড়ো যে বলেছিলে ডাকলেও আসবে না ?"

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি কৃত্রিম আফশোসের সুরে মানসী বলে, "হায় কপাল ! এমন লোক যে কেন বনে না গিয়ে সংসার করেছে তাই ভাবি ! আড়ালে লোকে কাকে কি না বলে, তাই বলে ডেকে এনে সব ফাঁস করতে হবে ? নাঃ, পারা গেল না !"

"ফাঁস যখন হয়েই গেছে"—প্রফেসর মুখ তুলে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তখন উত্তরটাই স্পষ্ট করুন। সত্যিই কি সেই ধারণা ছিলো ?"

"বোধহয় ছিলো। ভেবেছিলাম রাজী থাকলেও সাহস হবে না হয়তো বা!"

সুখময় ব্যস্তভাবে স্ত্রীর কথায় ত্রুটি সংশোধন করেন, "শোনো কথা? সাহসের কথা ওঠে কিসে? বেচারা নিরীহ ভদ্রলোক! ও কি চুরি ডাকাতি করে ফেরার হয়েছিলো যে—"

"বলা যায় কি?" মানসী আর একদফা হেসে বলে, "যাক নির্ভয় হোন। নিঃশঙ্কচিত্তে যখন খুশি চলে আসবেন আমার নির্দেশ।"

সুখময় এবার নিশ্চিন্তচিত্তে বলেন, "কেমন? প্রফেসর, আর এড়াতে পারবে? এ আর গুঁফো সুখময়ের অনুরোধ নয় বাবা, এ একেবারে হার হাইনেসের অর্ডার।"

নিজের রসিকতায় নিজেই পরমানন্দে হাসতে থাকেন সুখময়।

"এতো ঠাণ্ডায় তুমি আবার স্নান করবে?"

স্ত্রীর প্রশ্নে সচকিত সুখময় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ চান করবো বৈকি। ঠাণ্ডা কোথা! এই তো সবে কলির সন্ধ্যা! এখন থেকে চানটি ছাড়া ঠিক নয়! আচ্ছা তোমরা বসো, আমি একটু ইয়ে করে আসি।"

নয়ে

"বেশি জল ঢেলো না মাথায়।"

মানসীর

"আরে বাবু না না। দেখছো প্রফেসর? উঠতে বসতে খেতে হুকুম! তুমি আছো ভালো, সদাসর্বদা গিন্নীর গঞ্জনা

করবো?

ব'লে 'গঞ্জনা গরবে গরবিত' সুখময় পরমানন্দে বেরিয়ে

শুধু

দালানের ওদিক থেকে আশ্বাসবাণী ভেসে আসে, "আমার কিছু দে

বর

হবে না, যাবো আর আসবো! ঝপাঝপ দু'মগ জল ঢালতে যা দেরী।"

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে প্রফেসর ব্যাগ্র কণ্ঠে বললেন, "একটা কথা জানতে চাইছি, ঠিক উত্তর দেবেন?"

"দেওয়ার যোগ্য হলে—"

"জানি না যোগ্য কিনা—" শান্ত কণ্ঠের উত্তর আসে, "মনে হচ্ছে বুঝি বা ক্ষমা পেয়েছি! এটা কি সত্যিই ক্ষমার ছলনা?"

রহস্যময় মৃদু হাসির অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে প্রতি প্রশ্ন,

"উত্তরটাই যে ছলনা হবে না তার নিশ্চয়তা কি ? সত্যি মিথ্যে ধরতে পারবেন ?"

"তা বটে ! সে ধরবার ক্ষমতাও নেই। তবু বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করছে !"

"তবে করুন !"

"আশ্বাস দিচ্ছেন ?"

"আঃ ! আবার দেখছি আপনাকে 'ছেলেমানুষ' বলে গঞ্জনা দিতে হচ্ছে। সব কথাই কি কথায় ব্যক্ত করতে হয় ? সব কথাই কি জিগ্যেস ক'রে ক'রে জানতে হয় ?"

স্তব্ধ হয়ে যান প্রফেসর। এই প্রগলভার মুখের দিকে তাকাতেও ভয় ভয় করে !

এ ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবার আগে পর্যন্ত দৃঢ়সংকল্প ছিলো কোন কিছুতেই আর আত্মপ্রকাশ করবেন না। নেহাৎ ভদ্রতা বিনিময়ের পালা সাঙ্গ করেই বিদায় নেবেন। মুহূর্তে ভেসে গেলো সে সংকল্প !

কী এই আকর্ষণ, যা পাহাড় টলায়, কঠিন মাটিতে ভাঙন ধরায় ?

"এ কী এমন নিঃঝুমের পালা কেন ?" হৈ হৈ করে ঘরে ঢোকেন বলেন। কানে সাবানের ফেনা, গলায় জলের ফোঁটা, ভিজে ভিজে তো হ আগা থেকে জল ঝরছে। সত্য ভিজে গায়ে টেনেটুনে "চোরা করে একটা গেঞ্জি পরা। চিরুনীটা হাতে নিয়েই এসে "বি জর হয়েছেন।

"দু'টি বাক্যবাগীশ এমন নীরব যে ?" পূর্ব কথার জের টানেন সুখময়।

"আর কেন !" মানসী বলে "ওঁর প্রতি আদেশ হয়েছে এতো-দিনের ত্রুটি পূরণ করতে অন্ততঃ তিন মাস রোজ হাজরে দিতে হবে, সেই শুনে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন !"

"বটে নাকি ?" চিরুনীর সাহায্যে চুলের জল নিষ্কাশন করতে করতে সুখময় গম্ভীরভাবে বলেন, "কিন্তু তিন মাস মানে ? তারপর ?"

"তারপর ?" মানসী আবার তেমনি মুখ টিপে হেসে বলে,

"তারপর আর আদেশ দিতে হবে না, আপনিই হবে। শুনেছি আড্ডার নেশা, আফিমের নেশার চাইতে কিছু কম না।"

"তা যা বলেছো! দেখি তো লোকের!" অকারণে আর একবার ঘরফাটানো হাসি হেসে ওঠেন সুখময়।

ছোট্ট একতলা বাড়ি, তবু নিজের বাড়ি। বাড়ি করবার মতো অবস্থা সুখময়ের নয়। বোধকরি মানসীর একাগ্র সাধনা, আর দুঃসাহসিক প্রেরণাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ছোট্ট, কিন্তু ছবির মতো। বসবার জন্যে নির্দিষ্ট এই ঘরটিতে বাহুল্যের ছাপ নেই, আছে সুরুচির ছাপ।

অবশ্য সুখময় মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামা ঘটান। হাতের কাছে তোয়ালে খুঁজে না পেলে ভিজে মাথাটা নীচু করে টেবিল ক্লথের কোণটা টেনে মুছে ফেলার মধ্যে অযৌক্তিক কোনো কিছু দেখতে পান না সুখময়, আর চেয়ার চারখানাকে সব সময় টেবিলের কাছাকাছি রাখতেই হবে কেন, এরও মানে খুঁজে পান না। টুলে উঠে উঁচু হবার দরকারে এই হালকা বেতের চেয়ারগুলোর থেকে একখানা টেনে তার উপর নিজের গুরুতর দেহভারখানি নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য লজ্জিত হতেও দেখা যায় না সুখময়কে। মানসীর তিরস্কারে বরং আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন—"বাঃ তা কি করবো? হাতের কাছে টুলফুল থাকে না—"

সে যাক, আপাততঃ সুখময় বেশি কিছু অঘটন ঘটালেন না, শুধু পদতাড়নায় টেবিলটাকে বাঁকিয়ে দিয়ে একখানা চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, "তারপর? বাড়ির গিন্নীর এ কী ব্যবহার? এখনো অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে না যে?"

মানসী ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "আচ্ছা বেশ! নিজে গেলেন নিজের কাজ গোছাতে, আমি যাব আমার কর্তব্য পালন করতে, অতিথি মশাই বুঝি একা একা বসে ঘরের সিলিঙের বাহার দেখবেন?"

সুখময় আর একদফা হাসলেন। প্রফেসর সেন একবার ব্যস্ত হয়ে 'না না' করে উঠলেন এবং মানসী "বোসো তোমরা,—আসছি"

বলে লঘু ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সমুদ্রের কলকল্লোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্রমুখী বারান্দায় সতরঞ্চ পেতে বসে চায়ের সঙ্গে কথার যে প্রবল কল্লোল উঠতো সে কল্লোলের আভাস কলকাতার একখানি সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরের টেবিল পাতা চায়ের আসরে মেলে না।

তবু—সে কল্লোল কি কোথাও ওঠে না!

ওঠে বৈকি! শুধু সেটা কানে শুনতে পাওয়া যায় না, এই রক্ষা।

প্রায় উঠি উঠি সময়ে সুখময় বলে ওঠেন, "তাস খেলতে জানো প্রফেসর?"

"তাস?"

"হ্যাঁ হে ভালো ছেলে! জিনিসটার নামও শোনো নি নাকি? যে রকম হাঁ করে তাকাচ্ছো!"

প্রফেসর হেসে হেসে বলেন, "নাম শুনিনি বললে গায়ে ধুলো দেবেন যে, তবে খেলি নি কখনো।"

সুখময় ঘাড় নেড়ে বলেন, "জানি এই উত্তরই পাবো। ওহে গুড্‌বয়, শুধু ঘাড় গুঁজে পড়লেই হয় না! পুঁথির বাইরেও অনেক মজা আছে, একটু আধটু সবই জানতে হয়। জর্দা খাবে না, পান খাবে না, তাস খেলবে না, ও কী? খেলবে, খেলবে! না জানো শিখিয়ে দেবো।"

"তিনজনে আবার তাস খেলা!" মানসী তাচ্ছিল্যভরে বলে, "তা'হলে গোলাম চোর খেলতে হয়।"

"আহা তা কেন"—সুখময় বলেন, "আর একজন কাউকে জোগাড় করে নেবো! নিয়ে রীতিমত একটা ক্লাব খাড়া করবো। সে ক্লাবের নাম হবে, "চতুর্ভুজ ক্লাব!"

মানসী মাথা নেড়ে বললে, "ওসব চলবে না। আবার কাউকে জোগাড় করা চলবে না! যা আছি তাই ভালো। নামই যদি হয় তো—বিদেশী নাম কেন? ক্লাব নয় বৈঠক। আমাদের বৈঠকের নাম দেবো, 'ত্র্যহস্পর্শ বৈঠক'।"

"ব্রাহ্মস্পর্শ! এই অপয়া নাম? সুখময় দুই চোখ কপালে তুলে বলেন, "সর্বনাশ! ও প্রফেসর, এ ভদ্রমহিলা বলে কি?"

প্রফেসর মৃদু হেসে বলেন, "আর যাই হোক, বঙ্গমহিলা জনোচিত কথা বলেন নি!"

"বলিনি তো বলিনি! চব্বিশ ঘণ্টা অতো মনে রাখতে পারি না—আমি বঙ্গনারী, আমি বঙ্গনারী, প্রতিটি কাজ আর প্রত্যেকটি কথার আগে উচিত অনুচিতের শাস্ত্রগ্রন্থ খুলে দেখতে বসা আমার কর্তব্য!"

"ওই হলো"—সুখময় দুটো পান আর এক মুঠো জর্দা মুখে ফেলে সহাস্যে বলেন, "হলো বক্তৃতা শুরু। সাপের ল্যাজে পা পড়েছে। আচ্ছা, নামের তর্ক থাক, কাজের কথাটা হোক। তাসের আড্ডাটা বসছে তো? প্রফেসর, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে হে! জীবনে কখনো তাস খেলোনি!"

মানসী আবার ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "আর নিজেই যেন জীবনভোর খেলে এলে! বুড়ো বয়সে তো শিখলে। এখন বড্ড নেশা দেখছি যে!"

এক সঙ্গে আরো দুটো পান মুখে ফেলে সুখময় বলেন, "বুড়ো বয়সের নেশাই তো মোক্ষম হয় গো! আফসোস হচ্ছে এতো বড়ো বয়েসটা বৃথাই গেছে!"

সমিতির কাজে সদাব্যস্ত ফুলটুশের টিকি দেখতে পাওয়াই ভার। কিসের যে তাদের সমিতি, আর কি যে তাদের কাজ ভগবান জানেন। জিগ্যেসবাদ করতে গেলে যেন তেড়ে মারতে আসে। আগে প্রকৃতিটা ছিলো গম্ভীর, এখন হয়ে উঠেছে রুক্ষ।

কলেজ ছিলো, তবু নাওয়া খাওয়ার কিছু শৃঙ্খলা ছিলো। এখন এম. এ. দেবার পর সে বালাই ঘুচেছে। ক্রমশঃই ছেলে যেন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠছে। দুটি ভাত খেয়ে উদ্ধার করে দিতে কখন আসবে কোন স্থিরতা নেই। হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি এসে যায় মানসীর কিন্তু বলবার জো নেই। বললেই উত্তর দিয়ে

বসবে, "বেড়ে রেখে দিও, হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবার দরকার নেই।"

এক এক সময় ভারী একটা শূন্যতা অনুভব করে মানসী। একটি মাত্র ছেলে, তার সঙ্গে যেন হৃদয়ের কোনো যোগ নেই। অথচ কেন এমন হলো? মানসী কি মাতৃকর্তব্যের ত্রুটি করেছে?

মানসী জানে না—ত্রুটি মানসীর নয়, ত্রুটি রয়েছে ছেলের নিজেরই মধ্যে। এক একটা মানুষ জন্মগ্রহণই করে অসন্তোষ আর অপ্রসন্নতা নিয়ে। আপন পরিবেশে কিছুতেই সুখী হতে পারে না তারা। সাধারণ সুখ, সাধারণ সন্তোষ, তাদের কাছে ব্যঙ্গের বস্তু। ছেলেবেলা থেকেই এই ধরনের সে। যখন স্কুলে পড়তো, বরাবরই ক্লাশে ফার্স্ট হতো, কিন্তু এ নিয়ে ছেলের সামনে আত্মীয় বন্ধুর কাছে আনন্দ প্রকাশের উপায় ছিলো না মানসীর। 'তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা' দেখলে বিরক্তি বোধ করতো অতোটুকু ছেলে।

সুখময়ের ছেলে এমন হবে এটা একটা অদ্ভুত আশ্চর্য! অথবা এইটাই স্বাভাবিক, প্রকৃতির প্রতিটি কাজের মতো এও একরকম প্রতিক্রিয়া। বিধাতাপুরুষ সুখময়ের ভিতরে সন্তোষ আর প্রসন্নতা এতো উপচে দিয়েছেন যে, তার সন্তানের মধ্যে বোধকরি ও বস্তু দুটো দিতেই ভুলে গেছেন।

চিরবিজ্ঞ ছেলে। আশৈশব বাপকে 'শিশু' বলে অবহেলা করতে অভ্যস্ত। ছেলেবেলার মার উপর সামান্য কিছু আস্থা যাও বা ছিলো জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু গেছে! গেছে তখনই, যখন দেখেছে সুখময়ের মতো হাস্যকর জীবটির প্রতিও মার আকর্ষণের অভাব নেই। হ্যাঁ, তখনই মার মূল্য নেমে গেছে তার কাছে। দু'জনকেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে।

মানসী এতো কথা বোঝে না, ও আপন ত্রুটিই অনুসন্ধান করে মরে। ভাবে কেন ফুলটুশ এমন হলো? এই তো তার বয়সী আরো কত ছেলে রয়েছে—মানসীর মামাতো ভাসুরদের আর মাসতুতো দিদির, কই তারা তো এমন নয়? লেখপড়াতে অবশ্য ফুলটুশের চাইতে প্রায় সবাই নীরেস, সেও যেন ভালো, মানসীর মনে

হয় ফুলটুশ এতো বেশি বুদ্ধিমান না হয়ে বুদ্ধিতে যদি একটু 'খাটো' হতো! বয়সে কম আর বুদ্ধিতে বিজ্ঞ পণ্ডিত ছেলে নিয়ে মানসীর মাতৃহৃদয়ের সম্পূর্ণ ক্ষুধা মেটে না। ছেলে যেন ক্রমশঃ আলাদা একটা লোক হয়ে উঠছে, যে লোক মানসীর অচেনা অজানা!

এতদিন জোর করে ছেলেকে অগ্রাহ্য করতো, জবরদস্তি করে বকতো ঝকতো, ছেলের ভুরু কোঁচকানোকে চোখ বুজে অস্বীকার করে 'তপস্বী' সিদ্ধপুরুষ' ইত্যাদি বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, এখন আর সাহস হয় না। ক্রমশঃ অপমানিত হবার ভয় এসে বাসা বেঁধেছে বুকে।

কিন্তু কেন এই সাহসের অভাব? এ কি শুধু ছেলের প্রকৃতির জন্য? না নিজের প্রকৃতিতেই পরিবর্তন এসেছে মানসীর? নিজের মধ্যে থেকেই তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, পুরনো মানসী থেকে?

তবু সে ভাবে, একদিন একটু শক্ত হয়ে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেখবে। জেরা করে জানবে কিসের তাদের সমিতি, কী কাজে সে সদা ব্যস্ত? যে কাজে ব্রতী হলে দিন দিন মেজাজ খাপ্পা, প্রকৃতি রুক্ষ, আর হৃদয় মমতাশূন্য হয়ে ওঠে, সে কাজে কার কোন মঙ্গল সাধিত হবে? কিন্তু বলবে কাকে? বলবে কখন?

সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে, বেলা একটা বাজে, এখনো দেখা নেই। বাপের সঙ্গে তো 'চোরকামারের' সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুখময় ঘুম থেকে উঠে ছেলের খোঁজ নেওয়াটাও প্রায় ভুলতে বসেছেন। কারণ জানেন নিশ্চিত উত্তর পাবেন, 'সে বাড়ি নেই।'

তবু সুখময় এক অদ্ভুত সরল প্রকৃতির মানুষ!

ছেলের সমিতিকেও তিনি যথেষ্ট সমীহর চোখে দেখেন। মানসীর অনুযোগের উত্তরে বলেন, "ওরা যে সব দেশের কাজ করে গো! আমাদের মতো তো আর বিশ বছর বয়স না হতেই 'হরিঘোষের গোয়ালে' ঢুকতে হয়নি!"

নিজের অফিসকে সুখময় 'হরিঘোষের গোয়াল' আখ্যা দেন। যদিও মানসী জানে এই গোয়ালেই তাঁর ষোলোআনা প্রাণের টান।

অল্পবয়সের বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, মানুষ হয়েছেন মামার বাড়িতে, তাই একান্ত চেষ্টা ছিলো—যতো তাড়াতাড়ি পারি মায়ের দুঃখ ঘোচাবো।

তা মায়ের দুঃখ তিনি ঘুচিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকে, আর সাত তাড়াতাড়ি সংসারে ঢুকে। বেশিদূর পড়বারও সুযোগ পাননি। ফুলটুশের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। ও জীবনে কখনো অপরের জন্যে ভাবতে শেখেনি। কে জানে কোন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এখন পরের ভাবনা ভাববার দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে ফুলটুশ।

খানিকক্ষণ ঘর বার ক'রে মানসী বহুবারের পর আরও একবার প্রশ্ন করে, "হ্যাঁরে কেষ্ট দাদাবাবু আসেনি ?"

"আজ্ঞে না।"

"উঃ এই ছেলের জন্যে দেশত্যাগী হতে হবে আমায়"—বলে মানসী প্রতীক্ষার চাঞ্চল্য নিবারণ করতে একটা শেলাই নিয়ে বসে। কতোদিন থেকে ক'টা বালিশের ওয়াড় শেলাই করতে পড়ে রয়েছে, সে আর হচ্ছে না। কি যে হয়েছে আজকাল, কোনো কিছুতেই যেন মন বসে না। যখনি কোনো বাড়তি কাজ হাতে নিয়ে বসে, মনে হয় আজ থাক্, কাল হবে।

আজ জোর করে বসলো, আর বসার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের গলার আওয়াজ পেলো। মজাটি দেখো!

ছেলে এসে হাঁকডাক করে গলার আওয়াজ করলো তা নয়, কেষ্টা হাঁক পেড়েছে, "মা, দাদাবাবু এয়েছে"—তারই প্রতিবাদের গম্ভীর ভর্ৎসনা শোনা গেলো, "এসেছে তার হয়েছে কি ? পাড়া জানিয়ে খবর দিতে হবে ?"

আশ্চর্য, কেন এই রূঢ়তা ?

আজ মানসী সংকল্পে স্থির। তাই কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে, "কোথায় ছিলি এতোক্ষণ ?"

ফুলটুশ সাবান তোয়ালে নিয়ে যেমন স্নানের ঘরে যাচ্ছিলো, নিঃশব্দে অগ্রসর হতে থাকলো। মানসীর কণ্ঠে যদি কেবলমাত্র

সরল উদ্বেগ প্রকাশ পেতো, তা' হলে হয়তো এক কথাতেই যা হয় একটা উত্তর দিতো, কিন্তু মানসীর কণ্ঠে কৈফিয়ৎ তলবের সুর! এ সুর ফুলটুশের অসহ্য।

"উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিস যে?" তীক্ষ্ণস্বর তীব্র হয়ে ওঠে।

এবার উত্তর আসে, "ওর আবার উত্তরের কি আছে?"

"কোথায় ছিলে সেটুকুর উত্তর নেই?"

"মাত্র একটা জায়গাতেই ছিলাম না!" বলে এগিয়ে স্নানের ঘরের দরজা অবধি পৌঁছে যায় ফুলটুশ। মানসী কিন্তু আজ সত্যিই উত্তেজিত হয়েছে। তাই সে দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হাজির হয়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "এক জায়গায় যে থাকো না, সে আমিও বুঝি, কিন্তু একশো জায়গায় কোথায় ঘুরে বেড়াও সেইটাই শুনতে চাই।"

"বললে তুমি বুঝতে পারবে?" শুধু কথার সুরেই নয়, ফুলটুশের মুখে অবজ্ঞার ছাপটাও স্পষ্ট!

মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে মানসী স্থির ভাবে বলে, "যাতে বুঝতে পারি, সেই ভাবেই বলবার চেষ্টা করে দেখো না।"

"চেষ্টা করলেই কি সবাইকে সব বোঝানো যায়?" বলে মায়ের মুখের উপরেই কপাটটা বন্ধ করে দেয় ফুলটুশ।

মানসী কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে আসে রান্নাঘরে। উনুনের উপর বসিয়ে রাখা ভাতটা নামিয়ে, ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে গরম ভাত বাড়ে। রাগটা যেন সহসা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেমন যেন ভয় ভয় করছে। কে জানে ছেলেটা কোন সর্বনাশা দলে গিয়ে ভিড়েছে? কি তাদের ধরনধারণ। সে দলগত লক্ষণ কি শুধু ঔদ্ধত্য, অবিনয়, আর গুরুলঘু নির্বিশেষে সকলকে তাচ্ছিল্য করা?

এ তো মানসীর চোখ এড়ায় না, আত্মীয়স্বজন যে কেউ বাড়িতে আসুক সকলের প্রতিই যেন ফুলটুশের স্পষ্ট অবজ্ঞা। কথা কয় না তো, যেন কথার ঢিল ছোঁড়ে! কেন তার এই প্রবৃত্তি? চেনা জানা আপনার লোকের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে, কেন অজানা

অচেনাকে পরমাত্মীয় বলে গ্রহণ করতে চায় এরা ?

রাগ দেখিয়ে কাজ হবে না ভেবে ভাত দিয়ে নিতান্ত নরম হয়ে কাছে বসে। সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, "নেয়ে এলি, মাথাটা অতো রুক্ষু কেন ? তেল মাখিস নি ?"

ফুলটুশ ভুরু কুঁচকে বলে "তেল আমি মাখি ?"

"কোনোদিন মাখিস না ?"

"না।"

"হঠাৎ তেল কি অপরাধ করলো ?"

ফুলটুশ বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দেয়, "তেল মাখবার জন্যে তো অনেক তেলা মাথা আছে। আমি আর না-ই মাখলাম !"

মানসী ক্ষণপূর্বের সংকল্প বিস্মৃত হয়ে আবার কঠিন হয়ে ওঠে, বলে, "তা তোমার মাথাটাই বা হঠাৎ 'রুক্ষু' হয়ে উঠলো কী দুঃখে ?"

"মাথা থাকলেই মাথায় অনেক কিছু হতে পারে মা, কিন্তু আমাদের নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে ? তোমরা তো স্বর্গরাজ্যের প্রজা, ধূলোমাটির দিকে না-ই বা তাকালে !"

দুধের বাটিটা পাতের কাছ থেকে খুব খানিকটা সরিয়ে দিয়ে ভাতে হাত দেয় ফুলটুশ।

"দুধ খাবি না ?"

"না।"

"কেন একেবারেই ছেড়ে বা দিচ্ছিস কেন ? দিনকে দিন চেহারার কি ছিরি হচ্ছে দেখেছিস লক্ষ্য করে ?"

ফুলটুশ হঠাৎ হেসে উঠে বলে, "বড়ো সেকেলে মায়েদের মতন কথাটা হলো মা !"

"তা সেকেলে ছাড়া আমি কি বড্ডো একেলে ?"

মায়ের এই নিতান্ত সাধারণ কথাটার উত্তরে মার মুখের দিকে হঠাৎ অমন মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকায় কেন ফুলটুশ ? অমন বাঁকা বিদ্রূপের ক্ষীণ আভাস মুখে ফুটে ওঠে ওর ? সেই বাঁকানো ওষ্ঠাধরের ফাঁক থেকে একটা তিক্ত স্বাদের আমেজ মাখানো কথা

উচ্চারিত হয়, "সেটা নিজেকে জিগ্যেস করে দেখো।"

সহসা বুকের ভিতরটা কেমন যেন হিম হয়ে যায় মানসীর। কথার উত্তর দিতে পারে না, উঠে যেতেও পারে না···কী এ? ভয়?

এ কী হাসি! যা দেখলে এমন ভয় করে!

এ হাসির মধ্যে আর কি কোনো অর্থ আছে?

ঠিক এই রকম একটা হাসির আভাস কয়েকদিন আগেই আর একবার দেখেছিলো মানসী। তবে সেদিন এমন ভয় করেনি, সূক্ষ্ম একটা অপমানের জ্বালা অনুভব করেছিলো। বেশিদিন নয়, ক'দিন আগে কখন যেন একবার মায়ের ঘরে ঢুকেছিলো ফুলটুশ, আর মার বিছানার উপর পড়ে থাকা বইখানা নেহাৎই অবহেলাভরে তুলে দেখতে গিয়ে ঠিক এই ধরনেরই এক চিলতে হাসি হেসে নামিয়ে রেখেছিলো বইটা।

হ্যাঁ সেদিন কেমন একটা অপমান বোধ জেগেছিল মানসীর। ফুলটুশ চলে যেতেই রাগ করে সেই রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' খানা আলমারীর মধ্যে কাপড়ের ভাঁজের নীচে রেখে দিয়েছিলো।

নতুন বাড়ি হবার পর ঘরের সৌষ্ঠব হিসেবে ছোট্ট একটি বুককেস কিনেছিলো মানসী, আর বুককেসের সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থে কি ফেলেছিলো বাছাই করা কয়েকখানি বই। এই বইখানি তার মধ্যে প্রথম আর প্রধান। ফুলটুশ তখন ছেলেমানুষ, কিনেছিলো মামাতো ভাওরকে দিয়ে! বইটা মানসীর ঘরে আছে বলে তো কেউ কোনোদিন হাসেনি, শুধু দৈবাৎ একদিন একটা অলস দুপুরে যদি বইখানা টেনে নিয়ে দু'একটা পাতা উল্টে দেখতে ইচ্ছে করে মানসীর সেটা কি এমনি হাস্যকর?

অথচ ছেলেবেলায় গান আর কবিতায় কী ঝোঁকটাই ছিলো মানসীর!

বিয়ে হয়ে ঘর করতে এলো যেখানে, সেটা হলো মামাশ্বশুর-বাড়ি। বিরাট গোষ্ঠী, প্রতি পদে সংকোচ, সমীহ। তার উপরে সুখময়ের উপদেশবাণী। মার মনে একটু শান্তি দেবার জন্যে, মায়ের

পরিশ্রমভার লাঘব করবার জন্যেই যে মানসীকে আনা, একথা অহরহ মনে করিয়ে দিয়েছে সুখময়।

তারপর কবে সুখময়ের মায়ের মৃত্যু ঘটেছে কোন অবসরে মায়ের অঞ্চল থেকে স্ত্রীর অঞ্চল প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে সুখময়, সে ইতিহাস আর কে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে? বলতে গেলে মানসীর অপরিসীম চেষ্টাতেই আজ সে দশের একজন। সেই সংগ্রামের বছরগুলি কোথা দিয়ে কেটে গেছে কে জানে, কে জানে বয়েস বেড়ে গেছে কোথা দিয়ে! নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে নিজের চারিপাশে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলো মানসী, কোন ফাঁকে চল্লিশের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ ছিলো না, ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র এই সেদিনে।

সেদিন মায়ের বিছানায় 'সঞ্চয়িতা' দেখে মুচকে হেসেছে ফুলটুশ!

বেশি লেখাপড়া শেখবার সুযোগ মানসী পায় নি, বাপের অবস্থা ভালো ছিলো না, বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো কম বয়সে। কিন্তু পড়ার ঝোঁক কী ভীষণই ছিলো!

আর সুখময় যেন একেবারে আলাদা জগতের জীব। বরাবরই কবিতার নাম শুনলে সুখময়ের গায়ে জ্বর আসে, বইয়ে চোখ রেখে কি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে মানুষ, ভাবলেও অবাক লাগে।

বোধকরি স্বামীর সঙ্গে এই বিপরীপধর্মিতার প্রতিক্রিয়াতেই ছেলেকে তার শৈশব থেকেই পড়ার নেশা ধরিয়ে দেবার এক ঝোঁক ছিলো মানসীর, কিন্তু মানসীর ভাগ্যে ছেলের সে নেশা এমন প্রবল হয়ে উঠলো যে মানসী নিজেই ভেসে গেল সে স্রোতে।

ভেবেছিলো ছেলে একটু বড়ো হলেই, তারা 'মায়ে ব্যাটায়' এক আলাদা রাজ্য সৃষ্টি করবে, যেখানে সুখময়ের কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। অবশ্য সুখময়কে তারা অবহেলা অশ্রদ্ধা করবে না, শুধু সকৌতুকে তাদের নিজস্ব 'উচ্চলোক' থেকে করুণা করবে। মানসীর নিজের রক্তমাংস দিয়ে গড়া, নিজের সাধনা দিয়ে গড়া সন্তান, মানসীর মর্ম বুঝবে!

বেচারী মানসী জানত না আপন 'রক্তমাংস' যেমন পর হয়ে উঠতে পারে, তেমন পর বোধকরি দুনিয়ার আর কেউই হতে পারে না।

নাঃ, মায়ের মর্ম বোঝবার মতো মর্মস্পর্শী দৃষ্টি মানসীর ছেলে পায়নি। সে জানে মানসী সংসারগতপ্রাণা একটি সাধারণ স্ত্রীলোক মাত্র।

কিন্তু ফুলটুশের বা বেশি কি দোষ?

মানসী নিজেই কি এতোদিন ভুলে ছিলো না সে তাছাড়া আরও কিছু? হঠাৎ কোন অসতর্ক হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে খুলে পড়ে গেছে অনেক দিনের বন্ধ দরজা! কোথা থেকে এসে পড়েছে একটা আলোর ঝলক!

স্তব্ধ হয়ে বসে কতক্ষণ কতো কি ভেবে চলেছিলো মানসী, হয়তো আরো কতো কি ভাবতো। কেষ্ট এসে সচেতন করে দিলো, "মা, কি করছেন বসে বসে? খাওয়া-দাওয়া আজ আর হবে না না কি? একঘণ্টা পর থেকেই তো বলতে শুরু করবেন কেষ্টা সন্ধ্যে অবধি ঘুমোচ্ছে!"

মানসী চমকে ওঠে। হায়! হায়! বেচারা কেষ্টা যে কিছু খায়নি এখনো! ছি ছি কতো বেলা হয়ে গেছে!

মন নিয়ে রোমন্থন করবার বয়স তো সত্যিই নেই তার, তবে কেন এই অসাবধানতা? হয়তো তার এই অসাবধানতাই ছেলেকে জুগিয়েছে মাকে অবহেলা করবার সাহস!

তাড়াতাড়ি ভাত দিয়ে গেলো কেষ্টকে, আর মনে হতো লাগলো ফুলটুশ বোধকরি তাদের এই সান্ধ্যবৈঠকটা তেমন পছন্দর দৃষ্টিতে দেখে না।

অবিশ্যি সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে সে দৈবাৎ থাকে, কিন্তু পর পর ক'দিন নাকি এসেছিলো। মানসী টের পায়নি, সিঁড়ির তলার দরজা দিয়ে ঢুকেছে, কেষ্টর তৈরি চা খেয়ে চলে গেছে। মানসী অবিশ্যি কেষ্টর উপর রাগ করেছে তাকে না জানানোর, কিন্তু কেষ্ট কি করবে? তার যে 'মারীচে'র অবস্থা! দাদাবাবু যদি তাকে বলে

"ডাকতে হবে না, তুই যদি চা করতে না পারিস তো দরকার নেই দোকানে খেয়ে নেবো"—কেষ্ট কি করতে পারে?

মানসী ভাবে নিজেকে কিছু দিয়ে আটকাতে হবে। সুখময়ের বোকামীর স্রোতে ভেসে যাবে না আর। ওরা দু'জন বসে গল্প করে করুক—প্রফেসর আর সুখময়, মানসী কাজের কোনো ছুতোয় ভিতরে থাকবে। খাবার নিয়ে চা নিয়ে অপেক্ষা করবে ছেলের।

ত্রুটি হচ্ছে বৈ কি, কিছুদিন থেকে মাতৃকর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে। তাই ছেলের অভিমান হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই সম্ভব, সেটাই স্বাভাবিক। এই চিন্তার মধ্যে কিছু যেন আশ্রয় খুঁজে পায় মানসী।

সাধুসংকল্প করতে তো মানুষ কসুর করে না, কিন্তু বিধাতাই যে তার পরম বাদী। মানসীর ভাগ্যবিধাতা যে তাকে নিয়ে কি কৌতুক শুরু করেছেন তিনি জানেন। মানসীর সাধুসংকল্প টেঁকে কই?

নিজেকে এর থেকে যে সরিয়ে নেবে মানসী, গুটিয়ে নেবে নিজেকে গৃহকর্মের নিরাপদ দুর্গে, তা'র উপায় কোথা? ভদ্রতা রক্ষার দায়টা পোহাবে কে? সেটাকে তো আর বিসর্জন দেওয়া যায় না? প্রাণ বিসর্জন দিয়েও যে ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে হয় সংসারী মানুষকে! এদিকে সুখময়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে পড়ে প্রফেসর প্রায় নিত্য সন্ধ্যার অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, অথচ নিজে সুখময় সন্ধ্যা না যেতেই তাঁর নতুন নেশার টানে বাড়ি ছাড়বেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উসখুস করতে থাকেন, তারপরই তাসের আড্ডার লোক আসে ডাকতে।

আসল কথা 'ব্রাহ্মস্পর্শ' বৈঠকে তাসের আড্ডা বসানো সম্ভব হয়নি। একজোড়া তাস নিয়ে 'খেলা শেখানোর' খেলা দু'চারদিন হয়েছিলো, সে খেলা ভেঙ্গে গেছে। সুখময় কোন ফাঁকে পাড়ার এক তাসের আড্ডায় ভর্তি হয়ে বসে আছেন।

হয়তো প্রফেসর সেনের জন্য এত 'আঁকুপাকু' করার এও একটা কারণ সুখময়ের। মনে করেন, বাড়িতে একটা গল্প করার লোক উপস্থিত থাকলে সুখময়ের অনুপস্থিতির অপরাধটা চোখে পড়বে না।

মানসীর। সাহিত্য নিয়ে গল্প সিনেমা নিয়ে গল্প এবং কবিতা নিয়ে দুর্বোধ্য আলোচনা, এসব যেন সুখময়ের হাঁফ ধরিয়ে দেয়। অথচ ওরা ওতেই মশগুল!

যাক ভালোই হয়েছে যে মানসীর এতোদিনে নিজের মনের মতো বিষয় নিয়ে গল্প করবার একটা সঙ্গী জুটছে! এর বেশি আর কিছু ভাবা সুখময়ের দুঃস্বপ্নেব মধ্যেও আসা সম্ভব নয়।

অগত্যাই ভদ্রতা রক্ষার দায় পোহাতে হয় মানসীকে।

কাজ কামাই করে প্রয়োজনহীন কথা নিয়ে তর্কে মাততে হয়, আর কোনো কোনোদিন স্তব্ধ হয়ে বসে আবৃত্তি শুনতে হয়।

আবৃত্তির গলা আর ভঙ্গীটি অপূর্ব প্রফেসর সেনের। ভাবগম্ভীর অথচ মৃদু। শুনতে শুনতে যেন পুরনো কবিতার নতুন করে অর্থ উপলব্ধি হয়। শুনতে শুনতে আর মনে থাকে না কোথাও কোনো ত্রুটি হচ্ছে।

যদিও বিকেল না হতেই সেরে রাখে রান্নাঘরের কাজ, সেরে রাখে আরো কত কিছু। তবুও কোথাও ত্রুটি হয়ে যায় বৈ কি। সব কাজ কি সেবে রাখা যায়? হয়তো লক্ষ্মীর ঘরে সময়ে ধূপদীপ দেওয়া হয় না। হয়তো তুলসী তলায় 'সন্ধ্যা' দিতে ভুল হয়ে যায়। শাশুড়ীর আমল থেকে এসব কাজ নির্ভুল করে আসছে মানসী, কোনোদিন এদিক ওদিক হয়নি। অটুট স্বাস্থ্য আর নিরলস কর্মতৎপরতা, ব্যতিক্রম ঘটতে দেয়নি কখনো। আজকাল প্রায়ই এদিকওদিক হয়ে যায়। যখন মনে পড়ে, 'বৈঠক' থেকে ছুটে উঠে যায় ত্রুটি সংশোধন করতে, তখন যেন কেষ্টটার মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে সাহস হয় না। মনে হয় ও বুঝি বিচারকের আসনে বসে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানছে কর্ত্রীর দিকে।

টেবিলে পড়ে থাকা বই-কাগজগুলো উল্টে-পাল্টে শেষ হয়ে গেছে, কেষ্ট একসময় চা দিয়ে গেছে এক পেয়ালা, সুখময় আসেননি, আসেনি মানসী। প্রফেসর সেন বোকার মতো বসে থেকে থেকে প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন উঠে পড়ি কিন্তু পরের বাড়িতে একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে পড়তেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়।

পূর্ণ পেয়ালাটা অস্পর্শিত রাখলে নেহাৎ দৃষ্টিকটু দেখাবে ভেবে একটুখানি খেয়ে নামিয়ে রেখেছেন প্রফেসর সেন, আর অবাক হয়ে ভাবছেন আজকের এই ঔদাসীন্যের অর্থ। এটা অপ্রত্যাশিত। এই দিন তিনেক আগেও তিনি এসেছিলেন, কোথায়ও কোনো অবহেলার আভাস অনুভব করেন নি তো !···বিদায়কালে মানসী নিত্য নিয়মেই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আলো-ঝলসানো মুখে প্রশ্ন করেছে— "কালকের বৈঠকে হাজির থাকছেন তো ?"

প্রফেসর বলেছিলেন—কাল ? কাল তো আসা হবেই না, কাল নয়—পরশু নয়—তার পরদিন নয়। বিশেষ কাজে পড়ে বাইরে যেতে হচ্ছে দু'দিনের জন্যে।

প্রফেসর কি ভুল দেখেছিলেন ? সেই আলো-ঝলসানো মুখটা যেন কেমন নিবন্ত হয়ে গিয়েছিলো, সেটা কি প্রফেসরের দৃষ্টিভ্রম ?

মানসী বলেছিলো, "কি এমন বিশেষ কাজ, শুনতে পাওয়া যায় না ?"

"অবশ্যই। বৌদি পিত্রালয়ে আছেন, তাঁকে আনতে যেতে দাদার সময় নেই, অতএব বাহকের কাজ পড়েছে আমার ওপর।"

"ওমা তাই বুঝি ?"···ম্রিয়মান মুখটা আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো কৌতুকে—"আপনারও এ সব আছে ? আমি তো ভাবি, আপনি বিয়ে-টিয়ে করেন নি, মুক্ত জীব !"

"স্ত্রী ব্যক্তিটিই কি জীবনের একমাত্র বন্ধন ? হেসে বলেছিলেন প্রফেসর। শুনে মানসীও হেসে উঠেছিল।

"তা আবার বলতে ? আমাদের তো তাই ধারণা।"

"আপনার ধারণাটা বদলাবেন, ওটা ভুল।"

"তবে আপনার ধারণাটা কি তাই বলুন ? নিজেদেরকে অপরের বন্ধনরজ্জু ভেবে তো আমরা—মেয়েরা, মরমে মরে থাকি !"

"ওটা আপনাদের বিনয়, ঠিক জানেন—ওটা রজ্জু নয়, মাল্য। বন্ধন রয়েছে পুরুষের নিজেরই মধ্যে। ভালোবাসা জিনিসটা— মানে তা'কে যদি 'জিনিস' বলে ধরা যায়—যে রূপ নিয়েই অধিষ্ঠিত থাকুক, সেই বন্ধন। বলুন তা'কে 'প্রেম' বলুন 'স্নেহ', বলুন 'মমতা'।"

মানসী গম্ভীরভাবে বলেছিলো, "আরো একটা ব্যাপারে বন্ধন আছে, সেটা হচ্ছে ভদ্রতার। যার জন্যে আপনাকে প্রায়ই কলকাতার উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে চলে আসতে হয়।"

প্রফেসর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনি বুদ্ধিমতী, আমার 'প্রায়ই চলে আসতে' বাধ্য হওয়ার প্রকৃত অর্থটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন দেখছি। আমি নিজেই এটা পারছিলাম না! কেন যে আসতে বাধ্য হই, সেইটা বুঝতে না পেরে রীতিমতো অস্বস্তিতে ছিলাম।"

"শুধু অস্বস্তি? অনিদ্রায় ভুগছিলেন না?"

"হয়তো তাও। কিন্তু চলি এবার? ঘরে যতোক্ষণ গল্প হলো, দরজায় দাঁড়িয়ে তার চাইতে বেশি হয়ে যাবে, যদি এ নিয়ে এখন আলোচনা চালানো যায়!"

মানসী ব্যগ্রভাবে বলেছিলো, "আলোচনাটা কিন্তু তোলা রইলো —আগামী দিনের জন্যে। তা'হলে কবে আসছেন বলুন? কাল নয় —পরশু নয়—তার পরের দিনও নয়—তবে তো সে— ই শুক্কুরবারে?"

"তাই।"

"আপনার বৌদির বাপের বাড়ি কোথায়, তা' তো বললেন না?"

"এটাও একটা বক্তব্যের বিষয় তা ভাবিনি।"

"মেয়েদের কৌতূহল, জানেন তো? কোথায়?"

"দানাপুরে।"

"দানাপুরে?...যেতে আসতে তিনদিন লাগবে?"

"অঙ্ক কষে যাওয়া-আসা করলে লাগার কথা নয়, তবে একটা দিন ফেলাছড়ার ব্যয় করতে হবে, এই বৌদির অনুরোধ।"

"আপনাকে যে যা অনুরোধ করবে সেই রাখেন?"

"হাসালেন আপনি।"

"তা' বটে! কথাটা হাস্যকরই হলো। আচ্ছা নমস্কার! তিনদিন তা'হলে বৈঠক অন্ধকার?"

"অন্ধকার? মোটেই না। আপনি আলো করে রাখবেন?"

"যা বললেন! এ ঘরেই আসবো না!"

"সুখময়বাবুর তাসের নেশাটা বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না।"

"ওঃ। ভয়ঙ্কর। চিরদিনের বদ্ধমূল নেশাও কেটে যাচ্ছে তা'তে"
—বলে রহস্যময় একটি হাসি হেসে উঠেছিলো মানসী।

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন প্রফেসর, শুধু বলেছিলেন "সব উত্তর রইলো তোলা।·· নমস্কার!"

"নমস্কার!···শুক্রুরবারটা ভুল হবে না আশা করি?"

"ভুল? না।"

দরজা থেকে নেমে এসেছিলেন প্রফেসর, এবং অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আর একবার পিছন ফিরে দেখবার একান্ত ইচ্ছাকে দমন করে ফেলেও মনে মনে অনুভব করেছিলেন, এখনো তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছে মানসী, দরজা বন্ধ করবার ভঙ্গীতে দুই কপাটে দুটি হাত দিয়ে।

আজ সেই শুক্রবার। অথচ আজ এ কি অদ্ভুত ব্যবহার!

মনে করলেন আসাটা কমিয়ে ফেলবেন, খুব কমিয়ে ফেলবেন। সত্যি তিনি একটা বুদ্ধিমান লোক হয়ে একেবারে নিতান্ত নির্বোধের মতো কাজটা তো করে আসছেন। সুখময় একদিন তাকে ডেকে এনেছিলেন বলেই তিনি সে সুযোগটা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবেন কেন? 'অবাঞ্ছিত বন্ধুর' পর্যায়ে নেমে এলে, তদুপযুক্ত সমাদরই লাভ হবে। নাঃ আর নয়। হঠাৎ আসা বন্ধ করলে, সেটা চোখে ঠেকবে, দীর্ঘ অনুপস্থিতির কৌশলে আস্তে আস্তে সরিয়ে নেবেন নিজেকে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই!

কিন্তু·· প্রফেসর ভাবতে থাকেন···কিন্তু মানসীর মুখের দীপ্তিটা কিসের? শুধু ভদ্রতার? না শুধু সৌজন্যের? আগ্রহহীন সৌজন্যে মুখের রংটাও বদলে যায়?

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে জানান দিচ্ছে 'পার হয়ে যাচ্ছে সময়' —হয়তো বা এও বলছে 'আর প্রতীক্ষা করা অশোভন'···শেষ পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে

এসে ঢুকলেন সুখময়।

অবাক হয়ে বলে উঠলেন, "কি ব্যাপার প্রফেসর? ঘরের মাঝখানে ভূতের মতন একা দাঁড়িয়ে রয়েছো মানে?"

প্রফেসব মৃদু হেসে উত্তর করেন, "দশচক্রে ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছি।"

"কেন? কেন? কি হলো বলো তো? বান্ধবী কোথায়?"

'বান্ধবী' শব্দটাই সর্বদা ব্যবহার করেন সুখময়। শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে প্রফেসরের। উত্তর দেন, "কোথায় তা' তো বলতে পারছি না, তবে শুনেছি বাড়িতেই আছেন।"

"শুনেছো? শুনেছো কি হে? দেখা হয়নি এখনো?"

"কই?"

"এসেছো কতক্ষণ?"

"এসেছেন কতক্ষণ তার প্রায় মিনিট সেকেণ্ডের হিসাব আছে প্রফেসরের তবু আলগা ভাবেই বলেন, "তা—অনেকক্ষণ।"

"কী মুশকিল! অনেকক্ষণ এসেছো, অথচ বোকার মতো বসে আছো চুপচাপ? নাঃ সাধে কি নাম দিয়েছি কবি। বলি ডাক হাঁক শুরু করে দিতে পারোনি?"

"বাঃ! ডেকে বিরক্ত করবো কেন? নিশ্চয় কাজে ব্যস্ত আছেন।"

"কাজে ব্যস্ত? বাঃ বাঃ! এমন কাজে ব্যস্ত যে, একবার দেখা করে যাবারও সময় হয়নি? না না—এটা ভারী অন্যায় আর আমারও আজ তেমনি দেরী! দেখছো তো, আজ অন্যদিন অপেক্ষা প্রায় একঘন্টা পরে এসেছি।"

এমনভাবে বলেন সুখময়, যাতে মনে করা চলে যে, সুখময়ের ফেরার সময়টা প্রফেসরের মুখস্থ—অগত্যাই প্রফেসরকে বলতে হয়, "তাই তো—দেখছি। ভাবছি দেরীটা কেন?"

"আর কেন," সুখময় একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "বোসো হে বসো। এখান থেকেই একটু জিরিয়ে তবে যাই।·· ওরে কেষ্টা শোন দিকি।"

কেষ্ট বিনা বাক্যব্যয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়, প্রফেসরের আগমন

তার মোটেই প্রীতিকর নয়। সুখময় বলেন, "তোর মা কোথায় রে?"

"রান্নাঘরে।"

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলবে না এই বোধকরি কেষ্টার সংকল্প।

"রান্নাঘরে! আজ এখনও রান্নাঘরে কেন রে।"

"জানিনা, বোধহয় কোনো নতুন খাবার তৈরী করছেন।"

"এই দেখো যা ভেবেছি তাই। খাবার তৈরি মাথায় ঢুকলো তো রক্ষে নেই, জ্ঞানগম্যি থাকে না একেবারে। এই আড্ডা বসিয়ে সেটা কিছুদিন একটু বন্ধ ছিলো, বাতিক আবার চাগলো দেখছি।"

প্রফেসার আবার বসেছেন, এসব কথার উত্তর না দিয়ে বলেন, "আপনার দেরী হলো কেন, তাতো কই বললেন না?"

"ও হো বলিনি বুঝি? অবিশ্যি নতুন কিছুই নয়, উঠছি—এমন সময় একরাশ কাজ এনে টেবিলে চাপিয়ে দিয়ে গেলো। করি কি? খানিকটাও তো উদ্ধার করে আসতে হবে? চাকরের যা দুঃখু।"

চাকরের বেদনা বোঝবার ক্ষমতা প্রফেসরের নেই, তবু কোনো কথা খুঁজে না পেয়েই বোধকরি বলেন, "আপনাকে খুব খাটতে হয়, না?"

"খাটতে? রাম কহো। ওই ওপর ওপর দু'চারটে ফাইল সারলাম, ব্যস হয়ে গেলো। তারপর খালি আড্ডা। আমরা এখন সিনিয়র হয়ে গেছি বুঝলে হে, আমাদের কেউ একটা কথা বলতে সাহস পায় না। কড়াকড়ি যা কিছু ছোকরাদের বেলায়।" বলে আর একদফা হেসে ওঠেন।

প্রফেসরের মুখ দেখে মনে হয় না সুখময়ের গল্পের কিছুমাত্র রস তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে, তবু ফিকে ফিকে ভাবে বলেন, "জুনিয়াররা তা'হলে আপনাদের হিংসে করে বলুন?"

সুখময় ভুরু নাচিয়ে কতোই যেন রহস্যের কথা কইছেন এই ভাবে বলেন, "সেটাই স্বাভাবিক। করেও। সবাইকেই হিংসে করে। কিন্তু ভগবানের দয়ায়, এই সুখময় মুখুয্যেকে কেউ একটি দিনের

জন্যে ইয়ের চক্ষে দেখে না। 'মুখুয্যেদা' বলতে ছেলে বুড়ো সবাই অজ্ঞান। একদিন যা হয়েছিলো মজা—সে কাহিনী—"

প্রফেসরের মাথায় আকাশ ভাঙে, এখন সুখময়ের 'মজা'র গল্প শুনতে হবে? এরকম অস্থির মনের কাছে, ওঁর সেই গুছিয়ে বলা মজার কাহিনী 'সাজা'র মতোই লাগবে যে। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "তা'হলে—মানে—সে কাহিনী ফাঁদবার আগে আপনি বরং স্নানটা সেরে আসুন। চা খেতে খেতে শোনাবেন।"

"ঠিক বলেছো! শরীরটাও জল খাবো জল খাবো করছে বটে। আচ্ছা, আমি স্নানটাই সেরে আসি, আর তোমার বান্ধবীর রান্নাঘরে হানা দিয়ে দেখে আসি হঠাৎ কি নিয়ে এতো ব্যস্ত যে তোমাকে এক ঘণ্টা একলা বসিয়ে রেখে—"

স্বচ্ছন্দেই কথাটা বলেন সুখময়, 'তোমাকে' শব্দটার উপর যেন বিশেষ একটু জোর দিয়েই, কিন্তু সে বলার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত নেই। তাঁর নিজের কাছেও যে প্রফেসরের রীতিমত মূল্য রয়েছে।

সুখময় চলে যান, চৌবাচ্চা থেকে জল তোলার ও ঢালার উদ্দাম ঝাপঝপ শব্দ, আর মগ ব'লতি নাড়া-চাড়ার ঢন ঢন শব্দ বাইরের ঘর থেকেও শোনা যায়। প্রফেসর দশবার চোখ বুলানো খবরের কাগজখানা আর একবার চোখের সামনে তুলে ধরেন, আর এই সময় মানসী এসে ঘরে ঢোকে এক প্লেট খাবার হাতে নিয়ে। টেবিলে বসিয়ে দিয়ে রীতিমত সপ্রতিভ ভাবে বলে, "নিন খান।"

প্রফেসরের মুখে একটু ক্ষুব্ধ হাসি ফুটে ওঠে, "আপনার কথা শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এতোক্ষণ এই বস্তুটিরই প্রতীক্ষা করছিলাম?"

চেষ্টা করা সপ্রতিভতা বেশি স্পষ্ট প্রখরই হয়। মানসী সেই স্পষ্ট প্রখরতায় দিব্যি হেসে ওঠে, "আহা তা' কেন, তৈরি করছিলাম —ভাবছিলাম এই দিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করি।"

"একটু ভুল হলো—মিষ্টান্ন দিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করা যায় না, সেটা হচ্ছে মিষ্টবাক্যের এলাকা। বরং বলতে পারেন অতিথি সৎকার।"

"তা' আমাদের দেশে তাই বলে বটে।" মানসী একটা চেয়ারে

বসে পড়ে বলে, "আচ্ছা, এক্ষেত্রে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করা হয় কেন বলুন তো ?"

"খুব সম্ভব, ওটা নিত্য অতিথিদের জন্য। অ-তিথি যখন সব তিথিতেই আসতে শুরু করে তখন তার প্রতি গৃহস্থের যা মনোভাব জন্মায়, তা' থেকেই বোধকরি অতিথি-সৎকার কথাটার সৃষ্টি।"

মানসীর মুখটা একবার ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্তু লজ্জা আর বেদনার সেই ছায়াকে সরিয়ে ফেলতেও দেরী হয় না তার। মুখ টিপে হেসে বলে, "আচ্ছা বাক্যতত্ত্ব শিখবো পরে, আগে খেয়ে নিন।"

"কি বলে একে ?"

"কে কি বলে কে জানে! আমরা তো বলি মোহনপুরী।"

সহজ কথায় ফিরে এসে যেন বাঁচে মানসী···বাঁচে তো সকলেই, তবু কেবলমাত্র সহজ কথা কইতে ইচ্ছে করে কই ?

প্রফেসর জিনিসটায় হাত ঠেকিয়ে বলেন, "নামটি তো চমৎকার, কিন্তু এ জিনিস তৈরির জন্যে বুঝি বিশেষ কোন রেসট্রিকশন আছে।"

"তার মানে ? কিসের রেসট্রিকশন ?"

"ধরুন এমন কোনো নিয়ম আছে, খাবারটা বানাতে বসলে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ জাতির মুখদর্শন করতে নেই।"

হঠাৎ সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে মানসীর আকস্মিক একটা রক্তোচ্ছ্বাসে। অনেকক্ষণব্যপী আগুনের আঁচে যেমন লাল হয়ে ওঠে, তেমনি। আজ তিনদিন ধরে প্রতিজ্ঞা করেছে নিজেকে আর ছেড়ে দেবে না, মনের রাশ রাখবে শক্ত করে ধরে। সাধারণ আত্মীয় অভ্যাগতদের সঙ্গে যেটুকু সৌজন্য দেখায়, যতোটুকু আগ্রহ, সেইটুকু দেখিয়েই চলে যাবে কাজের ওজন দেখিয়ে। এমনি করেই নিজেকে সরিয়ে নেবে। ইচ্ছে করলেই পারা যায়। তবু শুক্রবার সকাল থেকেই সেই ইচ্ছাশক্তির উপর যেন তেমন আস্থা রাখতে পারে না, আরও একটা কিছু স্থূল শক্তির আশ্রয় খোঁজে। ভেবে ভেবে তাই বিকেলের দিকে এই খাবার তৈরির পত্তন। কিন্তু প্রফেসরের এই ব্যঙ্গবাণী সব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দিলো। আরক্ত মুখে উত্তর দিয়ে

বললো, "যে মুখ দেখলে ফিরে গিয়ে আর কাজ হয় না, তেমন মুখ দেখায় নিষেধ আছে বটে।"

প্রফেসর মুহূর্তকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। এতো স্পষ্ট করে কোনোদিন কি আপনাকে ব্যক্ত করেছে মানসী? স্তব্ধ হয়ে যান মুহূর্তের জন্য, তারপর কেমন একটা বঙ্কগভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, "তা'হলে এই মূর্তিমান অপয়া লোকটার জন্যে আপনার অনেক মূল্যবান কাজই হয়তো ব্যাহত হয়?"

"হয়ই তো!" মানসী বেপরোয়া সুরে বলে, "যেমন আজও হবে। আজ সন্ধ্যাবেলা রান্নাপর্বের শেষে আমার স্থিরচিত্তে বসে এক সের সুপুরি কুচিয়ে রাখবার কথা ছিলো, সেটা হবে না। তার বদলে সমাহিত চিত্তে বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনবো।"

"আজ হবে না। মাফ করবেন।"

"কেন, আজ আবার কোনো বৌদিকে বাপের বাড়ি রেখে আসার কথা আছে বুঝি?"

প্রফেসর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, "যে লোক প্রতিনিয়ত কবিতার সুর কেটে দেয়, তার কবিতা শোনার অধিকার নেই।"

সুখময় আসছেন, অদূরে তাঁর গুরুভার পদধ্বনি শোনা যায়—মানসী তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, "সুর জিনিসটা বড়ো খারাপ জিনিস জানেন না? ও কেবল জাল বিস্তার করে।"

"সে জাল আর আপনার কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে?"

মানসীর আর উত্তর দেওয়া হয় না, সুখময় এসে বসেন।

এমনভাবেই দিনের পর দিন ব্যর্থ সাধু সংকল্প। এমনিভাবেই ক্ষণে ক্ষণে করার ঘাত প্রতিঘাতে ঠিকরে ওঠে আগুনের ফুলকি। এমনিভাবেই পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। তবু সুখময় এসে রক্ষা করেন। কিন্তু সেও তো বেশিক্ষণের জন্য নয়। কিছুটা গল্প করার পরই টনক নড়ে তাঁর।

"আচ্ছা, বোসো প্রফেসর!" বলে খালি গায়ের উপর কোটটা চাপিয়ে তাসের আড্ডার উদ্দেশে রওনা হন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মুখোমুখি বসে থেকে, সহসা বেজায় মুখরা হয়ে ওঠে মানসী। অকারণ কোনো প্রসঙ্গ তুলে তর্কের ঝড় বইয়ে দেয়।

তর্কই শক্তির জোগানদার। বিরোধীতাই আবরণ। তা নইলে প্রতি মুহূর্তেই যে উৎঘাটিত হয়ে যাবার ভয়। তর্কে ভয় নেই, অথচ সান্নিধ্যের সুখ আছে।

হয়তো কোনো কোনোদিন সে তর্কের ঝড় সদ্যপ্রত্যাগত ঝুলটুসের কানে গিয়ে পৌঁছয়। সে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ঠোঁট কামড়ে বোঁ করে বেরিয়ে যায়, চা পর্যন্ত খায় না।

ছোট্ট কেষ্টাটা দাদাবাবুর এই দুর্গতিতে মনিবাণীর প্রতি যতোটা ক্রুদ্ধ হবার তা' হয়ে বাবুর বুদ্ধির মুণ্ডপাত করতে থাকে। উড়িষ্যার কোনো এক জঙ্গলের জীব কেষ্ট, বয়সে তো কিশোর মাত্র, তবু তার দৃষ্টিতেও মানসীর ব্যবহারের অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

শীত শেষ হয়ে দেখা দিয়েছে বসন্ত, হিমেল হাওয়ার জের এখনো সম্পূর্ণ মেটেনি। দুপুরের নতুন গরমের তীব্র দাহ অনুভূত হলেও ভোর আর সন্ধ্যায় যে হাওয়াটা বইতে থাকে, তাতে গা শিরশিরিয়ে ওঠে। হিমেল হাওয়া আছে, তবে হিমটা নেই। এখন আর ছাতের তারে শুকোতে দেওয়া কাপড়চোপড়গুলো রাত অবধি ছাতে পড়ে থাকলেও হিমে ভিজে যাবার ভয় নেই। দেরী করলেও চলে।

এসব মানসীর বিশুদ্ধ কাপড়ের এলাকা, কেষ্টর ছোঁওয়া নিষেধ। মানসী নিজেই তোলে।

প্রফেসর চলে গেছেন, সুখময় এখনো ফেরেন নি। অনেকক্ষণের কবিতা ভাবাক্রান্ত মন নিয়ে ছাতে উঠে এলো মানসী। ছাতে ওঠার জন্যে এ রকম একটা কাজের ছুতো পেয়ে নতুন করে যেন কাজের উপর কৃতজ্ঞ হয়ে গেলো। ছাতে যে মুক্তির নীল নির্জনতা।

সাংসারবহির্ভূত বহু কথার আলোচনার ভার, গম্ভীর কণ্ঠের ছন্দঝঙ্কৃত আবৃত্তিও শব্দভার, মনকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছে, সেখান থেকে তখুনি যে মনকে টেনে এনে চট করে সংসারের গণ্ডির মধ্যে

খাপ খাওয়াতে পারা শক্ত! তাই কাচা কাপড়গুলো তুলে আলসের উপর জড়ো করে রেখে, আলসে ধরে একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে।...এমন প্রায়ই হয়।

যখন তাসের আড্ডা ভেঙে সুখময় ফেরেন, কেষ্ট হাঁক পাড়ে, "মা বাবু এসেছে, খেতে টেতে দেবে নাকি?" তখন তাড়াতাড়ি নেমে আসে মানসী দ্রুতপদে।

আজও এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো সে রাস্তার দিকের আলসে ধরে।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। এ পাড়ায় লোক চলাচল স্তিমিত হয়ে এসেছে। রাস্তার ল্যাম্প পোস্টগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীর মতো। বিদ্যুৎ-ঝলসানো কালো পীচ্ ঢালা রাস্তাটা দোতলার ছাত থেকে দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। ওর যেন আদি নেই অন্ত নেই।

আকাশের তারার দিকে তাকায়নি মানসী, তাকিয়েছিলো প্রহরীর দীপ্তচক্ষুর মতো একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সময়ের জ্ঞান থাকলো না যেন!

আমি কি সত্যিই বদলে যাচ্ছি? আমি কি অমোঘ কোনো আকর্ষণে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাচ্ছি? আমি কি কোনো অতল গভীরতায় তলিয়ে যাচ্ছি? আমি কি যে কোনো মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি? তীব্র প্রশ্ন, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

ক্রমশ প্রশ্ন মিলিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় লক্ষণ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা। নিজের পরিবর্তনের লক্ষণ। 'আমি যা ছিলাম, তা নেই? 'আমি যা ছিলাম, তা কি আবার হতে পারবো? যা ছিলাম তা হতে পারলেই কি আমি সুখী হবো?'

এ জিজ্ঞাসাও কখন শান্ত হয়ে গেছে শুধু একটা চিন্তাহীন, লক্ষ্যহীন প্রশ্নহীন আচ্ছন্ন মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী নতুন বসন্তের এলোমেলো হাওয়ায়। সে হাওয়া রাত্রির গভীরতায় ভারী হয়ে আসে। একবার বুঝি গায়ের আঁচলটা টেনে দিতে ইচ্ছে হয়েছিলো, কিন্তু দিতে ভুলে গেছে।

কিছুক্ষণ আগেও খেয়াল ছিলো, কেষ্টা এইবার ডাক দেবে, সেটাও ভুলেছে।

সহসা চমকে উঠলো আকস্মিক একটা বিস্মিত প্রশ্নে—কেষ্টা নয়, সুখময়। নিজেই তিনি উঠে এসেছেন ছাতে।

"কি গো ব্যাপার কি? দিব্যি জেগে দাঁড়িয়েই রয়েছো দেখছি যে! আমি ভাবলুম বুঝি ঠাণ্ডা হাওয়ায় তোফা একখানি ঘুম লাগাচ্ছো। ফুলটুশ পর্যন্ত এসে গেছে, আমি তো কো—ন্ কালে এসেছি, নামছো না যে? খাওয়া হবেনা আজ?"

নিজের অভ্যস্ত ভঙ্গীতে কথা কন সুখময়, কিন্তু মানসী হারিয়ে ফেলেছে নিজের পুরনো ভঙ্গী। কিছুদিন আগে হলেও স্বামীর এমন ভাষার উত্তরে কুণ্ঠিত তো হতোই না, উলটে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠতো, "অনেকক্ষণ এসেছো তো ডাকতে কি হয়েছিল?...ছাতেই এসেছি, বাড়ি থেকে চলে তো যাইনি? কে কখন আসছে, আমি কি হাত গুনছি? নিজেরা রাত দুপুর অবধি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে আসতে পারেন, আর আমি একটু মাথায় হাওয়া লাগাবো তা প্রাণে সহ্য হয় না।"

কিন্তু আজ আর সে ভাষা খুঁজে পেলো না মানসী। অনভ্যস্ত কুণ্ঠিত সুরে বললো, "এতো দেরী হয়ে গেছে টের পাইনি তো! মাথাটা বড়ো ধরেছিলো, ভাবলাম একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে যদি উপকার হয়।"

"মাথা ধরেছে। এই দেখো কাণ্ড! এতক্ষণ বলছ না? আজ বুঝি মাথা ধরারই দিন। এই দেখো না, আমি এতক্ষণ বসে বসে কপালে 'আশ্চর্য মলম' ঘসছিলাম। চলো চলো, তুমিও না হয় একটু—"

মানসী চকিত হয়ে বলে "তুমি? তোমারও বুঝি—"

"হ্যাঁঃ! সন্ধ্যে থেকেই মস্তকটি ধৃত হয়েছেন। যতোক্ষণ তাস পিটেছি, সামনে রগের কাছে চিড়িক মেরেছে, বিশেষ করে ডান রগটায়। খিদেটাও যেন কমকম ঠেকছে। চলো, যা পারি দু'খানা —ওকি কাপড়চোপড়গুলো আলসেতেই থাকবে নাকি?"

লজ্জিত হয়ে মানসী কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলে "তাই থাকছিলো! তোমার মাথাধরা, তোমার ক্ষিদে কম, শুনে ভয় ভয় করছে যেন!"

সুখময় হেসে ওঠেন, "হুঁ তা বটে, তোমাদের দামী মাথা ছাড়া ধরবার রাইট্ আর কারো নেই, কেমন?······ইস্ বড্ডো যেন চিড়িক মারছে।"

থার্মোমিটারটা হাতে নিয়ে ছেলের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মানসী উদ্বিগ্নস্বরে বলে "এখন আবার বেরোচ্ছিস নাকি?"

ফুলটুশ চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে অভ্যস্ত অবহেলার ভঙ্গীতে বলে, "বারণ করো তো বেরোবো না।"

"বারণ করবার কথা হচ্ছে না, বলছিলাম এবার তো একবার ডাক্তার ডাকা দরকার!"

"ডাক্তার!"

"হ্যাঁ, আর তো সর্দিজ্বর বলে অবহেলা করা চলে না, তিন দিন হয়ে গেলো, জ্বর ছাড়া তো দূরে থাক আজ একেবারে একশো পাঁচ উঠেছে—"

ফুলটুশ বিব্রতভাবে বলে, "একখুনি ডাক্তার আনতে হবে? আমার আজকে—"

বোধকরি রোগটা কার সেটা স্মরণে আসায় নিজের দরকারের জরুরীত্বটা বলতে গিয়ে থেমে যায় ফুলটুশ।

মানসীর মুখের রেখাগুলোয় উদ্বিগ্নের শিথিলতার পরিবর্তে মুহূর্তে দেখা দেয় একটা কাঠিন্য। শান্ত কঠিন স্বরেই সে বলে, "আনতে হবে কি না সেটা তুমিই বোঝ! এখন আর ছেলেমানুষটি নও, দায়িত্ব বোঝবার বয়স অবশ্যই হয়েছে।"

"বেশ যাচ্ছি।" বলে বিদ্যুৎগতিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ফুলটুশ ওর মনে হয় দুশ্চিন্তাটা মার স্বভাবগত বাড়াবাড়ি! জ্বর

হলেই ডাক্তার ডাকতে হবে? এইতো ফুলটুশের কতো সময় কতো শরীর খারাপ হয়, রোদে ঘুরে জলে ভিজে জ্বর হয় কতোদিন, বাড়িতে বলেই না। আপনিই সেরে যায়। জানে তো, বললেই বাড়িতে তখুনি সোরগোল পড়ে যাবে। যেটা নিদারুণ ঘৃণা ফুলটুশের।

পারিবারিক চিকিৎসক বলে বিশেষ কেউ নেই। সুখময়ের মামার বাড়ির জানা ডাক্তার একজন আছেন, কদাচ দরকার পড়লে তাঁকেই ডাকা হয়। তা দরকার কদাচই হয়। মানসীর অটুট স্বাস্থ্য, সুখময়ের সাতজন্মে অসুখ করে না, ফুলটুশ খুব স্বাস্থ্যবান না হলেও, বড়ো অসুখ অনেককালই হয়নি তার।

কাজেই ডাক্তার ডাকাটা ফুলটুশের পক্ষে বিশেষ গুরুভার কাজ। ডাক্তারকে কল্ দিয়ে এসে ওর মনে হয় পিতৃঋণ সম্পূর্ণ শোধ করা হয়ে গেছে বুঝিবা!

বাড়ি এসে গম্ভীর চালে মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বলে এসেছি। পাঁচটার সময় আসবেন। কেষ্টা যেন তাড়াতাড়ি ওষুধটা এনে দেয়।"

"তুমি থাকবে না?"

"আমি? বাঃ! আমি কি করে—? আমার থাকার বিশেষ কিছু দরকার আছে?"

"বললাম তো—দরকার বোঝবার বয়েস তোমার হয়েছে, ওটা নিজেই ঠিক করো।"

"বেশ যাবো না!···আজ একটা স্পেশাল মিটিং ছিলো, আর আজকেই যতো ইয়ে" বলে গম্ভীরভাবে একখানা বই নিয়ে সটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ফুলটুশ।

"ওদিক থেকে কেষ্টা হাঁক দেয়, "মা বরফ এনেছি।"

বরফ!

ফুলটুশ ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বসে। দ্রুতভঙ্গীতে বলে, "ডাক্তার না বলতেই নিজেরা বুদ্ধি করে বরফ টরফ দেওয়া ঠিক হবে?"

"একশো পাঁচের ওপর জ্বর উঠলে রোগীর মাথায় বরফ নিজেদের

বুদ্ধিতেই দেওয়া চলে ফুলটুশ !" বলে ও ঘরে চলে যায় মানসী।

গৃহকর্তার অসুখকে উপলক্ষ্য করে মায়ে ছেলেতে চলে 'বরফ লড়াই'! এই দুদিন আগে ছাতে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলো মানসী, ছেলের সঙ্গে আর লড়াই চালাবে না, সে প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে না।

সুখময়ের জ্বরটা যে বাঁকা পথ ধরবে এ আশঙ্কা যেন প্রথম দিন থেকেই মানসীর বুকে বাসা বেঁধেছিলো। কেন বেঁধেছিলো কে বলবে? নিজের মনের অন্তর্হিত একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধই কি তাকে অবহিত করিয়ে দিচ্ছিলো "তোর এবার শাস্তির সময় এসেছে!'

কিন্তু ছেলের ব্যবহারে নিজের অপরাধবোধও চাপা পড়ে যায় মানসীর। প্রতি মুহূর্তে আপাদমস্তক জ্বলে যেতে থাকে, মনে হয় কোনো সাহায্য নেবে না ওর, তবু আবার মান খোয়াতে হয়, আবার ডেকে বলতে হয়, "এ ওষুধটা কেষ্ট আনতে পারলো না, এনে দিতে পারবে?"…হয়তো বলতে হয়—"আমি একবার চানটা সেরে আসি, খানিকটা ওঁর কাছে বসতে পারবে?"

ফুলটুশ কি তবে সত্যিই নিতান্ত পাষণ্ড? মোটেই তা নয়।

ওর হিসাবে ও যা করছে, যথেষ্ট করছে। সাত আট দিন সমিতির দিকে যায়নি, এমনি বেড়ানো বন্ধ করেছে, দরকার পড়লেই আড়ষ্ট হয়ে টুলে বসেই হোক, আর যাই হোক, বাপের মাথায় আইসব্যাগ ধরছে, বাতাস করছে, দুষ্প্রাপ্য ওষুধ সংগ্রহ করে এনে দিচ্ছে, আর কত করবে? মানসীর হুকুম মাত্র বাধ্য ভৃত্যের মতো সমস্ত হুকুম তামিল করছে, কেষ্ট যদি বা প্রতিবাদ করে, তর্ক করে, সে একেবারে বিনা বাক্যব্যয়ে করছে, এতেও যদি মায়ের মন না ওঠে, যদি তাঁর মনে হয় 'ছেলেটা অমানুষ', তা'হলে ফুলটুশ নাচার।

"ও বাড়ির কাকাদের একবার খবর দাও দিকি!"

ফুলটুশ মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে, "দেবু কাকা তো সেদিন জ্বর দেখেই গেলেন, কই আর তো এলেন না।"

"সবে দেড়দিন জ্বর দেখে গিয়েছিলো দেবু ঠাকুরপো, তার পক্ষে আর একবার খোঁজ নিতে না আসাটা বোধহয় খুব অন্যায় হয়নি।"

"না হবে কেন ? যত্তো অন্যায় দেখতে পাও শুধু বাড়ির লোকের।"

"বেশ, তুমি না পারো কেষ্টকে দিয়েই খবর দিচ্ছি। তবে চাকর বাকরের কথা কেউ তেমন গ্রাহ্য করে না এই ভেবেই বলছিলাম।"

বাপের অসুখে বোধকরি ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ দমে গিয়েছিলো ফুলটুশ তাই শেষ পর্যন্ত অতো বিরক্তিকর কাজটাও করলো।

দেবু ঠাকুরপো এসে চিকিৎসা এবং চিকিৎসক উভয়েরই যথেষ্ট সমালোচনা করে, অতঃপর রীতিমত চিন্তা প্রকাশ করে বলে, "তাইতো বৌদি, তুমি একা এভাবে রুগীর সেবা, সংসারের কাজ কি ভাবে চালাবে ? 'এদের' না হয় রোজ একবার করে আসতে বলে দিই ?"

বলা বাহুল্য 'এদের' অর্থে দেবুর স্ত্রী। সে যে এসে রোগীর সেবা কতোই করতে পারবে সেটা মানসীর অজানিত নেই। মেদের ভারে নড়তেই পারে না বেচারা।

তাই ম্লান হেসে বলে মানসী, "সংসারের কাজ আর কি ? তোমার দাদা পড়ে আছেন, সংসারের কাজ বলতে কিছুই নেই।"

"আহা কি মুশকিল ! দু'বেলা দুমুঠো ভাত সেদ্ধও তো আছে ?"

"সে এ ক'দিন কেষ্টাই চালিয়ে দিচ্ছে।"

"কেষ্টা ? তার মানে আপনার হরিমটর চলছে ! কেমন ? ছি ছি এটা তো ঠিক নয়, এভাবে উপোস দিয়ে ক'দিন দেহ টিঁকবে ? এ সব রোগে যমে মানুষে যুদ্ধ। না খেয়ে কদিন যুঝতে পারবেন ?"

মানসী যেন চমকে ওঠে।

যুদ্ধই তো চালাচ্ছে সমানে। শুধু যমের সঙ্গে নয়, মনের সঙ্গেও ! এই সাতদিনের মধ্যে বোধকরি সহস্রবার মনে হয়েছে, সেই মানুষটাকে খবর দেওয়া হোক। মনে হয়েছে, সে এসে দাঁড়ালে বুঝি অনেকটা ভরসা মিলবে, পরামর্শদাতা বন্ধু ! বড়ো বড়ো ডাক্তার ডাকা দরকার কিন্তু কে ডাকবে তাঁদের ? যিনি আসেন নিজের উপর তাঁর এমনি অগাধ আস্থা যে নিজে থেকে এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন না।... ছেলে তো ওই ! তাহলে কি হবে !

আধুনিক জগতে চিকিৎসার এতো হাজার রকম পদ্ধতি থাকতে

সুখময়ের রোগ বেড়ে যেতে থাকবে? আশ্চর্য! সেদিন থেকে আর এলোও না তো মানুষটা! প্রয়োজনের সময় সকলেই দুর্লভ হয়। কতোবার ভেবেছে মানসী, এক লাইন চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় মানসী কতো বিপন্ন, মানসী কতো অসহায়! জানিয়ে দেয়, সুখময় কতো পীড়িত! কী ভালোবাসেন সুখময়, তাকে, 'প্রফেসর' বলতে অজ্ঞান হয়ে যান একেবারে! যদি সুখময় আর—

দেবু হাঁ হাঁ করে ওঠে, "এই দেখুন কী মুশকিল! চোখের জল ফেলছেন কেন? অসুখবিসুখ হয় না মানুষের? আপনি এতো নার্ভাস, তা তো জানতাম না?"

অদম্য যে বাষ্পোচ্ছ্বাস গলার কাছ অবধি ঠেলে উঠে হঠাৎ চোখে জল এনে দিয়েছিলে, তাকে কষ্টে দমন করে নিয়ে মানসী ম্লান হেসে বলে, "জাতের স্বধর্ম আর কোথায় যাবে? কিন্তু সে যাক, বলছিলাম —বড়ো কোন ডাক্তারকে ডাকলে হতো না?"

"বড়ো ডাক্তার!" এক ফুঁয়ে সমগ্র 'বড়ো ডাক্তার' কুলকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেবু বলে, "বড়ো ডাক্তার মানে তো শুধু টাকা নেবার যম? তাঁরা আর বাহাদুরীটা করবেন কি? বড়ো গাড়ি থেকে মসমস করে নামবেন, দুটো বড়ো বড়ো বোলচাল ছাড়বেন, বড়ো অঙ্কের 'ফী'টি বাগাবেন আর সরে পড়বেন। প্রেসকৃপশন যা দেবেন তা, সবই ছোট ডাক্তারের জানা। ছোটরা তবু একটু যত্ন নিয়ে রুগীকে দেখে, মায়া মমতা দেখায়, বড়োদের সে সব বালাই নেই। ঠিক যেন যন্তর!"

মানসী ঈষৎ তর্কের সুরে বলে, "তবুও তো লোকে তাঁদের ডাকে?"

"সেটা লোকের বাতিক"

"তা' সে যাই হোক, আমার আর মন মানছে না ঠাকুরপো, তুমি একবার ডাক্তারবাবুকে বলো অন্ততঃ আর একজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে।"

"বেশ, আপনি বল্লেন তো বলবো। তবে কি না টাইফয়েড হচ্ছে

মেয়াদি রোগ, ডাক্তারের সাধ্যি নেই জ্বর নড়ায় চড়ায়।"

"অনেক রকম ইন্‌জেকশন তো উঠেছে আজকাল?"

"ইন্‌জেকশন? বিষ বিষ একদম বিষ! তখনকার মতো রুগীকে তোলে বটে, কিন্তু ভেতর একেবারে জরিয়ে দেয়।"

"তখনকার মতোও তো তোলে ঠাকুরপো?"

"আহা হা কী মুশকিল! আবার আপনি কান্নাকাটি শুরু করলেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখছি। কাকে যে পাওয়া যাবে! বড়ো ডাক্তারদের তো সাতদিন আগে থেকে ঘণ্টা মিনিট সব 'বুক' হয়ে থাকে কিনা। যাকগে যা হয় ব্যবস্থা একটা করছি, আপনি উতলা হবেন না! ফুলটুশকে দেখছি না যে?"

"ঘরে আছে।"

"আহা, তাকে একেবারে ছেলেমানুষ করে রাখছেন কেন? খানিক খানিক তার ওপর ভার দিয়ে আপনিও কিছুটা রেষ্ট নিয়ে নিন। নইলে—দেখছি কি না আপনার চেহারাটা এই কদিনেই যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।"

দেবু চলে যায়, বন্ধু আত্মীয় হিতৈষী পরামর্শদাতা সব কিছুর ভূমিকা নিখুঁত উৎরে দিয়ে।

বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বলে, "সুখময়দা'কে যা দেখে এলাম, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না!"।

সারাদিন বরফের ঠকৃঠক শব্দ থামে না, তবু তাপমাত্রা নড়ে চড়ে না।

আইসব্যাগ ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মানসী স্বামীর মুদ্রিতচক্ষু মুখের দিকে চেয়ে। এ দু'টি চোখ কি আর খুলবে? শিশুর মতো সরল আর উজ্জ্বল সেই চোখ দুটির দৃষ্টি দিয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কি বলবে, "আহা! কতো কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

হে ঈশ্বর! একবার শুধু ওই মুদ্রিত চোখ খুলে দাও, ওই ভাবলেশশূন্য নিস্পন্দ মুখে ভাবের সংস্পর্শ এনে দাও। মানসীকে

তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

পাপ? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। কেনই বা নয়।

কেন স্বামীর অসুখে ভরসা হিসেবে অহরহ প্রফেসর সেনকেই মনে পড়েছে, মানসীর কি আর কোন আত্মীয় নেই? এর আগে কি আর কখনো বিপদআপদ আসেনি মানসীর জীবনে?

যন্ত্রণায় একবার ভুরুটা কুঁচকে উঠলো সুখময়ের। তবে কি চৈতন্যের জগতে নেমে আসছেন সুখময়? আশান্বিত চিত্তে মানসী স্বামীর কপালে হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে বলে, "ওগো শুনছো, কি কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ গো, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?"

নাঃ, উত্তর পাওয়া যায় না!

যন্ত্রণার যে অভিব্যক্তি সেটা শুধু পেশীর আকুঞ্চন।

ফুলটুশ এসে ঘরে ঢুকলো কয়েকটা ওষুধপত্র নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে, "ডাক্তার রায়চৌধুরী আজ আবার আসবেন।" আমাদের ডাক্তারবাবু এগুলো এনে রাখতে বললেন।"

"রাখো।"

বলে চুপ করে গেলো মানসী। কি কথা বলবে ছেলেকে। উতলা হওয়া আকুলিবিকুলি করা—এগুলো ফুলটুশের বিশেষ বিরক্তিকর সে তো জানা আছে মানসীর! কথা কইতে গেলেই যে উত্তাল হয়ে ওঠে অশ্রুসমুদ্র, করবে কি মানসী!

মিনিট দুয়েক স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে একটু নড়ে চড়ে ওঠে ফুলটুশ। অকারণে টেবিলের দু' একটা জিনিস নড়াচড়া করে, জ্বরের চার্টটা চোখের সামনে একবার তুলে ধরে, তারপর টুক করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। রুগীর ঘর তার অসহ্য!

ছেলের গমনপথের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট একটা ক্ষোভের হাসি ফুটে ওঠে মানসীর মুখে। রুগীর ঘর ফুলটুশের অসহ্য মানসীও জানে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কি তার ব্যতিক্রম হবে না? ভক্তি, ভালোবাসা, মমতা, স্নেহ—এ কথাগুলো কি এ যুগে শুধু অর্থহীন শব্দ?

নাঃ এ শুধু মানসীর ভাগ্য! না কি মানসীর শিক্ষার ফল?

আত্মকেন্দ্রিক ছেলে! মানসী নিজেও কি আত্মকেন্দ্রিক নয়?

আজীবন আপনাকে ঘিরেই বৃত্ত রচনা করে আসেনি কি সে? টের পায়নি কোন ফাঁকে সে বৃত্তের বাইরে ছিটকে গেছে একমাত্র আত্মজ। এই যে অহোরাত্র রোগশয্যায় বসে আছে সে নির্নিমেষ নেত্রে ওই মুদ্রিতনেত্র মুখখানার দিকে তাকিয়ে, অহোরাত্র কি শুধু ওই মুখের অধিকারীর নিরাময় কামনা করছে? কতোবার চিন্তা হারিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে শূন্যতার অতলে তলিয়ে, কতোসময় শুধু আত্ম-বিশ্লেষণেই কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নিজেকেই বুঝে উঠতে পারে না মানসী।

সে কি সৃষ্টিছাড়া? সে কি অদ্ভুত অস্বাভাবিক?

নাকি অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলে এই চেহারাই থাকে অনেকের, শুধু তারা আপনাকে এমনভাবে চিরে চিরে জানতে চেষ্টা করেনা বলেই ধরা পড়ে না?

এই যে মানুষটা পড়ে রয়েছে, এর জন্যে হাহাকারের তো অন্ত নেই মানসীর, সমস্ত মন যেন মাথাকুটে মরতে চাইছে ওর পায়ের তলায়, এই মানুষটার অস্তিত্ববিহীন পৃথিবীর চেহারা ধারণাই করতে পারে না, তবু কেন অবিরত আর একটি সৌম্য প্রসন্ন মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে?

কেন মনে হয় সেখানে আশ্রয় আছে, আশ্বাস আছে?

মামাতো ভাওররা এলেন একে একে সবাই, মামাতো জায়েরা এলেন একসঙ্গে সবাই। সবাইয়ের দৃষ্টিতে হতাশার ভাষা, সবাইয়ের কণ্ঠে পরম আশার বাণী।

মানসীর ঠোঁটের কোনটা অলক্ষ্যে একটু বিস্ফারিত হয়, মুখের রেখাগুলো নমনীয়তা হারায়।

দেবুর বৌ লতিকা করুণকণ্ঠে বলে, "আমি এ ক'টা দিন এখানেই থাকি বড়দি, নইলে আপনাকে কে দেখবে?"

মানসী স্থিরস্বরে প্রশ্ন করে, "এ ক'টা দিন মানে?"

লতিকা ত্রস্তে ব্যস্তে বলে, "মানে আর কি, যে ক'দিন অসুখের বাড়াবাড়ি চলে!"

"ও! কিন্তু আমাকে দেখবার কি আছে? আমার তো কিছু অসুখ করেনি!"

"অসুখ করেনি! আর্শির সামনে দাঁড়াবার তো অবকাশ পান না নইলে বুঝতেন কি হয়েছে।" লতিকার কণ্ঠ আরো করুণ হয়ে আসে।

মানসী উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "রাত জাগলে অমন হয়। তোমারই বরং শরীর ভালো নয়, রুগীর বাড়িতে না থাকাই ভালো।"

না থাকাটাই যে ভালো সে কি আর লতিকা জানে না? কিন্তু কি করবে, স্বামীর নির্দেশে একবার 'বলে দেখছে'! স্বামীর এহেন অবিবেচকের মতো নির্দেশ পেয়ে পর্যন্ত অপর জায়েদের স্বামীভাগ্যের ঈর্ষা করছিলো সে! তবু শেষবেশ আর একবার বলে, "তাতে কি ওসব আমি ধরি না বড়দি। অসুখ ভাগ্যের লিখন।"

"তা হোক সাবধান হওয়া ভালো।"

"তবে যাই আবার কাল আসবো। আপনার দ্যাওর বলছিলেন, ফুলটুশের খাওয়াদাওয়ায় অসুবিধে হচ্ছে, আমার ওখানে গিয়ে যদি খেয়ে আসে।"

"বলা বৃথা লতিকা, সে যাবে না।"

বাড়ি গিয়ে লতিকা স্বামীকে বলে, "বলে মিথ্যে অপমান হওয়া! চিরদিনের স্বভাব জানি তো ওঁর! ভাঙেন তো মচকান না। নইলে বিপদ আপদের সময় পাঁচজনেই করে কর্মায এইতো চিরদিনই জানি। ছেলেটিও হয়েছেন মার মতো!"

"সুখময়দা'র অবস্থা তো ক্রমশঃই—"

"হুঁ! আর ক'দিন! বড়ো জোর দু' তিনটে দিন! তারপর তো সবই ঘুচবে। চিরদিনের অমন তেজী মানুষটার কপালেও ভগবান এই দুর্গতি লিখেছিলেন। আহা।"

"আহা!"

এই শব্দটুকু উচ্চারণ করতে কতো ভালবাসে আত্মীয়-স্বজন, ঘর পর!

অপরকে এই আহাটুকু বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে মানুষ, বলতে পেলে ধন্য হয়ে যায়, তবু মানুষের নিষ্ঠুর বলে বদনাম? আশ্চর্য!

কিন্তু মানসীর মতো এমন সৃষ্টিছাড়াই বা ক'জন আছে যে আহা শুনতে ভালোবাসে না, আহা শুনতে চায় না? অথচ অপরের 'আহা' আদায় করবার জন্যে যে কতো লোকে বানিয়ে বানিয়ে অপরের কাছে দুঃখ জানায়, কল্পিত যন্ত্রণার কাহিনী বিবৃত করে!

না, মানসী তাদের দলে নয়। 'আহা' তার অসহ্য!

পুরুষে অমন স্পষ্ট করে 'আহা' জানায় না বলেই হয়তো মানসী বরং পুরুষ আত্মীয়দের সহ্য করতে পারে। সহ্য করতে পারে না মহিলাদের। অথচ সর্বক্ষণই বাড়িতে রোগী দর্শনার্থীব ভিড়!

এখন আর আপনার মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় নেই, এখন চলছে যুদ্ধ! কঠোর কঠিন যুদ্ধ! মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের, চেষ্টার সঙ্গে ক্লান্তির, ইচ্ছের সঙ্গে সঙ্গতিবোধের!

ক্রমশঃ কি ক্লান্তিরই জয় হচ্ছে? জয় হচ্ছে মৃত্যুর?

শুধু সঙ্গতিবোধ থাকবে অটুট? অটুট থাকবে মানুষের গড়া শৃঙ্খলার?......অনেকদিন পরে দৈবাৎ কোনদিন 'ত্র্যহস্পর্শ' বৈঠকের একজন সদস্য এসে যদি দেখে সে বৈঠকের একজন সদস্য হারিয়ে গেছে অনন্ত শূন্যতায়, কী বলবে সে, কি বলবে? সহস্রবার একথা মনে পড়লেও মুখ ফুটে বলা যায় না 'ওরে তাকে একবার ডেকে আন!'

না, তার এখানে আসবার কোন ছাড়পত্র নেই।

আসবে দেবু ঠাকুরপোর দল, লতিকাদের দল।

আসবে মাসী পিসি মামীর দল।

যারা রোগীর ঘরে বসে হা-হুতাশ করবে, মানসীকে শেষ 'মাছভাত' মুখে দেওয়াবার জন্যে জেদাজিদি করবে, শেষ সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যাবে সিঁদুরের কৌটো উপুড় করে।

স্তব্ধ মৌন আত্মার অন্তরঙ্গ। সে বন্ধুত্বে অধিকার নেই নারীর।

পৃথিবী নাকি মানুষের জননী।

কে জানে কেমন করে রক্ষা হয় তাঁর সেই জননী নামের গৌরব। মানুষের জীবনের সাজানো ছন্দ প্রতি পদে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো হয়ে, ফিরে সাজাবার সকল সম্ভাবনা লুপ্ত করে দিয়ে।·· পৃথিবীর ছন্দ তবে অব্যাহত থাকে কেমন করে? কই সেখানে কখনো তো কোথাও ধরা পড়ে না ছন্দপতনের চিহ্ন?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মানসী, তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরো অবাক হয়ে যায়, যখন দেখে রাস্তার ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার সমস্ত শাখাগুলো ঠিক প্রত্যেক বছরের মতোই উঠেছে লালে লাল হয়ে।···অবাক হয়ে যায়, যখন দেখে ঠিক আগের মতোই শুক্লপক্ষের আকাশ থেকে খশে-পড়া একটুকরো জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ওর ঘরের মেঝেয় এসে স্থির হয়ে থাকে ফ্রেমে আঁটা আর্শির মতো, আর কৃষ্ণপক্ষের আকাশখানি অনেকদিনের অনেক হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের ব্যথাতুর দৃষ্টি প্রদীপগুলি সাজিয়ে বসে থাকে প্রদীপ সাজানো আরতির থালার মতো। অবাক হয়ে যায়, যখন দেখে পরিচিত কুল্‌পী বরফওয়ালাটা ঠিক আগের মতোই সামনের বাড়ির রোয়াকটায় জমিয়ে বসে, আর পাড়ার ছেলেগুলো তাকে ঘিরে কলরব করতে থাকে। অবাক হয়ে যায়, যখন বিশেষ এক একটি ফেরিওয়ালার ধুয়ো একই ভাবে বেজে ওঠে।

দেখতে দেখতে শুধু অবাক হয়ে যায় মানসী, সপ্তস্বরা পৃথিবীর কোনও তারও ছিঁড়ে পড়েনি।

আচ্ছা, মাঝে যেন কিছুদিন সব কিছুই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো না? নাকি বন্ধ হয়ে থেকেছিলো মানসীর চেতনার দরজাটা? মাঝখানের কিছুদিনের কথাটা কিছুতেই স্মরণে আনতে পারে না মানসী। কি হতো তখন? দিনের পর রাত আসতো? রাতের পর দিন?

তখনো কি পৃথিবার কর্মচক্র অব্যাহত নিয়মে চলতো ?

না কিছুই ভালো করে মনে পড়ে না, শুধু আবছা মনে পড়ে বাড়িতে অনেকদিন ধরে চলেছিলো অনেক গোলমাল। নানা লোকের ভিড়, আত্মায় আত্মীয়ার সহৃদয় সান্ত্বনার দম-আটকানো গুরুভার—যেন মানসীকে নিয়ে চালানো হচ্ছে কি একটা অভিনয় ! তখন বুঝি নিজস্ব কোনো সত্তা ছিলো না মানসীর !

ক্রমশঃ গোলমাল কমলো, জোয়ারের জল সরে যাওয়ার মতো ভিড় গেলো সরে, সান্ত্বনার কথাগুলো একঘেয়ে ছেঁদো ছেঁদো হয়ে থেমে গেল। অবশেষে অভিনয়ের শেষের খালি মঞ্চটার মতো পড়ে রইলো মানসীর এক অদ্ভুত শূন্য জীবন।

শুধু কি সুখময় নেই বলেই এই শূন্যতা ? মানসীর মনে হয় তার যেন আর কোনো কর্তব্য নেই। আর কর্তব্যবোধ-শূন্যতার মতো এমন নিঃসীম শূন্যতা আর কি আছে ?

অতীতটা ঝাপসা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতটা নিরবয়ব, বর্তমানটা অর্থহীন। আজকাল আর সকালে চোখ মেলতে না মেলতেই দৈনন্দিন হাজারো কাজের ফিরিস্তি এসে ভিড় করে দাঁড়ায় না, আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসে না মানসীকে, নিতে আসে না কোন কাজের নির্দেশ। কে জানে কে চালাচ্ছে মানসীর সংসার !

মানসীর সংসার ! তা সে নামটা তো আছেই। আছে ফুলটুশ, আছে কেষ্ট, আছে মানসী নিজে। আর যে মামীশাশুড়ীটি চিরদিন পরোপকারের জন্য বিখ্যাত তিনিও তো রয়েছেন অসুখের সময় থেকে। মানসীকে যত্ন করবার জন্যে আকুলতার শেষ নেই তাঁর। ক্ষুধাবোধের আগেই সামনে আহার মেলে, তৃষ্ণা না পেলেও ডাব অথবা সরবৎ মুখের সামনে এনে কাকুতি মিনতি জানায় ! অতএব এখন যদি মানসী অন্ধকার ভোরে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ছাতে বসে থাকে, কেউ কিছু বলবে না মানসীকে। কেউ ডেকে জ্বালাতন করবে না।

এমনি একদিন আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ

সেদিন চোখে পড়লো কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথাটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। আর চোখে পড়তেই অবাক হয়ে গেলো।

সন্ধ্যার দিকে মানসী চুপ করে নিজের ঘরে বসেছিলো: ছাতে উঠে যাবার উদ্যমের অভাবেই উঠে যায়নি। মামীশাশুড়ী এসে কণ্ঠে সদয় করুণার ভাব ঢেলে দিয়ে বলেন, "রোজই 'বলি বলি' করি বৌমা, বলতে পারি না, আমাদের ও পাড়ায় দাসেদের বাড়িতে চমৎকার ভাগবত পাঠ হয়, যাবে শুনতে?"

ভাগবত পাঠ! মানসী চুপ করে চেয়ে থাকে।

মামীশাশুড়ী অশ্রুসজল চোখে স্নেহঢালা সুরে বলেন, "চলো না মা। তবুও দু'দণ্ড মনটা অন্যমনস্ক হবে!"

মানসীর তো এ প্রস্তাবে কৃতার্থ হওয়াই উচিত, বিগলিত হওয়া উচিত মামীশাশুড়ীর হৃদয়বত্তা, সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধের পরিচয় পেয়ে, উচিত ছিলো সঙ্গে সঙ্গে ব্যগ্রভাবে বলা, "তাই চলুন মামীমা, একলা একলা আর পারছি না।" কিন্তু তা না বলে ও কিনা বোকার মতো বলে বসলো, "আমি তো অন্যমনস্কই থাকি মামীমা?"

"শোনো কথা!" মামীমা সক্ষোভে বলেন, "শূন্য প্রাণে শূন্য মনে অন্যমনস্ক হয়ে ছাতে ছাতে ঘুরে বেড়ালে ভেতরের জ্বালা মেটে? এ তবু পাঁচটা লোকের মুখ দেখবে, দু'টো ভালো কথা শুনবে—"

মানসী শুষ্কস্বরে বলে, "আমার ওসব ভালো লাগে না মামীমা।"

মামীমা কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলেন, "ভালো তোমার এখন কিছুই লাগবে না মা, তবু মানুষে যা ক'রে থাকে তাই বলছি। যাও যদি তো সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আগে নিত্যদিনই তো যেতাম, সুখোই আমাকে"—চোখে আঁচল দেন মামীশাশুড়ী।

মানসী স্থিরস্বরে বলে, "চলুন যাচ্ছি।"

মামীমা একটু স্বস্তি পান। তিনিও আর এখানে থাকতে পারছেন না। মানসীর উদ্‌ভ্রান্তর মতো ভাবটা কোনো রকমে ঘুচলেই তিনি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন। আর সত্যি বলতে কি ঠিক এ ধরনের শোকাহতা বিধবাকে চালানো তাঁর পক্ষে কঠিন। নিজে

তিনি বলতে গেলে আশৈশব বিধবা, কাজেই সম্ভবিধবা দেখলেন এ যাবৎ ঢের, অসম্ভব এলোমেলো কান্নাকাটি সত্ত্বেও তাদের বেশ আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। মানসী এদিক দিয়ে শান্ত চুপচাপ, কিন্তু কিছুতেই যেন আয়ত্তে আনা যায় না। 'খাও' বললে খায়, 'শোও' বললে শোয়, এ কেমন ধারা বিধবা?

যাক্ পাঠ শুনতে রাজী হওয়ায় মামীশাশুড়ী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন এই পথেই তবে ম্যানেজ করা যাবে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই জেনেছেন সত্যি 'ভালো' কিছুই লাগে না! তবু সংসারে যখন থাকতে হবে, যাহোক একটা কিছু ভালো লাগবার চেষ্টা করতে হবে বৈ কি। ভগবানের নামগানের চাইতে ভালো জিনিস আর কি আছে? সেটাই ধরা ভালো।

"সিল্কের চাদর একখানা গায়ে দাও মা।"

"সিল্কের চাদর!"

মানসী মামীশাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার তো সিল্কের চাদর নেই মামীমা! মানে কখনো তো—"

"আহা! কখনো আর পরতে যাবে কেন মা, কখনো কি এ মূর্তি, এ সাজ ছিলো! তা' আমার সুখোর চাদর টাদর নেই?"

মানসী মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলে, "আছে। সেইটা গায়ে দেবো?

"তা দেবে বৈ আর কি করবে বলো মা? সে তো নিজের সাজ দিয়ে গেছে? তার কাপড়চোপড়ই পরো বসে বসে।"

সাদা ধবধবে থানের উপর একখানা শুধু সিল্কের চাদর জড়িয়ে নিরাভরণ হাত দু'খানা থানের নীচে ঢেকে রিকশা চড়ে মামীশাশুড়ীর সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনতে গেলো মানসী।

মা নেই, বাপ নেই, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, এমন কি একটা বড়ো ভাইবোন পর্যন্ত নেই যে সম্ভবিধবার সম্ভরিক্ত হাত দু'খানা কারো মর্মে ঘা দেবে, আর সেই মর্মবেদনায় কাতর হয়ে ভাগ্যের ভেঙচানির মতো সরু দুগাছা চুড়ি আর কাপড়ের আগায় এক চিলতে পাড়ের রেখা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাবে মানসীকে। কাজেই মানসীর

জন্মের আগে বিধবা হওয়া মামীশাশুড়ীর সঙ্গে একই সাজে সেজে ধর্মকথা শুনতে যায় মানসী।

মোড় ঘুরতেই দত্ত ব্রাদার্সের স্টেশনারি দোকানটা। ঠিক আগের মতোই আলোয় আলোকাকীর্ণ দেহ নিয়ে পথচারীকে আকর্ষণ করছে। ঠিক আগের মতোই পাশের পানের দোকানটায় আজও বাজছে রেডিও। শেষ কবে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলে মানসী? কার সঙ্গে?

মনে করতে পারে না সে। শুধু মনে হয় বহু বহু যুগ আগের কথা সেটা।

•

পাঠ-বাড়িতে বহুদিন ধরে অনুপস্থিত ছিলেন মামীমা। কাজেই প্রশ্নসমুদ্র উদ্দাম হয়ে ওঠে। মামীমা তার কপালে করাঘাত করে না আসার কারণ দর্শান, আর দর্শান সঙ্গের মানসীকে। যে না কি হচ্ছে কারণের প্রজ্জ্বলিত প্রমাণ।

'আহা উহুর' স্রোত উদ্দাম হয়ে উঠে সীমা ছাড়ায়, আর সমস্তক্ষণ অনুভূতিহীন 'কাঠ' মন নিয়ে বসে থেকে যখন ফিরে আসে মানসী, তখন রিকশা থেকে নেমে বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়েই যেন পাথর হয়ে যায়।

বন্ধ দরজার সামনে সিঁড়িটার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে প্রফেসর সেন। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ।

রুদ্ধ কপাট খোলাবার কোনো চেষ্টা নেই, নেই কোনো চাঞ্চল্য। মনে হচ্ছে বুঝি যুগ-যুগান্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করছে এই মানুষটা, অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করতে হলেও করবে।

সুখময়ের অসুখের আগের দিনে শেষ এসেছিলেন প্রফেসর, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর এ বাড়ির দরজায় দেখা যায়নি তাঁকে। তারপর থেকে আর অনেক স্মৃতিমণ্ডিত এই ঘরখানায় জ্বলেনি নিওনের নীলাভ আলো। মিনি পেয়ালায় ঢালা হয়নি সোনালী চা। খড়খড়ির পাল্লাবন্ধ-করা ঘরখানা যেন মৌন মুখে শোক পালন করছে।

অন্যমনস্ক মানসী ছাতে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে ভেবেছে, মেয়েলি শাস্ত্রের লক্ষণ আর অলক্ষণের কথাগুলোর কি সত্যিই তা'হলে কোনো মূল্য আছে? 'ত্র্যহস্পর্শ' বৈঠক নাম দিয়েই কি মানসী এই সর্বনাশকে ডেকে এনেছে? তিনজনের একজন চলে গিয়েছে নামের অকল্যাণ স্পর্শে!

আর এরই সঙ্গে অনবরত ভেবেছে, আশ্চর্য! আরও একটা মানুষও এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কেন? ও কি টের পেয়েছে যে কী বিপর্যয় ঘটে গেছে মানসীর জীবনে? তাই আতঙ্কে আর আসে না? না কি এ অনুপস্থিতি শুধু দৈবাতের ঘটনা? একেবারে নিশ্চিন্ত মানুষটা দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ ভাঁজতে ভাঁজতে কোনো একদিন এসে উপস্থিত হয়েই সহসা মৃত্যুর মতোই স্তব্ধ অন্ধকার হয়ে যাবে?

আবার তার না আসার সহস্র কারণ গড়ে গড়ে ক্লান্ত মানসী কোনো কোনো দিন ভেবেছে, ভাগ্যিস আসেনি! কেমন করে নিজেকে তাঁর সামনে উপস্থাপিত করবে মানসী? শ্রীহীন, সজ্জাহীন ঐশ্বর্যহীন, গৌরবহীন এই দীন মূর্তি নিয়ে কি তার সামনে বার হওয়া যায়? যার সামনে রাজেন্দ্রাণীর মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে এতোদিন।

না না সে বড়ো লজ্জা! সে বড়ো লজ্জা!

এদিকে আর এক অদ্ভুত লজ্জার বশবর্তী হয়ে সেই মানুষটা ঘুরে বেড়িয়েছে এই বাড়ির আশে পাশে, অথচ দরজায় এসে দাঁড়াতে পারেনি। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছে উল্টো মুখে।

আজই শুধু দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ঘন্টারও বেশি সময়, চেষ্টাহীন, চাঞ্চল্যহীন নিশ্চল মূর্তিতে।

শুধুই যে সত্যবিধবার সামনে দাঁড়াবার মতো সাহসের অভাবেই এমনটা করেছেন প্রফেসর, তাও নয়। সুখময়ের মৃত্যুটাই তাঁর মনে এঁকে দিয়েছে একটা গভীর বিদারণ রেখা। সেই বিদারণের জ্বালাটা বড়ো মর্মান্তিক।

অমন একটা উচ্ছল প্রাণশক্তি এতো সহজে পরাজয় মানে কার কাছে? চিরন্তনের এই প্রশ্নটাই দিনরাত বিদ্ধ করেছে প্রফেসরকে। 'সুখময়বাবু আর নেই' 'সুখময়বাবু মারা গেছেন' 'ওখানে গেলে সুখময়বাবুকে আর দেখা যাবে না'—কী অদ্ভুত এই কথাগুলো! নিশ্বাসের মতো মৃদু সন্তর্পনে উচ্চারণ করতে গিয়েছেন, ভয় করেছে।

যমে-মানুষে টানাটানির যুদ্ধটা দেখেননি প্রফেসর, তাই কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারেন না নিজেকে। শুধু মাত্র কয়েকটা দিনের অনুপস্থিতি, শুধু কয়েকটা দিনের অদর্শন, এর অবসরে অতো বড়ো জিনিসটা কর্পূরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো!

নিজেই তিনি অসুখে পড়েছিলেন। বুড়ো বয়সে হঠাৎ জলবসন্তর প্রকোপে পড়ে গেলেন।

আগে বাড়িশুদ্ধু ছেলেমেয়েদের হয়েছিলো রোগটা।

দাদা বৌদি অনুযোগ করেছেন ছেলেমেয়েদের অতো করে ছোঁয়া নাড়া করার জন্যে। প্রফেসর হেসেছেন।

রোগের মত রোগ কিছু নয়, অথচ বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকা! মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, অন্য কিছু অসুখ করলে সুখময়কে খবর দিলে মন্দ হতো না। নিশ্চয় এসে গল্পটল্প করে যেতেন। অবশ্য শুধু সুখময়, তার বেশি আশা করেন না প্রফেসর।

সংক্রামকতার মেয়াদ শেষ হ'লে প্রথম যে দিন বাড়ির দরজায় এলেন, ভাবতে গেলেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম করে আসে।

দরজার কাছে এসেই গা'টা কেমন ছন্ ছন্ করে উঠেছিল। সারা বাড়িটা যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে বসে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কোনো জানালার ফাটলে পর্যন্ত এতোটুকু আলোকরেখা নেই। একটুখানি সময় দাঁড়িয়ে থেকে ভেবেছিলেন, হঠাৎ কোনো দরকারে কোথাও চলে গিয়েছে হয়তো এরা। কিন্তু দরজাটা হাট করে খোলা কেন? দরজার কাছে ছেঁড়া ছেঁড়া চারটি ফুল ছড়ানো কেন? সেটা দেখেই গা ছন্ ছন্ করে উঠেছিলো।

একটু ইতস্ততঃ করে এগিয়ে দেখলেন দরজার ভিতরে প্যাসেজটায়

অন্ধকারে কেষ্ট বসে আছে দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে। রাস্তার গ্যাসের আলো বাঁকা করে একটু এসে পড়ায় চেনা যাচ্ছে মানুষটাকে।

বিনা বাক্যে সরে এসে রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন প্রফেসর, করলেন বোধ করি বাক্স্ফূর্তি হবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে। একটা আকারহীন আতঙ্ক যেন তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, অথচ অনুমান করতে পারছেন না কিছু।

কে? কে? কে চলে গেছে ওই খোলা দরজা দিয়ে?

খানিক পরে আবার সরে এসে গলাটা পরিষ্কার করে ডাকলেন, "কেষ্ট!"

কেষ্ট মুখ তুলে চাইলো, তারপরই হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক তীব্র স্বরে বলে উঠলো, "আপনার আড্ডা আর বসবেনি বাবু, এবার বাড়ি যাও। আপনার দৃষ্টিতেই আমার সোনার বাবু শেষ হয়ে গেলো!"

বোকার মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তারপর কি বুঝেছিলেন কে জানে, ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েকটা দিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন এদিকে না আসবার, করেছিলেন মনের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু দুর্নিবার এক আকর্ষণে কে যেন অহরহ টানতে থাকে এই পথে।

নিজের মনে যুক্তি খুঁজে বেড়িয়েছেন—সামান্য একটা মূর্খ চাকরের কথাটাতে এতো মূল্য দেবারই বা দরকার কি? সদ্য-শোকাতুর ছেলেটা কি বলতে কি বলেছে কে জানে! তবু এসে দাঁড়াতে পারেন নি এতো দিন। আজ এসেছেন অদ্ভুত একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

ভেবেছেন, না আসাই কি মনুষ্যজনোচিত হচ্ছে?

প্রফেসরের এই হৃদয়হীনতায় মানসী কি ভাবছে? মানসী কি জানে কেষ্ট কি বলেছে আর না বলেছে? হ্যাঁ, সমস্ত সঙ্কোচ দূর করে আজকে তাই আবার এ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর সেন।

আর আজকেই কি না মানসী বেরিয়েছে বাড়ি ছেড়ে! লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে মানসীর।

কি মনে করলেন প্রফেসর? হয়তো ভাবলেন, মানসী এমনি করেই বেড়িয়ে বেড়ায় বুঝি। তবু এক পক্ষে ভালো হলো। পথে দেখা হয়ে একটা বাধা ঘুচলো! কে প্রথম কার সামনে এসে দাঁড়াবে, কেমন করে দাঁড়াবে সমস্যাটা মিটলো।

নিতান্ত শান্ত স্বাভাবিক গলায় আহ্বান জানালো মানসী "দরজা খোলা পান নি বুঝি? আসুন!"

মামীশাশুড়ী বাড়িতে ঢুকে এসে পিছন ফিরে বলেন, "হ্যাঁগা বৌমা, দোবে ও কে?"

হাওয়ায় মিলিয়ে যায় প্রশ্নটা। মানসী তো কই আসেনি পিছন পিছন। সে গেলো কোথায়? কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বাইরের ঘরে উঁকি মারলেন, দেখলেন ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। শুধু রাস্তার মৃদু আলো এসে পড়েছে জানালার কাছে, আর সেই আবছা আলোয় জানালার কোল ঘেঁসে দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নীরবে বসে আছে দুটি প্রাণী। তার মধ্যে একজনের গায়ের নতুন বৈধব্যের অস্বাভাবিক শুভ্রতা অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে!

মানসীর যে নিজের কোনো ভাই নেই একথা মামীমার জানা তবে কে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে এসে বসতে পারে? ভিতরে এসে বললেন, "কেষ্ট বাইরে কে এসেছে রে?"

"কে আবার আসবে?"

"এসেছে, তুই দেখে আয় না।"

কেষ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে উঁকি মেরে দেখে এসে বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বসে পড়ে।

"কে রে?"

"এসেছে সেই মুখপোড়া অপয়া বাবুটা।"

"অপয়া বাবু? সে আবার কে রে কেষ্ট?"

"এসে একটা জুটেছিল পুরী থেকে না কি। এখানে এসে বাবু আবার তাকে ডেকে এনে ঘরে তুললো! ও যেদিন থেকে ঢুকেছে, সেদিন থেকে এ বাড়ির লক্ষ্মী ছেড়েছে। তারপর তো সবই গেলো।"

মামীটা একটা কিছু আবিষ্কারের আশায় কেষ্টর কাছ বরাবর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন। বলেন, "তোর বাবুর সঙ্গে ভাব ছিল বুঝি?"

কেষ্ট গম্ভীরভাবে বলে, "ভাব ওনার দু'জনা'র সঙ্গেই। ওর কথা থাক ঠাকুমা, ওকে দেখলে আমার মনে বিষ ওঠে। বাবুর অসুখ থেকে এই ইস্তক দিনকতক থামা পড়েছিলো. আবার এসে হাজির হয়েছে দেখছি।"

ভিতরে আবহাওয়া উপরোক্তরূপ

কিন্তু এ হাওয়া বাইরে ওদের কাছে পৌছয় না। মানসী দুঃস্বপ্নের মধ্যেও ধারণা করতে পারে না, কেষ্ট এমন ভাষায় কথা বলতে পারে। ধারণা করতে পারে না, অকারণে কতো ছোট হয়ে গেছে সে ওদের চোখে!

দু'জনে চুপ করে বসে থাকে মিনিটের পর মিনিট, মিনিট থেকে ঘণ্টা। কেউ কোনো কথা বলে না, হয়তো বা বলবার প্রয়োজনও হয় না। অনেকক্ষণের পর নিঃশব্দে একবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান প্রফেসর। নিঃশব্দে খানিক অপেক্ষা করেন, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান। মানসী মিনিট খানেক খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে আসে ভিতরে।

এসে দেখে ফুলটুশ জল খেতে বসেছে, আর মামীশাশুড়ী কাছে বসে অনুরোধ উপরোধ করছেন। মানসী জানে এটা ফুলটুশের কাছে কতো বিরক্তিকর। অন্য সময় হলে ফুলটুশ এ ব্যাপার মোটেই সহ্য করতো না, স্পষ্ট অবহেলা করে বসতো, তবে এখন নাকি নিতান্ত দুঃসময়, তাই নীরবে হজম করছে এই অনুরোধ উপরোধ হা হুতাশ।

মানসীকে দেখেই মামীশাশুড়ী প্রশ্ন করেন, "বাইরে কে এসে-ছিলো বৌমা?"

"বাইরে?"

মানসী শূন্যে এর উত্তর খুঁজে বেড়ায়।

"কে গো ? তোমার কোনো ভাই-টাই বুঝি ?"

মানসী এবার স্থির স্বরে বলে, "ভাই নয়, বন্ধু !"

"বন্ধু ? ওমা ! আমার সুখময়ের বন্ধু বুঝি ?"

"আমাদের দুজনের বন্ধু !"···বলে ঘরে ঢুকে যায় মানসী।

পিতৃবিয়োগের পর এ কয়েকটা দিন ফুলটুশ ঈষৎ নরম হয়ে গিয়েছিলো, অন্ততঃ মায়ের উপর তাচ্ছিল্য ভাবটা একটু কমিয়েছিলো। কারণ বড়ো বেশি নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিলো মানসী। তা'তেই কিঞ্চিৎ নরম ছিলো। 'কথা'ই ফুলটুশের অসহ্য, কথাতেই তার আপত্তি।

হয়তো এই পরিবর্তিত নিঃশব্দ মানসীকে দেখে একটু করুণাই এসেছে তার। হয়তো এই করুণার সূত্রে মায়েছেলের যুদ্ধটা যেতো থেমে। হয়তো ভবিষ্যতে আবার কোনোদিন ফুলটুশ 'মা' বলে কাছে ঘেঁসে বসতো, হয়তো কোনো একদিন রিক্তমূর্তি মায়ের উপবাসক্লিষ্ট মুখের দিকে চোখ পড়ে গিয়ে মায়ের উপর শুধু করুণাই নয়, একটু মমতাই আসতো তার মনে, আর সেইটুকুই হতো মানসীর জীবনের চরম সার্থকতা, পরম পাওয়া। সেইটুকুর আশায় নিজেকে ক্ষয় করে, আনতো মানসী, কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর যাঁতায় !

কিন্তু কোথা থেকে আবাব কি হলো ?

এই দীর্ঘ বিস্মৃতির পর মানসীর জীবনে আবার এসে উদিত হলে তার জীবনের শনি। তখনকার মতো মন্তব্যহীন নিশ্চুপতায় জল· খেয়ে নিলো ফুলটুশ। বিষ উদ্‌গীরণ করলো রাত্রে খাওয়ার সময়।

পুরনো অভ্যাসে ছেলের খাওয়ার অদূরে বসেছিলো মানসী। ফুলটুশ খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বলে ওঠে, "উনি আবার কি মতলবে এ বাড়িতে এসেছিলেন ?"

মানসীর বুকটার মধ্যে ধ্বক্ করে ওঠে, তবু প্রায় অজ্ঞাতসারেই বলে ওঠে, "কে ? কে এসেছিলো ?"

ফুলটুশ ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, "কেন তোমাদের প্রফেসর সেন !"

মানসী গম্ভীর হয়ে যায়, গম্ভীরস্বরে বলে, "কি মতলবে এসে-

ছিলেন সেটা তুমি নিজে জিগ্যেস করলেও পারতে।”

“আমার কোনো দরকার নেই। তবে ও রকম নীচ লোককে প্রশ্রয় দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি।”

দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে উঠে আসে, শুভ্র থানের আবেষ্টনের মধ্যে এই রক্তাভা ভারী বেমানান্ দেখতে লাগে। সেই রক্তাক্ত মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটি প্রশ্ন বার হয়, “ওঁর কি কি নীচতা তুমি দেখেছো জানতে পারি কি?”

“জানবার জন্যে আমায় জিগ্যেস না করে বরং নিজেকেই জিগ্যেস কোরো মা!” বলে ফ্লনটিশ উঠে দাঁড়ায়।

আর মানসী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ছেলের গমনপথের দিকে চেয়ে।

কিছুক্ষণ পরে চমক ভাঙে মামীশাশুড়ীর ডাকে, “বৌমা. ওঠো না, একটু জল মুখে দাও।”

মানসী চমকে ওঠে, “কি বলছেন?”

“বলছি একটু জল মুখে দাও।”

“আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মামীমা, আপনি সেরে নিন।”

মামীমা বিগলিতস্বরে বলেন, “ইচ্ছে আর তোমার কোন্‌দিন থাকে গা, জোর করে একটু মুখে দেওয়া বৈ তো নয়। শরীর ধারণ করতে হলে খেতে তো একটু হবেই। ফ্লনটিশ বুঝি তোমার ওই বন্ধু—ইয়ে —ওই ভদ্দরলোকটিকে দেখতে পারে না?”

মানসী নিরুত্তর।

“তা'হলে আমি তোমায় একটি সুপরামর্শ দিই বৌমা”—মামীমা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গলা নামিয়ে বলেন, “ছেলে যখন পছন্দ করে না তখন ওসব বন্ধুটন্ধু আসতে না দেওয়াই ভালো। যতই হোক ছেলের বশেই এখন চলতে হবে তোমাকে।”

কিছুক্ষণ আগের শিথিল মন মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে সর্বাঙ্গের ভঙ্গীও ঋজু কঠোর হয়ে ওঠে বুঝি। তাই একটু কঠিন স্বরেই

মানসী বলে, "কেন, বাড়ির কর্তার পোস্টটা ও পেয়েছে বলে ?"

মামীমা থতমত খেয়ে বললেন, "না না, বলছি যতোই হোক ছেলের বয়েস হয়েছে, এখন তার ইচ্ছে অনিচ্ছে মেনে চলাই উচিত।...এই আমার মুবলী পছন্দ করে না ব'লে দোরের গোড়ায় কালীঘাট, তবু হেঁটে যেতে পারি না, যখনই যাই সেই রিশকায। · তবু তো পেটের ছেলে নয, ভাসুবপো।"

মানসী ধীরস্বরে বলে, "অভ্যাস হতে সময় লাগবে মামীমা।"

মামীমা এতো ঠাণ্ডা গলা তেমন পছন্দ করেন না। আগে আগে 'সুপোর বৌকে' খুবই পছন্দ করতেন, নিজেদের বাড়ির বৌদের সুশিক্ষা দিতে সুখোব বৌযের তুলনা দিতেন, কাবণ সদাহাস্যময়ী মানসীর সে রূপ ছিলো সর্বজন-মনোহর। যখন বেড়াতে গিয়েছে, হাতে করে নিয়ে গেছে ফল-মিষ্টি এটা-ওটা। করেছে কতো হাসি গল্প। কিন্তু এখন যেন মানসীব তল পাওয়া যায না। তার ওপর আজ আবার অন্য ভাব।

'সাতে পাঁচে থাকতে চাই না বাবা' এই মনোভাব নিয়ে প্রসঙ্গান্তরে আসেন ভদ্রমহিলা। বল্লেন, "সময়ে অনেক অভ্যেসই হওয়াতে হবে মা, এ হলো আব একটা জন্ম! যাই হোক চলো একটু জল খেয়ে নেবে।"

বোধকরি কেবলমাত্র কথা বাড়াবার ভয়েই মানসী নিঃশব্দে উঠে যায।

মামীমা ভেবেছিলেন জল খেতে বসে পাঁচরকম কথার অবসরে নিজের যাওয়ার কথা পাড়বেন, কিন্তু তাব অবসর পাবার আগেই সহসা মানসী নিজেই বলে ওঠে, "আপনি আর কত দিন আমাকে নিয়ে কষ্ট পাবেন মামীমা, আপনারও তো সংসার আছে ?"

নিজের ছেলে না থাকলেও ভাসুরপোদের নিয়ে ঘোরতর সংসারী মামীমা সকলেই জানে সে কথা। মামীমা বোধকরি এ প্রস্তাবটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। থতমত খেয়ে বল্লেন, "কষ্ট আর কি বৌমা!"

"কষ্ট বৈকি! আব কতো দিন ভুগবেন? আমার দিন যেমন করেই হোক চলে যাবে।"

মামীমা নিজেই যে প্রস্তাবটা করবার জন্যে মনে মনে সুর ভাঁজছিলেন সেই প্রস্তাবটা অপর পক্ষ থেকে আসতেই কিন্তু তাঁর মন মেজাজ অন্য হয়ে যায়। গম্ভীরভাবে বলেন, "দিন কি আর বসে থাকে মা, চলেই যায়, তবু আমাদের বাঙালী সমাজের একটা ব্যবস্থা আছে—বিপদে আপদে এক অপরের মুখ চাওয়া, তাই আপনার সংসার ভাসিয়ে এখানে পড়ে থাকা। নইলে আমার সুখোই যখন চলে গেল তখন আর—" বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথা আর শেষ হয় না।

মানসী ম্লানভাবে বলে, "মামীমা কি আমার কথায় রাগ করলেন?"

মামীমা জলদগম্ভীরস্বরে বলেন, "অকারণ রাগ করবো এমন পাগল আমি নই মা! আমিই বরং যাবার কথা বলি বলি করেও বলতে পারছিলাম না, তুমি বললে ভালোই হলো। কাল বার ভালো আছে রওনা দেব। তবে—একটি কথা বলে রাখি বৌমা, কিছু মনে কোরো না, বয়স তোমার যেমনই হোক দেখতে এখনো যুবতী, খুব সাবধানে রাখতে হবে নিজেকে। সংসার বড়ো ভয়ানক জায়গা তা' নইলে আর বলেছে কেন 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই'।"

মানসী মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বলে, "আপনি কি ভেবে কি বলছেন মামীমা?"

"কিছু ভেবেই কিছু বলিনি বৌমা! এমনি কথার পৃষ্ঠে কথা বলছি, তবে ছেলে তোমার বড় হয়েছে, তার মেজাজও ভাল নয়. 'সমীহ' করে চলতে তোমাকে হবেই।"

মানসী সহসা কঠিনস্বরে বলে ওঠে, "কেন বলতে পারেন মামীমা? তিনি তো আমায় ছেলের হাত-তোলায় রেখে যাননি! তাঁর 'ফাণ্ডের' টাকা আর 'ইনসিওরে'র টাকায় আমার সারা জীবনের মতো একমুঠো ভাত একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

মামীমা খড়কে খেতে খেতে গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, "একমুঠো ভাত আর একখানা কাপড়ের চালে যদি চলতে পারো বৌমা, তা'হলে অবিশ্যি ছেলেরও সাধ্যি হবে না যে তোমার ওপর চোখ রাঙাতে আসবে।"

মানসী আর উত্তর দেয় না, মামীশাশুড়ীর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে। আজীবনই জেনে এসেছে মানুষটা বোকা-সোকা ভালোমানুষ।

আজীবনের ধারণা কতো তুচ্ছ ব্যাপারেই বদলাতে পারে!

মামীশাশুড়ী বিদায় নিয়েছেন, সরে গিয়েছে মাঝখানের আবরণ। চারখানা দেয়ালঘেরা রণক্ষেত্রে এখন মুখোমুখি দুটি প্রাণী—মা আর ছেলে! জগতে যে মধুর সম্পর্কের তুলনা নেই।

সদ্যবিধবা মা, সদ্যপিতৃহারা পুত্র! পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ আর সহানুভূতিতে গলে যাবার কথা! একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে যাবার একেবারে একাত্ম হয়ে যাবার মত সময়, এমন আর হয় না, কিন্তু কোথায় সেই সহানুভূতি? আর কোথায়ই বা সেই অন্তরঙ্গতা? হৃদয়াবেগের বাষ্পমাত্র কোথাও নেই। স্পষ্ট প্রখর রৌদ্রালোকিত প্রান্তরে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ঘৃণা আর সন্দেহের তিক্ত দৃষ্টি নিয়ে। যেন একটা সুযোগ পেলেই একে অপরকে আঘাত হানবে।

যদিও ফুলটুশের উপস্থিতির সময়টা খুবই কম, তবু সেই সামান্য ক্ষণটুকুই যেন তীক্ষ্ণ বাণের মত উদ্যত হয়ে থাকে মানসীর জীবনের নিঃসঙ্গ নিঃসীম কোমল অন্ধকারের ওপর।

স্তব্ধ দুপুরে চিন্তার গহনসমুদ্রে অবগাহন স্নান করতে নেমেও সহসা এক সময় চমকে উঠতে হয়, সদ্যঃপ্রত্যাগত ফুলটুশের কোনো একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য! কর্মহীন সন্ধ্যায় শূন্য হৃদয়ের চাপা হাহাকারকে সবলে দমন করে তটস্থ থাকতে হয় ফুলটুশের প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে। কখন আসে কখন যায় স্থিরতা তো নেই!

স্পষ্টতঃ 'কথা বন্ধ' নেই, তবু প্রায় সব কথাই বন্ধ আছে। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কিছু তো নেইই, তারও অধিকাংশই পরোক্ষে। কেষ্ট বেচারাই এখন মা-ছেলে উভয়ের প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যম।

যথা, ফুলটুশ হয়তো কেষ্টকে বলে, "এই জিগ্যেস করে আয় মাকে, ব্যাঙ্কের পাশ বইতে যে সই করে রাখবার কথা ছিল, সেটা হয়েছে?"

কেষ্ট গিয়ে এ বার্তা জ্ঞাপন করে।

শুনে মানসী গম্ভীরভাবে বলে, "বলগে যা দাদাবাবুকে, ও বাড়ির কাকাবাবুকে একবার দেখিয়ে তবে সই করবেন।"

ভগ্নদূতের ভূমিকা নিয়ে ফিরে আসে কেষ্ট।

ফুলটুশ শার্টের পকেট থেকে চিরুনী বার করে মাথার ওপর জোরে জোরে চালাতে চালাতে দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, "ওঃ অবিশ্বাস!"

রাগ হলেই ফুলটুশ জোরে জোরে চুল আঁচড়ায়, এটা ওর মুদ্রাদোষ চিরুনী তো পকেটে মজুতই থাকে। আর পকেটওয়ালা জামাও সবসময় গায়ে চড়ানো আছে। শেষ কবে যে মানসী ফুলটুশকে খালি গায়ে দেখেছে মনেই করতে পারে না। খালি গায়ে থাকাটা অসভ্যতা, গেঞ্জিটা বাহুল্য। ডোরাকাটা একটা হাফ্‌সার্ট আর লম্বা একটা পায়জামা এই হচ্ছে একমাত্র পোষাক ফুলটুশের। অথচ কী শখই ছিলো মানসীর, ছেলেকে আদ্দির পাঞ্জাবী আর সিল্কের পাঞ্জাবী পরাবার। শখ ছিলো শান্তিপুরী ধুতি ভিন্ন আর কিছু পরতে দেবে না ছেলেকে। কিন্তু সে শখ আর মিটলো কই? হাফ্‌প্যাণ্ট ছাড়বার আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে ছেলে।

একটু আগে বেরিয়ে গেছে ফুলটুশ, শিগ্‌গিরের মধ্যে আর ফিরবে বলে মনে হয় না। হঠাৎ কী খেয়াল হলো মানসীর, দেরাজ খুলে বার করলো একতাড়া পুরনো চিঠি। অনেক—অনেক দিনের পুরনো। বধূজীবনের প্রারম্ভে মাঝে মাঝে যখন বাপের বাড়ি গিয়ে থেকেছে মানসী, তখনকার দিনের চারটিখানি, আর চাকরি হবার পর একবার বোনাসের টাকা পেয়ে মাকে নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছিলেন সুখময়, তখনকার অনেকগুলো। চার মাসে চল্লিশ পঞ্চাশখানা চিঠি লিখেছিলেন সুখময়। সাদাসিধে ভাষা, বক্তব্য বস্তু প্রায় ছেলেমানুষের মতো, তবু চিঠি বড়ো করবার ঝোঁকটি ছিল ষোল আনা।

মেঘলা বিকেলে জানালার ধারে এসে বসলো মানসী চিঠিগুলো

ছড়িয়ে নিয়ে। মেঘলা দুপুর যেমন মোহময়, মেঘলা বিকেল তেমনই নিরানন্দময়। সত্যি, মেঘ মেঘ বিকেলের মতো এমন বিরক্তিকর আর কি আছে? সন্ধ্যা আর বিকেলের ব্যবধান যায় মুছে, কোন্ ফাঁকে রাত্রি নামে টেরই পাওয়া যায় না। কে জানে এই মেঘ মেঘ আকাশ সকলের কাছেই এমন বেদনাবিধুর অনুভূতি এনে দেয় কি না। মানসীকেই কি এর আগে কোনো দিন এনে দিয়েছিলো? এরকম প্রায়ান্ধকার ঘরে জানালার ধারে বসে কোনো দিন কি স্মৃতির রোমন্থন করতে ইচ্ছে হয়েছিলো মানসীর?

একখানির পর একখানি চিঠি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরে খানিকটা পড়েই ধীরে ধীরে আবার ভাঁজ করে ফেলে। কোনটাই শেষ অবধি পড়ে না। পড়তে পারে না।·· এ চিঠি কি মানসীর? সে কোন্ মানসী যাকে এমন ছেলেমানুষী চিঠি দিয়েও পুলকাকুল করে তোলা যেতো?···অনেক যত্নে মনে আনতে চেষ্টা করে মানসী, সেই মানসীকে। মনে আনতে চেষ্টা করে সেই সুখ, আর সেই সুখময়কে। কিন্তু একটা বোবা দেওয়াল যেন চিন্তার দরজার সামনে এসে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। মানসী কি তবে সুখময়কে ভুলে যাচ্ছে?

ভুলে যাচ্ছে তো কিসের এই নিঃশব্দ হাহাকার। কিসের এই শূন্যতা? যে শূন্যতা মানসীকে যেন ছায়ার মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—তার চিরদিনের পরিচিত জগতের ওপর দিয়ে, কোথাও নোঙর ফেলতে দিচ্ছে না? এই বিরাট শূন্যতার গভীর গহ্বরে আজ ভুল? পৃথিবীটাই যে হারিয়ে গেছে মানসীর। সুখময়কে যদি ভুলেই যাচ্ছে সে, এমন হচ্ছে কেন তবে?

আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-কুটুম্ব সকলেই তো আছে, আছে মানসী। কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না কেন? তারা রাগ করলেও মানসীর কিছু উদ্বেগ নেই কেন? এই তো মামীশাশুড়ী চলে গেলেন থম্‌থমে মুখ আর গম্‌গমে ভাব নিয়ে, মানসী চুপ করে বসে থাকলো কি করে? ছুটে গিয়ে মিনতিতে কই ভেঙে পড়ল না তো? অথচ

আগেকার দিন হ'লে? আগেকার দিন হ'লে নিশ্চয় রাত পোহাতেই যাহোক কিছু একটা ছুতো করে সন্দেশের চাঙারি হাতে নিয়ে ছুটতো মামীশাশুড়ীর রাগ ভাঙাতে।

না সে মানসী আর নেই। কিন্তু এ পরিবর্তন এনে দিলো কে?

"মা?"

চমকে উঠলো মানসী। তাকিয়ে দেখলো কেষ্টর দিকে।

"একটা মেয়ে এসেছে দাদাবাবুকে খুঁজতে!"

"মেয়ে!" মানসী শ্রান্তস্বরে বলে, "কি রকম মেয়ে?"

"কি রকম আবার?" কেষ্ট বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বলে, "যেমন সব ধিঙ্গী অবতার মেয়ে হয়েছে এখনকার। কোমরে আঁচল-জড়ানো সেপাই!"

"বলে দাওগে দাদাবাবু বাড়ি নেই।"

"আহা সে বলতে কসুর রেখেছি যে! বলছে, দাদাবাবুর ঘরে এসে চিঠি লিখে রেখে যাবে। ওর সঙ্গে কাগজ কলম নেই। ইদিকে দাদাবাবুর ঘরেও কাগজ কলম কিছু পাচ্ছি না।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মানসী। তাক থেকে একটা ফাউন্টেনপেন পেড়ে কেষ্টর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

"আর কাগজ?"

বলে "কাগজ!"

করলে তাও সংগ্রহ হয়। কিন্তু কেষ্টর হাতে দিতে গিয়ে কি ভেবে মানসী নিজেই গিয়ে ফুলটুশের ঘরে ঢোকে।

মেয়েটি ফুলটুশের টেবিলের সামনে বসে বই খাতা ওল্টাচ্ছিলো। মানসীকে দেখে সমীহ আর অস্বস্তিভরে উঠে দাঁড়ায়!

"কাগজ কলম খুঁজছিলে?" বলে মানসী টেবিলে রাখে জিনিস দুটো।

মেয়েটি ইতস্তত: করে বলে, "আমি এসেছিলাম, মানে আপনিই যখন রয়েছেন, আর লিখে যাওয়ার কি আছে? গৌতমবাবুকে

বলবেন—কাল সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশে গাড়ি। ছ'টার মধ্যে সমিতি ভবনে গিয়ে পৌঁছলেই হবে। সকলে একসঙ্গে বেরোনো হবে।"

মানসী কষ্টে সহজস্বরে বলে, "আচ্ছা।"

মেয়েটি চলে গেলো, আর তারই পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ঝুপ করে বসে পড়ে মানসী স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

মনের মধ্যে বারবার শুধু একটা কথায় আনাগোনা করতে থাকে, "সাতটা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি—সাতটা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি।"

রেলগাড়ি! দল বেঁধে কোনোখানে বেড়াতে যাচ্ছে ফুলটুশ। মানসীকে একবার জানাবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু? কিন্তু বেড়াতে গেলে কি টাকার প্রয়োজনও হয় না?

বৃষ্টি এলো। কখন থেকে রিম্‌ঝিম্ করে শুরু করেছিলো কে জানে। সহসা এলো সশব্দে। চমক ভাঙলো মানসীর। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি! আলোটা জ্বেলে দিয়ে ফুলটুশের ঘর থেকে বেরিয়ে কেন কে জানে এসে দাঁড়ালো 'ব্রাহ্মস্পর্শ বৈঠকের' দরজায়। কোন্ প্রত্যাশায়? মানসী কি স্বপ্নেও ভেবেছিলো মৃদু-নীল আলো-জ্বালা ঘরে জানালার ধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে কেউ বসে থাকবে? কতোক্ষণ বসে আছে মানুষটা?

কেষ্ট অবশ্যই জানে, দিয়েছে দরজা খুলে, দিয়েছে আলো জ্বেলে। অথচ মানসীকে খবর দেয়নি! দৈবাতের ভুল না ইচ্ছাকৃত ভুল? কেষ্টর ভুলটা যে জাতেরই হোক, মানসীর এ কেমনতরো ভুল? এই একটু আগেই যে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলো মানসী ছেলের অবজ্ঞা আর অবহেলার পরিচয়ে, সে কথা ভুলে গেলো কেমন করে? কেমন করে ভুলে গেলো ও ঘরের মেজেয় এলোমেলো ছড়ানো আছে তার পুরনো স্মৃতির সঞ্চয়?

কুশলবার্তার আদান-প্রদান নেই, নেই প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা। শুধু জানালার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। লোকে দেখলে কি বলবে সে খেয়াল কি ওদের একেবারে

নেই? কথা কি ওদের ফুরিয়ে গেছে? না কথার সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছে বলেই এতো ভয়? না কি শুধুই সঙ্কোচ?

কে আগে কথা কইবে? কে কোন্ কথা তুলবে?

মৃদু বিলম্বিত শান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস! হঠাৎ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের থমকে-থাকা বাতাসের গায়ে।

"উঠছেন?"

"উঠি।"

"বাড়ির খবর সব ভালো?"

"বাড়ির? ওঃ। হ্যাঁ। ভালো।"

উঠি বলেও দাঁড়িয়ে থাকা···ঘড়ির কাঁটা পার হয়ে যায় এ ঘর থেকে অন্য ঘরে।

"কাল আসবেন?" অসর্তকে পিছলে পড়া একটি প্রশ্ন।

"কাল? যদি বলেন, আসবো।"

"বলার কি আছে? ইচ্ছে হ'লে আসবেন।"

চলে যাবার মুখে কথা যোগায়।

"ইচ্ছে হলে?"···সামান্য একটু হাসির মতো শোনায় পরবর্তী কথাটা—"ইচ্ছে তো রোজই হয়।"

এ ঘরে আরশি নেই, নিজের মুখ দেখবার কোন উপায় নেই। চেয়ারের পিঠে ধরে থাকা হাত দু'খানির ওপরই নজর পড়ে। রিক্ত নিরাভরণ! চোখ পড়ে হাতের ওপর পড়ে থাকা সাদা কাপড়ের পাড়হীন প্রান্তটার দিকে, এরা যেন শাসনের তর্জনী তুলে স্থির হয়ে আছে। নিয়মলঙ্ঘনের অপরাধ ক্ষমা করবে না।

মুখে আসা উত্তরটা সামলে নিয়ে মানসী আস্তে আস্তে বলে, "এলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি নেই?"

"কেন? ক্ষতি কেন?" অনেক সাবধানে উচ্চারণ করে মানসী।

"কেন? সব কেনর উত্তর নেই! তবু ক্ষতি আছে।"

"না, কোনো ক্ষতি নেই।"

"জানি।" প্রফেসারের স্বভাবগত ভারী স্বর আরো ভারী হ'য়ে আসে, "জানি তোমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার আছে।"

"তোমার"!

অলক্ষ্যে একবার কেঁপে ওঠে মানসী। 'আপনির গণ্ডী ভেঙ্গে গেলে কোন্ বাঁধ দিয়ে আটকানো যাবে ছুটে-আসা বন্যাকে?'

আবার উচ্চারিত হয়, "হ্যাঁ আমার অনেক ক্ষতি হয়, রাতের পড়া বন্ধ হ'য়ে যায় আমার, বন্ধ হ'য়ে যায় রাতের ঘুম। তাই আসি না।"

হায় ঈশ্বর! ক্ষতি হয় শুধু তারই? মানসীর কোনো ক্ষতি হয় না? কে জানতে পারছে কী মারাত্মক ক্ষতি ঘটছে মানসীর জীবনে? কে বুঝছে শুধু একজনের উপস্থিতির ছায়াতেই আচ্ছন্ন হ'তে বসেছে মানসীর ইহকাল পরকাল?

"তুমি বলার অপরাধে কথার উত্তর দেবেন না?"

"কি যে বলেন!" তবু বলতে পারা যায় একটা কথা।

"আচ্ছা যাচ্ছি।"

"আবার আসবেন।"

বেড়াতে যেতে টাকার প্রয়োজন হয় বৈ কি। ওইটাই তো পরাধীনতার শৃঙ্খল। কোনো কিছুতেই যদি টাকা না লাগতো, কে কার ধার ধারতো? কিন্তু মান খুইয়ে চাওয়া শক্ত, ওদিকে আবার বন্ধুবান্ধবীদের কাছে মান খোয়ানোর প্রশ্ন। শিখা বলেছে, "টাকা জোগাড় করতে না পারো গৌতমদা, কুছ পরোয়া নেই, আমি টাকা জোগাড় করে দেবো, অবশ্য তাতে যদি তোমার মানের হানি না হয়!" সেই লজ্জায় দু'দিন সমিতিভবন থেকে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো ফুলটুশ, কে জানতো শিখাটা আবার বাড়ি বয়ে এসে মানসীর কাছে সংবাদ পরিবেশন করে যাবে।

আজ সমিতির ঘরে গিয়েই শিখার কলহাস্য সংবর্ধনার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করলো ফুলটুশ, শিখা তার বাড়ি গিয়ে মানসীর সঙ্গে পরিচয় করে এসেছে।

নেই? ।এ সন্ধ্যা ছটা, বুঝলে তো গৌতমদা ?"

আ গৌতম গম্ভীরভাবে বলে, "এখনো ঠিক করিনি যাবো কি না।"

"এখনো ঠিক করোনি ?"

"না।"

"ব্যাপার বুঝেছি। টাকা শর্ট পড়েছে তো ?"

"সেটাই বা আশ্চর্য কি ?"

"বলে রাখিনি বুঝি, তেমন দরকার পড়লে আমি আছি।"

"তুমি আছো বলেই তোমার স্কন্ধে ভর করতে হবে ?" হেসে ফেলেছিলো শিখা আর গৌতম। তারপর শিখা অনেক জোরালো যুক্তিসহকারে প্ররোচিত করেছে যাবার সপক্ষে।

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই সাব্যস্ত করে ফেলেছে ফুলটুশ। অতএব টাকা চাই। মাকে একবার বলাও তো দরকার ছিলো, এই ছুতোয় বলা যাবে। ঠিক কোন্ স্বরে কথাটা পাড়লে মানমর্যাদাটা বজায় থাকে, অথচ টাকাটাও সংগ্রহ হয় সেই চিন্তা করতে করতে সমিতির ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ফুলটুশ।

আসলে ব্যাপারটা এই, খেটে খেটে ফুলটুশের দলের সদস্য-সদস্যারা ক'জনে মিলে ঠিক করেছে এতো খাটুনিতে কিছু বিশ্রাম আর খানিকটা প্রমোদভ্রমণের প্রয়োজন। অতএব চলো কোথাও দু'দিন বেড়িয়ে আসা যাক। গন্তব্যস্থল নির্বাচনে এ নাম সে নাম করতে করতে ভোটে ঠিক হলো 'দীঘা'। দীঘায় যাওয়া হোক। কষ্ট, অসুবিধে আর পথক্লেশের মধ্যে তবু কিছু থ্রিল পাওয়া যাবে। সত্যি ও জিনিসটার আস্বাদ যে ক্রমশঃ ভুল হয়ে যাচ্ছে।

যে সুদূর স্বর্গলোকের রক্তপতাকার দিকে তাকিয়ে প্রাণে বল সঞ্চয় হতো, যাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আপন দেশবাসীকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যেতো, যে দেশের মহিমায় অভিভূত দৃষ্টি নিয়ে আপন দেশকে নস্যাৎ করা চলতো, সর্বোপরি যাদের ভরসায় দেশের যেখানে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে বেড়ানো যেতো, তাদের রংই যে আজ ফ্যাকাশে তাই না এদেরও মনের রং যাচ্ছে মুছে। তবু সমিতিটা টিঁকিয়ে

রাখতে হয়েছে, কারণ বেচারাদের যে মায়েও তাড়িয়েছে, বাপেও খেদিয়েছে। আছে তো শুধু ওই সঙ্ঘ আর সমিতি। যেখানে অন্ততঃ সামাজিক শাসনের আওতা নেই।

টাকার কথা'টা কি ভাবে উত্থাপন করা চলে? ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো। আবার! আবার সেই আপাদমস্তক জ্বলে-যাওয়া'দৃশ্য। সেই মৃদু-নীল আলো, সেই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা! সেই কাছাকাছি দুখানা চেয়ার! সুখময়ের মৃত্যুর পর একদিন যে দৃশ্য দেখে পায়ের রক্ত মাথায় চড়ে উঠেছিলো ফুলটুশের। এই মুহূর্তে কি ও পারেনা কড় হস্তে এ ছবি ছিঁড়ে ফেলতে? এমন কুচিকুচি করে ছেঁড়া, যাতে আর কোনোদিন ঝেড়ে মুছে টাঙানো না চলে? পারে!

এখনি পারে। তবু আজকেও থাক্। ধৃষ্টতা আরো কিছুদূর পৌঁছক। লোকটাকে চাবুক মারবার মতো অবস্থা ঘটুক একদিন।

নিজস্ব খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলো ফুলটুশ, এবং নিজের সুটকেস্‌টা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে গোছাতে লাগলো জামা-পাজামা খাতা-পত্তর। ভঙ্গীতে একটা উগ্র অসহিষ্ণুতা, মুখের চেহারায় তিক্ততা আর আগুন!

মানসী দালান পার হতে হতে থমকে দাঁড়ালো। ওঃ আসা হয়েছে বাবুর! মুহূর্তকাল চিন্তা করলো, পাশ কাটিয়ে চলেই যাবে কি না। কিন্তু কি ভেবে আবার ঘরে এসে ঢুকলো। এই হচ্ছে ঠিক সময় যখন সুটকেস্ গোছাচ্ছে। এই সূত্র ধরে প্রশ্ন করা সহজ হবে।

"যাচ্ছিস্ কোথায়?"

ফুলটুশ একবার আরক্ত চোখ দুটো তুলে তাকালো, পরক্ষণে মন দিলো নিজের কাজে।

"আমাকে একবার জানানোও দরকার মনে করোনি, কেমন?"

ফুলটুশ এবার আর মুখই তুললো না। বালিশে পরানো দুটো ওয়াড়ের ওপরের ময়লা ওয়াড়টা টান মেরে খুলে ছুঁড়ে ঘরের এক

কোণে ফেলে দিয়ে বালিশটাকে জড়িয়ে ফেললো একটা বিছানার চাদরে। মানসী তাকিয়ে দেখলো পরিত্যক্ত ওয়াড়টার দিকে। ময়লা চিরকুট। এই বালিশে ফুলটুশ শুচ্ছে! বিচারকের দৃঢ়ভঙ্গী শিথিল হয়ে আসে, সে শিথিলতা নামে কণ্ঠে।

"কোথায় যাওয়া হবে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না।"

"যাবো যমের বাড়ি।" দাঁতে দাঁত চেপে বলে ফুলটুশ।

"বটে!" মানসীরও রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। সুখময়ের মৃত্যুর পর এরকম অনুভূতি এই বোধ করি প্রথম! "সে রাস্তাটা দেখিয়ে দেবার ভার কে নিয়েছে, জানতে পারি কি?"

"দরকার আছে কিছু?" উদ্ধত ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়ায় ফুলটুশ।

"হ্যাঁ আছে।" মানসী তীব্রস্বরে বলে, "যা খুশি করবার স্বাধীনতা তোমার এখনো আসেনি।"

এবার ফুলটুশ নিতান্ত অবহেলার সুরে বলে, "না থাকার কারণ কি? এ বাড়িতে তো ও স্বাধীনতাটা সকলেরই আছে দেখতে পাই।"

"খবরদার ফুলটুশ! বাঁকাচোড়া কথা ছাড়ো। সাহস থাকে তো সোজা ভাষায় কথা বল্। কার কি স্বেচ্ছাচারিতা দেখছিস তুই?"

ফুলটুশ ব্যঙ্গহাস্যে বলে, "এ প্রসঙ্গ তো ইতিপূর্বে অনেকবার হয়ে গেছে, আর কেন?"

"তবু আবার শুনতে চাই। বল্ স্পষ্ট করে। চব্বিশ ঘণ্টা তোর বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে রাজী নই। বল্ তোর কি বলবার আছে?"

ফুলটুশ এবার ব্যঙ্গ স্বর ছেড়ে তীব্র স্বর ধরে, "আমার যা বলবার সে প্রশ্ন নিজেকেই করো তুমি। একঘেয়ে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধে।"

"ওঃ বটে! তা তুমি কি আশা করো আমি ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকি?"

"কেন? সে আশা আমি করতে যাবো কেন? তবে এটাও ঠিক, ঘোমটা দিতে হয় না, ঘরের কোণেও বসে থাকতে হয় না মা, যদি আত্মসম্মানের আবরণ থাকে আচারে আচরণে।"

"তোমার ধারণা তা'হলে আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারছি না আমি? আর তোমারও মানের হানি ঘটাচ্ছি?"

"আমার? আমার সঙ্গে কারুর কোনো সম্পর্ক নেই"—বলে ভর্তি সুটকেসের অনমনীয় ডালাটাকে চেপে বন্ধ করতে থাকে ফুলটুশ।

"ফুলটুশ!" তীব্র স্বর আর্দ্র হয়ে আসে। মানসীর এ কী পরিবর্তন!

পরিবর্তন না বলে বরং অধঃপতনই বলা চলে তাকে। মানসীর চোখে জল। তাও আপন ছেলের দুর্ব্যবহারে? মানসী কি না ক্রন্দন-বিজড়িত সুরে বলছে, "একজন তো সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক লুপ্ত করে রেখে দেবো, আবার তোমার সঙ্গেও সব সম্পর্ক ছাড়া, তবে আমি কি করবো আমাকে তো বাঁচতে হবে?"

কিন্তু ফুলটুশেরই বা দোষ কি? ও তো আজ আসছিলো মায়ের প্রতি অনেক দিনের অনেক অবহেলার ত্রুটিপূরণের সংকল্প নিয়ে। শিখার মুখে মায়ের কথা শুনে হঠাৎ যেন কেমন মমতা এসে গিয়েছিলো! তা তার বিধাতাও যে তার প্রতি বড়ো নিষ্ঠুর। বারে বারে ভেঙে যায় তার সাধু-সংকল্প, বারে বারে মনের কানায় কানায় ভরে ওঠে বিষতিক্ত রস!

কেন অন্য সব ছেলেদের মায়ের মতো মা তার নয়? কেন তার মা এমন অদ্ভুত অসহ্যজনক? মেয়েদের বাঁচবার জন্য রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, গুরু, গুরুভগ্নী, ঠাকুর-দেবতা, পাঠকীর্তন ইত্যাদির যে অজস্র উপকরণ মজুত আছে, মানসী সেগুলো ধর্তব্য করে না কেন? মানসীর বাঁচবার জন্যে অন্য উপকরণের প্রয়োজন হয় কেন?

মেয়েদের 'ব্যক্তি-সত্তার সপক্ষে বাইরে যতোই বক্তৃতা ঝাড়ুক ফুলটুশ, চুপি চুপি বলতে বাধা নেই, ঘরে সংসারে মেয়েদের ব্যক্তি-সত্তার ঘোরতর বিরোধী সে।

বাবার মামী মাসীদের মতো একটি মা পেলেই তো বেশ খুশি হয়ে থাকতো ফুলটুশ! অগ্রাহ্য করে, অবহেলা করে, করুণা করে!

কিন্তু না, এমনি দুর্ভাগ্য ফুলটুশের যে তার মাকে বৈধব্য জীবনের শূন্যতা থেকে বাঁচতে মৃদু-নীল আলো-জ্বালা ঘরে বসতে হয়, বাইরের অতিথিকে সমাদর করে কাছে বসিয়ে!

তবু মানসীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু কাজ হলো।

ঈষৎ নম্রস্বরে বলতে হলো ফুলটুশকে, "ও বাড়ির কাকাদের ওখানে গেলেও তো পারো মাঝে মাঝে।"

বিক্ষুব্ধ একটুখানি হাসি দেখা দেয় মানসীর ওষ্ঠপ্রান্তে। ব্যঙ্গের সুরের পালা এবার ওর। "আচ্ছা! তোমার এই সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ! মনে রাখতে চেষ্টা করবো। এখন একটা কথা শুনতে পেলে সুখী হতাম। কোথায় যাচ্ছো সে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আমার নাই থাক, কোথায় টাকা ধার করেছো সেটা জানতে পারি কি?"

"বললেই কি তুমি বুঝতে পারবে?"

"বেশ না পারলাম কিন্তু ধার করারই কি খুব দরকার ছিলো? চাইলে বাড়িতে পেতে না?"

"হয়তো পেতাম! দয়ার দান সর্বদাই পাওয়া যেতে পারে। তাতে রুচি নেই।"

"ভালো! শুনে আমিও দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলাম! কবে ফিরবে জানতে চাওয়াও চলবে না বোধ হয়?"

"ফেরার ঠিক নেই।"

বলে গোছানো সুটকেসটা খুলে ফের গোছাতে শুরু করে ফুলটুশ। আর দাঁড়ানো চলে না। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায় মানসী।

দু'জনেরই ছিলো সদিচ্ছা, কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেলো! ফুলটুশ ভেবেছিলো যাত্রার আগে মায়ের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করে যাবে। মানসী ভেবেছিলো ছেলেটা কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে শূন্য পকেটে, কতো অসুবিধায় পড়বে হয়তো, যাহোক করে কিছু টাকা দিয়ে দেবে ওকে। সত্যি, সুখময়ের অসুখ থেকে আর এই অবধি অযত্নেরও তো শেষ নেই ছেলেটার! শ্রী লালিত্য কোথায় যেন

অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বাড়ির আবহাওয়াও তো তেমনি চমৎকার! এই স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে দু'চার দিন কোথাও ঘুরে আসতে চায় ভালোই। কিন্তু লুকোচুরি কেন? অথবা অগ্রাহ্য? মাকে বললে কি বাধা পেতো সে? সেই রকমই মা কি ফুলটুশের? কিন্তু এসব কথা বলবার অবকাশ মেলে কই?

কোথা থেকে আসে বন্যা, কোন্ আকাশ থেকে আসে ঝড়, মানসীকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখন চৈতন্য ফেরে, তখন দেখে ছেলের সঙ্গে হাজার যোজনের ব্যবধান।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিলো, ঠেলে খুলতেই চমকে উঠলো মানসী। 'সন্ধ্যে-জ্বালা' হিসাবে কেষ্ট কখন ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেছে, আপন মনে জ্বলে যাচ্ছে আলোটা। আর সেই প্রখর বিদ্যুতালোকে দেখা যাচ্ছে সারা ঘরের মেজেয় ছড়িয়ে পড়ে আছে খালি খাম আর খোলা চিঠি। হয়তো বৃষ্টির আগে এসেছিলো একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে হালকা কাগজগুলো।

শুধু জানালার একেবারে কোল ঘেঁসে পড়ে আছে ক'খানা চিঠি বৃষ্টির জলে মাখামাখি হয়ে। লেখাগুলো গেছে ভিজে ধেবড়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একখানা তুলে নিলো মানসী।

শেষ পৃষ্ঠাটা উল্টে পড়েছিলো, যেখানে লেখা রয়েছে—"ইতি তোমার সুখ!" পত্রলেখকের স্বাক্ষর! পুরো নামটা না লিখে, লিখেছে অর্ধেকটা। এই রকমই লিখতো সে। তাও গেলো বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে।

"মা, আমি দিন দশের জন্য দেশে যাবো!"

কেষ্ট এসে আবেদন জানালো।

কিন্তু উচ্চারণের ধ্বনিতে কি আবেদনের সুর ধ্বনিত হলো! এ তো রীতিমত স্থির সংকল্পের সুর। মানসী চমকে মুখ তুলে চাইলো, তারপর গম্ভীর ভাবে বললো, "বেশ! যাও।"

কেষ্ট ঠিক এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ভেবেছিলো অনুমতি আদায় করতে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। আর সেইজন্যই লড়ায়ের মনোভাব নিয়েই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো সে। মানসীর এই নিরুত্তাপ অনুমতিদানে ও একটু থতমত খেলো। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলো অপ্রতিভ মুখে, তারপরই হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকিয়ে গোঁ ভরে বলে উঠলো, "রাগ করলে নাচার! কতোকাল দেশে যাই নাই ঠিক আছে কিছু?"

"স্বপ্ন দেখছিস নাকি তুই?" মানসী প্রায় হেসে বলে উঠলো, "তোর ওপর রাগ করবো আমি? আমার সময় বুঝি এতোই সস্তা?"

এ তাচ্ছিল্যের সুর নিতান্ত মূর্খেও বুঝতে পারে কেষ্টরও বুঝতে আটকালো না। মুহূর্তে সেও আত্মস্থ হয়ে উঠলো, এবং গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, "তা' জানি মা, আমরা কি আর আপনাদের রাগের যুগ্যি?"

'আমরা' এবং 'আপনারা'র মধ্যে এ যুগের প্রধানতম অভিযোগের সুর।

মানসী হাতের কাজ থেকে মুখ তুলে এবার বিরক্তস্বরে বলে, "সক্কাল বেলা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলি নাকি? কবে যাবি—ক'টায় গাড়ি?"

একেবারে ক'টার গাড়ি!

এবারে আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারে না কেষ্ট, অভিমান উথলে ওঠে ওর। সহসা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে বলে "ক'টার গাড়ি? আজই যাবো বলছি না কি? কেষ্টকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো, কেমন? দাদাবাবু বাড়ি নেই, প্রাণের মধ্যে দিনরাত হু হু করতেছে, তাই বলছি ঘুরে আসি। তাতেই অমনি এতো রাগ হয়ে গেলো?" আবো উচ্ছ্বসিত হয়ে ডুকরে ওঠে কেষ্ট, "বাবু গিয়ে পর্যন্ত এ বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারিনে, ইচ্ছে হয় ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গাছতলায় মাথা কুটি। শুদ্ধু দাদাবাবুর লেগে যেতে পারিনি।"

মানসীর গম্ভীর্যও ধুলিসাৎ হয়ে যায় এই অবোধ ভালোবাসার

আকুলতার সামনে। তারও চোখ অশ্রুসজল হয়ে আসে। কোমল ভাবে বলে, "তা সে আমি বুঝতে পারি রে! তাইতো এক কথায় বললাম 'যা'। নইলে তুই গেলে কখনো চলে আমার?"

"আপনি তো রাগ রাগ করে বললে।"

"কি মুশকিল! রাগ আবার কখন করলাম রে? ভালো মনেই বলছি, যা দু'দিন ঘুরে আয়।"

কেষ্ট এবার চোখ মুছতে মুছতে বলে, "তা আপনারও কি তিনকুলে কেউ নাই মা? আপনিও দোরে চাবি দিয়ে দু'দিন কোথাও ঘুরে এসো না?"

মানসী মৃদু হেসে বলে, "নাঃ, তিনকুলের কোথাও কেউ নেই আমার। দেখেছিস কখনো কারুর কাছে যেতে? এতো দিন তো রয়েছিস।"

কেষ্ট বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গীতে বলে, "এতো দিনের কথা স্বতন্তর! এতো দিন স্বামী-পুত্তুরের জন্যে আটকে থেকেছো। এখন যেতে বাধা কি? দাদাবাবু যে ক'টা দিন বাইরে থাকে—"

মানসী ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, "নারে আমার কোথাওযাবার জায়গা নেই।"

"তা'হলে তোমার কাছে থাকবে কে?" কেষ্ট চিন্তা প্রকাশ করে। ও ভেবেছিলো কেষ্টর দেশে যাবার নামেই মানসী রেগে উঠবে, আপত্তি করবে এবং কেষ্ট জোরালো জোরালো যুক্তির দ্বারা সে সব আপত্তি খণ্ডন করে দিয়ে নিজের যাওয়ার প্রস্তাব পাকা করে ফেলবে, এবং সে অবসরেই মানসীকে পরামর্শ দেবে দু'দিন কোথাও ঘুরে আসতে। বাড়িতে একা থাকবে মানসী এটা তো সম্ভব নয়? কিন্তু আলোচনার পদ্ধতিটা ঠিক খাতে বইলো না। তবু ওর চিন্তা ও প্রকাশ করে, "তোমার কাছে থাকবে কে?"

"আমার কাছে?" মানসী পুরনো ভঙ্গীতে হেসে ওঠে, "আমার কাছে থাকবে ভগবান।"

"ভগবান!"...কেষ্ট চরম তাচ্ছিল্যের এক ভঙ্গী করে বলে, "ভগবান

যে চার হাত-পা মেলে বসে আছে, তোমার বাড়ির দরোয়ানী করবে বলে। ভগবান আবার আছে নাকি? ভগবান টগবান কেউ নাই।"

"ওমা ওকি রে কেষ্ট! ও কথা বলতে নেই।"

"বলতে নাই," কেষ্ট গোঁ ভরে বলে, "নাই তো নাই! কেষ্ট অতো শাস্তরের ধাব ধারে না। ভগবান মুখপোড়া থাকলে কি আর আমার সোনার বাবু মরে যায়? সগ্গে যদি কেউ থাকে তো যম আছে, আর শয়তান আছে।"

"বলেছিস ঠিক!"

কেষ্ট নিজের কথায় ফিরে আসে। বলে, "মা, ও বাড়িব মামী ঠাকুমাকে বলে আসবো?"

"কি বলে আসবি?" মানসী চকিত হয়ে ওঠে।

"এখানে এসে ক'দিন থাকতে?"

"রক্ষে কর কেষ্ট," মানসী জোর আপত্তি ঘোষণা করে ওঠে, "সুখের থেকে স্বস্তি ভালো আমার। তিনি থাকলেই সেই একগাদা রান্নাবাড়া, বাজার দোকান, কতো ঝামেলা! এ বাবা ইচ্ছে হয় রাঁধবো, ইচ্ছে হয় রাঁধবো না, ঘুমোবো, বই পড়বো, ঘুরে বেড়াবো।"

"ওই তো" কেষ্ট বিষণ্ণবদনে বলে, "সেই সবই ভাবনা আমার! বুঝছি তুমি রাঁধবে না খাবে না।"

অনেকদিন পরে মানসী কেষ্টর কথায় একটু কৌতুকের হাসি হাসে। বলে, "কেন, আমার জন্যে আবার তোর কি ভাবনা? তুই তো পড়ে আছিস শুধু তোর দাদাবাবুর জন্যে।"

কেষ্ট একটু কৃতার্থের হাসি হেসে কি বলতে যায়, কিন্তু বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে পড়তে হয় বেচারাকে।

আর কেউ নয়, এসেছেন ওবাড়ির দেবু ঠাকুরপো।

খবরাখবর নিতে এখন মাঝে মাঝে আসেন তিনি।

"কি খবর?" বলে মাটিতেই বসে পড়েন দেবু ঠাকুরপো।

ভাষাটা চিরপরিচিত, ভঙ্গীটাও নতুন নয়। বরাবরই 'কি খবর?' বলেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়তেন ভদ্রলোক। কিন্তু

সে কুশল প্রশ্ন ছিলো প্রশ্নমুখর উদ্দাম। বসবার ভঙ্গীতেও স্ফূর্তির আমেজ। সাড়া পেলেই মানসী যে অবস্থাতেই থাকুক বেরিয়ে এসে হৈহৈ করে উঠতো, "এই যে ডুমুরের ফুল, মনে পড়লো ?"

তারপর যদিও চলতো নিতান্তই বাজার-চলতি হাস্য-পরিহাস, তথাপি হাসির শব্দ কড়ি-বরগায় উঠে ধাক্কা খেতো। সুখময়ও খালি গায়ে মাটিতে বসে পড়তেন এবং মাঝে মাঝে এক একটি অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ফেলে বেশ কিছুটা আমোদের সৃষ্টি করতেন।

এখনো ভদ্রলোক পুরনো ধরনে 'কি খবর' বলে এসে বসেন বটে, কিন্তু প্রশ্নে প্রশ্ন-হীনতা, ভঙ্গীতে শৈথিল্য।

মানসীও বসলো এসে, অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ভঙ্গীতে নিরাভরণ হাত দু'খানা থানের আঁচলের নীচে ঢেকে। বললো "খবর ? সে তো তোমার কাছেই শুনবো বলে এলাম।"

"আমাদের আর খবর।" ইচ্ছে করেই উদাসী সুর কণ্ঠে আমদানী করেন ঠাকুরপো, নইলে মানাবে কেন ?

"তা সত্যি" মানসী মৃদু হাসে, "যতো নতুন খবর আমার কাছে, কি বলো ? তা' একটা নতুন খবর আছে বটে—ফুলটুশ বেড়াতে গেছে।"

"ফুলটুশ বেড়াতে গেছে ? সেটা ভয়ঙ্কর একটা নতুন খবর নাকি ?"

"বেড়াতে, মানে বিদেশে বেড়াতে।"

"তাই নাকি ? কোথায় ?"

"দীঘায়।"

"দীঘা ? সে আবার কোথা !" নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন ঠাকুরপো।

মানসী তেমনি মৃদু হেসেই বলে, "পৃথিবীর কোন এক খণ্ডে হবে অবশ্যই।"

"তা তো বটেই। ক'দিন গেছে ?"

"এই তো চারদিন।"

"থাকবে ক'দিন ?"

"ঈশ্বর জানেন, আর ফুলটুশ নিজে জানলেও জানতে পারে।"

"তার মানে?" ঠাকুরপো ভ্রূ কুঁচকে বলেন, "বলে যায়নি নাকি?"

"বলে আর কোন্ কথাটা? যাবে তাই-ই বলেনি।"

ঠাকুরপোর ভুরুটা একটু কুঁচকে আছে, "ভে-রি ব্যা-ড্। ভে-রি ব্যাড্ এ সব! বলবে না মানে? এখন তো উঠতে বসতে সব কিছুই আপনার অনুমতি নিয়ে করা উচিত ওর। এখন তো একাধারে আপনিই ওর মা-বাপ দুই।"

এ মন্তব্যের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। নীরবই থাকে মানসী।

দেবু ঠাকুরপো পরামর্শের সুরে বলেন, "না, না, এটা ঠিক নয় বৌদি! বয়েস খারাপ, মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেছে, এখন খুব হুঁশিয়ার!...তা'হলে আপনি এখন একলা আছেন?"

"একলা না, কেষ্ট আছে।" ইচ্ছে করেই কেষ্টর দেশে যাওয়ার প্রস্তাবটা ঘোষণা করে না মানসী। তথাপি ভয়ের জায়গাতেই সঙ্কো হয়। ঠাকুরপো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে ওঠেন, "কেষ্ট আবার একটা মানুষ! বলেন তো বাড়ি গিয়ে মেজ খুড়িকে পাঠিয়ে দিইগে। যে ক'দিন ফুলটুশ..."

"না না"। মানসী আপন অজ্ঞাতসারেই প্রায় ব্যাকুলভাবে নিষেধ করে ওঠে, "তাঁকে আর কষ্ট দেবার দরকার নেই, ফুলটুশের যা খেয়াল, হয়তো আজই এসে হাজির হতে পারে।"

"হয়তো ভালোই!" ঠাকুরপো উদাস মুখে বলেন, "তবে মেজ খুড়ির কষ্টর কিছু ছিলো না। আমাদের বাড়ি সুখোদার বাড়ি আলাদা তো কিছু নয়? সুখোদা আজ নেই বলে বাড়িটা তো পর হয়ে যায়নি?"

"তা তো বটেই", বলে চুপ করে মানসী, আর কিছু বলে না।

ভদ্রতা করে আরো কিছু বলা উচিত ছিলো না কি? কিন্তু পূর্বের সেই ভদ্রতাবোধ যে লুপ্ত হয়ে গেছে মানসীর, যে ভদ্রতাবোধের জ্বালায় সবদাই ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে মরেছে সে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে।

নাঃ অর্থহীন সেই ভদ্রতাবোধের বালাই মানসীর চিত্ত থেকে জীর্ণ

খোলসের মতো খসে পড়ছে। তাই মামীশাশুড়ীকে সাদর আহ্বান না জানিয়ে চুপ করে থাকতে ওর বাধে না।

আশাভঙ্গে ক্রুদ্ধ দেবু ঠাকুরপো বিরক্ত মুখে উঠে পড়েন।

সুখময়ের মৃত্যুর সময় থেকেই তাঁরা ক'ভাই বাসনা পোষণ করেছিলেন মানসীর নিরভিভাবকতার ছুতোয় মেজখুড়িটিকে তার স্কন্ধে চাপাবেন, কিন্তু মানসীর অনিচ্ছার অলক্ষ্য বর্মে ব্যাহত হয়ে সে বাসনা হতাশায় পরিণত হচ্ছে।

ভদ্রলোক বিদায় নিতেই কেষ্ট মুরুব্বির চালে বলে, "আপনার বাপু বড্ড খোট্! কাকাবাবু যেকালে বলেছিলো, সেকালে রাজী হলেই হতো। কতোই আর ঝামেলা করতো বুড়ি?"

"ওব্ বাবা, অনেক!"

"আচ্ছা মা তুমিই তা'হলে দু'চার দিন ওদের ওখেনে গিয়ে থাকো না?"

"কাদের ওখানে রে?" মানসী অবাক হয়ে তাকায়।

"কাকাবাবুদের ওখানে।"

"দূর পাগলা!"

"কেন? শুনি তো বে' হয়ে পেরথম পেরথম কাকাবাবুদের ওখেনেই থাকতে মা?"

মানসী হেসে ফেলে বলে, "তুইতো মায়ের পেট থেকে পড়ে পেরথম পেরথম হামা দিতিস। দিবি এখন তাই? নে আমায় নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোকে। আপনার চরকায় তেল দে।"

কথায় কথায় সহসা এক সময় আপন অবস্থা বিস্মৃত হয়ে যায় বৈকি মানুষ। মানসীর যে আর হাসিঠাট্টা করে কথা বলা শোভন নয়, সে কথা প্রায়ই মানসী ভুলে যাচ্ছে আজকাল!

কিন্তু মাথা ঘামাতে বারণ করলেই কি শান্তি আছে কেষ্টর? মানসীর একা থাকার জন্যে যতো না দুর্ভাবনা তার, তার চাইতে শতগুণ দুর্ভাবনা একা না থাকার? একা কি থাকতে পারে মানসী? একান্ত ভয় তার, সেই অপয়া অলক্ষুণে বাবুটাকে! সে কি আর না

এসে ছাড়বে? নির্ঘাৎ আসবে। কে জানে পাহারাদার কেষ্ট নেই দেখে হয়তো দু'বেলাই আসতে থাকবে। হে ভগবান, কি হবে তাহলে?

যে ভগবান নেই, তার কাছেই প্রার্থনা জানায় কেষ্ট, এই ক'দিনে সেই বাবুটার জ্বরবিকার হোক, পড়ে গিয়ে পা ভাঙুক, নিদেন ভয়ঙ্কর দরকারে পড়ে বিদেশে চলে যাক। এক একবার ভাবতে থাকে···দূর ছাই দেশে গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু ছুটে-যাওয়া উধাও মন বাঁধ মানে না। মনে পড়ে যায় দেশের মাঠ ঘাট, বন, দেশের ভিটের রান্নাঘর, ঘরের দাওয়া, গোয়াল। তাছাড়া ফুলটুশ ফিরে এলে বেরোনো অসম্ভব। শুধু যে ফুলটুশের অসুবিধে হবে বলেই তা নয়। অসুবিধে যা হবার সে তো হবেই। তাছাড়া কেষ্টর নিশ্চিত ধারণা ওর চোখের আড়াল হলেই মায়ে-ছেলে ঝগড়াঝাঁটি করে একটা কাটান ছেঁড়ান করে বসে থাকবে।

তখনকার মতো চলে গিয়ে আবার ঘুরে আসে কেষ্ট। মলিন মুখে বলে "থাকগে আর দেশে যেয়ে কাজ নেই।"

"কি মুশকিল! কেন রে?"

"না তোমায় একলা ফেলে রেখে গেলে দাদাবাবু বকবে।"

"দাদাবাবু বকবে?" মানসী ঝরঝর্ করে হেসে ওঠে, "আমার জন্যে দাদাবাবু তোকে বকবে? বকতে তার মনে পড়বে? তুই যদি আমাকে ভূতকে দিয়ে খাইয়ে রাখিস তাহলেও তোর দাদাবাবু খোঁজ করবে না। মা কোথায় গেলো?"

"ও আপনার গা-জুরির কথা! সবাই কি সমান হয়? দাদাবাবু বেজায় চাপা। কিন্তু মা এও বলি, আপনা[illegible] বা দু'দিন কোথাও গিয়ে জুড়োতে ইচ্ছে করে না কেন বলতো? এই শ্মশানপুরী [illegible]ড়ি আপনার ভালো লাগে?"

কেষ্ট চলে যায় আপন কাজে, আর মানসীর হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার তালে তালে হাতুড়ির ঘায়ের মতো ক্রমাগত ধ্বনিত হতে থাকে, "ভালো লাগে? ভালো লাগে—এই শ্মশানপুরীর মতো বাড়ি আপনার ভালো লাগে?"

ভালো লাগে কি না সে কথা তো কোনোদিন ভেবে দেখেনি মানসী! এখন ভেবে দেখছে। ভালো লাগে কি না বুঝতে পারছে না। কিন্তু কই সুখময় যাবার পর কেষ্টর মতো এ বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে তো কোনো দিন করে নি মানসীর। কোনো দিন ইচ্ছে করেনি ফুলটুশের মতো দু'দশ দিনের জন্যে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে। বরং এই বাড়ির কোথায় কোনোখানে যেন জমাট হয়ে আছে কিসের ভালো লাগা! কিসের এক আশা! সে আশায় রং নেই, আনন্দ নেই, গুরুভার একটা বিপদের মতো তার চেহারা, তবু সেই আশার বন্ধনই অদৃশ্য এক ডোরে বেঁধে রেখেছে মানসীকে এই বাড়ির ইটকাঠের সঙ্গে। এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার প্রশ্ন মনেই আসে না মানসীর।

কেষ্ট পড়েছে বিপদে। একবার যাবার বাসনা জানিয়ে, না করতেও পারছে না, অথচ মানসীর ভাবনা ভেবে সে বাসনা তার ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে। কিন্তু মানসী যে ওর যাওয়াটা নিশ্চিত ধরে নিয়ে যাবতীয় আলোচনা চালাচ্ছে, কোন অবসরে বলে কেষ্ট, "না, আমি যাবো না।"

ফুলটুশ ফিরে আসার জন্য মনে মনে হরিলুঠ মানলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেষ্টকে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করতে হলো ভগবান নেই!

কাজেই নিজের পুঁজিপাটা গুছিয়ে মানসীর কাছে আগাম টাকা কিছু নিয়ে রওনা দিতে হলো কেষ্টকে উড়িষ্যার একটি অখ্যাত জেলার উদ্দেশে। মানসীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাড়ির ঝিটাকে বলে কয়ে রাজী করিয়ে রেখে গেল রাতে থাকতে।

মানসী হাসে আর বলে, "ওই বুড়িটা হবে আমার রক্ষক? তা'হলেই হয়েছে! সারারাত ওর ঘুমের বাজনায় আমার ঘুমটা ঘুচবে আর কি!

কেষ্ট অভিভাবকের সুরে বলে, "তা হোক। মেয়েছেলেদের ঘুম একটু কম ভালো, একা বাড়িতে কেউ মেরে কেটে রেখে গেলে?"

কেষ্ট চলে গেলে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগলো মানসী। তুচ্ছ একটা মুখ্যু ছেলে, তারও কর্তব্যের দায়, বত্রিশ বন্ধনের পাকে

জড়িত। কতো ভাবনা বেচারার, কতো দুর্ভাবনা! অথচ ফুলটুশ?

কতো অনায়াসেই বন্ধন মুক্ত হতে পারে! কি করে এমন হয়? ভালবাসার তারতম্যে? না মনের গঠনের তারতম্যে?

মনের জগতে ভালোবাসার খুপরি আলাদা, কর্তব্যবোধের খুপরি আলাদা! কতো লোক মুমূর্ষু সন্তানের রোগশয্যার পাশেও সহজেই ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কতো লোক পড়শীর বাড়িব রোগীর শিয়রে বসে রাতের পর রাত জাগে। অতএব একথা ভাববার হেতু নেই, কেষ্ট মানসীকে ফুলটুশের চেয়ে বেশি ভালবাসে! সন্দেহের নিরসন হলো। কিন্তু আবও একটা সন্দেহ মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। ফুলটুশ কি মাকে আদৌ ভালবাসে?

কতোক্ষণ পরে কে জানে দরজায় শব্দ হলো। খুট! খুট! চমকে উঠলো মানসী! কে? কে দরজায় কড়া নাড়ে? চকিতে চোখ চলে যায় দেয়ালঘড়িটার দিকে। তাকিয়ে দেখে রাত্রি দশটা।

এতো রাত্তিরে! বুকটা হিম হয়ে আসে মানসীর? এ কী? এ কী!

এ কী অনাচার! এতো রাতে কেন? তবে কি সে জানতে পেরেছে আজ রাত্রে মানসী বাড়িতে একা? তাই এত দুঃসাহস।

না না, দরজা খুলবে না মানসী, কিছুতেই না।

আবার নড়ে ওঠে কড়াটা সজোরে, সশব্দে।

একটা জানলার গবাদ ধরে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী, পা দু'খানাকে প্রায় মাটির সঙ্গে পুঁতে ফেলে। আসুক প্রলোভন, আসুক বিপদ, আসুক ছদ্মবেশী শয়তান, কিছুতেই কেন্দ্রচ্যুত হবে না সে।

আবাব নড়ে উঠলো কড়া অধীব অসহিষ্ণু করস্পর্শে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। এ কী! কে এ! এ কী!

অথচ আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না কঠিন হয়ে, আর পুঁতে থাকা যায় না মাটির সঙ্গে, দ্রুতপদে গিয়ে খিলটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় মানসী, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপর শপাং করে এক ঘা চাবুক পড়ে। মুখের উপর না মনের উপর?

এতোক্ষণের সমস্ত কুৎসিৎ সন্দেহ চাবুক হয়ে গিয়ে পড়ে দুরাশাস্পন্দিত মনটার উপর। স্পন্দিত বক্ষ…তাইতো! বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত মন সেই বিপদের আশাতেই স্পন্দিত হয়ে ওঠে, এ তথ্য কি অসম্ভব ?

একগাল হাস্যের সঙ্গে ননীর মা ঢুকে বলে, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি ? দেরী হয়ে গেলো মা! সংসারের জঞ্জাল কি সহজে মেটে ? ননীর বাবা ফেরে সেই রাত ন'টায়, তাকে খাইয়ে দাইয়ে তবে তো ? কাল থেকে আর এমন হবে না।"

সুইচ অফ্ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে বালিশটা গুছিয়ে নিতে গিয়ে হাতে কি ঠেকলো। হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে সরিয়ে নিলো হাত। কি এ ? ওঃ! সেই চিঠিগুলো!

বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া অস্পষ্ট স্বাক্ষরাঙ্কিত সেই চিঠিগুলো। সেদিন চিঠিগুলো কুড়িয়ে যথাযথভাবে গুছিয়ে সিল্কের ফিতে দিয়ে তাড়া বেঁধে রেখেছিলো, শুধু আলস্যবশতঃ তোলা হয় নি।

এখনই কি উঠে তুলবে ? ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মানসী। পরক্ষণেই আবার ধুপ করে শুয়েও পড়ে। থাক! আজ থাক। এতোদিন যখন গেলো! কাল তুলে রাখলেই চলবে।

বাড়িতে লোক নেই, ননীর মার কাজই বা কি ?

সকালে উঠে সামান্য কিছু সেরে দিয়ে ও বলে, "দুয়োরটা ভালো করে দিয়ে রাখো মা, একলা রইলে। কেষ্টা মুখপোড়া দেশে যাবার আর সময় পেলো না! আমার সংসারে এতো ঝামেলা না থাকলে তোমার কাছে এ ক'টা দিন থাকতুম মা! কি করবো, নিরুপায়। উনুনে আগুন দে গেলুম, যা হয় দুটো ফুটিয়ে নিয়ে খাও। রাত থেকে উপোসী!" চলে যায় ননীর মা।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে মানসী। সহানুভূতি জিনিসটা সহ্য করা কি কষ্টকর! উনুন জ্বলে যায় যাক্! আজ আর রান্নাঘরের দিকেও যাচ্ছে না সে।

আজ মানসী স্বাধীন। অদ্ভুত রকমের স্বাধীন। এ স্বাধীনতাটুকু

নষ্ট করতে রাজী নয় সে, বেঁধে খেয়ে আর ঘুমিয়ে। চেখে চেখে ভোগ করবে এ স্বাধীনতা। সময়টাকে নিয়ে আজ যা খুশি করতে পারে মানসী। যা খুশি!

অদ্ভুত একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে মানসীর ঠোঁটের কোণে। নাঃ, যা খুশি করবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তার নেই। খুশির খেয়ালে বড়ো জোর উপোস করে থাকতে পারে। তা' ছাড়া আর কিছুই না।

কই? পারে কি খুশি মতো একখানা চিঠি লিখতে?

যদি সে চিঠি কারো উদ্দেশে না পাঠায়? যদি সে চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলে? নাঃ তবুও না।

নির্জন নিঃসঙ্গ ঘরে বসেও সে চিঠি লিখতে হাত কাঁপবে মানসীর, কাঁপবে বুক! এ ঘরের সমস্তখানে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সুখময়ের উপস্থিতি, এঘরের বাতাসে বিলীন হয়ে আছে সুখময়ের আত্মা!

নির্জন ঘরের সুবিধা গ্রহণ করে যেই মানসী সাদা ধবধবে কাগজের উপর কালির দাগ টানতে যাবে, হয়তো হো হো করে হেসে উঠবে সুখময়ের অশরীরী আত্মা! হয়তো সে আত্মা চেপে ধরবে মানসীর কলম-ধরা হাত। হয়তো তার সেই শিশুর মতো সরল বড়ো বড়ো দুটি চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি ভরে বলবে—ছিঃ মানসী! না, স্বাধীন হয়ে কিছু করা যায় না।

কিন্তু যেখানে মানসী সম্পূর্ণ পরাধীন, সেখানে সে কি করবে? 'ব্রাহ্মস্পর্শ বৈঠকে'র দরজায় এসে যে দাঁড়াবে, তাকে নিয়ে কি করবে সে? তাকে কি বলতে পারবে 'আপনি বিদায় হোন, আমি একা আছি। আমার দেহরক্ষী কেষ্ট আজ অনুপস্থিত। আপনাকে দেখে আমার ভয় করছে। আমার বুক হিম হয়ে আসছে।'

বলা যায় একথা? না, তা বলা যায় না। যা বলা যায় তাই বলে মানসী।

"আপনি এসেছেন? ভালোই হলো! একেবারে একা বাড়িতে হাঁপিয়ে মারা যাচ্ছিলাম! এ অভাগা ব্যক্তিকে কেষ্টও ত্যাগ করে চলে গেছে! বসুন, চা নিয়ে আসি, আর 'সঞ্চয়িতা'। অনেক দিন

আপনার আবৃত্তি শোনা হয়নি!”

সুটকেশটা গুছিয়ে নেবার মতো অবস্থাও বোধকরি ছিলোনা ফুলটুশের, এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্রগুলো যথেচ্ছ মুচড়ে ডালা-খোলা গহ্বরটার মধ্যে পুরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলো মাত্র। কিন্তু কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিসগুলো যদিবা ওর জবরদস্তিতে সুটকেশের মধ্যে বসলো ঘাপটি মেরে, সুটকেশের ডালাটা রীতিমতো অবাধ্যতা শুরু করেছে

দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে গায়ের জোরে ডালাটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছিলো ফুলটুশ, শিখা ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো!

কি হলো! লোকটা হঠাৎ যাত্রার তোড়জোড় করছে কেন! শিখার আসা বোধহয় টের পায়নি ফুলটুশ, তাই হাতের জিনিসটাকে কিছুতেই বাধ্য করতে না পেরে বিরক্তির সঙ্গে, সুটকেশের মধ্যে মাথা উচু করে বসে থাকা কয়েকটা জিনিসকে টেনে টেনে বার করতে থাকে। এবারে কথা কয় শিখা। ওর স্বভাবগত দৃঢস্বরে প্রশ্ন করে, “কি হচ্ছে কি এ সব?”

ফুলটুশ এবার ঘাড় তুলে দেখলো, উত্তর দিলোনা। শিখা ওর মুখ দেখে একটু বিস্মিত হয়েছে। কেমন যেন ভারী ভারী টস্‌টসে মুখ, লাল লাল চোখ! হাঁটু মুড়ে কাছে বসে পড়ে বলে, “হলো কি তোমার!”

“হবে আবার কি? কিছু না।” বলে আরব্ধ কাজে মন দেয় ফুলটুশ। সঙ্গে সঙ্গে শিখা ওর হাত থেকে ভাঁজকরা শার্টটা টেনে নিয়ে খুলে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, “ভারী অহঙ্কার দেখছি! কথার উত্তরই দেওয়া হচ্ছে না। বলো শিগগির, কি হয়েছে? হঠাৎ সুটকেশটার সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়েছো কেন?

“চলে যাচ্ছি।”

“চলে যাচ্ছো? তার মানে?”

“মানে? এর আবার মানে কি? সাদা বাংলা কথা।”

"দীঘায় বেড়ানো 'হয়ে' গেলো ?"

"হ্যাঁ !"

"সংকল্পটা অবশ্যই আকস্মিক ?"

"আমার সব সংকল্পই অকস্মাৎ আসে।"

শিখা আর একবার ওর মুখের দিকে তাকালো, স্পষ্ট প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে রগের শিরাটা দপ্ দপ্ করে ওঠানামা করছে, রুক্ষ চুলগুলো আরো রুক্ষ অবিন্যস্ত, নাকের পাটাটা যেন কাঁপছে। অসুস্থ মানুষের মতো চেহারা। অসুখ করেনি তো! হঠাৎ ওর কপালের ওপর একটা হাত রেখে দেখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে কপালটা। "এ কী কাণ্ড! তোমার যে দারুণ জ্বর!"

"জানি, সেই জন্যেই তো চলে যাচ্ছি।"

শিখা ওর সামনে থেকে সুটকেশটাকে ঠেলে বেশ কিছুদূর পাঠিয়ে দিয়ে বলে, "অসম্ভব! এই জ্বর নিয়ে চলে যাবে ? ক্ষেপেছো নাকি ?"

"এই জ্বর নিয়ে এখানে পড়ে থাকলেই সেটা ক্ষ্যাপার কাজ হবে। নাও সরো, আমাকে কাজ করতে দাও।"

"না !"

"না ! না কি ?"

"তোমার যাওয়া হবেনা !"

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে ফুলটুশ। তারপর বলে, "তুমি আমার গার্জেন নাকি ?"

শিখার রং ফরসা নয়, তবু যেন হঠাৎ ভারী ফরসা দেখায়, হাসির একটু আভাস উঁকি মারে তার ঠোঁটের কোণে। তবু গভীরভাবে বলে, "এক হিসাবে তাই। মেয়ে মাত্রেই ছেলেদের গার্জেন।"

"নতুন একটা জ্ঞান সঞ্চয় হলো। কিন্তু এখন দয়া করে যাও, আমাকে এগুলো করে নিতে দাও।"

"বললাম যে যাওয়া হবে না !" শিখা প্রায় ধমকে ওঠে। "রেখে দাও ওসব। শুয়ে পড়গে। ওঃ! বিছানাও গুটিয়ে ফেলা হয়েছে

দেখছি। আচ্ছা পেতে দিচ্ছি আমি।”

“ছেলেমানুষী করো না। বলছি যাও, নিজের কাজে যাও!”

“আপাততঃ তোমাকে বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়াই আমার কাজ। ওঠো শিগগির।”

ফুলটুশ আবার একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে, তারপর ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি হেসে বললো, “লম্বা-চওড়া হুকুম তো খুব দিচ্ছো পার্টির মত নিয়েছো?”

“পার্টির!”

“হ্যাঁ। হ্যাঁ। অন্ততঃ সঞ্জয়বাবুর?”

পার্টির সকলেই প্রায় সঞ্জয়কে দাদা বলে, শুধু ফুলটুশ বলে সঞ্জয়বাবু।

শিখা বিরক্ত ভাবে বলে, “এখানে আমরা কেউ পার্টির কাজ করতে আসিনি, কেউ কারো অনুগ্রহের চাকর হয়েও আসি নি। প্রত্যেকে নিজের খরচায় বেড়াতে এসেছি!”

“তা'তে কি? কেউ অসুখ বাধিয়ে অপরের আমোদ-প্রমোদের হস্তারক হবে এমন স্বাধীনতা না থাকাই উচিত।”

শিখা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “আচ্ছা যাচ্ছি আমি সঞ্জয়দার কাছে, জেনে আসছি কাউকে বিদায় করবার কি অধিকার তাঁর আছে?”

ফুলটুশ হতাশার ভানে কপালে হাত রেখে বলে, “হায়! হায়! তিনি বিদায় করেছেন একথা কে বললো?”

“সব কথা বলে বোঝাতে হয় না।”

ফুলটুশ মৃদু হেসে বলে, “থাক্, কারো সঙ্গে আর ঝগড়া বাধাতে হবে না। আমি এমনিই চলে যেতাম। সঞ্জয়বাবু এ ইঙ্গিত না দিলেও যেতাম। বুঝতে পারছি না এ জ্বরটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে। ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।”

শিখা মৃদু হেসে বলে, “অতএব বাড়ি গিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে বিছানায় আশ্রয় নিতে চাও, কেমন?”

“বাড়ি গিয়ে?”

জ্বরতপ্ত রগের শিরাটা হঠাৎ যেন বেশি স্ফীত হয়ে দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে। হাত দিয়ে এক মুঠো চুল চেপে ধরে ফুলটুশ বলে, "বাড়িতেই যে যাবো তার কোনো মানে নেই, নাও যেতে পারি।"

"নাও যেতে পারো? তাহলে?" বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে শিখা।

"হাসপাতালেও যেতে পারি।"

শিখা অবাক হয়ে বলে, "হাসপাতালেও যেতে পারো? কেন বলতো? এমন অদ্ভুত খেয়াল কেন?"

বোধকরি মাথার যন্ত্রণাতেই অস্থির হচ্ছিলো ফুলটুশ, তাই তেমনি ভাবেই চুলগুলো মুঠোয় চেপে টানতে টানতে বলে, "বাড়িতে আমার কেউ নেই।"

শিখা আরো অবাক হয়ে তাকায় ফুলটুশের জ্বরতপ্ত মুখের দিকে। এ আবার কি জ্বর? বিকারের লক্ষণবাহী ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ নয়তো?

তবু জোর দিয়ে বলে, "কী বকছো বাড়িতে তোমার মা আছেন না?" নিজের চোখে দেখে এসেছে শিখা ফুলটুশের মাকে

"মা? মা আছেন!"...ফুলটুশ যেন সহসা সম্বিৎ ফিরে পায় তাই সহজভাবে বলে, "হ্যাঁ তা তো বটেই, বাড়িতে অবশ্য মা আছেন।"

বাইরে বাতাস বইছে। ঝড়ো বাতাস ধূ ধূ বালিয়াড়ির উপর দিয়ে বালুকণা বহন করে চলছে সে বাতাস। জানলা দিয়ে সে বাতাস আছড়ে আছড়ে এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে সে বাতাসে শিখার চুল উড়ছে, উড়ছে শাড়ির আঁচল। কেমন যেন অন্যরকম দেখতে লাগছে ওকে, একটু যেন অসহায় অসহায়। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ও বলে, "সবসময় তোমার মনে এত যন্ত্রণা কিসের বলো তো?"

মনে যন্ত্রণা! ফুলটুশ একটু চমকে গিয়েই অস্বাভাবিক জোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে সে বলে, "আপাততঃ তো মাথার যন্ত্রণা নিয়েই অস্থির হচ্ছি"

"সে জানি। এখনকার কথা হচ্ছে না লক্ষ্য করেছি, সব সময় তুমি কী যেন একটা যন্ত্রণা ভোগ করছো!"

"আমার প্রতি এতো লক্ষ্য রাখছো, এজন্য ধন্যবাদ।"

"থামো তো! বাজে কথা রাখো। শুনতে চাই আমি তোমার কথা। তোমার মাকেও সেদিন দেখলাম, কিন্তু ওঁর বিষাদেব অর্থ বুঝি। বাঙলা দেশের মেয়েরা স্বামীর মৃত্যু হ'লেই নিজেকেও মৃত ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু তোমার ধরনটা অদ্ভুত! বিশেষ করে তোমার বাবা মারা যাবার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছো। বাবা তো কতো লোকেরই মারা যায়। আমারও তো বাবা মা কেউই নেই।"

ফুলটুশ দুই ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিখার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো, কথা শেষ হতে গম্ভীরভাবে বলে, "তা'হলেই বুঝতে হবে কোথাও একটা গোলযোগ আছে। হয় আমিই অদ্ভুত, নয় আমার জীবনটাই অদ্ভুত। কিন্তু তুমি নিয়মিতভাবে আমাকে 'ওয়াচ' করে চলো নাকি? এ তো ভালো নয়। অভ্যাস বদলাও।"

"আমার অভ্যাসের কথা থাক, তুমি বলো কেন তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগের অভ্যাস?"

"সকলেরই নিজস্ব একটা প্রকৃতি থাকে, এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতাও থাকে।"

"তা ঠিক!" বলে ঈষৎ আহতভাবে উঠে দাঁড়ায় শিখা।

ফুলটুশ সুটকেশটা আবার টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বলে, "যাক্ তোমাকে তা' হলে একটু রাগাতে পেরেছি। এতেই কাজ হয়ে যাবে আমার।" এবার রাগ করে চলে যায় শিখা।

এখানে পার্টির এক সদস্যের কার কি আত্মীয়তাসূত্রে একখানা বাড়ি পাওয়া গেছে, তাই এই বেড়াতে আসা এদের। মেয়ে বলতে প্রায় এই শিখাই একা। আর একটি মেয়ে আছে— বিভা। নিতান্ত অবোধ নতুন একটা মেয়ে। এবং ভাগ্যতাড়িত আত্মীয়-পরিজনহীন বেচারা! কিভাবে যে ছিটকে এসে এদের দলে ভিড়েছে, সে আর কারো খেয়াল নেই। দেখতে এতোই কুশ্রী যে, বোধকরি পথে পড়ে থাকলেও বিপদের আশঙ্কা নেই তার। মেয়েটা একেবারেই শিখার অন্ধভক্ত। আর রান্নায় তার একান্ত অনুরাগ। প্রকৃতপক্ষে সেই

সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতেই তাকে সঙ্গে আনা।

পাশের ঘরে এসে উঁকি মেরে দেখলো শিখা, বিভা নিবিষ্টচিত্তে আলু কুটছে। বাঁচা গেলো! নইলে এখনই "শিখাদি শিখাদি" করে অস্থির করে তুলতো।

এ ঘরে এসে নিজের চৌকিটার উপরে বসে পড়লো শিখা। জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রতপ্ত বালুপ্রান্তর, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরো তপ্ত হয়ে উঠেছে।

শিখার মনে হলো, প্রকৃতির এই রুক্ষ রূপটার সঙ্গে গৌতমের প্রকৃতির অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে। আশ্চর্য বৈ কি!

যদিও গৌতম নিজের বা নিজের বাড়ির সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো কথা উচ্চারণ করে না, তবু শিখা জানে, ভাই বোন আর কিছু নেই ওর। মা বাপের এক সন্তান। অবশ্য এ'খবরও জেনেছে কিছুদিন আগে ওর বাবা মারা গেছেন। কিন্তু সে আর এমন কি! কতো লোকেরই তো বাবা মারা যায়। গৌতমের প্রকৃতিটা এমন অদ্ভুত হলো কেন?

চির-নিঃসঙ্গ হয়েই যারা জন্মায়, গৌতম বুঝি তাদেরই দলে।

কিন্তু গৌতমের জন্যে তাঁর এতো ভাবনা কেন? শিখা ভাবে, পার্টির তো আরো কত ছেলে রয়েছে, ভারভারীক্কি গম্ভীরমুখ সঞ্জয়, স্ফূর্তিবাজ ছেলে অনিমেষ, পার্টির প্রতি মারাত্মক রকমের নিষ্ঠাপরায়ণ সুনন্দ, অতীশ আর দেবজ্যোতি, পার্টির কড়া সমালোচক খর-জিহ্বা নীহারেন্দু। এতো ছেলে রয়েছে, তবে কেন তার গৌতমের জন্যে এতো উৎকণ্ঠা? কেন গৌতমের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছাবার ইচ্ছে হয় তার?

কেন গৌতম তাকে যতোই দূরে সরিয়ে দিতে চায়, ততোই তার প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে।

একটু পরেই বিভা এলো ব্যস্ত হয়ে, "শিখাদি শুনছো, গৌতমদা কিছু না খেয়েটেয়ে চলে যাচ্ছেন সাড়ে তিনটের বাস ধরবার জন্যে।"

চমকেই প্রথম তাকালো শিখা হাতের ঘড়িটার দিকে—কটা

বেজেছে। দেড়টা বেজে গেছে। আশ্চর্য, এতোক্ষণ সে এতো অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলো না কি? এখানে খাওয়াদাওয়া অবশ্য যথেষ্ট বেলাতেই হয়। এখন বোধ হয় বিভা খাওয়ার ডাক দিয়েছে সবাইকে। আর সেই সূত্রেই জেনেছে গৌতমের খবর।

ঘড়ি দেখে নিয়েই শিখা সহজ সুরে বলে, "খাবে কি, গৌতমদার যে খুব জ্বর।"

"জ্বর।" বিভা বিস্মিত হয়ে বলে, "কখন জ্বর হলো? এইতো সাবান দিয়ে গেঞ্জি রুমাল সব কাচছিলেন।"

"তাই নাকি? বাঃ! চমৎকার! জ্বর নিয়েই বাহাদুরী হচ্ছে আর কি!"

"কিন্তু জ্বর গায়ে যাবেন কি করে!"

বোকা বিভা বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করে।

"বীরপুরুষেরা একশো বাইশ জ্বর নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে, বুঝলি বিভা?" বলে ত্বরিত গতিতে চলে যায় শিখা।

"তোমার এভাবে একা যাওয়া হবে না।"

পিছনের ডাকে পিছন ফিরে তাকালো ফুলটুশ। ভিজে চুলগুলোর উপর জোরে জোরে চিরুনী চালাচ্ছিলো, চিরুনীটা থেমে রইলো।

মাথায় যন্ত্রণার চোটে জল ঢেলে এসেছে এই মাত্র, চোখদুটো জবাফুলের মত লাল।

শিখা ওর কাছে এসে তীক্ষ্ণস্বরে বললো, "তোমার এভাবে স্বেচ্ছাচার চলবে না। জ্বরে কাঁপছো একেবারে!"

ফুলটুশ সত্যিই জ্বরে কাঁপছিলো, তবু স্বভাবসিদ্ধ অবহেলার ভঙ্গীতে বললো, "জ্বরে কাঁপছি বলেই যে কারো ভয়ে কাঁপবো তার কোনো মানে নেই।"

"বেশ, নিতান্তই যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যাবো পৌঁছে দিতে।"

ফুলটুশ সহসা ফিরে দাঁড়ায়। ওর মুখের দিকে রক্তিম চোখের

স্পষ্ট চাহনি ফেলে বলে, "তার মানে ?"

"মানে অতি প্রাঞ্জল। তোমার যা অবস্থা, তাতে সঙ্গে একজন লোক থাকা খুব দরকার শেষে যদি বাসে কি রেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ো ?"

"ও, সহানুভূতি দেখাচ্ছো ? দেখো তা'হলে বলে রাখি, আমার সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না কেবল ওই সহানুভূতি ! একেবারেই বরদাস্ত হয় না।"

শিখার ক্ষণপূর্বের মমতা-মদির চোখ দুটির মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠলো একটা বিদ্যুৎশিখা। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণে মাথা নেড়ে সে বললো, "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয় !"

"তাই না কি ? দুঃখটা বড্ডো বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে না ?"

বিভা ঢুকলো এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে। ওর সর্বদাই ব্যস্ত ভাব। "গৌতমদা, অন্তত এই এক পেয়ালা চা আর দুখানা বিস্কুট খেয়ে যান।"

ফুলটুশ এবারে প্রায় হেসে ফেলে। চিরন্তন পাকামি ফেলে হতাশ স্বরে বলে, "না ! তোমাদের মেয়েলীপনা আর ঘুচবে না কখনো।"

"মেয়েলীপনা আবার কি !" বিভা তার কুশ্রী মুখে সৌজন্যের হাসি হাসে, "কিছু না খেয়ে চলে যাচ্ছেন, খারাপ লাগে না বুঝি ?"

"কেন ? কেন খারাপ লাগবে ?" অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ফুলটুশ, "কেন খারাপ লাগবে ? আমি কি তোমাদের বাড়ির জামাই ? রাগ করে না খেয়ে চলে যাচ্ছি তাই সকলে মিলে সাধতে এসেছো ?"

ভীতু বিভা ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালা আর বিস্কুটের প্লেটটা নিয়ে সরে যাচ্ছিলো, শিখা হঠাৎ প্রায় বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর, জিনিস দুটো ছিনিয়ে নিয়ে বলে, "নিয়ে যাচ্ছিস মানে ? খেতেই হবে ওকে। কষ্ট করে তৈরী করে আনলি না ?"

"নাও ধরো দেখি কেমন ফেলে চলে যেতে পারো ?"

ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা চটা-ওঠা কাঠের টুল, তার ওপরেই বসে পড়ে ফুলটুশ। মুখে তার বিচিত্র কৌতুকের একটা হাসি ফুটে ওঠে। হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিয়ে বলে, "তাও পারি আমি, অনায়াসে পারি, কিন্তু থাক্, হয়তো বা কেঁদেই ফেলবে তোমরা।"

বিভার রান্নাঘরে তাড়া, ও চলে যায়।

শিখা জানালার বেদীটার ওপর বসে পড়ে বলে, "তোমাকে দেখে মনে হয়, জীবনে কখনো কারো স্নেহ-মমতা পাওনি তুমি"

তেমনি বিচিত্র হাসি হেসেই ফুলটুশ বলে, "দেবার লোকের অভাব ছিলো না কিন্তু জিনিসটা কেমন সহ্য হয় না।"

"তার জন্যেই বোধহয় তোমার মাকে ওরকম দেখতে লাগে।"

ফুলটুশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "আমার মাকে? কি রকম?"

"এই কেমন বিষণ্ণ!"

"একদিন তো মাত্র দেখেছো!"

"একদিন কেন, এক মিনিটেই অনেক কিছু বোঝা যায়। তুমি তো তাঁর একটিমাত্র ছেলে, সেই ছেলে এতো নিষ্ঠুর হলে মায়ের কতই না খারাপ লাগে!"

"তুমি যেরকম একধার থেকে সকলের দুঃখু বুঝতে শুরু করেছো তাতে কোন মিশনে ভর্তি হয়ে পড়াই তোমার উচিত!"

বলে পেয়ালাটা নামিয়ে স্যুটকেশ আর বেডিং দুটো দু'হাতে বাগিয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ফুলটুশ।

অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে জোর করে স্যুটকেশটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে, "চলো তোমায় বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

হাত যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল, হালকা হয়ে বাঁচলো সে হাত।

তবু ফুলটুশ নীরস স্বরে বলে, "দরকার ছিলো না কিছু।"

"তোমার দরকার না থাক্ আমার আছে। যা দেখছি, ট্রেনেই না তুমি একেবারে শুয়ে পড়ো—"

"পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই। রেলওয়ে হসপিটাল সর্বত্রই আছে। বেওয়ারিশ মড়া ফেলবার ব্যবস্থাও অবশ্যই আছে।"

অনিমেষ ওর সঙ্গে সঙ্গে এগোতে এগোতে বলে, "নিজের প্রতি তোমার এত তাচ্ছিল্য, মনে হয় তুমি বুঝি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা। কিন্তু তোমার তো মা আছেন শুনেছি—"

"আমার বিষয় এতো তথ্য সাপ্লাই করছে কে?" বলে বিরক্ত-ভাবে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে জোরে জোরে এগোতে থাকে ফুলটুশ।

কিভাবে যে দু'বার বাস বদল করে ট্রেনে চড়ে সে, ঈশ্বর জানেন! ট্রেনে চড়েই শুয়ে পড়ে গৌতম নিজেকে প্রায় ছেড়ে দিয়ে।

'তোমার তো মা আছেন!' প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ের মতো বারে বারে ধাক্কা দিতে থাকে কথা কটা, 'তোমার তো মা আছেন! তোমার তো মা আছেন!'

ওরা শুধু সমিতির সদস্য। ওদের সমিতির সদস্য হবার চুক্তিপত্রে স্পষ্ট করে লেখা আছে, 'আমি পরিবারিক বন্ধন স্বীকার করি না। আমি একা সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

তবু ওরা ব্যক্তিজীবনের সংস্পর্শে এলে সাধারণ মানুষের স্তরে না এসে পারে না। কারো অসুখ করলে, স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিতে চায়, কেউ নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাইলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় 'তোমার মা আছেন'।

কিন্তু চৈতন্য আর বেশিক্ষণ থাকে না—হাতুড়ির ঘা স্তিমিত হয়ে আসে, গাড়ির দোলানি আর অনুভূতিকে স্পর্শ করে না।

বিভা গম্ভীর ভাবে বলে, "গৌতমদা খেয়ে গেলেন না বলে তুমিও খাবেনা শিখাদি, এটা কিন্তু ঠিক নয়। লোকে এতে—"

শিখা তীব্র কণ্ঠে বলে, "গৌতমদা খেলো না বলে খেলাম না, এ কথার কি অর্থ বিভা? মানুষের একদিন খাবার অনিচ্ছে হ'তে পারে না?"

বিভা থতমত খেয়ে বলে, "রাগ কোরোনা শিখাদি, তা ঠিক বলছি না আমি, মানে বলছিলাম কি—"

"কিছু বলতে হবে না তোমায়—যাও।"

অনেক পরে অনিমেষ ফিরে এলো।

ক্লান্তভাবে বসে পড়লো বসবার ঘরটায়, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পেতে ওরা হরদম আড্ডা দেয়। বললো, "গৌতম ছেলেটা অদ্ভুত।"

কেন কে জানে সঞ্জয় গৌতমকে দেখতে পারে না, তাই অকারণ তীব্র হয়ে ওঠে, "অদ্ভুত কেন, একেবারে অসাধারণ!"

"অসাধারণ গৌতমদা নয় সঞ্জয়দা, বরং সে গৌরব আপনিই নিতে পারেন।" শিখা বলে ওঠে।

"মানে?

"মানে অতি পরিষ্কার। হঠাৎ কারো জ্বর হয়ে পড়লে তাকে তদ্দণ্ডে চলে যেতে বলতে সাধারণ লোকে পারে না।"

"আমি চলে যেতে বলেছি?" সঞ্জয় প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, "এই কথা রটিয়েছে ও?"

দেবজ্যোতি ওকে ধরে বসায়, "আরে সঞ্জয়, সামান্য কারণে অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন? শিখা হয়তো একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে—"

শিখা দৃপ্তভাবে বলে, "ভুল ধারণা মোটেই নয়! সঞ্জয়দাই বলুন, গৌতমদাকে উনি চলে যেতে বলেছেন কি না?"

"হ্যাঁ, আমি বলেছি! অবশ্যই বলেছি! বলেছি, এখানে ডাক্তার নেই কিছু না, হঠাৎ বেশি অসুখবিসুখ হয়ে পড়লে সকলেরই বিপদ, তোমার বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। এমন কিছু অন্যায় কথা আমি বলিনি। এর থেকে ও যদি রটিয়ে থাকে—"

"কোনো কিছুই রটিয়ে বেড়াবার ছেলে যে ও নয়, সে কথা সকলের থেকে আপনিই ভালো জানেন সঞ্জয়দা! তবে এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা যখন পার্টির আনুগত্যের শপথ নিই, তখন আমাদের ভাবতে বলা হয়, আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পারিবারিক সম্বন্ধের দায় নেই, আমরা শুধু পার্টির সম্পত্তি! তা পার্টির দিক থেকে সম্পত্তি রক্ষার দায়টা তো থাকা উচিত?"

"গৌতমের সম্বন্ধে শিখাকে যেন বড্ডো বেশি কনশাস্ মনে হচ্ছে!" নীহারেন্দু বলে তিক্ত হাসি হেসে।

সঞ্জয় বলে, "বিশেষ একজনের প্রতি পক্ষপাত, ওটা মেয়েদের স্বধর্ম নীহার!"

"অসহ্য!" বলে শিখা আরক্তমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে চলে গেলো।

গিয়ে দেখলো বিভা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে জুত করে বসেছে। একবার তাকিয়ে দেখে একটু অনুকম্পা হলো, আশ্চর্য মেয়েটা! কী অদ্ভুত বোধশক্তিহীন! কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড ওর প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অনুকম্পার জায়গায় এসে দাঁড়ালো ঈর্ষা!

ও কী সুখী!

"চটিয়ে দিলে তো শিখাকে?" অনিমেষ হেসে বললো সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে!

"থামো! এ ধরনের আলাপ-আলোচনা আমার কাছে নিতান্ত বিরক্তিকর, নীহারেন্দু বলে, এ সব মেয়েলী ন্যাকামী অসহ্য!"

অনিমেষ সহাস্যে বলে "মানে যদি সে ন্যাকামীটা অন্য খাতে প্রবাহিত হয় এই তো? ভয় নেই বন্ধু, গৌতম সে ধরনের ছেলেই নয়। কোনো রকম সেন্টিমেণ্টকেই আমল দেবে না সে! কিন্তু যাই বলো ওর জন্যে যথেষ্ট ভাবনা আমার। ও রকম হাই ফিভারের ওপর জেদ করে চলে গেলো! গাড়িতে সেন্সলেস্ হয়ে পড়লে—। হঠাৎ অতো জ্বরই যে কেন—"

"আমার তো মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া", বিভা একটা কাঁসার থালার উপর পাঁচ রকমের পাঁচটা চায়ের কাপ বসিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য শেষ করলো, "আমাদের সঙ্গে কুইনাইন আনা উচিত ছিলো!"

সবাই হেসে উঠলো।

বিভার কথা কেউ ধর্তব্য করে না, বিভার কথায় সকলেই হাসবে

এ রীতি। ওর যত নির্বুদ্ধিতা সহ্য করা হয় শুধু ওর সেবাপরায়ণতার গুণে। সমিতির ঘরে যখন তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে ওঠে, টেবিল ফাটে, কড়িকাঠ কাঁপে, ঠিক সেই সময় ত্যাগ্‌বুঝে চায়ের পেয়ালা এনে সামনে ধরে বিভা। ওকে নিয়ে সবাই মিলে হাসাহাসি করলেও ওর দৃকপাত নেই। এখনো হাসি উঠলো।

নীহারেন্দু ব্যঙ্গহাস্যে বললো, "শুধু কুইনাইন কেন? আইস্‌ব্যাগ থার্মোমিটার, ওডিকোলোন, হাতপাখা, এগুলোই বা বাদ দিচ্ছো কেন? এগুলো আনলে ভালো রকম একটা কাজ জুটে যেতো তোমাদের। তোমার আর তোমার শিখাদির।"

বিভা বুঝলো ওর মন্তব্যটা হাস্যকর হয়েছে, ম্লানমুখে ফিরে গেলো থালাটা নিয়ে।

ও চলে যেতেই সঞ্জয় বলে, "এসব বাজে আলোচনা ছেড়ে কিছু কাজের কথা হোক। কলকাতায় ফিরেই আমাদের যে ইস্তাহারটা ছাপতে দেবার কথা, আজ পর্যন্ত তো তার ড্রাফ্‌টই হলো না।"

"হবে কোথ্‌থেকে?" নীহারেন্দু প্রকৃতিগত ব্যঙ্গহাস্যে বলে, "প্রত্যেকটি অক্ষর নিয়ে তো মতভেদ হবে, আর খানিকটা করে ঝগড়া হবে!"

"না না, আজ ওটা পাকাপাকি সেট্‌ল করে ফেলা হোক।"

অতঃপর একটুকরো কাগজ নিয়ে বসা হয়, এবং যথারীতি খানিক পরেই তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে ওঠে। এ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে শিখা কখন একসময় নিঃশব্দে এসে নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে।

-জনে জনে রচি গেলো কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম উপহার
রেখে গেলো তার।

আপনার প্রাণ সূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেলো
না রাখি স্বাক্ষর।
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে,
না রহিলো কোনো তার ক্ষত—'

থেমে গেলো ছন্দ, 'সঞ্চয়িতা' খানা হাত থেকে খসে পড়ে গেলো একটা প্রবল ধাক্কায়। এ ধাক্কা কি বাতাসের? ভেজানো দরজাটা হঠাৎ খুলে গেলে ঘরের মধ্যে বাতাস এসে ধাক্কা দেয় বটে, কিন্তু তা'তে কি এমন হ'তে পারে? অতো ভারী বইটা পড়ে যেতে পারে সে ধাক্কায়? না, বাতাসের ধাক্কা নয়। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে যাওয়া দু'টো মানুষ বুঝি কেঁপে উঠলো শুধু একটা আকস্মিকতার ধাক্কায়। কাঁপলো বুক, কাঁপলো হাত!

যে ব্যক্তি বাইরে থেকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে দরজাটা হু'হাট করে খুলে দিয়েছিলো, ক্ষণিকের জন্য তার মূর্তিটা দেখা গেলো।

হয়তো বা সবটাও দেখা গেলো না। শুধু যেন একটা প্রেতছায়া চকিতের জন্য দরজা ঠেলে একটা শরীরী উপস্থিতির চমক দিয়েই মিলিয়ে গেলো দরজার সামনে থেকে।

সেইটুকুর মধ্যেই যে দৃশ্যটা ঘরের মধ্যে থাকা মানুষ দুটোর চোখের ওপর চাবুকের মতো এসে লাগলো, সে হচ্ছে একমাথা রুক্ষ চুল, এক জোড়া আরক্ত চোখ, আর দু'হাতে দু'টো মোট ধরে ঝুঁকে-পড়া, বিপর্যস্ত-বেশবাস একটা রোগা দেহ।

প্রফেসর সেনের শিথিল হাত থেকে বইটা পড়ে গেলো মাটিতে, মানসীর শিথিল কণ্ঠ থেকে হঠাৎ একটা আর্তধ্বনি উঠলো বাতাসে "ফুলটুশ।"

"ফুলটুশ। মানে গৌতমবাবু? ইয়ে—আপনার ছেলে?" প্রফেসর দাঁড়িয়ে উঠে বাইরে দৃষ্টি ফেলে উদ্বিগ্নভাবে বলেন, "উনি অমনভাবে এসেই চলে গেলেন যে?"

উত্তর দেবার জন্যে অবশ্য তখন আর মানসী চেয়ারে বসে নেই,

লুটন্ত আঁচল মাটিতে ছড়িয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েছে দরজায়, দরজা থেকে ফুটপাথে। যেখানে এই মাত্র নেমে পড়েছে সেই প্রেত ছায়াটা! বোধহয় সে ছায়া একবার হাত তুলে নিজের সদ্য-পরিত্যক্ত ট্যাক্সীখানাকে চলে যেতে নিষেধ করেছিলো। কিন্তু ড্রাইভার ততোক্ষণে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। শুনতে পেয়েও সে আর ফিরে তাকায় না, কারণ একটা জ্বরে বেহুঁশ মানুষকে গাড়িতে তুলে পর্যন্তই সে বিপদ গুনছিল।

এক হাতে সুটকেশ, এক হাতে বেডিং, এলোমেলো পদক্ষেপে কয়েক গজ এগিয়েছিলো ফুলটুশ, পিছন থেকে শার্টের কোণটা চেপে ধরলো মানসী। "ফুলটুশ।"

"আঃ!" চরম বিরক্তির পরমতম প্রকাশ।

"কি হয়েছে কি তোর? চলে যাচ্ছিস মানে?"

"ছেড়ে দাও!" হাতের বোঝা দুটো পথে নামিয়ে, নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায় সে। কিন্তু মানসী মরীয়া।

"ছাড়বো মানে? বাড়ি আয় বলছি!"

"থাক! যথেষ্ট হয়েছে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর নাটক করবার দরকার নেই!"

ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য জড়ানো জড়িতস্বরে কথা ক'টা উচ্চারণ করেই ফের মোট দু'টো তুলে নেবার জন্যে ঝুঁকেছিলো ফুলটুশ! কিন্তু তোলা হলো না, নিজেই হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো ফুটপাতের ওপর, সমস্ত তেজ আর অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়ে।

মনের মধ্যে পাহাড়ী অরণ্যের গর্জনই উঠুক, আর মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুনই জ্বলুক, দেহটা তো রক্তমাংসের! আর সে রক্তমাংস আজও নমনীয়, সুকুমার পৃথিবীর অনেক শীত, অনেক বর্ষা, অনেক ঝড় আর অনেক মার খেয়ে মজবুত হয়ে ওঠেনি।

তা'ছাড়া এমনিতেই তো এরা অমজবুত।

এদের সমস্ত শক্তিই যে খরচ হয়ে যায় বিদ্রোহ আর অহঙ্কারের সাধনায়। স্বাস্থ্য শক্তির সাধনা করতে ফুরসত মেলে কই?

নেমে এসেছেন প্রফেসরও। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? এঁকে যে রীতিমত অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।"

কথা ক'টা যেন বাতাসের পাখায় ভর করে বলে চলে গেলো, তা'র সঙ্গে যেন মাটির কোনো যোগ নেই।

মানসীর কি বুদ্ধিবৃত্তি ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে?

প্রফেসর বলেন, "কি রকম দলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন? এই অবস্থায় একা ছেড়ে দিয়েছে! আশ্চর্য! যাক এখন তুলে নিয়ে যাওয়া হোক আগে। ভিড় জমে উঠেছে।"

মানসী ফুটপাথের ওপরই বসে পড়েছিলো অচৈতন্য ছেলের মাথাটা দু'হাতে ধরে। এ কথায় মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো। নেহাৎ বড়ো রাস্তা নয় তাই রক্ষে, তবু এই এক মিনিটেই যেন মাটি ফুঁড়ে গোটা আষ্টেক দশ কৌতূহলী লোক এসে জুটে পড়েছে।

মানসী বিহ্বলভাবে বলে, "দুজনে ধরাধরি করে তাহলে—"

"দুজন লাগবে না। ওজন কোথা?"

প্রফেসর একাই তাকে তুলে ধরে ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যান। পিছন পিছন উদ্‌ভ্রান্তের মতো মানসী।

রাস্তারই একটা লোক কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে মোট দুটো রাস্তা থেকে তুলে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর ছুটোছুটি।

ডাক্তার আসে, ওষুধ আসে, আসে চিকিৎসার নানাবিধ উপকরণ। কোন ফাঁকে সন্ধ্যারাতটা মধ্যরাতে গিয়ে ঠেকে, খেয়াল থাকেনা দু'জনেরই। খেয়াল ফেরে তখন, যখন পরপর দু'টো ইন্‌জেকশন দেবার পর ডাক্তার বিদায় নেন, আপাততঃ অভয় দিয়ে।

এতোক্ষণ মানসী যন্ত্রের মতো আদেশ পালন করে চলেছিলো ডাক্তারের আর প্রফেসরের, উত্তর দিচ্ছিলো তাঁদের প্রশ্নের। এতোক্ষণে নিজে থেকে কথা বলে। বলে, "অনেক তো হলো, এবার বাড়ি যান।"

"বাড়ি যাবো? বাড়ি যাবো কি বলুন?"

একদিনকার অসতর্ক 'তুমি' আবার বাড়ির নির্জনতায় বোধকরি আতঙ্কেই 'আপনি'কে আশ্রয় করেছে।

একান্ত নির্জন একখানা বাড়িতে যদি দু'টি নরনারীকে কেবলমাত্র মুখোমুখি বসে থাকতে হয় খানিকটা দূরত্ব রেখে, যদি নিজেদেরকে বন্দী রাখতে হয় সংযমের সীমায়, তবে তার একমাত্র শক্তির আশ্রয় তো এই 'আপনি'। 'তুমি' যে বাঁধভাঙার সর্বনাশা বন্যা!

তাই প্রফেসর মানসীর কথায় মুখ তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "বাড়ি যাবো কি বলুন?"

"বাড়ি যাবেন না? বাড়ি যাবেন না মানে?"

মানসীকে কি ভূতে পেয়েছে? তাই অকারণ অমন ভয়ব্যাকুল মুখ তার, অদ্ভুত এই ভদ্রতাবোধহীন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন?

প্রফেসর কিন্তু এ তীক্ষ্ণতায় বিচলিত হন না। ওষুধপত্রগুলো টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে নির্লিপ্তভাবে বলেন, "মনে হচ্ছে, আজ আপনাদের একা রাখা চলে না।"

"কেন চলে না? এই তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

"তা'হোক!"

"তা'হোক মানে কি?" মানসী যেন এবার নিজে হাল ধরতে চায় বানচাল নৌকোটাকে সোজা করতে। তাই চটপট বলে, "অনেক ভুগলেন, আর কষ্ট করতে হবে না। রাতের আর কতোটুকুই বা আছে, এটুকু একা থাকতে খুব পারবো আমি।"

"আপনার পারাটাই তো সব নয়।"

"কিন্তু আপনি ঠিক বুঝছেন—"

"ঠিকই বুঝছি। আপনিই আপাততঃ ছেলের অসুখে অবুঝ হয়ে পড়েছেন।"

মানসী অবুঝ হয়ে পড়েছে? হায় ঈশ্বর, মানসীর মতো এতো বুঝমান জগতে কে আছে? বুঝমান বলেই তো বুঝছে—প্রফেসরের এই সহজ প্রস্তাবটা কতো ভয়ঙ্কর! কিন্তু সে কথা কি উচ্চারণ করা যায় এই নির্মল পবিত্র মানুষটার সামনে? কেমন করে বলবে,

সমাজের আইন বড়ো কড়া ! একমাত্র ছেলে রোগে শয্যাশায়ী বলেই যে মানসীর এতোবড়ো একটা বেআইনী কাজ সমর্থন করবে, সমাজ এতো আহম্মুখ নয়। তা'ছাড়া সেটাও তো সব নয়। যেটা প্রথম যেটা প্রধান, সে হচ্ছে ফুলটুশ !

ফুলটুশ যদি প্রথম চোখ খুলেই আবার তার সামনে জীবনের শনিকে দেখতে পায় ? না না, সে হতে দেবে না মানসী। তাই শান্তভাবে বলে, "না, না, অবুঝ উতলা হওয়া স্বভাব আমার নয়, ঠিক কথাই বলছি আমি, এবার বাড়ি যান। খাওয়া পর্যন্ত হলো না কি অন্যায় বলুন তো ?"

"একটা বেলার খাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, কেমন ?"

"কি মুশকিল, তাই কি বলছি ? বলছি, দরকার তো নেই আর। বেশ শান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ও, জ্বরও নেমেছে। তবে কেন মিছিমিছি আপনি—"

"মিছিমিছি তো নয়। সত্যি সত্যিই আমি ! যাক্ অনেক ভদ্রতার নমুনা তো দেখানো হয়েছে আপনার, বক্তব্যগুলোও সব বলা হয়ে গেছে আশাকরি ? এবার একটা কাজ করে ফেলুন দেখি। আপনার হিটারটা জ্বেলে দু' পেয়ালা কফি তৈরি করে ফেলুন। কফি খেলে বুদ্ধি পরিষ্কার হয় জানেন তো ?"

এতো দুঃখের মধ্যেও মুখে হাসি এসে যায়। কী পোড়ামুখ মানসীর ! ছি ছি ! হেসে ফেলেই আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে মানসী বলে, "তাহলে সেই দু'পেয়ালাই আপনার খাওয়া উচিত, কারণ আপনার বুদ্ধিটাই পরিষ্কার হওয়া দরকার বেশি।"

"কেন, বাড়ি যেতে চাইছি না বলে ? এখানে থাকতে চাইছি বলে ?" সরাসরি প্রশ্ন করেন প্রফেসর, পরিষ্কার গলায়।

"যদি বলি, এতোক্ষণে একটু বুদ্ধিসম্পন্ন কথা বলেছেন !"

প্রফেসর হঠাৎ একেবারে মানসীর সামনে এসে দাঁড়ান, তিরস্কারের মতো সুরে বলেন, "এতো ভয় কিসের ? মানুষ কি জানোয়ার ?"

কেঁপে ওঠে মানসী, এই নিতান্ত কাছাকাছি অভূতপূর্ব অনুভূতিতে,

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "মানুষের তৈরি আইনগুলো অনেকটা জানোয়ারদের মতো কিনা!"

"অবস্থা বুঝে সে আইন অগ্রাহ্য করা চলে।"

"সবাই তো গ্রাহ্য করেই চলেছে।"

"সবাইয়ের কথা জানিনা, আমি শুধু নিজের কথাই জানি। আর সেই জানা থেকেই যা কিছু বিবেচনা আমার।"

তবু শেষ চেষ্টা করে মানসী, "বাঃ বেশ, আর একজায়গায় যে কি রকম অন্যায় হয়ে যাচ্ছে! .আপনি না ফিরলে আপনার বাড়িতে সবাই কিরকম দুশ্চিন্তায় পড়বেন বলুন তো?"

"বাড়িতে? বাড়িতে আমার বিরহে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, এমন লোক বিশেষ নেই।"

"কি যে বলেন! বিরহে কাতর না হলেও দুশ্চিন্তা হবে না? ধরুন রাস্তায় কতো রকম বিপদ রয়েছে।"

"সেটা অবশ্যই। তা'র সমাধান করতে ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারি থেকে একটা ফোন্ করে দিয়েছি বাড়িতে।"

"করে দিয়েছেন!"

মানসীব কণ্ঠে এ কী সুর? আশার, না হতাশার? শুনতে হতাশার মতোই লাগলো বটে, "উঃ কী কাজের লোক আপনি!"

"হ্যা। ভীষণ কাজের লোক। এবার আপনি একটু কাজের মেয়ে হয়ে পড়ুন। খুব ভালো লাগবে এখন এক পেয়ালা কফি খেলে। খেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ও ঘরে গিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

ঘুমোবার চেষ্টা। ওঃ! মানসী যেন আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে। কথা কইতে কইতে ভুল হয়ে যাচ্ছিলো, কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে সে, কি জন্যে এই কথা কাটাকাটি! পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেই মাটিধুলোর স্পর্শ লাগে কথায়।

"প্রফেসর সেন!" গাঢ় গম্ভীর স্বর মানসীর। প্রফেসর চমকে তাকান। এ সম্বোধন আজ বড়ো অপরিচিত ঠেকে। কি নামে তবে সম্বোধন করে মানসী?

কে জানে! মনে পড়ছেনা—কিছুতেই মনে পড়ছেনা। কোনো নামেই কি সম্বোধন করে?

"বলুন!"

"আপনি আমাকে মাপ করুন। সমাজের আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারি, কিন্তু অগ্রাহ্য করতে পারিনা আমার ছেলেকে। ঘুম ভেঙে উঠে ও আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবে না।"

প্রফেসর চকিত হয়ে তাকান।

যেন হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য নতুন ভাষা শুনলেন। "কি বলছেন?"

"যা বলবার বললাম তো! এ কথা দু'বার বলা বড়ো শক্ত।"

প্রফেসর সেনের নির্মল প্রশান্তির ওপর সহসা যেন একটা দাঁত খিঁচিয়ে ওঠা ভূতের ছায়া পড়ে।...ওঃ তাই! তাই! তাই সেই দুরন্ত জ্বরগ্রস্ত রোগী অমন করে ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছিলো তখন! যে যাওয়াটাকে প্রফেসর সেন কেবলমাত্র জরতপ্ত মস্তিষ্কের খেয়াল ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন! কিন্তু এও কি সম্ভব?

শুধু অতোটুকু ছেলে বলেই নয়, সুখময়ের ছেলে বলেই অবাক হয়ে যান প্রফেসর। অবাক হয়ে যান মানসী শুধু তা'র মা বলেই নয়, মানসীর মতো মর্যাদাময়ী মা বলে। কিন্তু অবাক হওয়াটা প্রকাশ করা চলে না। প্রফেসব সরল হতে পারেন, অবোধ নন:

নিশ্বাস পড়লো একটা। "এটা কি একান্তই সত্য?"

"একান্তই সত্য।"

"কোনোদিন তো বলেন নি?"

"কোনোদিন তো বলবার প্রয়োজন হয়নি।"

"তা' বটে!" প্রফেসর চিন্তা করতে থাকেন·· তাই মানসী অমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলো! তাই অমন ব্যাকুল প্রতিবাদ করে উঠেছিলো।

"তা'হলে আর কি করা যায়! বিধাতাই দেখছি আপনার প্রতি বিমুখ। না দিলেন আপনাকে মাঝরাতে কফি খাওয়ার আরামটা বুঝতে, না দিলেন ঘুমোতে।"

কফি! তাইতো!

মানসী আরো অনেক ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে, "ও কি? এখুনি চলে যাচ্ছেন না কি? কফিটা হোক না!"

"ভাগ্যে নেই। মাফ করবেন!"

"সে কি! সে হতেই পারে না। আপনাকে অন্তত আর একটু বসতেই হবে!"

"অর্থাৎ অতিথি সৎকারের লেশমাত্র ত্রুটি না থাকে, কেমন?"

"সেইটুকুই যদি সব মনে কৱেন, তো তাই।"

"কি মনে করি সে কথা থাক, আর এটাও আজ থাক! মাঝরাতে কফি খাওয়াব সুর আর বাজছে না মনের মধ্যে!···একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকবেন, ডাক্তারবাবু বলে গেছেন জ্বরটা 'ফল্' করবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে। খুব বেশি নেমে যেতে পারে, তাছাড়া— খুব উইক! আচ্ছা তা'হলে—"

বোধকরি জুতোটা সংগ্রহ করতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন প্রফেসর। এরপর কি আবার মুখ ফুটে বারণ করবে মানসী? বলবে না, না, এতোক্ষণ যা বলেছি সব ভুল, তুমি থাকো, তুমি থাকো! তুমিই যে এখন মানসীর একমাত্র ভরসাস্থল!'

না, তা' বলা যায়না। কিন্তু কফি।

"ওষুধগুলোর কথা ভালো করে মনে রেখেছেন তো? চলুন দোরটা দিয়ে দেবেন।"

মানসীর চিন্তায় বাধা পড়ে, নিঃশব্দে অনুসরণ করে সে প্রফেসরকে।

কিন্তু রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে দাঁড়াতেই একটা তীব্র যন্ত্রণা ব্যাকুল করে তোলে তাকে। এ কী! এই ব্যক্তির দু'টোর সময় অভুক্ত লোকটাকে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে মানসী কেবলমাত্র নিজের সুনাম রক্ষার প্রয়োজনে? ওর বাড়ি যে এখান থেকে তিন ক্রোশের ব্যবধানের! কি উপায়ে এতোটা রাস্তা পাড়ি দেবে ও, এই যানবাহনহীন গভীর রাতে?

"শুনুন।" প্রফেসর রাস্তায় নেমে ফিরে তাকালেন।

"কিসে যাবেন ?

"কিসে ? ওঃ গাড়ীর কথা বলছেন ? দেখি, ভাগ্যে কি জোটে ?" মৃদু হাসলেন প্রফেসর।

"আমার কথাটাকে কি আর কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারিনা ?"

"ফিরিয়ে তো নিলেনই !"

"তবে ?"

"ওইটাই পাথেয় থাকলো ! যান, দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে যান ! দেরী করবেন না, ছেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে খুঁজতে পারে।"

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে মানসী, আর ফুলটুশ হঠাৎ ঘুম ভেঙে খুঁজতে পারে সে কথা ভুলে সন্ধ্যাবেলার আশ্রয় বাইরের এই ঘরটাতেই বসে পড়ে মেঝের ওপর। কি আশ্চর্য ! 'সঞ্চয়িতা' খানা এখনো উপুড় হয়ে পড়ে আছে !

এই ক'ঘন্টার মধ্যে কি ওলটপালট কাণ্ডই হয়ে গেলো !

ফুলটুশের অসুখটা কি বিধাতার পরিহাস ? সুখময়ের অসুখের সময় অনবরত যাকে খুঁজেছিলো মানসী, তাকেই সাক্ষী রেখে বিধাতা এই প্রচণ্ড পরিহাসটা পাঠালেন মানসীকে।

এমনি একটা কিছুই কি তবে চেয়েছে মানসী ? একটা অভাবনীয় কিছু, আকস্মিক একটা কিছু, ভয়ানক একটা কিছু। যাতে সমস্ত বাধা বাঁধন ভেসে যাবে, ভেসে যাবে সমস্ত বিচার বিবেচনা !

মানসীর সেই কুৎসিৎ অপবিত্র বাসনার ফলেই এমন করে বাণখাওয়া পাখির মতো লটকে এসে পড়লো ছেলেটা। মানসী কি তবে খুব ভয়ঙ্কর পাপী ? নিজেকে কেবলই নির্দোষ সাজিয়ে সাজিয়ে পার পেয়ে যেতে চায় সে ! এইবার তার সত্যকার শাস্তির সময় এসেছে ! ফুলটুশও চলে যাবে সুখময়ের মতো !

অভিমানী ফুলটুশ ! মাতৃস্নেহহারা ফুলটুশ। অবোধ অজ্ঞান বেচারা ফুলটুশ !

ফুলটুশ মরে যাবে ! সুখময়ের মতো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হঠাৎ প্রায় শব্দ করে কেঁদে উঠে তীরের মতো ছুটে চলে যায় মানসী ও

ঘরে, যেখানে অজ্ঞান অচৈতন্যের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে ফুলটুশ, ওষুধের প্রভাবে। কিন্তু মানসী এ কী করেছে! কেন করেছে এমন ভুল। যে ঘরে সুখময়ের রোগশয্যা পাতা হয়েছিলো, কেন সেই ঘরে সেই জায়গায় ফুলটুশকে শুইয়েছে সে! মানসী কি তখন পাগল হয়ে গিয়েছিলো!

কালই ছেলেকে ঘর বদলে শোয়াবে মানসী। প্রফেসর সেন এলেই বলবে সাহায্য করতে, অকপটে স্বীকার করবে তার এই মানসিক দুর্বলতা। মেয়েমনের দুর্বলতা, ভীরু মাতৃমনের দুর্বলতা!

প্রফেসর সেন! কিন্তু সে কি আর আসবে?···ঘুরে গেলো চিন্তার মোড়। বসে বসে মনে করতে চেষ্টা করলো কি যেন একটা ভয়ঙ্কর কথা বলেছিলো না তাকে মানসী? সেকথা শুনে সেই নির্মল প্রশান্তি আঁকা মুখের ওপর গভীর কালো একটা ছায়া এসে পড়েছিলো না?

ছি ছি মানসী কেন এমন করে হার মানলো?

কেন একেবারে সাধারণ মেয়েদের মতো হয়ে গেলো? কেন সেই উন্নত হৃদয়ের বিশ্বস্ততার দায়িত্বটা বহন করবার সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারলো না? কেন তার মতোই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারলো না—ঠিক বলেছেন আসুন, এক একজনে দু'পেয়ালা করে কফি খেয়ে পালা করে রাত জাগা যাক। কেন বলতে পারলো না যেতে চাইলেই বা আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে? কেন পারলো না অসাধারণ হয়ে উঠতে, অসামান্যা হয়ে উঠতে?

ফুলটুশের বিরক্তি? সে তো মানসীর চিরজীবনের সঙ্গী, চিরদিনের সম্বল। ততোবড়ো মূল্য দিতে পারলেই না অসামান্যা হয়ে উঠতে পারতো মানসী! কিন্তু অসামান্যা হবার শক্তি কি মানসীর মধ্যে সত্যিই আছে? তা থাকলে সমস্ত চিন্তা হারিয়ে তার মেয়ে মনটুকু শূন্যে মাথাকুটে মরছে কেন কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত মানুষটার সামনে একপাত্র পানীয় ধরে দিতে পারেনি বলে? হায় হায়! কেন মানসী সেইটুকু দিয়ে তবে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেনি!

'তোমার তো মা আছেন। তোমার তো মা আছেন!'

রেলগাড়ির অবিরাম শব্দ-ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে যে শব্দ ক'টি জ্বরাচ্ছন্ন মাথার মধ্যে অবিরত ঘা মারছিলো, সে শব্দটা হঠাৎ থেমে গেলো কেন? কখন গেলো? আচ্ছা, সব শব্দই না কখন এক সময় যেন জমাট হ'য়ে গিয়েছিলো একটা অন্ধকারের পিণ্ডের মধ্যে? অচৈতন্যের অন্ধকার, অনুভূতির আর অবলুপ্তির অন্ধকার! কিন্তু সে অন্ধকার ক্রমশঃ যেন ফিকে হয়ে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে আলোর স্ফুরণ! অবলুপ্তির অসাড়তায় চৈতন্যের সাড়! জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অনুভূতিটা কেমন একটা বোবা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। ঠিক মনে পড়ছে না কিসের বিতৃষ্ণা, অথচ সে বিতৃষ্ণার 'বিস্বাদ যেন মন থেকে জিভে পর্যন্ত লাগছে!

চোখ খুলে তাকালো ফুলটুশ।

দেখলো সকালের আলো এসে পড়েছে জানালা দিয়ে, দেখলো আজন্মের পরিচিত পরিবেশের মাঝখানে শুয়ে রয়েছে সে!

আবার চোখ বুজে হাতড়াতে লাগলো সে জমাট অন্ধকারের ওপারটায়। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। হ্যাঁ মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে। মনে পড়েছে সেই আগুনের রঙে আঁকা পৃথিবীর কুশ্রীতম দৃশ্যটা। মুখোমুখি বসে থাকা দু'টি প্রাণী! এর চাইতে কুশ্রী দৃশ্য জগতে আর কি আছে!

দরজাটা ঠেলে খোলার সঙ্গেসঙ্গেই চোখে পড়েছিলো এই কুশ্রী ছবি, আর মুহূর্তের মধ্যেই সে আগুন দপ্ করে ছুটে এসে মাথার মধ্যে সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলো দাউ দাউ করে।

এবার সবই মনে পড়ছে। আবার মনে জ্বালা ধরে উঠলো। আর জ্বালা ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সে·উঠে বসতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শরীরে কুলোলো না! বসতে পারলো না! মাথাটা তুলেই ধপ করে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শুয়ে পড়লো আলাদা একটা অনুভূতি নিয়ে। ও কে? ও কে? নীচেয় শুয়ে রয়েছে কে?

কাল রাতের সেই কুশ্রী প্রাণী দু'টোর একটা না?

কিন্তু কই, দেখে এখন আর তেমন আগুন জ্বলে উঠলো না তো! বালিশটা টেনে নিয়ে খাটের ধারে মাথাটা এনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ফুলটুশ।

শুধু মাটিতে বিনা বালিশে গুটিয়েসুটিয়ে ছোট্ট হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মানুষটা, কেমন যেন অসহায়ের মতো! ওর মুখের ভাবটা অতো দুঃখী দুঃখী কেন? বিষাদের অভিনয়? ঘুমন্ত মানুষ কি অভিনয় করতে পারে?

ওর নিরাভরণ হাত দু'খানা অতো রোগা কেন? অতো ময়লাই বা হলো কবে ওই হাত আর ওই মুখ? এই হাত দু'খানায় এক সময় অনেকগুলো চকচকে ঝকঝকে কি সব বালাটালা পরা থাকতো না? তখন কি এই রকম দেখতে ছিলো হাতটা? নাঃ এখন অদ্ভুত রকম বদলে গেছে! যে দু'খানা হাত অহরহ এ সংসারের সর্বত্র ক্ষিপ্র-কুশলতায় ধুলো আর মালিন্যের সঙ্গে লড়াই করে বেড়াতো, সেই নিটোল ফরসা, চকচকে গয়নাপরা হাত দু'খানার সঙ্গে এ হাতের কোনো মিল নেই! ওই ঘুমন্ত মলিন মুখটারও কোনো মিল নেই, সেই অহরহ হাস্যে আর ভ্রূকুটিতে, তিরস্কারে আর বাক্‌চাতুর্যে উজ্জ্বল মুখটার সঙ্গে! কে সে? ফুলটুশের মা।

কিন্তু এ মা ফুলটুশের অপরিচিত! এর জন্যই বুঝি ওরা বলেছে 'তোমার তো মা আছেন'।

মা! মা? হারানো সেই ক'টা শব্দ আবার ফিরে আসতে চাইছে। মনে পড়েছে—বারে বারে ধ্বনিত হচ্ছে 'তোমার তো মা আছেন।' 'তোমার তো মা আছেন।' কথাটাতো ভুল নয়। ওই তো মা ফুলটুশের! তবে কি এতোদিন ধরে ফুলটুশেরই কোথাও একটা ভয়ানক ভুল হচ্ছিলো?

মা! এই শব্দটা কতোদিন উচ্চারণ করেনি ফুলটুশ? অথচ একদিন তো করতো? কারণে অকারণে কাজে অকাজে সর্বদাই উচ্চারণ করতো। সে কবে? কতো যুগ যুগান্তর আগে? একবার কি চেষ্টা করে দেখবে এখনো উচ্চারণ করতে পারে কি না!

নিতান্ত সন্তর্পণে, খুব আস্তে!

চমকে চোখ খুলে তাকালো মানসী।

কে ডাকলো বহুদিনের ভুলে যাওয়া একটা নামে। ফুলটুশ? 'মা' বলে ডাকলো ফুলটুশ?

"ফুলটুশ!" গাঢ় মৃদুস্বর! সেই স্বরই যেন একখানি করতল হয়ে আস্তে আস্তে কপালের উপর নেমে এলো! পাছে হাতটা বিরক্তির ঠেলা খেয়ে কপাল থেকে খসে পড়ে তাই ভয়ে ভয়ে আলগোছে।

না পড়লো না। আস্তে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অনুভব করা সম্ভব হচ্ছে উত্তাপ অনেক কম।

কথায় আবেগ প্রকাশ মানসীর কখনই আসে না। ছেলের ভয়ে তো আরোই শুকিয়ে গিয়েছিলো। সমস্ত আবেগসমুদ্রকে কষ্টে সংহত রেখে প্রায় সহজ সুরে উচ্চারণ করলো, "এখন কেমন লাগছে রে?"

"ভালো!"

ভালো! ফুলটুশ, মানসীর ছেলে, একথা উচ্চারণ করলো! মানসীর হাতটা ঠেলে ফেলে দিলো না, মানসীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো না, সহজ সাধারণ মানুষের মতো শুধু একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো 'ভালো'! হাতে চাঁদ পেতে তবে আর বাকী কোথায় মানসীর! এখন, এখন যদি মানসীর আর সমস্ত পৃথিবী শূন্য হয়ে যায় তবু মানসী টিঁকে থাকবে, বেঁচে থাকবে।

"বড্ডো কাহিল লাগছে না রে?"

"কাহিল? তা একটু লাগছে!"

আশ্চর্য! আশ্চর্য! মানসী কি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কোনো অলক্ষ্য দেবতার বর পেলো? তাই তা'র ছেলে একেবারে সহজ হয়ে গেলো! যে ছেলে মায়ের সস্নেহ প্রশ্নে নিতান্ত সহজে স্বীকার করে ফেলতে পারে—হ্যাঁ অসুখ করে একটু কাহিল লাগছে তা'র!

এতো সুখ মানসী রাখবে কোথায়?

তা' ফুলটুশেরও যেন হঠাৎ এটা ভালো লেগে যাচ্ছে, এই সহজ

হ'তে, স্বাভাবিক হ'তে। ইচ্ছে হচ্ছে এই দুঃখী দুঃখী মুখ আর ময়লা হয়ে যাওয়া রোগারোগা নিরাভরণ হাতওয়ালা মানুষটার প্রাণের একটু কাছাকাছি গিয়ে বসতে।

'যেখানে ঘৃণার সাথে
নিজে সে আপন হাতে লেপিয়াছে কালি—'

কে জানে কাছাকাছি পৌঁছলে হয়তো দেখা যাবে সেখানটা পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার আলোভরা। ফুলটুশের নিজের ঘৃণা আর সন্দেহের ছায়াই অন্ধকার করে তুলেছে জায়গাটাকে.

"তেষ্টা পেয়েছে?"

"তেষ্টা? না, কই?"

"বড্ডো জ্বরটা গেলো কি না, বিস্বাদ হয়ে আছে জিভটা। মুখটা একটু ধুইয়ে দিই, তারপর জল খেতে ভালো লাগবে।"

তাড়াতাড়ি মুখ ধোওয়ার সরঞ্জাম আনতে গেলো মানসী। কবে জ্বর হয়েছে, কখন কি ভাবে গাড়িতে উঠেছে, কেউ সঙ্গে আসেনি কেন, এসব কোনো প্রশ্ন করলো না, তুললো না এ অভিযোগ যে, মানসীর চোখের আড়ালে যথেচ্ছাচার করেই অসুখ বাধিয়েছে সে। টিট্‌কারির হাসি হেসে বললো না, "কেমন? শখ মিটেছে তো?"

শুধু কৃতার্থমন্যের মতো সেবায় তৎপর হয়ে উঠলো।

আরও একবার মনে হলো ফুলটুশের, আগাগোড়াই কি তা'হলে ভুল করে এসেছে সে? নইলে পার্টির ওরা, যারা স্ট্যাম্পকাগজে বণ্ড সই করেছে 'আমি কারো নই, কেউ আমার নয়. আমি কেবল মাত্র পার্টির'—তা'রাও কেন অসুখের সময় কষ্টের সময় নিতান্ত সহজে বলে, "সেকি? তুমি যথেচ্ছাচার করবে কি বলে? তোমার যে মা আছেন!" মা থাকা, তা'হলে একটা সত্যিকার কিছু থাকা?

গরম জল আর মুখ ধোওয়ার জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকলো মানসী। অভ্যস্ত নিপুণতায় বিছানার কাছে একটা টুল এনে রাখলো, রাখলো তোয়ালে, কাচের গ্লাস, এনামেলের গামলা; আনলো ফুলটুশের ফরসা জামা পাজামা। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও এসব অনুভব

করতে পারলো ফুলটুশ।

"জলটা লাল যে? কী এ?"

"পেয়ারাপাতা সেদ্ধ জল, দেখ মুখ ধুয়ে, খুব আরাম লাগবে!"

"হঠাৎ পেলে কোথায়?"

"আমাদের গয়লার ছেলেটাকে ধরলাম, ওদের খাটালের ওখানে পেয়ারা গাছ আছে বলেছিলো একদিন।"

"বাবাঃ! এতোর মধ্যে তাই মনে পড়লো তোমার?"

অগত্যাই মানসীর মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে নিতে হয়। এতেও যদি চোখে জল এসে না পড়ে তো' কিসে পড়বে!

"হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে খুব জ্বালাতন করলাম তোমায়।"

"তা করলি! কুটুম্বর জামাই, খামোকা আমায় ভোগাতে আসা কেন বাপু, দেখো দিকি অন্যায়!" হাসতে হাসতে চলে গেলো মানসী, ওঘরে গিয়ে চোখটা মুছে নিতে। স্নানের জলে চোখের জলও কিছু মিশলো। তবে তো মানসীরই দোষ!

মানসীর মানসিকতাকে মানসী পাপ বলে স্বীকার না করলেও, অন্যায় বলে না মানলেও, নিশ্চয় পাপ হচ্ছিলো তার, হচ্ছিলো অন্যায়! নইলে মাত্র যে মুহূর্তে সে দমন করতে পেরেছে লোভকে, পেরেছে দুর্বলতা জয় করে মনকে শক্ত করতে, গভীর রাত্রির অসহায় পরিস্থিতির মাঝখানে পেরেছে আপন হৃদয়কে ঘরের দরজা খুলে পথে বার করে দিতে, সেই মুহূর্তেই তো এতো বড়ো সম্পত্তিটা করায়ত্ত হয়ে গেলো মানসীর!

এ যেন ভাগ্যবিধাতা প্রত্যক্ষ রূপ ধরে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেলেন মানসীকে—দেখো কোন্‌টা শ্রেয়। না আর ভুল করবে না মানসী, আর না।

এতো বড়ো আশ্রয় পেয়ে গেছে সে, আর শূন্যতা কোথায়? এবার সহজ জীবনের পালা। আবার ভালো করে সংসার করবে মানসী, করবে রান্নাবান্না, বড়ি, আচার, আমসত্ব। ঝাড়বে ঘরদোর, বিছানাপত্র, পূরণ করে নেবে এতোদিনকার ঔদাসীন্যের ত্রুটি।

আর, আর হয়তো বা একদিন ফুলটুশের বিয়ে দিয়ে ঘরে আবার শ্রী ফিরিয়ে আনবে। আবার এ বাড়ির ছাতের আলসেয় শাড়ি শুকোবে, আবার এ বাড়িতে শিশুকণ্ঠের শব্দ ধ্বনিত হবে। সেই-তো ভালো, সেই তো স্বাভাবিক, সেই তো জীবনের সুস্থতা।

যে অস্বাভাবিক জ্বরের ঘোরে কতোগুলো দিন অপচয় হয়ে গেলো মানসীর, সে জ্বর বোধ হয় এতোদিনে কাটলো।

ঈশ্বরের করুণা বুঝি এই ভাবেই আসে।

বারবার করে স্নান করলো মানসী, যেন এই স্নানের মধ্য দিয়েই দেহ মনে অণুপরমাণু পর্যন্ত শুচি করে নেবে।

শুধু স্নান সেরে এসে ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অজ্ঞাতসারে একটা নিশ্বাস পড়লো, অতর্কিতে একবার মনে হলো, শুধু যদি তখন হিটারটা জ্বেলে কফিটা তৈরী করতো! তা'হলে বোধকরি আর কোথাও কোনোখানে আক্ষেপের লেশমাত্র থাকতো না!

দেবতা যখন প্রসন্ন হ'ন, তখন বোধকরি সবদিক থেকেই অনুকূল হাওয়া আসে। না হলে যখন মানসী ফুলটুশের জন্যে কিছু ফল আনানোর জনে ননীর মাকে নির্দেশ দিচ্ছে, এবং বারবার অবহিত করিয়ে দিচ্ছে শস্তার দিকে না ঝুঁকে সে যেন ভালো জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেয়, ঠিক সেই সময় গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেশটা কাঁধে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো মূর্তিমান কেষ্টচন্দ্র!

"কিরে কেষ্ট! তুই এসে গেছিস? বাঁচলাম বাবা! তা এখুনি এলি যে?"

এতোটা সাদর অভ্যর্থনার জন্যে কেষ্ট বোধকরি প্রত্যাশিত ছিলো না, তাই দেশের পোঁচ-লাগানো রোদে পোড়-খাওয়া কালো শীর্ণ মুখে একটি আকর্ণ হাসি হেসে কেষ্ট "চলে এলুম" বলে টিপ্ করে এক প্রণাম করলো। পায়ের ধুলো অবশ্য নিলো না, জানে রেলের কাপড়ে ওটা অচল।

"তারপর? ছিলি কেমন? চেহারা তো একেবারে রাজপুত্তুরের মতো ক'রে এসেছিস।"

"তা' আর হবে না ?" কেষ্ট কৃতার্থমন্যের তৈলাক্ত হাস্যে বলে, "দেশে কি আর কিছু ঠিকঠাক থাকে ? কখন নাওয়া কখন খাওয়া, দিনভোর রোদে টো টো করে ঘুরুণী !"

"তা বেশ, তা'তেই তো তোদের খুব শান্তি ! নে, এখন চানটান করে নে।"

ননীর মা বলে, "আমি কি তা'হলে আর বাজারে যাবোনা মা ?"

"ওমা সে কি ? এখন যেমন যাচ্ছো যাও। কেষ্ট এখন নাইবে, জল খাবে, তবে তো ! দাদাবাবুকে তো এখুনি কিছু খেতে দিতে হবে।"

"দাদাবাবু এয়েছে ?" সচকিত প্রশ্ন করে কেষ্ট।

"এয়েছে বলে এয়েছে !" কেষ্টর প্রশ্নের উত্তর দেয় মানসী "একেবারে হুড়মুড়ে জ্বর নিয়ে এয়েছে।"

"অ্যাঁ ! যা ভেবেছি তাই। সারারাত গাড়িতে চোখে পাতায় এক নেই, ভাবতে ভাবতে আসছি, কি জানি গিয়ে মাকে বা কেমন দেখি, দাদাবাবুকেই বা কেমন দেখি !"

মনের অগোচর পাপ নেই। দেশে তিষ্টোতে পারেনি কেষ্ট, সারা গাড়ি ভাবতে ভাবতে আসছে কি জানি গিয়ে মানসীকে দেখতে পাবে কি না ! কে জানে কেষ্টর বোকামির ফলে ফাঁকা বাড়ির সুযোগে, বাড়ির গিন্নি ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে কি না ! বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছিল তার। সে জায়গায় নিত্য পরিচিত ধোয়ামোছা নির্মল পরিবেশের মাঝখানে এই সদ্যস্নাতা শুভ্র বৈধব্যের মূর্তিটি দেখে চোখ মন প্রাণ সব কিছু জুড়িয়ে গেলো তার। আর মনে মনে শতবার নিজের কান মললো। ছি ছি ! কালই সে কালীঘাটে পুজো দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে।

মানসীও এই কালো শীর্ণ পরিতৃপ্ত হাসিভরা গাঁইয়া ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। এই কি কম দুর্লভ ? এতো রয়েছে মানসীর ! এদের এই শ্রদ্ধার আসন থেকে নেমে পড়ে কোথায় ছুটেছিলো মানসী ?

"দাদাবাবুর জ্বর হলো কবে ?"

"কবে তা' তো জানিনা বাপু, কাল রাত্তিরে একেবারে টলতে টলতে এসেই শুলো।"

পরবর্তী সংবাদ আর কিছু উল্লেখ করলো না। মানসী বললো না ডাক্তার এসেছিলো কি চিকিৎসা হয়েছিলো। সে কথার যেন গুরুত্ব কিছু নেই, যেন না বললেও চলে।

"যাই দেখে আসি।"

"দেখবি, আগে নিজে ধাতস্থ হ' দিকি।"

"মায়ের এক কথা। আমি কি একেবারে রাজপুত্তুর হয়ে এইছি। মানুষটার যে এতো জ্বর, তা' ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হবে তো? শুধু পানফল আর বেদানা খাওয়ালেই হবে? সংসারে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই যে কিছু ব্যবস্থা হয়েছে! আমি বরং ঝট করে ও বাড়ির কাকাবাবুকে খবর দিয়ে আসি মা।"

মানসী যেন পরবর্তী প্রসঙ্গে বেঁচে যায়, প্রথম কথাটার আর উত্তর দিতে হয় না।

"তোর সর্দারি থামাবি? যা বলছি শোন্। আগে চান কর, কিছু খা, তারপর যা খুশি কর।"

"আহা কেষ্টর চানটাই বড় হলো।" ব'লে সন্তর্পণে দালানে উঠে পা টিপে টিপে ফুলটুশের ঘরে উকি দেয় কেষ্ট।

"ও ঘরে না রে, এ ঘরে।"

"এ ঘরে! তা'হলে তো আর চানের আগে ঢোকা চলবে না।" ব'লে দরজা আড়াল করা ভারী পরদাটার এদিক থেকে ওদিক থেকে একটু উকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে সরে এলো কেষ্ট।

ফুলটুশ তখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে। কতকটা ক্লান্তিতে কতকটা শান্তিতে।

কেষ্ট চানের চেষ্টাতে যেতেই মানসী আস্তে আস্তে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো। না, ফুলটুশ টের পাবে না, ঘুমোচ্ছে কাদার মতো। টেবিল থেকে ওষুধের শিশি, পুরিয়া, কাঁচের গ্লাস ইত্যাদি ক'রে ডাক্তার আসার সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে তুলে রাখলো চাবি বন্ধ ড্রয়ারটার মধ্যে।

ছেলের ঘুমন্ত মুখটা দেখলো আর একবার। তেমনি ঘুমোচ্ছে। ঘর বদলাবার কথাটা একবার মনে এলো, কিন্তু দিনের আলোয় রাতের ভয়টা তেমন মাথা তুলে দাঁড়ালো না! এইতো সকালের আলো-ঝলসানো পরিচিত ঘর, এ ঘরের কোথাও কোনোখানে তো মৃত্যুর ছায়া গুঁড়ি মেরে বসে নেই। তবে ভয় কি? থাকুক, থাকুক ছ'দিন, মানসীর ঘরেই থাকুক ছেলেটা, যেমন থাকতো ছোটবেলায়। প্রসন্ন-মনে চলে এলো রান্নাঘরে। উনুনটা জ্বলে যাচ্ছে।

সকালে ভেবেছিলো নিজের জন্যে আর রান্নার হাঙ্গামা করবে না, সে আর চলবে না, কেষ্ট এসেছে। ভাত চড়িয়ে দিলো, দিলো তার মধ্যে ছোট্ট একটা নেকড়ার পুঁটুলি করে ভাজা মুগের ডাল ফেলে। কেষ্ট মুগের ডাল ভাতে ভালোবাসে। মনটা ভারী হালকা ঠেকছে!

গতরাত্রে অনবরত ভেবেছে, যদি ফুলটুশের অসুখটা অনেক—অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কি করবে মানসী? দেবুঠাকুরপোর দলের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের স্রোতে ভেসে যাবে? না, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শুধু একজনকে আশ্রয় করে করবে যমের সঙ্গে যুদ্ধ? তাই! করবে তাই!

সেবার হার মেনেছিলো, এবারে মানবে না!

সে কল্পনার মধ্যে কেমন একটা ভয়াবহ উত্তেজনা ছিলো, সে কল্পনা, যেন মানসীকে টেনে নিয়ে চলেছিলো কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে, সেই অদৃশ্য কাঁটার তীক্ষ্ণ জ্বালায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছিলো সে। সকালের আলোয় ভাগ্যদেবতা যেন সূর্যের মূর্তি ধরে প্রসন্ন দৃষ্টি ফেললেন, ফুলটুশ চোখ মেলল 'মা' বলে ডাকলো! এলো কেষ্ট। বাচ্চা একটা গ্রাম্য ছেলে, মানসীর মাইনে করা চাকর মাত্র, তবু সে বুঝি মানসীর হিতাকাঙ্ক্ষী—অভিভাবক। মানসীর নৌকায় নোঙরের খুঁটি। মানসী যদি ভুলক্রমে ভেসে যেতে চায়, কেষ্ট রক্ষা করবে। কিন্তু গেলো কোথায় ছোঁড়া?

সদ্দারী করে দেবুর বাড়ি খবর দিতে গেলো না কি? সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

হাত চালিয়ে রান্নাটা সেরে নিচ্ছিলো, হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো! যদি সে আজও আবার আসে?

রাগ অভিমান করে কর্তব্য ত্যাগ করবে, এমন তো হতে পারে না! কাল রাত্রে অমন অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে, যে অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারছিলো না, শুধু মানসীর তাড়নায় চলে যেতে সে বাধ্য হয়েছে, সে কি করে নিশ্চিন্ত থাকবে, একটা সংবাদ পর্যন্ত না নিয়ে? এসে চুপচাপ বসে নেই তো? যেমন থাকে মাঝে মাঝে।

"ফুলটুশ একটু হরলিকস্ খা'!"

ফুলটুশ চোখ খুলে বললো, "এখন থাক!"

"থাকবে কেন? খেয়ে ফেলনা। এতটা উপোসও তো ঠিক নয়।"

"তবে দাও।" হাতটা বাড়িয়ে দেয় ফুলটুশ।

খালি গেলাসটা ফের হাতে নিয়ে ছেলের সঙ্গে শুধু একটু কথা কইবার জন্যেই কথা কয় মানসী, "ওখানে সমুদ্র কেমন রে?"

জিজ্ঞেস করতে পারে না পুরীর মতো কি না। পুরীর সঙ্গে যে অনেক প্রসঙ্গ জড়িত। ফুলটুশ যে এর আগে কখনো সমুদ্র দেখেই নি, সে কথা মনে পড়ে কি না কে জানে। ফুলটুশও সে কথা বলে না, শুধু ক্লান্ত গলাতে বলে, "সমুদ্র, সমুদ্রের মতো।"

"তা' বটে," হেসে ফেলে মানসী, "আচ্ছা তুই একটু ভালো হয়ে ওঠ সব গল্প শুনবো।"

সাহস বেড়েছে মানসীর, তাই আবার ও বলে, "কথা বলবো না বলছি, তবুও বলি—কেষ্টা মুখপোড়া এসে হাজির হয়েছে, দেখেছিস?"

"এসে হাজির মানে?" ক্লান্ত চোখে বিস্ময়।

থতমত খেয়ে গেল মানসী। আবে ফুলটুশ তো জানেই না কেষ্টর অনুপস্থিতির খবর। না বললেই হতো। কে জানে এই সংবাদ থেকে ছেলের বদলে যাওয়া মন সন্দেহে কালো হয়ে উঠবে কিনা। এখন যে প্রতি পদে ভয়, পাতার আচ্ছাদনটুকু কখন উড়ে যায়। তাই ব্যস্ততার ভানে বলে, "ও সে অনেক কথা, বলবো পরে। এখন কতকগুলো কথা শুনতেও কষ্ট হবে।"

ব্যস্ততার ভানে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আচম্‌কা দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সামনে সেই অভিশপ্ত মূর্তি!

এ কী বিবর্ণ শুকনো বিশ্রী চেহারা, এমন তো কোনোদিন দেখেনি মানসী। কোথায় ছিলো এ? সমস্ত রাত কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো? প্রশ্ন করবার আগেই ওদিক থেকে কথা আসে শ্রান্ত শান্ত স্বরে। "ডাক্তার এসেছেন!"

"ডাক্তারবাবু! ওঃ! কিন্তু আপনি কি? মানে আপনি কোথায় ছিলেন?"

"সেটা অবান্তর। ডাক্তার আসার দরকার অবশ্যই আছে। কেমন আছেন এখন?"

"একটু ভালো। ওকে আবার 'আছেন' বলে এত মান্য করবার কি আছে? চলুন—"

"ডাক্তারকে নিয়ে আসি।"

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন, ঢুকলেন না প্রফেসর। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন. মৃদু হেসে বললেন, "ঠিক আছি। যা বলবার সব আপনিই তো বলবেন।"

ডাক্তারের গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

প্রফেসরও বেরোলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে মানসী, সেই চির-পরিচিত ভঙ্গী। যখন ঘরে বসে গল্প করার চাইতেও বেশিক্ষণ গল্প হ'তো দরজায় দাঁড়িয়ে। আর সুখময় ঘরের মধ্যে বসে রসিকতা করতেন, "ছোঁড়াকে রাস্তায় বার করে দিয়ে আবার দরদ দেখানো কেন? এ যে শান্তিপুরী ভদ্রতা! আর দু'দণ্ড বসতে বললে তো পারতে?"

"আপনিও এখুনি চলে যাচ্ছেন?"

"যাই আর কি করবো!"

"ওষুধপত্রগুলো কিরকম হবে?"

যেন নিতান্তই প্রয়োজনে পড়েই মানসী ওই মানুষটাকে আগলাতে চাইছে।

"প্রেস্‌ক্রিপশন তো রইলো, আনিয়ে নেবেন। আপনার কেষ্ট তো এসে গেছে।"

"কেষ্ট এসে গেছে, আপনি জানলেন কি করে ?"

মানসীর চোখে মুখে বিস্ময়।

"কেষ্টই তো আমাকে রাস্তাব মাঝখান থেকে আবিষ্কার করলো !"

"বলেন কি। কিন্তু সত্যিই কি আপনি বাড়ি যান নি ? রাতটা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ?"

"ধরুন তাই। কেষ্ট হঠাৎ আমায় ধরলো। ওর দেওয়া নামকবণটা কিন্তু সুন্দর। বললো—বন্ধুবাবু একটা ডাক্তার মাক্তার ডেকে দিতে পারো, দাদাবাবুব খুব জ্বর। যাচ্ছিলুম ও বাড়ি খবর দিতে। তা' সে তো এখেনে নয়, আপনি যখন রয়েইছো—"

মানসী ম্লান হাসে, "কাল রাতের কথা ওতো কিছুই জানে না। আমাকে না জানিয়ে নিজেই পণ্ডিতি করে যাচ্ছিল কোথায়। ভালোই হলো, যে আপনাকে—"

"হ্যাঁ ভালোই হলো ! যাক্ খবর নিতে আসতে পারবো ?"

"কি যে বলেন ? কাল থেকে খুব রেগে আছেন তো ?"

"রেগে ? তাই হবে বোধ হয়। তবে এ নিয়ে ভেবেছি অনেক বটে। ভাবছি আপনাকে তো অনেক বিব্রতই করলাম এযাবৎ, এবারে ছুটি দিতে হবে।"

মানসী এক মুহূর্ত স্থির থেকে বলে, "আমিও তাই ভাবছি। হয়তো নিজেই বলতাম আপনাকে।"

শ্রোতার মুখটা মুহূর্তে অমন কালি মাড়া হয়ে গেলো কেন ? সে কি ভেবেছিলো, আজও পূর্ব ভঙ্গীতে চঞ্চল সুরে বলবে মানসী—ছুটিটাই যে কাম্য, তাই বা ভাবছেন কেন ? বিব্রত হতেও যে অনেকে ভালো-বাসে। না সে কথা বললোনা মানসী। আর একবার থেমে বললো, "আমিও আপনার কাছে অনেক দোষটোষ করেছি, পারেন তো—"

কথার শেষ হলো না, লোকটা উল্টো দিকে মুখ করে চলতে শুরু করেছে।

আঃ। মুক্তি! মুক্তি! আর কোনো যুদ্ধ নেই, নেই অহরহ আতঙ্কের নাগপাশ! এবার শুধু একটি সরল মসৃণ পথে জীবনটাকে ঠেলে গড়িয়ে দেওয়া! নিজের হাতের মধ্যেই ছিলো এই অগাধ মুক্তি। একথা কেন এতোদিন বুঝতে পারেনি মানসী। আজ থামলো যুদ্ধ, ঘুচলো নাগপাশের বন্ধন! কিন্তু তবু দেহমনের সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এমন মোচড় দিয়ে উঠছে কেন?

মুক্তি এতো যন্ত্রণাদায়ক?

গতরাত্রের কথা খেয়ালে নেই, আজ খেয়াল হয়েছে এ ডাক্তারের মুখ অপরিচিত। তাই ফুলটুশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, "ডাক্তার আনলো কে?"

"আর বলিসনে, কেষ্ট মুখপোড়াব কীর্তি।"

"কেষ্ট ডাক্তার ডেকেছে?"

"নাঃ, অতো ক্ষমতা নেই। রাস্তায় বুঝি প্রফেসর সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তাঁকেই ধরে করে—"

যেন প্রফেসর সেন এমন কেউ নয়, যেন নিতান্ত সহজেই তার নাম উল্লেখ করা যায়।

"হুঁ। তিনি আজও আসছিলেন বুঝি?"

"তা' তাঁকে তো এ পাড়ায় রোজ সকালেই আসতে হয়।"

হ্যাঁ অনায়াসেই এখন মিথ্যা কথা বলতে পারে মানসী, বলতে শিখেছে অনেকদিন থেকেই। এরপর হয়তো প্রতি পদেই বলবে। মিথ্যার দুর্গকেই যে এবার পরম আশ্রয় বলে মেনে নিয়েছে মানসী। তাই অক্লেশে বলতে পারে, "এদিকে কোন্ বড়লোকের ছেলেকে বুঝি পড়ান, মোটা টাকা দেয় তারা, তাই রোজ ভোর বেলা উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু। টাকার জন্যে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতেই পারে লোকে কি বলিস? যাক কেষ্টা এখন এলে হয়, ওষুধপত্রগুলো আনাব।"

"কোথায় গেছে সে?"

"ভগবানকা মালুম।" পুরনো মানসী, সহজ মানসী।

কিন্তু কি করে এতো সহজ হ'তে পারে মানসী? অদ্ভুত শক্তি! অদ্ভুত শক্তি! নিজেই নিজের শক্তির পরিচয়ে অবাক হয়ে যায় সে!

এরপর জীবনের চাকা চলে মসৃণ সমতল পথে। একজন চল্লিশের কাছাকাছি বিধবা বাঙালী মহিলার জীবনের চাকা ঠিক যেমন ভাবে চলা উচিত। কিছু দিন চলতে থাকে।

ফুলটুশ পথ্য করে। কেষ্ট বিনা নির্দেশে বাজার থেকে নিয়ে আসে পলতাপাতা আর কচি ডুমুর। মানসী রান্না করে, ছেলেকে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, কখনো গল্প করে, কখনো "না তোকে আর বকবোনা" বলে এঘরে চলে এসে শুয়ে পড়ে বাংলা খবরের কাগজ খানা হাতে করে। সকালে তো পড়ার সময় হয়ে ওঠে না।

ফুলটুশ মাকে কিঞ্চিৎ শান্তি দিচ্ছে বৈ কি! মার আর তা'র মাঝখানে শনির ছায়া দেখতে পাচ্ছে না বলেই হয়তো সহ্য করে নিচ্ছে মার একটু আদর, একটু শাসন! মুখটা যেদিন বড্ডো শুকনো লাগছে মার, বলছে, "আজ বুঝি ইয়ে একাদশী?" মানসী যখন ঝেড়ে ঝেড়ে ভিজে কাপড় জামা শুকোতে দিচ্ছে তখন বলছে, "এতো কাজ তুমি করো কেন? কেষ্ট পারে না?"

কণ্ঠস্বরে হয় তো দরদ ফুটতে দেয় না, তবু কথাটা দরদের। ময়লা হয়ে যাওয়া দুঃখী দুঃখী মুখ, আর রোগা হয়ে যাওয়া খালি খালি হাতওয়ালা মানুষটাকে ক্রমশঃ দয়া করতে শুরু করেছে ফুলটুশ!

একদিন তো এমন কথাও বলে ফেলেছিলো, "আমার অনেক বন্ধুরই তো বাবা নেই, তাদের মায়েরা তো কই এমন বিশ্রী কাপড় পরেনা?"

"বিশ্রী আবার কি! যা হয় একটা পরলেই হলো!"

"তবু একটুখানি বর্ডার রাখলে তো পারো!"

মানসী শুধু মৃদু হাসে! এইতো চরম পাওয়া! আবার কি চাই!

এই স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠলো একটা তরঙ্গ। শিখা এলো একদিন। দীঘা থেকে ফিরে তারও না কি অসুখ করেছিলো, তাই খবর নিতে আসতে পারে নি! এসে বললো, "কী গৌতমদা কি খবর? এসেছিলো না কি কেউ!"

"কে আসবে?"

"এই অনিমেষ কি দেবজ্যোতি, নীহারেন্দু কিম্বা—

"কিম্বা সঞ্জয়বাবু?" মুচকে হাসে ফুলটুশ।

"না সঞ্জয়দার কথা হচ্ছে না! কিম্বা বিভা?"

হেসে ফেলে দুজনেই!

"বিভা তোমাদের থেকে অনেক ভালো!"

"একশো বার! আমি কি অস্বীকার করছি?"

"তারপর! কেমন এন্‌জয় করলে?"

"অদ্ভুত! চমৎকার!"

"কাজ কতদূর এগোচ্ছে?"

"অগাধ! ইস্তাহারের বয়ান এখনো ঠিক হচ্ছে না।"

"সেটাই আশা করছিলাম!"

"তা তো করবেই। তোমার মা কোথায়?"

"আছেন কোথায় কাজে কর্মে!"

"ভদ্রমহিলা ঘোরতর সংসারী, না?"

"খুব সম্ভব!"

"খুব সম্ভব মানে? তোমার মা'র কথা, তুমি জানো না?"

"আমার নিজের কথাই আমি জানি না, তো মা'র!"

"ওঁকে কিন্তু একদিন দেখেই আমার খুব ভালো লেগেছিলো! দেখা করতে চাইলে বিরক্ত হবেন?"

কে জানে মানসী বিরক্ত হবে কি না, কিন্তু মানসীর ছেলে বিরক্ত হয়! এই হলো শুরু মেয়েলিপনা! আশ্চর্য! শিখার মতো মেয়ের মধ্যেও ওই মেয়েলিপনার চাষ? কোনো কিছুর বাইরে থাকতে রাজী নয় ওরা, সব কিছু উদ্‌ঘাটিত করে দেখতে চায়। পেড়ে ফেলতে চায়

সবাইকে। মানসীর এই দোষের জন্যেই না ছেলেবেলা থেকে নিজেকে কঠিন খোলসের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছে ফুলটুশ।

অসুখটার মধ্যে একটু যেন শিথিলতা এসে গেছে। না না এটা ঠিক নয়, আবার নিজেকে শক্ত করে নেওয়া দরকার। মায়া মমতার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া মানেই তো শস্তা হয়ে যাওয়া।

"কি হলো! অমন চিন্তায় পড়ে গেলে যে!"

"নতুন চিন্তা কিছু নয়, ভাবছি 'মেয়ে' মাত্রেই সেই আদি অকৃত্রিম মেয়ে।"

"অর্থাৎ?"

"না বুঝলে বোঝবার দরকার নেই।"

"হুঁ বুঝেছি। কিন্তু মানুষ তো আর যন্ত্র নয়?"

"হওয়া উচিত!"

"যন্ত্র হওয়া উচিত মানুষের?"

"নিশ্চয়!"

"আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।"

"খামোকা আমার সঙ্গেই বা একমত হতে যাবে কেন?"

"কিন্তু তোমার দিকে যুক্তিটা কি?"

"যুক্তি আবার কি! আমি তো কারো সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না। নিজের কথা বলতে পারি তোমাদের ঐ হৃদয়াবেগকে আমি ঘৃণা করি।"

"আবেগকে ঘৃণা করতে পারো, 'হৃদয়' বস্তুটাকেও করো?"

হঠাৎ ভারী হেসে ওঠে ফুলটুশ। নিষ্ঠুরের মত হাসি। বলে, "ব্যাপার কি হৃদয় নামক বস্তুর চর্চা চলছে না কি? ভালো ভালো!"

"চলছেই তো!" রাগ করে বলে শিখা।

"শুনে বড়ো আনন্দ হলো! রঙিন কার্ড ছাপাবে তো প্রীতি-ভোজের নেমন্তন্ন করতে!"

"তা'ও ছাপাবো।" বলে রাগ করে উঠে দাঁড়ায় শিখা।

ফুলটুশ যেন দেখেও দেখে না!

"যাচ্ছি!"

"আচ্ছা!"

"উঃ! কী অহঙ্কার! দু'দণ্ড বসতেও বলে মানুষ!"

"মানুষ বলে হয়তো, যন্ত্র বলে না।"

"ও, তা'ও তো বটে। অনিমেষ বলেছে, তুমি পার্টির কাজের ভয়ে আত্মগোপন করে আছো!"

"সে তার উপযুক্ত কথাই বলেছে!"

"বিভা বলেছে—"

"দোহাই তোমার। বিভা প্রসঙ্গ থামাও। যাচ্ছি বলে আবার প্রসঙ্গের অবতারণা করে সময় নষ্ট করছো যে?"

মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে শিখার! কথাটা সত্যি। রাগ দেখাতে উঠে পড়েছিলো অথচ তখনো অনেক কথা বলতে বাকী। তাই না নানা প্রসঙ্গের অবতারণা! লোকটা কি অসভ্য! অবশ্য এর পর আর থাকা চলে না। স্ট্র্যাপ দেওয়া যে ব্যাগটা হাতে লোফালুফি করছিলো, সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলো।

কেমন একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ফুলটুশ। এই একমাত্র মেয়ে, যাকে এ যাবৎ 'মেয়ে' বলে মনে করতো না ফুলটুশ, হয়তো বা মনে মনে একটু শ্রদ্ধাও করতো, কিছু দিন থেকে একদম বাজে হয়ে যাচ্ছে ওটা! কেন যাচ্ছে তা'ও যেন কিঞ্চিৎ বুঝতে পারছে। দীঘার ব্যাপারেই সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে। ছি ছি! সেই আদিম অকৃত্রিম কতকগুলো ঘৃণ্য ব্যাপার! সেই স্নেহ মমতা প্রেম! পৃথিবী কেন ধ্বংস হয়ে যায় না! তা'হলে ওগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়!

ওঘরে মানসী অনেকদিনের অব্যবহৃত একটা দেরাজ ঝাড়াঝুড়ি করছিলো। মেয়েটিকে আসতে দেখে একটু অবহিত হলো। সেদিনের সেই মেয়েটি! ফুলটুশের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তা'হলে! সাধারণ বন্ধুত্ব, না বিশেষ বন্ধুত্ব? চির কৌতূহলী মানব মন!

মা হ'লেও রক্ষে নেই। কৌতুক কৌতূহলে অনেক কিছু ভাবতে

বসে সে। ওঃ তাই! এই না তুমি একনম্বরের কাঠখোট্টা ছেলে! তবে? আরে বাবা, ও দেবতাটি কাউকে ছেড়ে কথা কয়না। মেয়েটাও অবশ্য দেখতে কেমন কাঠ কাঠ, তা' হোক। ফুলটুশের বিয়ের আশা করবার মতো দুঃসাহস তো নেই মানসীব, তবু যদি কারো সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করেও—

মানসী এমন অনুদার নয় যে জাতগোত্রের ধূয়ো তুলে কোনো প্রতিকূলতা করবে।

কান খাড়া করে ওদের কথাবার্ত্তা একটু শুনতে ইচ্ছে হলো, সফল হলো না! একটু স্বর ভেসে আসছে মাত্র, কথা বোঝা যাচ্ছে না! শুধু একবার বড়ো গলার হাসি শোনা গেলো। ফুলটুশের গলা! তা'হলে ফুলটুশও এরকম গলা ছেড়ে হাসতে জানে? বাইরে তা'হলে ছেলে আমার ঠিকই স্বাভাবিক, শুধু যতো বিদঘুটেমি বাড়িতে! একটু কেমন ঈর্ষা এলো। পরক্ষণেই ভাবলো, না না তা নয়। ভগবানের দয়ায় আজকালই বুদ্ধিশুদ্ধি একটু ফিরেছে! তাই বান্ধবীর সঙ্গে হাসি গল্পের ঘটা!

মেয়েটা চলে গেলে তার সম্বন্ধে একটু খোঁজপত্তর নেবে মানসী ফুলটুশের কাছে।

হাতের কাজ একটু থেমে থেকেছিলো, আবার হাত চালাতে লাগলো মানসী। ফুলটুশের জলখাবার খাবার সময় এসে যাচ্ছে। কারো সামনে খাওয়ার কথা তুলতে গেলে তো মাকে ফাঁসি দেবে, মেয়েটা চলে যাক। হঠাৎ থমকে গেলো মন। স্তব্ধ হয়ে গেল চিন্তা!

কাগজপত্রের অন্তরালে কি এটা? একজোড়া তাস!

সুদৃশ্য আর দামী! ত্র্যহস্পর্শ বৈঠকের জন্য শখ করে কিনেছিলেন সুখময়। ক'দিনই বা খেলা হয়েছিলো! ময়লা হয়নি, পুরু হয়ে যায়নি! পরে আড্ডার জন্যে আরো তাস কিনেছিলেন সুখময়, কিন্তু ওটা কোনোদিন নিয়ে যাননি। বলেছিলেন, "আহা থাক্ থাক্, ভালো জিনিস বাড়িতে থাক্। যত্ন করে রেখে দাও, দু'জনে যখন বুড়ো হবো, রাতে ঘুম না এলে 'ধাপুড় ধুপুড়' খেলা যাবে।...ভুরু কোঁচকাচ্ছো যে?

লোকের সামনেই বুড়ো, ভেতরে ভেতরে কি আর বুড়ো হবো গো ?"

তাসের প্যাকেটটা অনেকক্ষণ হাতে করে চুপচাপ বসে থাকে মানসী। সুখময়ের কথা সুখময় রেখেছেন, বুড়ো তিনি হলেন না কোনদিন! কিন্তু মানসী? মানসী হয়তো আরো কতোদিন বেঁচে থাকবে! প্রচলিত অর্থে বেঁচে থাকা! পুরনো হবে, বুড়ো হবে, ফুরিয়ে যাবে, তবু বসে বসে পৃথিবীর অন্নজল ধ্বংসাবে!

ফুরিয়ে যাবে! এখনি কি ফুরিয়ে যায়নি মানসী? ফুরিয়ে যাওয়াই তো উচিত। হঠাৎ খট্‌খট্ করে একটা শব্দ কানে এলো। জুতোর শব্দ। ওঃ মেয়েটা চলে গেলো!

তা' একখুনি গেলো যে বড়ো! মনটা আবার ফুলটুশের জগতে ফিরে আসে। কি কাঠখোট্টা ছেলেটা! প্রেমেপড়লেও দু'টো গল্প করে উঠতে পারে না! আশ্চর্য! কথার জন্যে কথা সৃষ্টি করতে পারে না! মানসীর ছেলে হয়েও এমন?

স্থান কাল পাত্র মনে থাকে না, মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে মুখে। হাসিতে আত্মমহিমা! সে হাসিতে অহঙ্কার! সে হাসিতে মাদকতা! ছুক্ষণ আগের বিধুর বিষণ্ণতার সঙ্গে এ হাসির কোথাও মিল নেই।

সরবৎ আর সন্দেশ হাতে করে ছেলের ঘরে ঢুকলো মানসী।...

"নে খেয়ে নে। আজ তোর খুব দেরী হয়ে গেলো। তুই তো আবার কারো সামনে খাওয়াটাওয়া পছন্দ করিস না? তাতেই... আচ্ছা, মেয়েটি তো সেদিনকার সেই মেয়েটি না? তোর ওখানে যাবার আগে যে বলতে এসেছিল?"

খাদ্যবস্তুটা টেনে নেয় না ফুলটুশ, শুধু গম্ভীরভাবে বলে, "হু"।

"নাম কিরে ওর?"

"জানি না, ভুলে গেছি।"

আড়চোখে একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায় মানসী। ও বাবা, এ যে বেশ ঘোরালো অবস্থা! ছেলের মুখটা যেন ভার ভার। ঝগড়া হয়নি তো? যে ছেলে মানসীর, হয়তো যাহোক একটা তর্ক

তুলে রাগিয়ে দিয়েছে ওকে। তাই এতো তাড়াতাড়ি—

কিন্তু তর্ক তুললো কখন? বেশ তো হাসাহাসি হচ্ছিলো!

না বাবা, এ হচ্ছে মন কেমনের ভাব!

ছেলের সামনে আজকাল ইচ্ছে করেই একটু বোকা বোকা কথা কয় মানসী! বোকা বোকা, আর একটু অবুঝ অবুঝ! বুঝতে শিখেছে, এতেই যেন একটু সন্তুষ্ট করা যায় ফুলটুশকে! তীক্ষ্ণধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মা ওর পছন্দ নয়!

হ্যাঁ বুঝতে শিখেছে মানসী, ছেলে তার যতোই প্রগতিশীল আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হোক না কেন, মা সম্বন্ধে তার দৃষ্টি পঞ্চাশ বছরের আগের! মা মায়ের মতো হোক!

বাঙালীঘরের বুড়িসুড়ি বিধবা মায়েরা যেমন হয়! পূজোআচ্চা মালাজপ, ঠাকুরদেবতা সবই তার কাছে হাস্যকর। তবু মায়েরা সেই হাস্যকর জিনিসগুলো নিয়েই থাকুক, এই হচ্ছে তার প্রকৃত মনোভাব। হ্যাঁ, সে কথা এতোদিন বুঝে ফেলেছে মানসী, আর তাতেই বুঝি একটু একটু করে মন পাচ্ছে ছেলের!

ক্ষতি কি, যদি মানসী তার বুদ্ধির সমস্ত কোণগুলো ক্ষইয়ে ফেলে একটু ভোঁতা ভোঁতা একটু বেচারী বেচারী একটু 'মা মা' হয়ে থাকে? তাই অবোধের মতো চোখ বড়ো করে বলে, "শোনো কথা! নাম ভুলে গিয়েছিস কি রে? অনেকদিনের তো চেনা?"

"চেনা হলেই নাম মনে রাখতে হবে?"

"কি জানি বাপু, তোর যেন সবই অনাসৃষ্টি। মেয়েটি কিন্তু মন্দ দেখতে না। আমার তো বেশ লাগলো!"

"তবে আর কি, ঘটকালি শুরু করে দাও!"

তিক্ততা ঝরে পড়ে ফুলটুশের কণ্ঠে।

ভেবেছেন কি উনি? কথার জাল ফেলে কথার মাছকে খেলিয়ে তুলতে চান?

মানসী ছেলের এখনকার ভাবটা ঠিক ধরতে পারে না, ভাবে তিক্ততার ভানটা বোধহয় চালাকি, কথাটা ওই খাতে এনে ফেলতে

চায়! বাবা কথায় বলে ঘি আর আগুন। ছেলেকে এতোদিন যে উচ্চমার্গের জীব ভেবে এসেছে, তা নয় দেখে মানসীর যেন ভারী ফুর্তি লাগে। যতোই কায়দা করো বাপু আসলে তুমি সাধারণ, অতি সাধারণ! একেবারে সমতলভূমির জীব!

সেই ফুর্তিতে আহ্লাদে আহ্লাদে গলায় বলে ওঠে মানসী, "করিই যদি তুই আটকাতে পারবি? দেখনা এইবার।"

ফুলটুশ একবার সেই আহ্লাদে আহ্লাদে মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে আর ঠিক আগের মতো সর্বাঙ্গে একটা দাহ অনুভব করে। অসহ্য! না না, সহ্য করতে পারেনা ও মার ওই খুশি-ডগমগ ভাব। উঃ খুশি জিনিসটা কী কুৎসিৎ। বিশেষ করে মেয়েদের মুখে তার প্রকাশ। বোধ করি পৃথিবীর আদিমতম বর্বরতা এই মুখভঙ্গীতে আহ্লাদের প্রকাশ। এ অসহ্য হবে না? তাই ঘৃণা আর বিদ্বেষে জরজর গলায় বলে ওঠে, "একটা মেয়ে আর ছেলেতে কথা বলছে দেখলেই তোমরা অমনি রহস্যের গন্ধ পেয়ে বসো তাই না? হবেই তো যেমন নোঙরা মন নিজেদের!"

"কী! কী বললি!"

এ কী? অকারণ এ কী ছোবল! মানসীর শুধু রসনাই নয়, সমস্ত অন্তরাত্মাই যেন তীব্র চীৎকার করে ওঠে, "কী? কী বললি?"

"যা বলেছি, ঠিকই বলেছি!"

সেই চিরপরিচিত তিক্তব্যঙ্গের সুর! না, কোথাও কোনোখানে একতিল পরিবর্তন হয়নি। অসুখে পড়ে, অসুবিধেয় পড়ে ক'টা দিন একটু নরম হয়ে থেকেছিলো মাত্র! আব সেই পরিবর্তনটুকুই মায়ের প্রতি তার অশেষ কৃপা মনে করে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলো মানসী, গিয়েছিলো ধন্য হয়ে। ভেবেছিলো এই তো পরম পাওয়া! সংকল্প করেছিলো এর পর থেকে নিজের বাকী জীবনটা ওইটুকুর বিনিময়েই বিকিয়ে দেবে। বোকাটে বোকাটে আর বেচারী বেচারী হয়ে গিয়ে শুধু ছেলের মনরক্ষা করে চলবে! যেমন ভাবে চলে থাকে অসহায়া বিধবা মায়েরা!

ছি ছি, মানসী কি বুদ্ধিহীন! মানসীর মূল্য কি এইটুকু? মানসীর একমাত্র পরিচয় শুধু এই?

উদ্ধত দুর্বিনীত ছেলে! তোর কি কোনো ধারণা আছে, কেবল মাত্র তোর জন্যেই কী বিরাট ঐশ্বর্য অবহেলায় ত্যাগ করেছে মানসী!

মিনিট খানেক গুম্ হয়ে থেকে মানসীও তিক্তব্যঙ্গের সুরে বলে, "কিন্তু সে ধারণাটা যে মাত্র আমাদের মতো নীচমনাদেরই থাকে তাও তো মনে হয় না! তোমাদের মতো উচ্চমনাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে সে ধারণার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় যে!"

"সেটা শুধু ধারণাই নয় কিনা।" বলেই ফুলটুশ হঠাৎ উঠে চটিটা পায়ে গলিয়ে রোগা কাঠির মতো পা দুটো খট্‌খটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো। অসুখের পর রাস্তায় বেরোনো এই প্রথম।

আশ্চর্য! মানসী ব্যস্ত হয়ে ছুটে বাধা দিতে গেলো না, গেলো না তার শার্টের কোণ চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠতে, "ফুলটুশ! কি হচ্ছে কি? যাচ্ছিস কোথা?" শুধু দাঁড়িয়ে রইলো কাঠের মতো! দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ ধরে।

আর আশ্চর্য যে, এই নিদারুণ অপমানের দাহব অন্তরালে বাজতে লাগলো একটি অনির্বচনীয় আনন্দের সুর।

মুক্তির আনন্দ! এ মুক্তি বুঝি সেদিনের মতো যন্ত্রণাদায়ক মুক্তি নয়, এ একেবারে বেপরোয়া-বেয়াড়া। এ মুক্তিতে রুদ্রবীণার সুর।

এতোদিনে 'ভালো' হবার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো মানসী। এখন মানসী কেবলমাত্র নিজের! নিজেকে নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার তাকে দিয়ে ফেলেছে ফুলটুশ।

ফুলটুশের উপর মানসী কৃতজ্ঞ!

পার্টির ওরা হৈ হৈ করে উঠলো।

"আরে গৌতমবাবু যে! কী ব্যাপার! এইমাত্র শিখার মুখে শুনলাম তুমি একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছো, পরলোকের যাত্রী হ'তে হ'তে থেমে গেছো, হঠাৎ সশরীরে আবির্ভাব যে! কোথা থেকে?"

"পরলোক থেকেই !"

"তারপর আছো কেমন ? এমন কি হলো যে—"

ফুলটুশ বিরক্তভাবে বলে, "থাক্, ওসব মেয়েলি প্রসঙ্গ থামাও। অসহ্য !"

বিভা ফট করে বলে বসে, "যাই বলুন গৌতমদা, এ শরীরে আপনার কিন্তু—"

"দয়া করে উপদেশ রাখবে তোমার ? উঃ পৃথিবীটা যে কবে মেয়ে শূন্য হয়ে যাবে !"

নীহারেন্দু মুচকি হেসে বলে, "গৌতমবাবুর অবস্থাটা একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে যে ! বিশেষ কোনো মেয়ের দুর্ব্যবহারে মেজাজ বিগড়ে যায়নি তো ?"

"শাট্ আপ্ !" হঠাৎ প্রচণ্ড ধমকে ওঠে ফুলটুশ, "ইতিমধ্যে কাজ কতোদূর কি হলো জানতে এসেছি, ইয়ার্কি দিতে আসিনি !"

"তা' বটে ! ইয়ার্কি দেওয়ার ব্যাপারটা বাড়ি বসে বিশেষ একজনের সঙ্গেই ভালো, কি বলো ?" বলে নীহারেন্দু টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাতা টেনে বার করে কি লিখতে বসে।

"সঞ্জয়বাবু !"

সঞ্জয় ব্যস্তসুরে বলে, "ও হ্যাঁ নিশ্চয়। মানে আর কি, এ ক'দিনের ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।"

কিন্তু কে কাকে কি বোঝাবে ? ফুলটুশ তো আজ সত্যিই কাজ বুঝতে চায় না, চায় ঝগড়ার মতো একটা কিছু ! ভিতরটাকে মুচড়ে মুচড়ে যে বেদনা উঠছে, একটা বৃথা সংঘর্ষের আগুন জ্বলে উঠে যদি সেটা জ্বলে ধ্বংস হয়ে নিবৃত্ত হয় তা হোক।

প্রকৃতিকে স্বীকার করে না নিতে পারলেই তো দেখা দেবে বিকৃতি। অন্তরের মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধে আছে যে চিরন্তন পুরুষচেতনা, প্রকৃতির নিয়মেই সে কামনা করে নারীকে, সে কামনাকে উদ্ধত অহঙ্কার দিয়ে অস্বীকার করতে চাইলে বোধ করি এমনি দশাই ঘটে।

শিখাকে অকারণ অপমানে তাড়িয়ে দিয়ে পর্যন্ত ভিতরের এই মোচড়টা শুরু হয়েছিলো। তাই ছোবল হেনে এসেছে মাকে, ছোবল হেনে গেলো সহকর্মীজনদের! হ্যাঁ গেলোই শেষ পর্যন্ত!

প্রত্যেক ব্যাপারে খুঁত কেটে আর তর্ক তুলে এবং সে তর্ককে ঝগড়ার পর্যায়ে তুলে, তবে বিদায় নিলো ফুলটুশ।

ও চলে গেলে, এরা বললো, "কি ব্যাপার! ওর আজ হয়েছে কি!"

শিখা ওর এই অকারণ অসহিষ্ণুপনায় রেগে জ্বলছিলো, এবং কেন কে জানে ওর অসভ্যতাকে নিজের লজ্জা বলে গণ্য করে যেন মরমে মরে যাচ্ছিলো, তাই আগুনের মতো জ্বলে উঠে বললো, "কবে আবার আপনাদের গৌতমবাবু এর থেকে বুদ্ধিসম্পন্ন একটি সুসভ্য জীব ছিলেন?"

বিভা তাড়াতাড়ি বলে, "যাই বলো শিখাদি, তা' বলে গৌতমদা এতোটা এ রকম ছিলেন না! আমার মনে হয় অসুখ করেই—মানে শুনেছি তো মেনিনজাইটিস না কি হ'লে যেন মাথার গোলমাল—"

"দোহাই তোমার বিভা, তুমি বিজ্ঞের ভূমিকাটা ছাড়বে?"

চিঠিখানা পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রফেসর! আবার এ কী বন্ধনের আহ্বান! এ কী? খেলা? এ কী হতভাগ্য এই মানুষটাকে নিয়ে মজা দেখা? তবু এ আহ্বানে বরফ হয়ে যাওয়া মনে উত্তাপ জাগে কেন? শিরায় শিরায় বাহিত শান্ত-করে-আনা রক্তে দোলা লাগে কেন? এ আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে নিজের পথে এগিয়ে পড়ার চিন্তা মনে ঠাঁই দিতে পারা যায় না কেন?

কিছুকালের ছুটি নিয়ে দেশভ্রমণের আয়োজন করে ফেলেছিলেন প্রফেসর সেন। সেই আয়োজনের মাঝখানে এলো এই চিঠি! এ চিঠি যেন সব কিছু তচ্‌নচ্‌ করার ডাক!

"আমি মুক্ত! এবার তুমি এসো যতো শীঘ্র পারো।

মানসী"

এই চিঠি !

এ আহ্বানকে উপেক্ষা করবেন প্রফেসর? চিঠি পাইনি, এই ভেবে বেরিয়ে পড়বেন দেশ দেশান্তরের উদ্দেশে? কি লাভ আবার সেই জটিলতার পাকে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে? সে তো সত্যিই অর্থহীন, হয়তো বা সত্যিই অন্যায় !

সেদিন থেকে অনবরত নিজেকে বিচার করেছেন প্রফেসর, অনবরত নানা যুক্তি ঠিক করে করে খাঁটি রাখতে চেয়েছেন নিজেকে, কিন্তু সমস্ত কিছু ছাপিয়ে চোখের উপর ফুটে উঠেছে একটা দৃশ্য !

বন্ধ দরজাটা ঠেলে হাট করে খুলে দিয়েই সেই প্রেতছায়াটার দ্রুত অপসারণ। যে দৃশ্যের ব্যাখ্যা পেয়ে গেছেন মানসীর কাছে !

তবে আর কোন লজ্জায়—? তবে আবার মানসীই বা কেন—?

আবার কি কোথাও চলে গেছে মানসীর ছেলে? না কি?··· না কি?···হঠাৎ ভয়ানক রকম চমকে ওঠেন প্রফেসর, ভয়ানক একটা ভয়ে হাত পা হিম হয়ে আসে। তাই কি এ কথা লিখেছে মানসী? 'আমি মুক্ত'! এ যে বড়ো সর্বনেশে ভাষা—

হায়, হায়, কেন প্রফেসর বৃথা অভিমানে একেবারে নীরব হয়ে বসে রইলেন! যদি তাই হয়! কিন্তু তা কি সম্ভব? ঈশ্বর কি এতোই অকরুণ?

"আমার সব ভার আজ থেকে তোমার!"

অনাদিকাল হ'তে অনন্তকালের নায়িকারা সর্বস্ব সমর্পণের মন্ত্র-পাঠের মুহূর্তে যে চোখে নায়কের মুখের দিকে তাকিয়ে এসেছে, আরো অনাগুন্তকাল ধরে যে চোখে তাকাবে, সেই চোখে তাকিয়ে থাকে মানসী! আধবোজা ভীরু চোখ!

তবু সেই ভীরু চোখের পাতার নীচে দুঃসাহসিক সংকল্পের আগুন! "তুমি আমাকে নাও," এই সহজ নিবেদন মন্ত্রখানিই আবেদনের ছদ্মবেশে উচ্চারিত হয়—'আমার সব ভার আজ থেকে তোমার।' 'আমার ভার তোমার' মানেই তো আমি তোমার!

প্রেমরূপে আমি তোমার, বুদ্ধিরূপে আমি তোমার, চিন্তারূপে আমি তোমার, দেহরূপে আমি তোমার! আবার দেহাতীত আত্মার রূপেও আমি তোমারই!

পুরুষ সাহসী, কিন্তু নারী দুঃসাহসিকা! এ মন্ত্র নারী সহজে উচ্চারণ করতে পারে। পুরুষ শুনেই কেঁপে ওঠে। পুরুষ চিরকাল বলে এসেছে, "তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো তোমার কেন্দ্রে তোমার মহিমায়, শুধু আমাকে তোমার দিকে তাকাতে দিও, দিও কাছে আসতে, এইতো বেশ!"

নারী তা' বলে না। নারী বলে, "না, আমাকেই তুমি সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে যাও তোমার কাছে—আমার কেন্দ্র থেকে, আমার আশ্রয় থেকে, আমার মহিমা থেকেও।" সে জানে সর্বস্ব না পেলে সর্বস্ব দেওয়া যায় না।

"শুধু একটু বসতে দিও কাছে—" এতে পুরুষের মন ভরে, নারীর মন ভরে না। তবু সংশয় আর বিশ্বাসের লুকোচুরি চলে। চলে আপন হৃদয়দ্বন্দ্বের বোঝাপড়া। 'ও কি আমাকে চায়?' এ প্রশ্নের চাইতেও জটিল প্রশ্ন 'আমি কি ওকে চাই? সত্যিকরে চাই? শুধু আবেগ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে? চিন্তা দিয়ে?'

দীর্ঘ দু'টি দিন রাত্রি ধরে অবিরত ভেবেছে মানসী, 'আমি কি সত্যিই ওকে চাই?'

সংসারের কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'লাম বলে, বঞ্চিত হলাম বলে, সংসারের প্রতি অভিমানে পিঠ ফিরিয়ে আমি কি ওর দিকে মুখ ফেরাতে চাইছি?

আরো অনেক ভাবলো। কোথা দিয়ে গেলো দিন, গেলো রাত্রি, কখন এলো ফুলটুশ. কখনই বা এলো কেষ্ট। তারা খেলো কিনা শুলো কিনা, কিছুই তাকিয়ে দেখলো না। শুধু অবিরাম জপ করতে লাগলো 'চাই, চাই, তোমাকেই আমি চাই!'

তা নইলে ফুলটুশের রূঢ়তায় এমন আনন্দের বন্যা মনে এলো কেন? কেন অন্তরের সমস্ত অণুপরমাণু থেকে অন্তরাত্মা পর্যন্ত এক

যোগে বলে উঠলো, 'মুক্তি মুক্তি!'

যেন কোন দুরূহ তপশ্চর্যার সংকল্পে ভাঙন ধরার গোপন উল্লাস! লজ্জা? কেন? কাকে? যে ছেলে অকারণেও অহরহ তার দিকে তীক্ষ্ণ সন্দেহের দৃষ্টি হেনে বসে থাকবে, তা'কে?

আচ্ছা ফুলটুশ যদি এমন না হতো?

যদি খুব ভালো, খুব মমতাময় খু-ব মাতৃঅনুগত হতো? তা'হলে? তা' হলে কি মানসী জীবনের নতুন সার্থকতার কথা ভাবতে পারতো? এই খানেই এক জটিল আবর্ত।

মানসীর সন্তান যে মানসীর প্রাণের আশ্রয় নয়, নয় স্বাভাবিক সহজ, সেইখানেই বুঝি মানসীর মুক্তির আনন্দ!

এরকম না হয়ে অন্য রকম হ'লে কি হতো সে চিন্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় মানসী। ভুলে যেতে চায় সুদীর্ঘ চল্লিশটা বছর সে এই পৃথিবীর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে! সে শুধু ভাববে সে মানসী! একটি সশ্রদ্ধ প্রেমপূর্ণ পুরুষ-মানসের একান্ত 'মানসী!' অতএব, "আমার সব ভার আজ থেকে তোমার!"

কেঁপে উঠলেন প্রফেসর, অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, "কি হয়েছে?"

মানসী চোখ তুলে মৃদু হাসলো, "কি হবে?"

"ইয়ে, মানে সকলে ভালো আছেন তো?"

"ও! হ্যাঁ!"

"তবে?" আরো অস্ফুট আরো ভীত স্বর!

"সংকল্প স্থির করে ফেললাম! অনেক ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্ত স্থির করেছি।" মানসী যেন বাজার দরের আলোচনা করছে!

হ্যাঁ অনেক সাধনায় এই সহজ হওয়া! আবেশ নয়, আকুলতা নয়, সেটাই লজ্জার!

"এ গৌরবের ভার যদি সত্যিই দাও মাথায় করে নেবো, কিন্তু পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছি না!"

"পরিস্থিতি আদি ও অকৃত্রিম। শুধু এবার নিজের স্থিতিস্থানটা বদলানো দরকার মনে করছি!"

"তবে তাই চলো মানসী," হঠাৎ যেন এক টুকরো আগুন জ্বলে ওঠে চিরদিনের সৌম্য শান্ত দুটি চোখের তারায়! "দু' মাসের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম পথে, তুমিও চলো সঙ্গে।"

"চিরদিন বইতে পারবে তো?"

"সন্দেহটা এখন থাক্ না!"

"কবে তোমার যাত্রা শুরুর দিন?"

"দিন তো ছিলো আজই! এখন দিনস্থিরের ভার তোমার!"

"আজ, আজই, কোথায় যাবে ঠিক করেছো?"

"সে কথা আর নয়। এখন তুমি ঠিক করো।"

"বললাম যে সব ভার তোমার!"

"বেশ!" এক মিনিট চুপ করে থাকলেন প্রফেসর, তারপর বললেন, "কিন্তু এ কথা কি সত্যিই সত্যি?"

"সন্দেহ হচ্ছে?"

"অন্ততঃ বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না।"

"ভরসা দিচ্ছি! অনেক ভাবলাম, ভেবে দেখছি, সত্যিই কি এভাবে থাকার কোনো মানে আছে?"

"আমার কাছে হয়তো মানে নেই, কিন্তু তোমার?"

"আমার?" মানসী অদ্ভুত একটু হেসে বললো, "আমি কুল ছেড়ে শ্যামকেই ধরলাম এবার!"

"মাগো কোথায় যাচ্ছো গো?"

কেষ্ট এসে থমকে দাঁড়ালো। কয়েকটা কাপড়জামা একটা সুটকেশে ভরে নিচ্ছিলো মানসী। কেষ্টর কথায় মুখ তুলে তাকালো, বললো, "তীর্থে!"

কেষ্ট সন্দিগ্ধভাবে বলে, "বাজে কথা! নিয্যস দাদাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে কোথাও চলে যাচ্ছো!"

"শুধু শুধু ঝগড়া করবো কেন?"

"কেন তা' তোমরাই জানো। এই তো দেশ থেকে এসে ক'দিন

দেখলুম দিব্যি ভালো হঠাৎ আবার কখন কি হলো, চোরে কামারে দেখা নেই। তোমার এ দু'দিন অসুখের ছল করে পড়ে থাকাও তো রাগ বৈ আর কিছু নয়!"

মানসী হঠাৎ নিতান্ত ক্লান্তস্বরে বলে ওঠে, "কেষ্ট, আমি না থাকলেও তো তুই বেশ চালাস!"

"চালাই তার কি?" কেষ্টর আবার সন্দিগ্ধ স্বর।

"কিছু না। তাই চালাবি! এই শোন, ধর এটা! এই বাক্সটায় টাকা আছে, কিছুদিন চলবে, ফুরিয়ে গেলে দাদাবাবুকে বলিস!"

"কেন, তুমি কতো কালের জন্যে যাচ্ছো?"

"আর তো ফিরবো না। তীর্থে বাস করবো।"

"আহা আর কিছু না! ও সব আহ্লাদের কথা রাখো। ক'দিন তাই বলো?"

"তা' কি করে বলি? ধর যদি মরেই যাই?"

"ভাল হবে না বলছি মা ওই সব কথা বললে! কার সঙ্গে যাচ্ছো শুনি? কে হঠাৎ তোমায় তীর্থের লোভ দেখিয়ে নাচালো?"

মানসী একবার এই অবোধ ছেলেটার মুখের দিকে তাকালো, কি লাভ এই ছেলেটাকে আঘাত দিয়ে? না হয় মিথ্যে কথাই বলা যাক। তারপর হঠাৎ মনটাকে শক্ত করে নিলো, নাঃ, যা সত্য তাই স্পষ্ট হোক!

বললো, "একজন যাচ্ছিলো, আমি তা'র সঙ্গ ধরেছি!"

"সেটি আবার কোন জন? ও বাড়ির মামীঠাকুমা বুঝি?"

"না! তোর বন্ধুবাবু!"

"বন্ধুবাবু!"

কেষ্টর চোখের সামনে সহস্র ফুল ফুটে উঠলো, "বন্ধুবাবুর সঙ্গে তীর্থে যাচ্ছো তুমি?"

মানসী বুঝতে পারে। একটু মমতা হয়। হাতের কাজ থামিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তারপর সমস্ত দ্বিধা সবলে ঝেড়ে ফেলে কাজ করে। ভালোই হলো, ভালোই হলো! রইল না কোন

আবরণ, রইল না মিথ্যার মুখোস। যা সত্য তাই জ্বলতে থাকুক সূর্যের মত।

ষোলো বছরের কুমারী মেয়ের আত্মহারা আবেগে অকূলে ভাসা নয়, অনেক চিন্তা আর অনেক দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্ত ফল। তবু প্রেম আছে, আছে প্রেমের উন্মাদনা! নব অনুরাগের আবেগ উঠছে ফুলে ফুলে! সে আবেগ জোয়ারের জলের মতো মনের উপরে নয়, মনের তলায় পাক-খাওয়া চোরা ঘূর্ণির মতো! সেখানে নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন, নতুন সার্থকতার আশা!

হৃদয় যমুনা উঠেছে উদ্বেল হয়ে, নারীহৃদয়ের চিরন্তনী বাধা ছুটতে চায় অভিসারে! সে পথ হোক কাঁটাবন, হোক অন্ধকার, হোক বজ্রে বিদ্যুতে সচকিত, তবু মন ছুটেছে।

ভয়ঙ্করের নেশা বড়ো ভয়ঙ্কর!

তবু এ অভিসার যাত্রার বাইরের চেহারাটা অদ্ভুত শান্ত। এ যাত্রার আগে টেবিলে চিঠি লিখে রেখে যাওয়া যায়, "অনেক ভেবে স্থির করলাম, তোমাকে মুক্তি দেওয়াই আমার উচিত!" "মা"।

"এ কী? এ রকম কেন?"

'প্রশ্ন নয়, যেন চাপা উত্তেজিত একটা শব্দ মাত্র।

"কি রকম?"

"গাড়িতে আর লোক নেই কেন?"

ফার্স্ট ক্লাশ বার্থের পুরু গদির একটা কোণের দিকে নিজকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়েছে মানসী! ছড়িয়ে বিছিয়ে নয়, যতোটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে!

প্রফেসর দাঁড়িয়ে আছেন, কামরার দরজা খোলা, গাড়ি এখনো চলতে শুরু করেনি! তাকিয়ে দেখলেন মুখের দিকে। মুখটা অতো বিবর্ণ দেখাচ্ছে কি ভয়ে? না গাড়ির তীব্র আলোয়?

হঠাৎ চিরদিনের শান্ত দৃষ্টিটায় ফুটে উঠলো একটা রূঢ় তীব্র

আলো! সেই তীব্র আলো গিয়ে পড়লো মানসীর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখের ওপর "কেন, অনেক লোক না থাকায় অসুবিধে বোধ করছো?"

"না অসুবিধে কি!" মৃদু নিশ্বাসের মতো স্বর।

কথাটা ব'লে মানসী জানালার বাইরে প্লাটফর্মটার দিকে চেয়ে থাকে। যেখানে আলোয় আলো, যেখানে এখনো কর্মব্যস্ততার অন্ত নেই, যেখানে এখনো ঠেলাগাড়ি নিয়ে ফেরিওলাগুলো ছুটোছুটি করছে খাবার নিয়ে, খেলনা নিয়ে, বই নিয়ে। এখনো প্রত্যেকটি কামরার দরজা খোলা। দরজার নীচেয় নীচেয় আলাদা একটু করে ভিড়! এখনো বোঝা যাচ্ছে না, কে যাত্রী, আর কে এসেছে 'তুলে দিতে।' একটু পরেই ধরা পড়বে সে কথা। যখন ট্রেনটা নড়ে উঠবে তখন চুকবে বিদায় নেওয়া দেওয়ার পালা। তখন যারা যাবার তারা গাড়িতে উঠে পড়ে কামরার দরজাগুলো দেবে চেপে বন্ধ করে। যারা ফিরে যাবে একটু হয়তো ম্রিয়মান মুখে, একটু হয়তো শিথিল ভঙ্গীতে।

কিন্তু এখনো গাড়ি নড়ে ওঠেনি।

এখনো আলোয় আলোভরা প্লাটফর্মটা দেখা যাচ্ছে! তবে এখনো জানালার বাইরে তাকিয়ে এই পরম উপভোগ্য দৃশ্যটা দু'চোখ বিস্ফারিত করে দেখে নেবেনা কেন মানসী? এখনি তো গাড়ি চলতে শুরু করবে, প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়ে হু হু করে ছুটতে থাকবে অন্ধকারের পটভূমিকায়!

তীব্র দৃষ্টিটা আবার শান্ত হয়ে এলো। মানসীর বসার এই ভঙ্গীটা বড়ো বেচারী বেচারী!

"অন্য কতকগুলো লোক থাকলেই, থাকবে প্রশ্নোত্তরের ঝঞ্চাট। ইচ্ছে করেই তাই এ ব্যবস্থা করলাম! এ গাড়িতে শুধু দু'টো বার্থ দু'জনের। অনেক লোকের অনর্থক কতকগুলো প্রশ্নোত্তরের হাত তো এড়ানো যাবে!"

মানসী একটু লজ্জিত হলো।

এবার তাড়াতাড়ি বললো, "তা ঠিক! আমি এ রকম গাড়ি দেখিনি কখনো আগে, তাই—"

"এ রকম কখনো দেখোনি? আশ্চর্য তো!"

আশ্চর্য বৈ কি!

কিন্তু মানসী তার জীবনে রেলগাড়িই বা চড়েছে ক'বার? কবে পাড়ি দিতে গিয়েছে বিদেশের পথে, তীর্থের পথে?

কিন্তু আরো কতো আশ্চর্য আজকের এই যাত্রা! ওই কর্মতৎপর বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিঃশব্দে বার বার উচ্চারণ করতে থাকে মানসী 'আমি কুলত্যাগ করছি! আমি কুলত্যাগ করছি!'

জগতের কেউ কখনো কি এমন কুলত্যাগ করেছে?

'সংসারের সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত—'

মানসী কেন তবে এই সংসারের কর্মচক্র থেকে খসে পড়লো?

মানসীর জীবন এমন অদ্ভুত হলো কেন? নড়ে উঠলো গাড়ি।

কেঁপে উঠলো সমস্ত যন্ত্রের সহস্র পাকের বন্ধন!

খোলা দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর।

দেবু ঠাকুরপোর দল গম্ভীর হয়ে গেছে, দেবীদের মুখে চোখে হাসির ফুলঝুরি!

"যাই বলো, আমরা তো বাবা এরকম সাহসের কথা ভাবতেই পারিনা!"

"আশ্চর্য বুকের পাটা বটে, সঙ্গে আর দ্বিতীয় প্রাণী মাত্র নেই!"

"আহা, বুঝলাম না হয় বয়েস হয়েছে তোমার, তা'বলে এমন কিছু বুড়ো হওনি! লোকনিন্দে বলে একটা জিনিস তো আছে!"

"আহা, সেই লোকনিন্দের কথাই তো হচ্ছে, নইলে সত্যি কিছু আর—। মানে—দেখতেই রোগাটে হালকা হালকা, নইলে বলতে গেলে তো, আমাদের মায়ের বয়সী!"

মামীশাশুড়ী তিক্তস্বরে বলেন, "হ্যাঁ, তোমাদের মায়ের বয়সী না ঠাকুমার বয়সী! কথায় বলে 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই—!' বয়সের সাহসে নয়; ইনি যে চিরকেলে জাঁহাবাজ দজ্জাল! একটু মিষ্টি কথা আর ওই গপ্‌পোর গুণেই সবাই বিভোর হয়ে থাকতে। আমি

বরাবরই চিনেছি। বেপরোয়া মেয়েমানুষ, জগৎ সংসারকে অগ্রাহ্যি! তীর্থে যাওয়ার বয়েস কি পেরিয়ে যাচ্ছিলো! কই আমায় কোন্ একবার বললি যে 'মামীমা সঙ্গে চলো!" তা'হলে দেখতেও সৌষ্ঠব হতো, তোর একটা হিতভবসা হতো! তা' নয় কোথাকার কে একটা পর-মিনসের সঙ্গে চললেন তীর্থ করতে! তাই কি কাউকে বলে গেলি গা? নেহাৎ চাকর ছোঁড়া বললো তাই। কি জানি মা, কী ব্যাপার!"

প্রফেসরের বৌদি অবাক হয়ে ছেলেকে বললেন—"কি বললি, তোর কাকার সঙ্গে একটি ভদ্রমহিলা গেলেন? কে তিনি? কই শুনিনি তো একবারো?···দূর, কাকে দেখে কি বুঝেছিস! আর কেউ হবে।···কি বললি, তোর কাকার ট্যাক্সী থেকে নামলো? তুই বললি না কিছু? ও মা কী কাণ্ড! কাকার সঙ্গে দেখাই করিসনি? কেন? জিজ্ঞেস করলেই বুঝতিস, কোনো বন্ধুবান্ধবের বৌকে কোথাও দিতে হয়তো···কি? বিধবা! তাই নাকি! আর কেউ নেই সঙ্গে! সে আবার কি!"

ফুলঝুড়ির আগুনের ফুলকি ফুল কাটলোনা, শুধু এদিকে ওদিকে একটু আগুন ছিটকালো, আর শেষ পর্যন্ত পড়ে রইলো খানিকটা পোড়া বারুদের গন্ধ। অবিশ্যি মানসীর আর কিসে কি!

ওর ট্রেনখানা তো তখন দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে অন্ধকারের পরদা ছিঁড়ে ছিঁড়ে। পিছনের সমালোচনায় ওর কি আসে যায়?

"মানসী।"

চমকে জানালার বাইরে থেকে চোখটা ফিরিয়ে আনলো মানসী।

"জানলাটা এবার বন্ধ করলে হতো! ঠাণ্ডা আসছে!"

"না না!"

"না! কি না? ঠাণ্ডা আসছে না?"

"কই!"

অনেকটা ব্যবধান রেখেই বসেছিলেন প্রফেসর, তবু হাতটা বাড়িয়ে চেপে ধরলেন ওর একটা হাত, "ঠাণ্ডা আসছে না? তবে হাত

এমন বরফ কেন ?”

হাতটা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিলো মানসী।

“শুয়ে পড়ো।”

“না না।”

কেমন যেন ভয়ার্ত ভঙ্গীতে গায়ে জড়ানো সিল্কের চাদরখানা আরো জড়িয়ে নিয়ে সোজা শক্ত হয়ে বসে মানসী!

“মানসী! নিজেকে না বুঝে এমন করে এলে কেন? তুমি এতো বড়ো ভুল করবে, এ কথা ভাবতেই পারিনি।”

মানসী শিথিল হয়ে গেলো, গেলো যেন ভারী অসহায় হয়ে। মাথা নীচু করে বললো, “ভুল করিনি!”

মুখ নীচু করতেই স্পষ্ট চোখে পড়ছে দু'পাশের কালো চুলের মাঝামাঝি পরিষ্কার সরু ধবধবে সাদা রেখাটি। এ রেখা যে কোনোদিন বঙ্কিম ছিল সে কথা এখন বিশ্বাস করা শক্ত!

সেই সরু রেখাটির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে প্রফেসর যেন আচ্ছন্নের মতো বললেন, “ভুল করোনি?”

“না! শুধু শুধু—”

“মানসী!” নির্নিমেষ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অন্ধকার বহিঃপ্রকৃতির দিকে তাকালেন প্রফেসর, গাঢস্বরে বললেন, “মানসী, সেদিন বলেছিলাম মনে আছে, মানুষ জানোয়ার নয়!”

“আমায় মাপ করো।”

এতোক্ষণে বুঝি অনুভব করলো মানসী, রাত্রির গাড়ির দুরন্ত তাড়নায় হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ধাক্কা মেরেছে ভিতরের মানুষ দু'টোকে। জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

“শুয়ে পড়ো।”

“তুমি?” কুণ্ঠিত ভীরু চোখ!

“আমি? আমার তো উচ্চাসন!” প্রফেসর মৃদু হেসে আপার বার্থটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

উচ্চাসন! উচ্চাসন! তাই বটে!

গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের মতো একেবারে স্থির শান্ত নিঃশব্দ মানুষটার মৃদু গভীর নিশ্বাসের ওঠানামার ক্ষীণ শব্দটুকু যেন বারবার উচ্চারণ করছে ওই বাক্যাংশটুকু।

মানসী এখনো বসে আছে কাঠের মতো কঠিন হয়ে, যেন শুয়ে পড়বার একান্ত ইচ্ছাটাকে দমন করাই ওর কৃচ্ছ্রসাধন। ক্লান্ত দেহ-মন যতোই মিনতি করুক, উচ্চাসনস্থিত মানুষটার নিজের হাতে বিছিয়ে দিয়ে যাওয়া শুভ্র শয্যাটুকু যতোই লোভের হাতছানি দিক, মানসী শিথিল হবে না কিছুতেই। বিছানার কোণটা উল্টে রেখে বসে থাকবে চুপ করে।

নিশ্বাসের ওই গাঢ় শব্দটুকু এতো অপরিচিত লাগছে কেন? ওর নিশ্বাসের শব্দ কি কোনোদিন শোনেনি মানসী? শুনেছে বৈকি, কিন্তু সে শব্দ শুধু দীর্ঘনিশ্বাসের।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে মানসী। কেন? কেন? কেন ও ওর উচ্চাসনে স্থির থাকবে? কেন নেমে আসবে না নীচে? যেখানে মানসীর ভয় আতঙ্ক আর প্রতীক্ষা, সেই খাদের অন্ধকারের নীচে? কেন বারেবারে ওই লোকটাই প্রমাণিত করবে মানুষ জানোয়ার নয়!

জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই জেতার যে দুরন্ত আত্মপ্রসাদ, সে আত্মপ্রসাদ মানসীকে পেতে দেবে না কেন ও? ঈর্ষা আর রাগের জ্বালাতে ছটফট করতে থাকে মানসী প্রতিক্ষণটুকু।

প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে থাকে ভয়ঙ্কর একটা কিছুর।

প্রতিমুহূর্তে তীব্র আকর্ষণে টেনে নামিয়ে আনতে ইচ্ছে করে ওকে ওর উচ্চাসন থেকে।

নারীহৃদয় কি সবক্ষেত্রেই এমনি কতকগুলো পরস্পর বিরোধী ভাবের সমষ্টি, না কেবলমাত্র মানসীই এমন ব্যতিক্রম?

আস্তে আস্তে ক্রমশঃ কমে আসে আক্রোশের জ্বালা, কখন পূর্ব আকাশ থেকে নেমে আসে দেবতার প্রসন্ন প্রসাদ। আসে ভয়ের

সমাপ্তি, ভয়ঙ্করের সমাপ্তি !

সার্শির কাঁচে এসে লেগেছে ভরসার উজ্জ্বল রক্তিমাভা ! সেই কাঁচে মাথা হেলান দিয়ে চোখটা বুজে মনে মনে ওই পরম দেবতাকে প্রণাম জানালো মানসী। এখন লজ্জা করছে গতরাত্রির বিচলিত বিহ্বলতাকে স্মরণ করে, এখন আশ্চর্য লাগছে নিজের দুর্বলতা ভেবে।

"সারারাত বসেই কাটালে ?"

চমকে চোখ খুললো মানসী। কখন কোন ফাঁকে কি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো ? তাই টের পায়নি, কখন প্রফেসর নেমে এসেছেন আপার বার্থ থেকে, কখন স্নান সেরে নিয়েছেন ? চোখ খুলে দেখলো সামনে সেই সদ্যস্নাত মূর্তি !

"কেটে তো গেলো !" মৃদু হাসল মানসী।

"স্নান করবে না ?"

"স্নান করবো'না এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে যাবো কেন ?" সহজভাবে হেসে ওঠে মানসী, "রাগের আইনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করবার একটা বিধি আছে বটে, কিন্তু স্নান ত্যাগের বিধি তো—"

"প্রথম বিধিটা তো পালন করা হলো, কিন্তু ভাবছি, রাগ কেন ? সত্যিই কি তার কোনো কারণ আছে !"

মানসী আবার জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলো।

স্টেশন প্লাটফরমে ভোরের সমারোহ শুরু হয়ে গেছে।

লাইটের আলো নয়, আকাশ থেকে এসে পড়া আলোর বন্যায় এখুনি ভেসে যাবে চারিদিক ! কামরার দরজা আবার খোলা হয়েছে। তাই গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে পাশে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে একটি মধুর আলস্যের ভঙ্গী করে মানসী বলে, "অকারণটাই কারণ !" চাপাহাসির ব্যঞ্জনাটুকু রাতজাগা ক্লান্তক্লিষ্ট মুখটায় বেমানান লাগে, তবু ভালো লাগে।

"চা খাওয়া হবে ?" প্রশ্নকারীও মৃদু হাসে।

"স্নানটা সেরে আসি, তুমি খাওনা ততোক্ষণ।"

"থাক্, ও উপদেশটা না দিলেও চলবে !"

"কিন্তু—"

"কি কিন্তু ?"

"কিছু না। আচ্ছা প্রস্তুত হও, আসছি।"

স্নানের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে স্নান ঘরে ঢুকে মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী। এইমাত্র যে 'কিন্তু'কে 'কিছু না' বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে তার কথাই ভাবতে লাগলো।

'কিন্তু'কে ঝেড়ে ফেলে না দেওয়াটাও যে হাস্যকর! কুলত্যাগিনী মানসী শুদ্ধাচারিণী হিন্দুবিধবার জিদ নিয়ে যদি স্টেশনের চা খেতে না চায়, তার চাইতে হাস্যকর আর কি আছে ? তবুও কিন্তু।

কিন্তু শুধু চায়েতেই তো পরিসমাপ্তি ঘটবে না ? নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসবে দুপুর বিকেল রাত্রি !

রাত্রি ! আবার রাত্রি ! আসবে বৈ কি ! কতো রাত্রি আর কতো সকাল আসবে এখনও মানসীর জীবনে, তার কি কোনো হিসেব আছে ? কিন্তু সে কোন মানসীর ?

তবু ভালো লাগলো, ভারী ভালো লাগলো ! নিজেই সুন্দর করে তুললো মানসী এই সকালের পরিবেশটি। নিজেই সেই রাত্রের বন্য-ব্যবহারের গ্লানিটা যেন হাসি কথার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে মুছে নিতে চায় সে !

অতএব —ঢালো আরো দু' পেয়ালা চা, কেনো গোলাপী রেউড়ি, খোঁজ করো কাগজওয়ালা বাংলা কাগজ এনেছে কি না !

গাড়ি এখন ছুটবে নির্মল আকাশের নীচে উজ্জ্বল আলোয় নেয়ে। সবুজ শ্যামল রোদে-ঝলমল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে।

"আমাদের গন্তব্যস্থানটা কি ?"

"তুমিই বলো !"

"আমি বলবো মানে ? কোনো একটা জায়গার টিকিট তো কেনা হয়েছে ?"

"তা হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে যে নামা যায় না তা তো নয় ?"

"মাঝখানে নেমে পড়ার কথাই ওঠে না। রেলগাড়ির মতো সুন্দর

জায়গা আর আছে? শুধু এইভাবে গাড়িতে গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"চমৎকার হয়," প্রফেসর চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচ দুটো মুছতে মুছতে গম্ভীর বেদনাময় স্বরে বলেন, "সুন্দর হয়, যদি পৃথিবীর আবর্তনের হিসেব থেকে রাত্রিটা মুছে যায়!"

খানিকক্ষণ নীরবতা! প্রফেসর খবরের কাগজটা তুলে ধরলেন মুখের সামনে, মানসী তাকিয়ে বসে থাকলো বাইরের দিকে।

হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানসী বলে ওঠে, "সত্যিই যদি তাই হতো!"

"কি হতো!"

"যদি দিন রাত্রির হিসেবের খাতা থেকে রাত্রিটা মুছে যেতো!"

"হ্যাঁ, কাল সারারাত শুধু এই কথাটাই ভেবেছি! ভেবেছি যদি আমাদের জীবনের দিনগুলো শুধু দিনেরই সমষ্টি হয়, রাত্রির বালাই না থাকে, কেমন হয়!"

মানসী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "প্রশ্নের উত্তরটা কি ঠিক করলে?"

"শুনতে চেও না!

"কেন? বলো, বলো তুমি—"

"সত্যি শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ!"

"উত্তর এই, রাত্রিহীন দিন নিতান্তই অর্থহীন!"

মানসী স্তব্ধ হয়ে গেলো!

কি যেন একটা স্টেশনে এসে থামলো গাড়িটা, কিছু গোলমাল উঠলো, একটা কাঁচের চুড়িওয়ালা জানালার কাছে এসে সাধ্যসাধনা করে গেলো, একটা পাকা পেয়ারাওয়ালা দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় জানালার কাছ বরাবর তার ডালায় সাজানো জিনিসগুলো যে পাকা, 'পাকা' পেয়ারাই সে সম্বন্ধে তারস্বরে ঘোষণা করে গেলো, কেউ উঠলো, কেউ নামলো, গাড়ি কোনো দিকে তাকালো না, যথানির্দিষ্ট সময়ে স্টেশন ছেড়ে চলে গেলো নিষ্ঠুরের মতো উদাসীন মহিমায়!

অসহিষ্ণু হাতে প্রফেসরের মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজখানা টেনে সরিয়ে দিয়ে মানসী পূর্বকথার জের টেনে বললো, "ও কথা বললে কেন ?"

"কোন কথা ?"

"এই যে শুধু দিনটা অর্থহীন ?"

"কথাটা সত্যি বলে।"

"কিন্তু আমরা তো ছেলেমানুষ নই ?"

"নই, তার প্রমাণ দিতে পারলাম কই ?"

"আমরা কি তা' বলে হার মানবো ?"

"হার তো মানলামই। ভয় করা মানেই হার মানা। 'সঞ্চয়িতা' তোলা থাকলো তোমার বাক্সে, আমার বাক্সে থেকে গেলো মাঝরাতে মজা করে কফি খাবার সরঞ্জাম, দু'জনে শুধু দুই চোখ ঢাকা দিয়ে পৃথিবীর আদিম অন্ধকারের বিভীষিকা দেখলাম।"

মানসীর মুখে কথা জোগাবে কি, ওর চোখের নীচে যে জোয়ার উঠেছে ঠেলে! তবু বাঁধ দিতে চেষ্টা করতে হবে বৈ কি। হাসির আভাস আনতে হবে মুখে। "জেগে জেগে ভাবলে আবার কখন ? সারারাত তো ঘুমোলে পড়ে পড়ে ?"

"ঘুম ? তা' হবে।"

"কিন্তু শোনো—"

"কি ?"

"তুমি যে বলেছিলে মানুষ জানোয়ার নয়।"

"হ্যাঁ। সে কথা আমি মানি, কিন্তু এও জানি মানুষ পাথরের পুতুলও নয়।" পড়ে পুরনো করে ফেলা খবরের কাগজখানা আবার সামনে তুলে ধরলেন প্রফেসর।

তবু দেখতে পেলো মানসী, সেই স্বল্প অবসরেও দেখতে পেলো, সেই চিরশান্ত সৌম্য মুখের রেখায় রেখায় একটা অপরিসীম যন্ত্রণার ছাপ। রংটা কালি মাড়া। এই ছাপ মুছিয়ে নেবার জন্য কিছুক্ষণ আগে কতো ছেলেমানুষী করেছে মানসী, করেছে কতো বাচালতা,

করেছে ছুটুনী আর খুনসুটি। সবই বৃথা হয়ে গেছে তা'হলে?

মনে ভাবলো, যাবে না কেন? যেখানে বাসা বেঁধেছে কালনাগ, সেখানে বাইরে চন্দন মাখিয়ে বাতাস করলেই কি রোগী শীতল হবে? মানসীই তা'হলে কালনাগিনী?

আচ্ছা ও কি জানে, মানসীর জীবনের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে উনচল্লিশটা বর্ষা শরৎ বসন্ত?

ওকে কি সে সংবাদটা জানিয়ে দেবে মানসী?

বলবে, 'আমাদের প্রেম তো দেহকে আশ্রয় করে নয়, তার সাধনা দেহাতীতের!' বার বার ভাবে বলবে, তবুও বলতে পারে না। মনে হতে থাকে, এ কথায় বুঝি ও আহত হবে, অপমানিত হবে। তা'ছাড়াও? তা'ছাড়াও যে কিছু আছে।

মনের গভীরে যে একটা বিপরীত সুর বাজছে!

দিনের পর রাত্রি এলোনা, দিনই এলো। অন্তত সেদিন এলো। নেমে পড়লেন প্রফেসর। ডাকলেন, "কুলি! কুলি!"

মানসী অবাক হয়ে বলে, "হরিদ্বার পর্যন্ত টিকিটের মেয়াদ বলেছিলে যে?"

প্রফেসর বাইরের দিক থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, "এ কথাও তো বলেছিলাম মাঝখানে নেমে পড়লে আইনের দায়ে পড়তে হবেনা।"

"কিন্তু নামলে কেন?"

"কেন? নামলাম গাড়ি বদলাবো ব'লে। যে গাড়িতে রাত নেই, এখন শুধু সেই গাড়িতে চলা!"

"যে গাড়িতে রাত নেই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে শুধু ভিড় আছে।"

"আর জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার পেটের মেয়ে ছিলে বাছা", বৃদ্ধা মহিলাটি মানসীর হাতের ওপর শরীরের সমস্ত ঝুঁকিটা দিয়ে খুঁড়িয়ে

হাঁটতে হাঁটতে বিগলিত বচনে বলেন, "নইলে .একালে কে কার জন্যে এতো করে ?"

যদিও নিতান্তই ঘাড়ে এসে পড়া ব্যাপার, তবু মানসী সৌজন্য দেখিয়ে বলে, "কি যে বলেন, এটুকু আর কে না করে ?"

"করে না মা, করে না। জগতকে তো চেনোনি এখনো, বয়েস কাঁচা আছে। যতো দিন যাবে, বুঝবে দুনিয়াখানা কেমন। এই যে আমি বিদেশ বিভূঁয়ে এসে এই ঘোর বিপদে পড়লাম, এ কিসের জন্যে ? মানুষের বেআক্কেলের জন্যেই তো ? নইলে আমি একটা বুড়ি জ্যেঠি দূরদূরান্তর থেকে আসছি, ছ্যাওরপো তুই, তোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, আর তুই কিনা ইষ্টিশানে নিতে এলি না ? তোমরা যাহোক ছিলে, তাই না বাঁচলাম !"

মানসী হতাশভাবে একবার অদূরবর্তী মানুষটার দিকে তাকালো, কিন্তু লাভ হলোনা কিছু, সামনে এগিয়ে চলেছে সে, শুধু পিঠটা দেখা যাচ্ছে তার। কি বিপদ ! যে গাড়িতে 'রাত' নেই, শুধু ভিড় আছে, সেখান থেকে কেমন করে যে এই মহিলাটি ভিড়ে পড়লেন মানসীদের সঙ্গে !

অপরাধের মধ্যে ভিড়ের ঠ্যালায় কে তাঁর পা মাড়িয়ে দিয়েছিলো দেখে মানসী 'আহা' করেছিলো। সেই যে তিনি পেয়ে বসলেন, আর ছাড়লেন না, তারপর এই বিপদ ! তাঁর ছ্যাওরপো নাকি কিছু দিন হলো সপরিবারে হরিদ্বারে এসেছেন, কাজেকাজেই তিনি 'দড়িছেঁড়া' অবস্থায় বাড়িতে ভাইপোদের উত্যক্ত করে মেরে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। একটা ভাইপো বুঝি হাওড়া থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত এসেছিলো, তারপর একাই আসছেন ! ভরসা এই, হরিদ্বারে অবস্থিত দেবরপুত্র স্টেশনে উপস্থিত থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে। কিন্তু দেখো ব্যাপার। 'কা,কস্য পরিবেদনা ।'

মানসী সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলে, "খুব সম্ভব চিঠি পাননি। না হ'লে এ রকম করবেন কেন ?"

বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন "না, চিঠি পায়নি ! হলেই হলো। পাছে

ন' পায় বলে বেয়ারিং চিঠি দিয়েছে, অমনি না? তা' নয় গো তা' নয়, এসব ওর বৌ ছুঁড়ির বজ্জাতি। সোয়ামীকে কুশিক্ষা দিয়েছে— যেও না, এনোনা, মরুক বুড়ি।"

মানসী হেসে ফেলে বলে, "তা'তে তার লাভ?"

"শোনো কথা। মেয়ে যেন জগতের কোনো খলকাপট্যি দেখেনি! আমি এলেই তো ওনাদের সুখের হন্তারক হবো গো, তাতেই রাগ! এলো যখন, তখনই বলেছিলাম 'আমায় নিয়ে চল।' সত্যি বলবো, ছোঁড়া তেমন অমত করেনি, কিন্তু ওই বৌটি শয়তানের ধাড়ি, কিছুতে নিলোনা সঙ্গে। সাত বায়নাক্কা। এ অসুবিধে হবে, সে অসুবিধা হবে, আপনি 'শুচিবাই,' এই সব কথা। আমিও মনে সংকল্প করে রেখেছিলাম, রও তুমি, তোমার একা একা সুখ ভোগ করা বার করছি আমি! সেই ইস্তক ভাইপোদের বলে বলে তবে এই টাকা কটা যোগাড়! বেশ, না নিতে এলি না নিতে এলি, এ রাজ্যে কি আর তোর বাসা ছাড়া জায়গা নেই? ধর্মশালায় উঠবো।...বুঝলে মেয়ে ধর্মশালা তো সর্বত্রই আছে? চল একসঙ্গে উঠি গিয়ে।"

মানসী কাঁটা-দিয়ে-ওঠা গায়ে নিষ্প্রাণ গলায় বলে, "তাই কি হয়? আপনার নিজের লোক যখন রয়েছেন। যাহোক করে খুঁজে বার করে—"

"থামো বাছা! নিজের লোকের কাঁথায় আগুন! কথায় বলে 'আপনার চেয়ে পর ভালো, ঘরের চেয়ে বন ভালো'। এই যে তুমি সেই ইস্তক আমার ঘটি পুঁটলি বইছো কিসের সুবাদে? আর আমার ছ্যাওবপো বৌটি? সঙ্গে নিয়ে যদি কালীগঙ্গা করতে বেরোলাম, না ভিজে কাপড়খানা ধরবে, না ঘটিটা পুঁটলিটা বইবে, গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে যাবে।"

একদিকে বৃদ্ধার শরীরের সমস্ত ভার, অন্য হাতে পুঁটুলি ও ঘটি, এই নিরুপায়ের বেশে মানসী স্টেশন থেকে রওনা দিচ্ছে, কে জানে কোথায়! প্রফেসর সেন নিতান্তই ভদ্রতার বশে বিপদগ্রস্ত বৃদ্ধাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তার শাস্তি এই!

স্টেশন থেকে বার হতে না হতেই ছেঁকে ধরেছে গাড়ি আর গাড়িবানেরা! টাঙা, রিকশা! যাত্রীর চাইতে যান বেশি, অতএব ভাবনার কিছু নেই। শুধু গন্তব্যস্থানটা একবার বলে দেওয়ার ওয়াস্তা! মানসী একটু দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রফেসর অনেকটা এগিয়েছেন। আচ্ছা মানুষ তো, পিছন ফিরে দেখার নাম নেই। মানসীর এই বিপন্ন অবস্থাটা খুব উপভোগ করা হচ্ছে আর কি!

দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকে, "এই শুনছো, ইনি কি বলছেন শোনো!"

প্রফেসর সেন একখানা টাঙাকে হাতের ইশারায় ডেকে, বৃদ্ধার নিকটে এসে বলেন, "কি বলছেন?"

"বলছি ঠিকানা খোঁজা-খুঁজিতে আর কাজ নেই, এখন তুমি আমাকে তোমাদের সঙ্গে ধর্মশালাতেই তোলো। তারপর দেখছি আমি, সেই ভিজে বেড়াল শয়তানটাকে এ শহর থেকে বার করতে পারি কি না! কিছু না হোক, 'হরকী প্যারির' ঘাটে তো আসতেই হবে বাছাধনকে!" বেশ একটি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন মহিলাটি।

মানসী প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেখানেও অবশ্য বিব্রত বিপন্নের ছাপ। সেই বিব্রত ভাবেই প্রফেসর সেন বলে ওঠেন, "দেখুন, মানে, আমরা যে কোনো ধর্মশালাতেই উঠবো তারও ঠিক নেই—"

"ওমা সে কি! এই যে তোমার বোন এখুনি বললো—বোধহয় ধর্মশালাতেই ওঠা হবে।"

প্রফেসর একটা গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি ফেললেন মানসীর দিকে। যেন, 'এ আবার কি! এরকম অদ্ভুত পরিচয় দেওয়ার অর্থ?'

কিন্তু পরিচয় কি মানসী দিয়েছে? বৃদ্ধা নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এবং এমন ভাবে বলে চলেছেন যে প্রতিবাদ করবার আর অবকাশই পায়নি বেচারা। আর প্রতিবাদ করলেই বা কোন ভাষায়?

তা'হলেই তো আর কোনো একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে পরিচয় দিতে হবে? কি সেই সম্পর্ক?

মানসী শুধু চোখের ইশারাতেই নিরুপায়ের ভঙ্গী দেখায়, এবং

আশ্চর্য এই, ছানিপড়া চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টিতেও সে ইশারা ধরা পড়ে যায়। বৃদ্ধা সহসা মানসীর উপর থেকে দেহভার সরিয়ে নিয়ে নীরসস্বরে বলেন, "পয়সাকড়ি তোমাদের কিছুই লাগবে না বাছা, সে সম্বল আমার আছে। শুধু একত্র একটা ঘর নেওয়া মাত্র। এতে তোমাদের ক্ষতি কিছুই হবে না।"

"না না, ক্ষতি কিসের? মানে কোথায় থাকবো, কিছু ঠিক নেই কিনা, তাই বলছি।"

"ঠিক নেই আবার কেমন কথা?" মহিলাটি প্রফেসর সেনের উপর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "বিদেশ বিভুঁই জায়গায় এসেছো, থাকার জায়গার একটা ঠিক না করে? এখন কি তা'হলে ওই 'ছুকরি' বিধবা বোন ঘাড়ে করে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?"

"আপনি ভুল করেছেন।" মানসী সংকল্পমন্ত্র পাঠের সুরে বলে, "উনি আমার ভাই নন।"

"ভাই নয়!" বৃদ্ধা ভুরু কুঁচকে বলেন, "ভাই নয়? তবে আবার ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবার গরজ কার হলো? ভ্যাওর বুঝি?"

"না।"

"না?"

বৃদ্ধা বোধ করি অজ্ঞাতসারেই মানসীর স্পর্শ থেকে খসে পড়ে আরো বিরস কণ্ঠে বলে, "ভাই নয়, ভ্যাওর নয়, কে তবে উটি তোমার?"

"কেউ না।"

"কেউ না? অ! বুঝেছি। তাই সন্দ করছি তখন থেকে, 'দাদা' বলে একবার ডাকে না কেন?"

সহসা বৃদ্ধা একটা হ্যাঁচকা টানে মানসীর হাত থেকে তাঁর সম্পত্তিটি টেনে নিয়ে নিজে বাগিয়ে ধরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, "বলি বাছা নিজের মাথাটি না হয় খেয়েছো, তাই বলে এ বুড়ির মাথা খাওয়া কেন? এই পুঁটলির মধ্যে আমার ঠাকুরদেবতা ছিষ্টি। আর তুমি সর্বস্ব ছুঁয়ে এক করলে? নারায়ণ! নারায়ণ!"

খুঁড়িয়ে হাঁটার কথা ভুলে বৃদ্ধা বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে একখানা সাইকেল রিকশার ওপর চেপে বসে ঝাঁসির রানীর ভঙ্গিমায় বলেন—"চল 'হর কী প্যারি'। নারা—য়ণ! নারা—য়ণ!"

মিনিট খানেক স্তব্ধ থেকে প্রফেসর হেসে বলেন, "আর কখনো পরোপকার করবে?"

মানসী এ কথার জবাব দেয় না, দাঁতে ঠোঁট চেপে বলেন, "এখান থেকে ফেরার গাড়ি কখন?"

"সে কি?"

"হ্যাঁ। দেখো খোঁজ করে। এ দেশের মধ্যে আর কিছুতেই ঢুকবো না আমি!"

"কি আশ্চর্য।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব আশ্চর্য। আমার আগাগোড়াই আশ্চর্য।"

"কিন্তু এখুনি কি কোনো গাড়ি—"

"বেশ, ওয়েটিঙ্‌ রুমেই বসে থাকবো।"

প্রফেসর গম্ভীরভাবে বলেন, "কিন্তু বাইরে ঘুরে বেড়ালে এসব ঝড়ের সামনে তো পড়তেই হবে?"

পড়তেই হবে! পড়তেই হবে এ রকম ঝড়ের সামনে?

কিন্তু আর কতো রকমের ঝড় ঠেকাবে মানসী? অনেকদিন ধরে অনেক ঝড় তো বয়ে গেলো ওর ওপর দিয়ে।

"আমরা কি কলকাতায় ফিরে যাবো?"

ছায়ামূর্তির মত ঝাপসা ঝাপসা গলায় উচ্চারিত হলো, "আমরা কেন ঘুরছি!"

"তা জানিনা।" তেমনি একটা ঝাপসা গলারই উত্তর এল, "শুধু জানি, কলকাতায় ফিরে যাওয়া যাবেনা।"

"তা' হলে?"

আরো ঝাপসা আরও অস্পষ্ট এই স্বর। এ যেন অপর কাউকে

প্রশ্ন নয়, নিজের মনের মুখোমুখি বসে, এক অসহায় জিজ্ঞাসা।

তা' হলে।

সত্যিই তো তাহলে কি! শুধু ঘুরে বেড়াবে ওরা সারা জীবন? কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ কোন গতিপথে ঘুরবে? শূন্যলোকের অমোঘ নিয়মে তারা কি তাহলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে না? যাবে না ধ্বংস হয়ে?

ক্লান্ত নারীকণ্ঠ আবার উচ্চারণ করে, "মানুষের দৃষ্টির বাইরে, অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে, আমরা কি শুধু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারি না?

উত্তরের পুরুষকণ্ঠ যেন জ্বালাভরা ক্ষোভের, "না। পৃথিবীর কোনখানে কোথাও এমন জায়গা নেই, যেখানে মানুষের দৃষ্টি নেই!"

না, কোথাও নেই তেমন জায়গা। প্রমাণ হয়ে গেছে সে কথা।

হরিদ্বার থেকে ছিটকে চলে এসে তেমন একটু জায়গাই তো খুঁজেছিল তারা। এক চিলতে ঠাঁই।

'ঘর' নয়, আশ্রয়।

নীড় নয়, শুধু চারখানা দেওয়ালের ঘের দেওয়া একটুকরো জমি।

তাই বা মিলেছিল কই?

সমস্ত পৃথিবী যে সন্দেহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ উঁচিয়ে সজাগ হয়ে বসে আছে। বিষদৃষ্টি হেনে প্রশ্ন উদ্যত করে রেখেছে, "ভাই নয় কেউ নয়, তবে ও তোমার কে?" ভুরু বাঁকিয়ে বলছে, "তোমাকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবার গরজ ওর কেন?"

একজন পুরুষ, আর একজন নারী। যে নারীর সীমান্তরেখায় নেই সিঁদুরের ছাড়পত্র।

এখানে সন্দেহের শেষ নেই, এখানে বিশ্বাসের প্রশ্ন নেই।

"ঘর চান? ক'খানা?"

ক'খানা! তাই তো!

এ প্রশ্নের উত্তর তো ভেবে রাখা হয়নি। তাড়াতাড়ি ভেবে নিতে হয়, "ক'খানা আবার? দু'খানা।"

"সঙ্গে উনি?"

"সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে হন উনি আপনার?"

ভাই তো বোন নয়, মেয়ে নয়, কে তবে?

"ভাগনি?"

"ভাইঝি?"

"বিধবা ভাজ?"

"কেউ না?"

"না, কেউ না।"

"অ! কোন সম্পর্ক নেই? তা' আমাদেরও মশাই ঘর নেই।"

"ঘর চান? ক'জন মেম্বার? মাত্র এই দু'জনই নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বুঝেছি। না মশাই, তেমন কোন ঘর আমাদের নেই।"

দ্বার থেকে দ্বারে, পথ থেকে পথে। সন্দেহ কি এক রকম?

"ঘরভাড়া চান? নিয়মিত ভাড়া দিতে পারলেন তো? করা হয় কি? চাকরি বাকরি? এতদিন ছিলেন কোথায়? বদলী হয়ে এসে পড়েছেন? কোন অফিসে? কলকাতায় কোথায় থাকতেন?"

প্রশ্নের ধাক্কায় ছিটকোতে ছিটকোতে হরিদ্বার থেকে আরো কত দূর চলে আসতে হয়েছে, কোথাও নেই প্রশ্নহীন পৃথিবী।

আছে। আছে সে পৃথিবী।

তুমি ছোট হও, নির্লজ্জ হও, ইতর হও, পৃথিবী আর কোন প্রশ্ন করবেনা। শুধু একটুখানি ঘৃণার দৃষ্টি ফেলে বলবে, "ও! আচ্ছা! থাক্—সরে বস, কাছ ঘেঁসতে এসোনা।"

কিন্তু ছোট না হতে পারলে? নির্লজ্জ না হতে পারলে? ইতর হতে না পারলে? দাঁড়াও জেরার মুখে, বল সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করবার তুমি কে?

তাই নিজের মনকে প্রশ্ন করো, "তাহলে?"

"চল আমরা আবার পুরী যাই।" জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া

নির্বোধ খেলুড়ের হতাশা নিয়ে বললেন প্রফেসর সেন।

"পুরী!" কষ্টে উচ্চারণ করলো মানসী।

"হ্যাঁ পুরীই। দেখি সেখানটা আজও সেইরকম আছে, না ভয়ঙ্কর রকমের বদলে গেছে।"

"হয়তো কিছুই বদলায়নি, হয়তো সমস্ত পৃথিবীটাই অবিকল তেমনি আছে, শুধু আমরাই বদলে গেছি!"

"ওখানে গিয়ে—" ব্যগ্র প্রশ্ন করেন প্রফেসর, "আবার আগের মতো সহজ হওয়া যায় না? স্বাভাবিক হওয়া যায় না? সেখানে তোমার বাড়িতে তুমি আর আমার বাড়িতে আমি? আর তেমনি শুধু দিনে একবার দেখা হওয়া, শুধু একবারের জন্যে সমুদ্র তীরে বসে থাকা, এ কি একেবারেই হতে পারে না?"

"সেখানেও তো পরিচয় চাইবে?"

"বললাম তো"—প্রফেসর যেন সত্যিই এক নতুন আলো দেখতে পেয়েছেন, পেয়েছেন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের শান্তি, তাই আরও ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন, "তোমার বাড়িতে তুমি, আমার বাড়িতে আমি। তেমনি রোজ দেখা হওয়া।"

"কিন্তু সে কতদিন? কোনখানে তো কোন সমাপ্তি রেখা টানতে হবে?"

"নিজে হাতে করে নাই বা টানলাম আমরা কোন রেখা। মৃত্যু তো আসবেই একদিন, জীবনের প্রান্তে রেখা টেনে দিতে?"

মানসী হাসে। ক্ষুব্ধ হাসি।

"যতদিন সেই পরম বন্ধু এসে সমস্যার সমাধান না করছেন ততদিন তো কতকগুলো বাস্তব সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। অবশ্য সমুদ্রের বালিতে ঝিনুক কড়ির বদলে টাকাকড়ি ছড়ানো থাকলে সে সমস্যা মিটতো।"

"ততদিন যা আছে চলুক না।"

"কথাটা বড্ড গতানুগতিক," মানসী তেমনি ক্ষুব্ধহাসি হাসে, "তবু আর কোনো কথা মনে আসছে না বলেই বলছি, আমার জন্যে তো তোমার সব গেল—ধর্ম কর্ম, ইহকাল পরকাল—"

"পরকালের কথাটা ঠিক জানিনা, ওটা কিসে থাকে কিসে যায়, তবে ইহকালটা ঠিকই আছে। আর ধর্ম? সেটা ষোল আনাই আছে।"

"তা হলে কর্মটাই গেল?" হেসে উঠল মানসী, অনেকদিন আগের মত।

"ওটাও যায়না। পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়ানো আছে কর্মের সম্ভাবনা।"

"তাহলে জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রই শেষ ক্ষেত্র?"

"না মানসী, হয়তো ওটাই প্রথম ক্ষেত্র। ওখানে গেলে হয়তো আমরা নিজেদেরকে সত্যি করে চিনতে পারবো।"

"কিন্তু—" মানসী অসহায় চোখে তাকায়, "ওখানে যেতে পারবো? পারবো থাকতে? সে বাড়িটা তো আজও আছে? আছে সেই রাস্তা, সেই সমুদ্র?"

দুজনের মনেই সুখময় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই তাঁর প্রসন্ন প্রশান্তি হাসি বুলানো মুখ নিয়ে। সেই রাস্তায়, সেই সমুদ্রের কিনারায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে না তো তার সঙ্গে? দেখা হতেই বলে উঠবেন না তো, "কি মানসী, কি হে প্রফেসর, তোমরা এই?"

কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী দুরপনেয় কলঙ্ক! অসহনীয় জ্বালা! এ কলঙ্কের জ্বালা নিবৃত্ত করার আর কোন্ উপায় আছে, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা ছাড়া? না, আর কোনো উপায় নেই। বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারে গৌতম, পালিয়ে যেতে পারে পাড়া থেকে, দেশ থেকে, আত্মীয় সমাজ থেকে, কিন্তু তা'তে কি হলো? পৃথিবী থেকে পালাতে না পারলে, তা'র যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো পথে, যে কোনো শহরে গ্রামে স্টেশনে ধর্মশালায়, দেখা হয়ে যেতে পারে তো দুটো মানুষের সঙ্গে, এক সঙ্গে!

তখন? তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে কী করতে পারবে গৌতম?

না, কিছু করতে পারবে না।

এ যুগের পৃথিবী কোনো অবস্থাতেই দ্বিধা হন না, সত্যিকার

সংসারের মানুষেরা কেউ মানসিক যন্ত্রণায় হার্টফেল করে না।

অতএব সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে কিছু করবার থাকবে না গৌতমের। তবে যা করবার এখনই নয় কেন? এখনই এই মুহূর্তে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার একটা উপায় আবিষ্কার করা যায় না?

আশ্চর্য! বাড়িতে কেন কোন কিছু থাকে না? বিষ নয়, ভয়ঙ্কর ধারালো একটা অস্ত্র নয়, একটা দড়ি ঝোলাবার মত আংটা সীলিঙে নয়!

এখন, এত রাত্রে কোথা থেকে কী জোগাড় করতে পারবে গৌতম? গুম্ হয়ে বসে ভাবতে ভাবতেই রাত শেষ হয়ে গেল, আর আশ্চর্য, ঠিক শেষ হ'বার একটু আগেই গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লো সে। অত বড় জ্বালার যন্ত্রণা সত্ত্বেও ঘুম এসে গেল।

আর সেই ঘুম ভাঙলো নিত্য নিয়মে বেষ্টর ডাকে নয়, একখানি মমতা-মধুর করস্পর্শে।

"এই ওঠোনা, এত বেলা অবধি ঘুমোও তুমি?"

চোখ দুটো লাল লাল, দৃষ্টিটা শূন্য শূন্য, যেন জীবনের সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

শিখা আর একবার তেমনি স্নেহে কপালটা ধরেই একটু নাড়া দিল, "কী চিনতে পারছো না নাকি? আমি কিন্তু স্রেফ্ কম্‌লি তাড়ালেও যাবো না, না চিনলেও চিনিয়ে ছাড়বো। উঠে পড় দিকি। তোমার অবস্থা দেখে ভয়ই হ'লো, বুঝি আবার সেই রকম জ্বরে পড়েছো।"

হঠাৎ উঠে বসলো গৌতম, প্রায় বিদ্যুৎবেগে চাপা গলায় ধমকে উঠলো, "কী বাজে বকছো বকবক করে?"

শিখার বোধ করি আজ অক্রোধের ব্রত, তাই এহেন সম্ভাষণেও হেসে ওঠে। হেসে বলে, "তা বক্‌বকম করবার উপায় যার নেই, সে বকবক ছাড়া কী করবে? যাক্, তোমার যা হিংস্র দৃষ্টি দেখছি আঁচড়ে কামড়ে বসাও বিচিত্র নয়। কিন্তু কিসের তোমার এই আগুন, এ আমাকে দেখতেই হবে।"

"তুমি যাবে?" উঠে পায়চারি করছিল গৌতম, কাছে এসে বসলো, "চলে যাও।"

শিখা, অকম্প শিখা।

"চলে যাওয়া অসম্ভব। একজন লোক যখন নিজের বাড়িতে বসে তার অতিথিকে সহজেই বলতে পারে 'চলেযাও', তখন অনায়াসেই বোঝা যায় তার ব্রেনটা আর সহজ নেই। অতএব ছেড়ে চলে যাওয়া অমানুষিকতা।"

"বেশ আমিই চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু দরজরে দিকে এগোবার আগেই শিখা এগিয়ে গেছে বিদ্যুতশিখার মত। দরজার পাল্লা ছুটো ঝপাঝপ্ ভেজিয়ে দিয়ে তা'তে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকের সুরে বল্লে, "না, যাবে না। বেশি চেঁচামেচি করতো দরজায় খিল লাগিয়ে দেব।"

"তা' দেবে বৈকি। অনায়াসেই দেবে, মেয়েমানুষের পক্ষে অসম্ভব কি আছে?"

ভুরু ছুটো কুঁচকে উঠলো শিখার, কুঁচকে উঠলো ঠোঁট, "কেবলি এত বড় বড় কথা কিসেব? মেয়েমানুষের কি জানো তুমি? কবে জানলে? বল, বল শিগগির।"

"তোমার কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।"

"কিন্তু আমি তো উত্তর না নিয়ে নড়বো না।"

"তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছো কেন বলতে পারো?"

"তুমিই বা আমার সঙ্গে এরকম করছো কেন বল তো? দেখতে পাচ্ছো না তোমার জন্যে মরে যাচ্ছি আমি। তোমায় না হলে চলবে না আমার, তবু একটু ভদ্রতা হয়না?"

"ভদ্রতা! চমৎকার!"

হঠাৎ এক ঝটকায় দূরের মানুষটা একেবারে কাছে সরে আসে যতটা কাছে আসা সম্ভব, ধমকের সুরের বদলে চমকের সুরে বলে, "বেশ না হয় অভদ্রতাই করো।"

"শিখা!"

"কি ?"

"তুমি বলেছিলে আমার মধ্যে সর্বদা কিসের আগুন জ্বলে। কিন্তু একথা কি বিশ্বাস কর, এমন যন্ত্রণাও থাকতে পারে, যা পৃথিবীর কারো কাছে বলা যায় না ?"

"বিশ্বাস করি। কথা দিচ্ছি আর জানতে চাইবও না। কিন্তু তোমার মনের ভারের ভাগ আমাকে দাও।"

"যে কথা বলা যায় না, তার যন্ত্রণার ভাগও দেওয়া যায় না।"

"যায়। সব ভার তুলে দিলে যায়।"

"এসব কথা আমার নাটুকে লাগে, তা'তো বরাবর জানো।"

"তবু জীবনে মাঝে মাঝে নাটকীয় মুহূর্ত আসে। আকাশ থেকে নাটক লেখা হয় না।"

"প্রেম, ভালবাসা, এসব রদ্দি জিনিসগুলো আমার অসহ্য।"

"তোমার এই ভয়ঙ্কর মৌলিক মতবাদটা শোনাবার জন্যেও তো একটা সহ্যশীল শ্রোতার দরকার ? সে পোস্টটা অতএব স্বেচ্ছায় আমিই নিচ্ছি।"

"নিচ্ছি! নিচ্ছি মানে ? দিচ্ছে কে ?"

"হাত পেতে চাইলেই দেওয়ার প্রশ্ন, জবর দখলে সে প্রশ্ন নেই।"

"সমিতিতে তো আরও অনেক ছেলে আছে। আমার ওপরেই বা এত উৎপাত কেন ?"

"তোমার কপাল আর আমার ভাগ্যদোষ। এখন ওঠো দিকি, জবরদখলটাকে আইনসঙ্গত করে নিতে কি কি হাঙ্গাম করতে হবে তার চেষ্টা দেখা যাক।"

"আমি কিছু পারবো না।"

"আচ্ছা পেরোনা। আমি মার কাছে শরণ নিইগে।"

"থামো, চুপ করো। মা নেই।"

স্বরের ভীষণতায় চমকে ওঠে শিখা, 'মা নেই' সে কেমন কথা ? তবে কি ? তাই কি ? বাবা মারা যাবার পরও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল গৌতম ? কিন্তু চাকরটা তো কিছু বললো না।

আস্তে বললো, "কোথায় মা ?"

"জানি না, এই দেখ।" মুচড়ে চটকে মাটিতে ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে শিখার কোলে ফেলে দিল গৌতম।

সেই কাগজ, সেই মানসীর দেওয়া মুক্তিপত্র।

"কী এ ? কোথায় গেলেন মা ?"

"খুব সম্ভব যমের বাড়ি।"

"তা তোমার মত ছেলের মার পক্ষে", শিখা ঝাঁজালো গলায় বলে ওঠে, "ওর চাইতে প্রশস্ত স্থান আর কি থাকতে পারে ? কখন লিখেছেন এ চিঠি ?"

"দয়া করে এ সম্পর্কে আর প্রশ্ন কোরনা আমায়।"

"নাঃ প্রশ্ন করবার আর আছেই বা কি ?" শিখা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমাদের এই সুন্দর দেশে এখনো যখন সর্বসন্তাপহারিণী গঙ্গা আছেন।"

"গঙ্গা !"

"তা' এ চিঠির অর্থ আর কি হ'তে পারে ?"

"শিখা !"

"ওকি ওমন করে হাত মুচড়ে দিচ্ছ কেন ? এই কি তোমার পাণিগ্রহণের নমুনা নাকি ?"

"আঃ। বল এ চিঠি আত্মহত্যার ?"

"পরিস্থিতির সঙ্গে ক্যালকুলেশান করলে এ ছাড়া আর কিই বা মনে হয় বল ? তোমারই মা তো, নিশ্চয় তোমার মতইসেন্টিমেন্টাল !"

"না, না, না—ভয়ানক রকমের প্র্যাকটিকাল তিনি। তুমি কিছুই জানোনা—"

"জানতেই তো চাই গৌতম !"

"সে হয় না।"

"আচ্ছা থাক, চাইব না। কিন্তু তোমাকে যে চাইই আমার। চলো কিছুদিন কোথাও যাওয়া যাক।"

"যাওয়া যাক মানে ?"

"মানে হচ্ছে কলকাতার বাইরে কোথাও। তোমার একটা চেঞ্জের দরকার! তাছাড়া—"শিখা একটু হাসে, "প্রথমটায় সঞ্জয়দা নীহারেন্দু এদের বাক্যযন্ত্রণা থেকে—"

"ব্যাপার কি তোমার? তুমি কি একেবারেই ঠিক করে ফেলেছ আমি তোমায় বিয়ে করবোই।"

"না। ঠিক করেছি আমি তোমায় বিয়ে করবোই।"

আশ্চর্য! এত বড় ধৃষ্টতাতেও ধমকে উঠল না গৌতম। তার মনের মধ্যে কেমন করে যেন একটা শান্তির প্রলেপ পড়েছে, কোনখানে ধ্বনিত হচ্ছে একটা আশার সুর।

ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে তো হয়তো তাকে বিশ্বাস করতেও পারবে গৌতম, যদি ওই একলাইন লেখার অর্থ শিখার অনুমান অনুযায়ী হয়। যদি মানসী আপন মুক্তির মূল্যে মুক্তি দিয়ে গিয়ে থাকে গৌতমকে।

মাতৃশোক! কী মধুর, কী পবিত্র! কী শান্ত!

সেই শান্ত মধুর পবিত্র সুখের আশ্বাস পেলে বুঝি পৃথিবীর সব ধৃষ্টতাই ক্ষমা করা যায়।

"আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করো!" এ কথা উচ্চারণ করলো অন্য আর এক কণ্ঠ, অন্য অনেক দূরে। "সেই বাড়িটা খুঁজে বার করো।"

"সেই বাড়িটা!"

"সেই বাড়িটা!"

হ্যাঁ সেই বাড়িটা আছে। অবিকল তেমনই আছে।

এখানে এসে বোঝবার উপায় নেই পৃথিবীর কোথাও কোন পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো মহাপ্রলয় ঘটে গেলেও পরিবর্তন হবে না।

সমুদ্র চিরদিন এমনি থাকবে, থাকবে সমুদ্রতীর।

কিন্তু বাড়িগুলো অবিকল রয়ে গেছে কি করে?

একটু চুপ করে মনে মনে ভেবে নিলো মানসী, না থাকবার কি আছে? মানসীর জীবনে যুগ যুগান্তর অতিক্রান্ত হয়েছে বলেই তো আর সত্যিই সময়ের খাতায় বহু যুগ পার হয়ে যায়নি!

সেই বাড়িটাও ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে আছে দরজায় তালা ঝুলিয়ে। হয়তো বা সেই তালাটাই, যেটা খুলে প্রথম ঢুকেছিল মানসী আর সুখময়, আর যেটা বন্ধ করে সুখময় চাবিটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিল চক্রতীর্থে না কোথায় যেন বন্ধুর আত্মীয়ের কাছে।

আর সুখময়ের সেই অনুপস্থিতির ক্ষণটুকুতে—।

"এর চাবি খোলানো যায় না?"

অশরীরী স্বরে প্রশ্ন উচ্চারিত হলো।

"সন্ধান নিতে হয়। কিন্তু সত্যিই কি এই বাড়িতেই থাকতে চাও মানসী!"

"হ্যাঁ বড্ড ইচ্ছে করছে।"

"তা'হলে আপাততঃ কোন ধর্মশালার কি কোন হোটেলে উঠে, খোঁজ করতে হবে। তবু বলছি, ভাল করে ভেবে দেখো মানসী, খুব কি স্বস্তি পাবে? আমার কি মনে হচ্ছে জান—"

"কি মনে হচ্ছে?" তেমনি ঝাপসা ঝাপসা স্বর।

"মনে হচ্ছে, যেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা খোলা গলার জোরালো হাসির আওয়াজ শুনতে পাবো।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

"ছি মানসী। ভয় দেখাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি।"

"তুমি তো থাকবে না, তুমি তেমনি তোমার সেই হোটেলেই থাকবে, আমি থাকবো এখানে। তুমি—"

"মানসী একথা সেদিন আমিই বলেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বিশেষণ দেওয়া যায়না সে কথাকে। চলো যাই এখান থেকে। এখানে, এই নির্জন বালিয়াড়িতে এই বন্ধ দরজার সামনে অকারণ আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনা, অসুস্থ বোধ করছি।"

"তবে চলো।"

"কী আশ্চর্য। এখনো বালিতে ঝিনুক ছড়ানো থাকে।"

"তার চাইতেও আশ্চর্য নয় কি, আবার আমরা সেই বালিতে হেঁটে বেড়াচ্ছি।"

"আমরা!" আবার বুঝি সেই ছায়াশরীর কথা বললো।

না, আর কোন কথা উচ্চারিত হবে না। 'আমরা'র মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে।

'নির্জন আবাস'। ছোট্ট সুন্দর একটি হোটেল।

হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবার এত্তালা চেয়ে পাঠাবার পরে খুব কুণ্ঠিত একখানি কথা ধীরে ধীরে যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, "সত্যিই কি এমন হ'তে পারেনা—দু'জনে দু' হোটেলে থাকলাম? তুমি তো বলেছিলে!"

প্রফেসর খোলা পরিষ্কার চোখে নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকেন মুহূর্ত খানেক, তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেন, "বলেছিলাম? কিছু না ভেবেই দিশেহারা হয়ে বলেছিলাম। যদি সত্যই তুমি তাই চাও, তাই হবে।"

তাই হলো।

মানসী এই ছোট্ট 'নির্জন আবাসে' আর প্রফেসর সেই তাঁর পুরনো জায়গায়, বহুবার যেখানে এসেছেন, থেকেছেন।

আগে ভয় হয়েছিল, আগে সাহস হয়নি, তারপর কেন কে জানে চট করে মনস্থির করে নিলেন।

সেই অনেকদিন আগেকার সুস্থ সুন্দর স্বচ্ছ জীবনটাকে আবার পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করতে গেলেন? না সে জীবন লোভের হাতছানি দিয়ে ডাক দিল?

হয়তো এসব কিছুই না, হয়তো শুধু যে কোন একটা জায়গায় থাকার জন্যই থাকা।

একতলার ঘর, বারান্দার কোলেই উদ্দাম সমুদ্র।

মানসী বলেছিল, "তুমি আসবে, আমি নেমে পড়বো, দু'জনে বেড়াবো ঝিনুক মাড়িয়ে মাড়িয়ে, আর পরীক্ষা করবো নিজেদের।"

"মানসী, তুমি বলেছিলে সব দ্বিধা ঘুচিয়ে, সব পরীক্ষা সাঙ্গ করে ডাক দিয়েছ আমায়—"

"তা'তে তো ভুল নেই। কূল ছেড়ে অকূলে ভাসার মন্ত্র পাঠ ছিল সেটা। আজ যে দেখা দিয়েছে নতুন আর এক সমস্যা।"

"মানসী, সে সমস্যা কি সুখময়বাবু?"

"না।"

"তবে?"

"সে তুমি।"

"আমি!"

"হ্যাঁ তুমি। তোমার কতটা নিয়েছি, আর কতটুকু দিতে পেরেছি অনবরত শুধু তাই ভাবছি।"

"লাভ লোকসান, হিসেব নিকেশ, টাকা আনা পাই?"

"যা বলো।"

"নিজেকে সব কিছুর কারণ ভেবে দুঃখ পাও কেন? যা অনিবার্য তা তো হবেই, তাকে কি ঠেকানো যায়!"

কিন্তু "দুঃখ পাও কেন," বললেই কি দুঃখ পাওয়া বন্ধ করা যায়? সে যে ক্ষয়কীটের মত একেবারে মনের কোটরে বাসা বেঁধে অবিরত জীর্ণ করে চলে। কিন্তু কিসের এই যন্ত্রণা?

নিজেকে দেওয়ার? না, নিজেকে দিতে না পারার?

মানসী নিজেই বুঝতে পারে না। দিন দিন রোগা হয়ে যায়, মলিন হয়ে যায়, আর প্রতিদিন যখন প্রফেসর সেন এসে বারান্দার ওই চেয়ারটায় বসেন আর বলেন, "চুপচাপ একা বসে থেকে থেকে শরীরটা একেবারে নষ্ট করছো কেন? চলোনা একটু হাঁটবে, একটু বেড়াবে।"

তখন ক্লিষ্ট একটু আলস্যের হাসি হেসে উত্তর দেয় মানসী, "কি

হবে? এই তো বেশ বসে আছি। সমুদ্রকে সবসময় দেখছি।”

তবে আর কি করা?

কিছুক্ষণ বসে থাকা, দু'টি একটি কথা। হোটেলের চাকরকে ফরমাস করে হয়তো কোনদিন একটু চা আনায় মানসী, কোনদিন ভুলে যায়। প্রফেসর সেই আনানো চা কোনদিন খান, কোনদিন খেতে ভুলে গিয়ে ঠাণ্ডা করে ফেলে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলেন, “নষ্ট করলাম!”

আস্ত জীবনটাকেই যে ঠাণ্ডা করে নষ্ট করে ফেললো, সময়ে চুমুক না দিয়ে, তার আবার এক পেয়ালা চা নষ্টয় এত কুণ্ঠা কিসের, এ প্রশ্ন তুলে হয়তো একটু পরিহাস করে মানসী, হয়তো করে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এলেন না প্রফেসর।

এটা কোনদিন হয় না। অপ্রত্যাশিত।

সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল মানসী, তারপর উঠে দাঁড়ালো। খোঁজ না নিয়ে রাত্রে নিশ্চিন্ত থাকা যাবেনা।

অসুখ, অসুখ ছাড়া আর কি?

ইদানাং কী খারাপই হয়ে গেছে চেহারাটা। কোথায় গেছে সেই প্রসন্ন প্রশান্ত সৌম্য মুখচ্ছবি, তার জায়গায় এ যেন আর কে! চোখের কোণে কালি, উঁচু হাড়ের নীচে ভাঙা গাল, শুকনো ঠোঁট, রুক্ষ চাহনি।

এই চেহারা নিজের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের চেহারা। অকৃতদার পুরুষের তৃষ্ণার্ত পুরুষচিত্ত আশায় আশ্বাসে উদগ্র হয়ে উঠেছিল, সে তৃষ্ণা ফের সংবরণ করে নিতে হয়েছে, সংহত করতে হয়েছে নিজেকে নিজের মধ্যে। সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে আনছে, এ আর বুঝতে ভুল হয় না।

ওর সুখ গেছে, শান্তি গেছে, গেছে সামাজিক সম্ভ্রম, ধ্বংস হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ। অথচ মানসী নিজেকে রেখে দিতে চাইছে অভেদ্য বর্মে। মানসী কী নিষ্করুণ!

ওর আড়ালে ওকে যেন সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে মানসী। দেখতে পাচ্ছে নিজেকেও। মানসী ওর প্রাণে জাগিয়েছে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন

মানসী ওর মনে ধরিয়েছে সর্বনাশের রং, মানসী ওর দেহে জ্বেলেছে অগ্নিকণা, আর এখন মানসী তার সবকিছু বিস্মৃত হয়ে চুপ করে বসে শুধু সমুদ্রের ঢেউ গুনছে। কিন্তু কী করবে মানসী? মানসীরই কি যন্ত্রণা কম? তবু উঠে দাঁড়ালো সে।

হোটেলের ওই ছোট চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে একবার বেরোতে হবে।

একা বেরোবার সাহস হয় না, মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলবে বুঝি।

কিন্তু বয়সে ছোট বলেই কি হোটেলের চাকরের কাজ কম? মরবার সময় নেই তার। এইমাত্র নির্জন আবাসে জনতা বাড়াতে নতুন দুজন বোর্ডার এলো!

তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে যত কিছু ফাই ফরমাস আর কে খাটবে? বড়রা তো শুধু বড় বড় ব্যাপারেই আছেন।

আবার নতুন বোর্ডার!

নতুন লোকে বড় ভয় মানসীর এখানে যে ভিড় কম, এই ছিল পরম শান্তি, কিন্তু সে শান্তি থাকছে কই?

"নতুন বোর্ডার এল? কোনদিকে থাকবে তারা?"

"এই যে আপনার ডানপাশের ওই গোল বারান্দাওয়ালা ঘরটায়। ওই ঘরটাই হচ্ছে সবচেয়ে দামী, ভাল ভাল ফার্নিচার আছে কি না? তাছাড়া প্রত্যেকটা জানলা থেকে সমুদ্দুর দেখা যায়। ম্যানেজার বলছিলো···এইরে, মেয়েছেলেটা যে এসেই হাজির হয়েছে দেখছি—"

ছেলেটা ছুটলো নতুন বোর্ডারের ঘরের দিকে।

কিন্তু যার জন্যে ঘরে ছোটা, সে চলে এসেছে নিজের গোলবারান্দা ছেড়ে এখানে। এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে নিথর হয়ে।

বোঝা যেত না, দেখা যেত না, ঘরের থেকে এসে পড়া আলোর রেখা বারান্দাটায় শুধু একটু আলো আঁধারের ঘোমটা রচনা করে রেখেছিল, সেই ঘোমটায় দু'জনেরই মুখ ঢাকা থাকতো। কবে কোনদিন শোনা এতটুকু কণ্ঠস্বর কে রেখেছে চিনে. কে তার থেকে চিনে নিতে পারে পরিচয়?

কিন্তু বাচ্চা চাকরটা ফট করে আলোর সুইচটা দিল টিপে, বারান্দা ভেসে গেল আলোয়, বুঝি হেসে উঠল কৌতুকে। আর।

আর সেই আলো ভাসা বারান্দায় একটা মানুষ আর একটা মানুষকে মূঢ়র মত প্রশ্ন করে বসলো, "আপনি গৌতমের মা না?"

গৌতমের মা! ফুলটুশের মা!

আজও এ পরিচয় আছে মানসীর? আজও তাকে দেখে চিনতে পারে লোকে?

"তুমি—তুমি!"

"আমি শিখা!"

"শিখা!"

"হ্যাঁ, আর এখন আপনার বৌমা।"

হঠাৎ সকাল থেকে—কি যে খেয়াল হলো, প্রফেসর ঠিক করলেন—আজ যাবো না। কী অর্থ আছে এই প্রতিদিন হাজরে দেওয়ার? কী সুখ যাওয়ায়? সেই ঝোড়ো ঝোড়ো প্রাণ-কেমন-করা হাওয়া, সেই চির অশান্ত সমুদ্রের অশান্ত আক্ষেপ ধ্বনি, সেই বেলা পড়ে আসা আবছা আলোয় মুখোমুখি দু'খানা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর একসময় ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসা।

আর কোন পরিবর্তন নেই, নেই কোনো ব্যতিক্রম।

এ কী শ্মশান জাগানো শব সাধনা! কী কুক্ষণেই এমন একটা অস্বাভাবিক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেছিলেন তিনি! অসতর্কতায়!

কিন্তু তবু সকাল থেকে সমস্ত মন তো উন্মুখ হয়ে থাকে—বিকেলের প্রতীক্ষায়। "যখন তখন এসো না" এটা মানসীর নির্দেশ। "সমস্ত দিন ধরে সমস্ত চৈতন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে তোমার আসার প্রতীক্ষায়, তখন তুমি আসবে।"

আজ হঠাৎ মনে হল—তখনও আসবো না।

মানসীকে আবার নতুন করে বোঝা দরকার। ও কি এখন তার ভালবাসাকে দুঃসহ ভার বলে ভাবতে শুরু করেছে? ও কি ওর

জীবনে প্রফেসরকে অবান্তর মনে করছে? যাব না, যাব না, আজ যাব না!

সকাল থেকেই এই মন্ত্র জপ।

গেল দুপুর, এল বিকেল। একখানা বই নিয়ে নিজের দোতলার ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসলেন। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, শুধু তার সেই অশ্রান্ত আক্ষেপধ্বনি শোনা যায়। আর তার ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগে। এ হাওয়ায় এই গভীর অর্থবহ গ্রন্থকাহিনীতে মন বসতে চায় না। অনবরত আর একখানা ছোট্ট একটুকরো একতলার বারান্দার ছবি মনে ভাসতে থাকে।

সে কি হতাশ হবে? না চঞ্চল হবে?

চঞ্চল হয়ে চলে আসা কি অসম্ভব তার পক্ষে?

কাটলো বিকেল, কাটলো সন্ধ্যা। ঘড়ির কাঁটা এগোতে লাগলো।

মনের কাঁটা নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেয় না। চার ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠাও না পড়া বইখানা মুড়ে রেখে উঠে পড়েন প্রফেসর, ধীরে ধীরে জুতোটায় পা-গলিয়ে নেমে আসেন রাস্তায়।

রাস্তা দিয়ে গেলে যাওয়াটা শিগগির হয়, তবু সমুদ্রের গা ঘেঁসে ঘেঁসে বালির গাদা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগোতে থাকেন।

এখান দিয়ে গিয়ে একেবারে সেই বারান্দাখানায় ওঠা যায় গোটা কয়েক সিঁড়ি বেয়ে।

না, বারান্দায় উঠতে হয়নি। বোধকরি দূর থেকে দেখেই দ্রুত গতিতে নেমে এসেছিল বারান্দায় বসে থাকা ছায়ামূর্তিটা।

'আজ এলে না কেন', এ কথা বললো না সে, বললো না, 'এত দেরী কেন?' খুব তাড়াতাড়ি বললো, "এসো না, আজ এসো না।"

"রাগ করেছ?"

"না না। শুধু আর একদিনের মত আবার আজও হাতজোড় করছি তোমায়—এসো না। আজ নয়, কাল নয়, কোনদিন নয়।"

"তোমার আদেশ চিরদিনই মাথা পেতে নিয়েছি। শুধু বল মানসী, কারণটাও কি জানতে পাব না?"

"এখানে গৌতম এসেছে, এসেছে তার বৌ।"
অবসন্ন স্বরে বলে মানসী।

গৌতমের বৌ। শিখা! অগ্নিশিখা! বুঝি তার অসাধ্য কাজ নেই। নইলে গৌতমকে ধরে আনতে পারে মানসীর কাছে?

কাঠের পুতুলের মত ভাবশূন্য মুখ করে বসে আছে গৌতম, তবু বসে তো আছে?

আর শিখা?

শিখা তার নিজের পাঁচদিনের সাজানো সংসারটাকে তুলে গুছিয়ে রেখে এসে এখন মানসীর জিনিসপত্র তুলে বাঁধাছাঁদা শুরু করেছে। মানসীকে ফেলে রেখে যাবে না সে, পড়ে থাকতে দেবেনা এমন ভাবে। না, ওজর আপত্তির ধার ধারেনা সে। সে বন্যার মত দুর্বার।

"আপনি যাই বলুন, আমাকে পেরে উঠবেন না। আমি কী মেয়ে তার সাক্ষী দেখুন। ওই যে আপনার লোহার গোপাল পুত্তুরটি, ওকে বিয়ে করিয়ে ছেড়েছি। এরপর আর বলবেন, আপনার আপত্তি টিঁকবে? আগে একটু শরীর সারিয়ে নিন, তারপর সব চাপাচ্ছি আপনার ঘাড়ে। আমি খেটে খেটে মরবো আপনার সংসার নিয়ে, আর আপনি দিব্যি বসে সমুদ্রের হাওয়া খাবেন, ও সব চলবে না।"

কী অপূর্ব এই জোর! কী সুন্দর এই জুলুম!

অনেক দিনের শুকনো মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, স্নেহ সুধারসে। ওরা জানে না কোথায় ছিল এতদিন মানসী, কোথায় কোথায় ঘুরেছিল, সঙ্গে কে ছিল? ওরা ধরে নিয়েছে ছেলের উপর অভিমানে এই দীর্ঘ কটা মাস নিঃসঙ্গ মানসী এই নির্জন কারাবাসে আছে।

মানসী কি ওদের এই নির্মল স্বপ্ন ভেঙে দেবে?

"অদ্যই শেষ রজনী!"

শিখা বলে উঠল, "শেষবারের মতো চাঁদের আলোয় সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসা যাক।"

"রাত্রি বারোটা!" গৌতম বললো গম্ভীর ভাবে।

না, মার সঙ্গে কথা হয়নি কোনো দিন।

কথা কেন, চোখ তুলে কি চেয়েইছে?

আর মানসী? মানসীই কি চেয়েছে, কথা বলেছে? সেও নয়।

সব কথার মাধ্যম শিখা। অনর্গল কথা বলাই যেন তা'র চাকরী।

কথা দিয়েই সমস্ত অস্বস্তি ঢাকতে চায় শিখা, কথা দিয়েই আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায় আর দুজনের বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তা। নিজের তোড়ে ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, নিজের পরিকল্পনার ছাঁদে ফেলবে ওদের। ওর বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু ওর মন নির্মল। তাই অনায়াসে বলতে পারে, "মা চলুন।"

"আমি! আমি কেন?"

"নয় কেন? আপনি তো শুনেছি একটু কবি কবিই আছেন, এই 'জ্যোৎস্না-স্নাত সমুদ্র বেলা'য় বেড়িয়ে এলে নিশ্চয় খুব ভাল ঘুম হবে আজ আপনার। চলুন চলুন।"

হ্যাঁ জীবনে এরকম অনেক কিছুই ঘটে বৈকি। যা অভাবনীয়, যা অবিশ্বাস্য। কিন্তু মানসীর জীবনে কি এত বিচিত্র পরিস্থিতিও এসে হাজির হয়?

নইলে স্বপ্নেও কি কখনো এ কথা ভেবেছে মানসী, কয়েকটা দিন আগেও ভাবতে পারতো, জ্যোৎস্না রাতে রাত দুপুরে ঝিনুক মাড়িয়ে মাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াবে সে ছেলে বৌয়ের সঙ্গে?

"কাল কখন গাড়ি আমাদের?"

শিখা প্রশ্ন করে একমুঠো বালি তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে।

"রাত আটটায়।" গম্ভীরকণ্ঠে গৌতমের উত্তর শোনা যায়।

কুলটুশ তা'হলে এখন এ সভ্যতাটুকু শিখেছে, কেউ কথা কইলে তা'র উত্তর দিতে হয়।

"কী মজা! রাতের গাড়ি আমার খুব ভাল লাগে।"

বাতাসে চুল উড়ছে শিখার, উড়ছে আঁচল। বুঝতে দেরী হয় না, 'রাতের গাড়ি'টা কিছু নয়, ওটা উপলক্ষ্য মাত্র, মজাটাই লক্ষ্য। অকারণ পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটাই শখ।

কবে কোন দিন যেন মানসীও এমনি করতো না, রাশি রাশি ঝিনুক কুড়োতো আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত সমুদ্রেই?

"মা, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"না তো, কষ্ট কি?"

"হতেও পারে, যা একখানি চেহারা বাগিয়েছেন। চলুন না বাড়ি, দৈনিক হু'সের কবে দুধ খাওয়ানো হবে আপনাকে।"

হ্যাঁ, নিজে সাধ্যমত স্নেহের প্রলেপ লাগাতে চাইছে শিখা, অভিমানক্ষুব্ধ জননী হৃদয়ের গভীর ক্ষতে। পূরণ করতে চাইছে গৌতমের ত্রুটি।

"রোজ শুধু ডান দিকটাই বেড়ানো হয়। আজ বাঁ দিকটায় যাওয়া যাক।"

"যথেষ্ট হয়েছে আর থাক। পৌনে একটা বাজল।"

"বাজুক না। ঘড়ি তো বাজবার জন্যেই আছে।"

কিন্তু শিখার আচরণ দেখে মনে হয় মানুষও বুঝি বাজবার জন্যে।

"এবার ফেরা হোক।"

এই প্রথম কথা কইল মানসী!

"তবে হোক।"......

"আরে বাস!"

আবার উছলে উঠেছে শিখা, "শুধু একা আমিই নই, দেখ দেখ ওই ভদ্রলোকের কবিত্ব! এই রাতে একেবারে কিনারায় ভিজে বালির ওপর কিরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বসে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউগুলো গুনে শেষ করবার সংকল্প নিয়ে বসেছেন।"

"পৃথিবীতে পাগলের সংখ্যা তো এক আধটি নয়।" গৌতম মন্তব্য করে।

"দেখে আসবো ভদ্রলোককে ?"

"তার মানে ?"

"আহা দোষ কি ? বুড়ো তো ? দেখছো না চাঁদের আলোয় টাক চকচক করছে !"

"পাগলামী কোর না।" মুখ ফেরায় গৌতম।

কিন্তু ততক্ষণে সে পাগলামীটা আর একজন শুরু করেছে। মানসী চলেছে এগিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্যের মতই।

"মা, পাগলের খোঁজ নিতে আর যেতে হবে না কষ্ট করে।" শিখা ডাক পাড়ে।

কিন্তু এ নিষেধবাণী মানসীর কানে পৌঁছয় না। আর কখনো বুঝি পৌঁছবেও না। মধ্যরাত্রির গভীরতায় জনশূন্য সমুদ্রতীরে নিঃসঙ্গ বসে থাকা ওই মানুষটার শুধু বসে থাকার ভঙ্গীর মধ্যেই মানসী তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে। পেয়েছে সমস্ত জটিলতার নির্ভুল সমাধান।

পিছন পিছন যে আরও দুটো মানুষ আসছে, সে খেয়ালটুকুও কি হারিয়ে ফেললো মানসী, সেই নির্ভুল সমাধানের আনন্দে ? তাই একেবারে সেই বসে থাকা মানুষটার পিঠ ছুঁয়ে ধমকের সুরে বলে উঠল, "এটা কি হচ্ছে ? শাস্তি দেবার আর কোন উপায় আবিষ্কার করতে না পেরে বুঝি অসুখ বাধিয়ে শাস্তি দিতে চাও ?"

উঠে দাঁড়িয়েছে বসে থাকা মানুষটা। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সমস্ত পরিস্থিতিটার দিকে। কথা বলবার ক্ষমতা ওর আছে বোঝা যাচ্ছে না।

তাই মানসীকেই আবার কথা বলতে হয়, "ক' ঘণ্টা বসে আছ ? খুব সম্ভব বিকেল থেকে ?"

"তাতে কি ?" বোবা মানুষটা কথা বলে আস্তে আস্তে, "এমনি বসেছিলাম, বাতাসটা বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু তুমি এখন ? এঁরা ?"

"এঁরা ? একজনকে তো জানো ওর তো আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না ? আর এ হচ্ছে শিখা। আমার বৌমা, ফুলটুশের বৌ। আর তোমার পরিচয়—"

"ওঁরা চলে গেলেন !" কথা নয়, যেন একটা মূঢ় হতাশা ঝড়ের গায়ে এলিয়ে পড়ল অবসন্ন দেহ নিয়ে।

"হ্যাঁ, চলেই গেল দেখছি," মানসী মৃদু হাসলো. "তোমার পরিচয়টা সইবার সাহস পেল না।"

"মানসী, তুমি যাও।"

"না। তোমার চলে যাওয়ার মূল্যে ওদের চলে যাওয়াকে আটকাতে যাবার মূঢ়তা আর করবো না।"

"কিন্তু মানসী, এই এতদিন তো ওরা ছিল না।"

"ছিল বৈকি!" মানসী আর একটু হাসলো, "ছিল সংস্কারের ছদ্মবেশে, অকারণ ভয়ের ছদ্মবেশে!"

"মানসী, এটাই যে ভুল নয়, কি করে বুঝছো?"

"বুঝলাম। এইমাত্র বুঝলাম। এই অনন্তকালের সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনের মধ্যে থেকে হঠাৎ অর্জন করলাম সত্যিকার সত্যকে বুঝে ফেলার শক্তি। সেদিন সংসারের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই হয়তো নিজের ওপর সংশয় ছিল। অনবরত ভেবেছি, সর্বহারার আবার সর্ব সমর্পণের মূল্য কি! আজ আবার সংসার হাত ভরে দিতে এসেছে শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা, তাই আজ সংশয় ঘুচলো। আর ভুল হবে না, চলো।"

আর এক ঝড়

কোথায়? সেটা কোথায়?

চেতনার প্রারম্ভ থেকে'অনবরত এই একই প্রশ্ন ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে সীতুকে। কোথায়, সেটা কোথায়?

এ প্রশ্ন তাকে মা বাপের কাছে স্বস্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না, দেয় না সুস্থ থাকতে। থেকে থেকে মন একেবারে বিকল করে দেয়। তখন আর খেলাধুলো ভাল লাগে না সীতুর, ভাল লাগে না কারুর সঙ্গ। খাওয়ার জন্যে মায়ের পীড়াপীড়ি আর বাপের বকুনি অসহ্য লাগে।

এ প্রশ্নকে মন থেকে তাড়াতে অনেক চেষ্টা করেছে সীতু, যত বড় হচ্ছে তত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কিছুতেই এই অদ্ভুত প্রশ্নের জটিল জালকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উচ্ছেদ করতে পারছে না।

সব কিছুর মাঝখানে একটা অদেখা জায়গার ছবি চোখের উপর ভেসে উঠে মনটাকে উন্মনা করে দেয়, আশেপাশের কোন কিছু ভাল লাগে না।

সীতুর এই সাড়ে আট বছরের জীবনে কত কত বারই তো মাকে এ প্রশ্ন করেছে সীতু, আর প্রত্যেক বারই তো একই উত্তর পেয়েছে, তবু কেন সংশয় ঘোচে না, তবু কেন আবার বলে বসে, 'অনেক দিন আগে আমরা কোথায় ছিলাম মা?'

অতসী কখনো স্নেহে, কখনো বিরক্তিতে, কখনো শান্ত মুখে, কখনো ক্রুদ্ধ মূর্তিতে একই উত্তর দেয়, 'কোথাও নয়, কোথাও নয়। কখনো কোনদিন আর কোথাও ছিলে না। এখানেই জন্মেছ, এখানেই আছ। কেন অনবরত এই এক বিশ্রী চিন্তা নিয়ে মাথা ঘুলোও?'

'কেন'। সে কথা কি সীতু নিজেই জানে? সীতু কি ইচ্ছে করে এ চিন্তা মাথায় আনে? এ ছবি কি সীতু নিজে এঁকেছে?

...একটুকরো রোয়াক, কি রকম যেন একটা নল দিয়ে জল পড়া চৌবাচ্চা, ছোট ছোট জানলা বসানো ক'টা যেন ঘর, ঘরের দেওয়াল

ভর্তি ছবি টাঙানো, আর পাশের কোনদিকে যেন একটা গলি। সরু গলি, মাঝে মাঝে জঞ্জাল জড় করা।

আর একটা ছোট ছেলে কোন একটা জানলায় বসে বসে দেখছে সেই গলিতে লোকের আনাগোনা।· ·

পথ চলতি লোক চলে যায়, ফেরিওলা সুর করে ঢোকে আবার বেরিয়ে আসে, রাস্তার ঝাড়ুদার এসে সেই জমানো জঞ্জালগুলো তুলে নিয়ে যায়, ছেলেটা বসে বসে দেখে। সে ছেলেটা কে?

সে বাড়িটা কোথায়? ঝাপসা ঝাপসা এই ছবিটা আবছা একটা রহস্যলোকের সৃষ্টি করে অনবরত যেন সাতুকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সাতুদের এই চকচকে ঝকঝকে সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়িটা থেকে। এ বাড়িটাকে কিছুতেই যেন নিজেদের বাড়ি বলে মনে হয় না সাতুর, কিছুতেই এর সঙ্গে শিকড়ের বন্ধন অনুভব করতে পারে না।

সাতুদের বাড়ির বেটে নেপালী চাকরটা একটুকরো ন্যাকড়া নিয়ে যেমন করে শার্সির কাঁচগুলো ঘসে ঘসে চকচকে করে, চকচকে করে আলমারির গায়ে লাগানো আর মার চুলবাঁধার লম্বা আয়নাগুলোকে, তেমনি একটা কিছু দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করে ফেলতে ইচ্ছে করে সাতুর এই ভুলে ভুলে যাওয়া ঝাপসা ঝাপসা ছবিটা। পরিষ্কার আয়নায় মুখ দেখার মত করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই ছেলেটাকে। দেখতে ইচ্ছে করে সেই জানলা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতো যে মানুষটা সে কে?

কী ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাতটা তার!

বাড়ির সমস্ত কোলাহল আর সকলের সঙ্গে থেকে সরে এসে আপ্রাণ চেষ্টায় তলিয়ে যায় সাতু, বসে থাকে মস্ত জানলাটার ধারে, যে জানলাটা এ পাশের ছোট্ট একটা ঘরের, যাতে অন্য অন্য জানলার মত লেসের পর্দা ঝোলানো নেই।

জলখাবার খাবার সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, চাকরটা যে দু'বার ডেকে গেছে, এইবার হাত ধরতে মা আসবেন, এ সবের কোন

কিছু খেয়াল নেই সীতুর। অবশেষে তাই হল।

অতসী নিজেই উঠে এল বিরক্ত হয়ে। হয়তো বই পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে, হয়তো বা আরামের দুপুর-ঘুমটুকু ছেড়ে। বিরক্ত মুখে বলে উঠল, 'সীতু! ফের তুমি গোঁজ হয়ে বসে আছ, খাওয়ার সময় খাচ্ছ না? তোমার জন্যে কী করবো আমি? বল কী করবো? বাড়ি থেকে চলে যাব?'

'মা'। সীতু অসহায় মুখে বলে, 'সেই বাড়িটা কাদের একবারটি বল না!'

অতসী খুব চীৎকার করে বকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বসে পড়ল জানলার ধাপটায় সীতুর পাশে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সে বাড়িটা নিশ্চয় তোর পূর্বজন্মের বাড়ি সীতু। আগের জন্মের স্মৃতি তোর মনে পড়ে নিশ্চয়। ও সব কথা আর ভাবিসনে বাবা!'

'আমি তো ইচ্ছে করে ভাবিনা মা।' সীতু ম্লানমুখে বলে, 'আমার যে খালি খালি মনে—'

কি মনে হয়, সে কথা আর নতুন করে তো বলতে হয় না, অতসী জানে। তার কোমলতার সঙ্গে ঈষৎ কঠোরতা মিশিয়ে বলে, 'কেন মনে হয়? বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে এইতো জানা কথা। এই যে খুকু? ও কি আগে আর কোথাও ছিল? এ বাড়িতেই জন্মেছে, এ বাড়িতেই আছে। বল, খুকু কি তোমার বোন নয়? দাদা নও তুমি ওর?'

সীতুর চোখ ছলছলিয়ে জল ভরে আসে, তবু বলে চলে অতসী, 'বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে, বুঝলে? আর কোন দিন ও কথা ভাববে না। আমি তো বলেছি অদ্ভুত কোনো একটা বাড়ির স্বপ্ন তুমি দেখেছ বোধ হয় কোনদিন, তাই বারেবারে মনে পড়ে। স্বপ্নের কথা মনে রাখতে নেই। চল খাবে চল।'

ছেলের হাত ধরে নিয়ে যায় অতসী বিষণ্ণ মুখে। মুখে যতই বকাবকি করুক, বুকটা কি দমে যায় না তার? কেন সীতুর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে? কিছুতেই কেন ভুলিয়ে দেওয়া যায় না

তাকে তার সে স্মৃতি !

আপেলের টুকরো মুখে পুরে নার কথাটা ভাবতে শুরু করে সাতু।

স্বপ্ন! তাই হয়তো। স্বপ্ন তো ঝাপসা-ঝাপসাই হয়। কিন্তু স্বপ্ন কি সব সময় এমন করে টানে ?

'দাদ্দা দাদ্দা।' টলতে টলতে খুকু এল মোটা মোটা গোল গোল পা ফেলে। ওর ওই পা ফেলাটা ঠিক যেন ছানা হাতির মত। দেখলেই মনটা আহ্লাদে ভরে যায়। ওর পা ফেলা, ওর থ্যাঁদা থ্যাঁদা লাল লাল মুখটা, উড়ু উড়ু সোনালী চুলগুলো, আর ওর ওই সম্প্রতি নতুন শেখা 'দাদ্দা' ডাক, এটা যেন সব মন খারাপ মুছে নেয়। ওর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে ইচ্ছে করে।

'দাদ্দা দাদ্দা !' দাদার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকু।

'ওরে সোনা মেয়ে, ওরে সোনা মেয়ে !' একটা হাত বাড়িয়ে খুকুকে ধরে নেয় সাতু, বলে, 'আপেল খাবে ? আপেল ? ফল ফল ?'

খুকু অদ্ভুত উচ্চারণে দাদার কথার পুনরাবৃত্তি করতে চেষ্টা করে 'পঃ পঃ !' তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দাদার হাতের খাদ্যটা খপ্ করে কেড়ে নিয়ে মুখে পুরে ফেলে।

সাতু বিগলিত স্নেহে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'ডাকাত মেয়ে, ডাকাত মেয়ে, থন্দেত খাবে ? থন্দেত ? খুব মিষ্টি।'

খুকু বলে, 'মিত্তি।'

ছুই ভাইবোনের কণ্ঠ নিঃসৃত হাসির শব্দে ঝলসে ওঠে বারান্দাটা। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির উপর কে যেন বড় একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাবা। লোকে যাঁকে 'মৃগাঙ্ক-ডাক্তার' বলে। কোঁচকানো ভুরু, বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠ।

'সাতু !'

সাতু মুখটা নীচু করলো।

'কতদিন বারণ করেছি !'

মুখটা আরও নীচু করলো সাতু।

হ্যাঁ, অনেক দিনই বারণ করেছেন বটে। বাচ্চারা বড়দের এঁটো

খায়, এ তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। খুকুকে সীতু নিজের পাত থেকে কিছু খাওয়াচ্ছে দেখলেই এমনি রেগে জ্বলে যান। আজও তাই আস্তে আস্তে স্বর চড়াতে থাকেন, 'একটা ব্যাপারেও কি সভ্য হতে নেই? সবসময় অসভ্যতা অবাধ্যতা?'

সীতুর মুখটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। বাবার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না সে, বাবার সঙ্গেই পারে না। বাবাকে দেখলেই ওর শুধু ভয় নয়, কেমন একটা রাগ আসে, ভয়ানক একটা রাগ।

আর তিনিও। তিনিও যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সীতুর সঙ্গে সহজ হয়ে, সহজ গলায় কথা বলবেন না। তাই যখনি কথা বলেন কপাল কুঁচকে বিরক্ত-বিরক্ত গলায়। ছেলেকে শুধু শাসনই করতে হয় এইটাই বোধকরি জানেন সীতুর বাবা। তাই তাঁর সীতুর প্রতি সর্ববিধ ব্যবহার তো বটেই, চোখের চাউনিতে পর্যন্ত শাসন শাসন ভাব।

'আর কোনদিন খাওয়াবে? বল—জবাব দাও।'

কিন্তু জবাবটা দেবে কে? সীতুর মাথাটা তো একভাবে নীচু থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই বোধকরি জবাব দিতে ছুটে এল অতসী। কিন্তু জবাব না দিয়ে প্রশ্নই করলো, 'কি হল? এখুনি উঠলে যে? বলছিলে যে খুব টায়ার্ড ফিল্ করছো—'

'টায়ার্ড ফিল্ আমি তোমাদের ব্যবহারে যতটা করি অতসী, ততটা দৈনিক পঁচিশঘণ্টা কাজ করলেও নয়'—মৃগাঙ্ক ডাক্তারের গলার স্বরটা থমথমে শোনায়। 'খুব বেশি চাহিদা আমার নয় সে তুমি জানো। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তোমার, ছেলেমেয়েকে নিয়ে যা খুশি করবার। শুধু হাতজোড় করে অনুরোধ করি, তোমার আদরের ছেলেটি যেন ওকে ওর পাত থেকে কিছু না খাওয়ায়। সে অনুরোধ রক্ষিত হবে এটুকু কি আমি আশা করতে পারি না?'

সীতুর চোখটা মাটির দিকে, তবু সীতু বুঝতে পারছে বাবার সেই রুক্ষ মুখটা আরও শক্ত হয়ে পাথুরে পাথুরে হয়ে গেছে, আর মায়ের মুখটা বেচারী বেচারী। মায়ের জন্যে এখন কষ্ট হচ্ছে সীতুর, মনে হচ্ছে

বেশির ভাগ সময় তার দোষেই মাকে এই পাথুরে পাথুরে আগুন-ঝরা চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সীতু কি করবে?

খুকুটা যে 'দাদ্‌দা' বলে ছুটে এসে ওর কাছ থেকে কেড়ে খায়।

কিন্তু শুধুই কি খাওয়া?

সীতু খুকুর গায়ে একটু হাত ঠেকালেই কি অমনি রুক্ষ হয়ে ওঠেন না বাবা? বলেন না 'বড়দের হাত লোনা, ছোটদের গায়ে দিলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়?'

সীতু কত বড়? মার চাইতে? বাবার চাইতে? নেপবাহাদুরের চাইতে? অনেকবার ইচ্ছে করে সীতুর, বাবাকে জিগ্যেস করবে তাঁর ডাক্তারি বইতে পষ্ট কি লেখা আছে? লেখা আছে কি শুধু সাত আট বছরের ছেলেদের হাতই লোনা হয়?

ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না জিগ্যেস করতে, অদ্ভুত একটা আক্রোশে। বাপের উপর ভয়ানক একটা আক্রোশ আছে সীতুর। সর্বদা শাসনের ফল, না আরও কোন কারণ আছে? কে জানে কি, তবে এইটুকুই দেখা যায়, বাপের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না সে। নিজে থেকে ডেকে তো নয়ই, প্রশ্ন করলে উত্তরও দেয় না। অতসীর ভাষাতে 'গোঁজ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন আজও।

'কথা কয়ে তো উত্তর পাওয়া যাবে না ওনার সঙ্গে, কাজেই বোঝা যাবে না বারণ করলেও কেন শোনে না,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার বিদ্রূপকঠিন কণ্ঠে বলেন, 'তোমাকেই হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, দয়া করে ছেলের এই বদভ্যাসটি ছাড়াও।'

অত আদরের খুকু সোনা, তবু তার উপর রাগ এসে যায় সীতুর, মনে মনে তাই বাপের কথার উত্তর দেয়। 'ছেলের বদভ্যাসটি তো ছাড়াবেন মা, আর মেয়ের বদভ্যাসটি? সামনে খাবার জিনিস দেখলেই খপ্‌ করে মুখে পুরে দেওয়ার বদভ্যাসটি? নেপবাহাদুরের কাছ থেকে ভুট্টা খায় না সে? বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে আলুভাজা, বড়াভাজা?'

মনে মনে বলা উত্তর শোনা যায় না।

অতসীকে তাই আলাদা উত্তর দিতে হয়, 'বারণ কি করি না?

শুনছে কে ? খুকুটাও তো হচ্ছে তেমনি।'

'বাজে ওজর কোরনা', মৃগাঙ্ক ডাক্তার বলে ওঠেন, 'বাজে ওজরের মত বিরক্তিকর জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে, বুঝলে ? কাল থেকে যখন ওকে খেতে দেবে খুকুকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে। এই হচ্ছে আমার শেষকথা। এটুকু যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে আইন আমাকে নিজের হাতেই নিতে হবে।'

শেষ রায় দিয়ে ফের ঘরের মধ্যে ঢুকে যান মৃগাঙ্ক।

কিন্তু ইত্যবসরে আপ্রাণ চেষ্টায় মার কোল থেকে নেমে পড়েছে খুকু। আর আবার গিয়ে থাবা বসিয়েছে দাদা প্রস্তাবিত সেই ওর 'খন্যেতে।'

ঠাস করে মেয়েকে একটা চড় কসিয়ে আবার তাকে কোলে তুলে নিল অতসী, চাপা কড়া গলায় বলে উঠল, 'তোর শরীরে কি লজ্জা নেই হতভাগা ছেলে ? তোর জন্যে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে আমার ! কেন তুই খাবার দিস ওকে ? জানিস উনি বাচ্চাদের কারুর এঁটো খাওয়া ভালবাসেন না। তবু কেন ? বল কেন ?'

কেন ? মার এই প্রশ্নের উত্তর দেবেনা সীতু, ইচ্ছে করেই দেবে না। উত্তর এর পরে দেবে কাজের মধ্যে দিয়ে। যেই না খুকু পাজিটা সীতুর খাবারের উপর হাত বসাবে, মার চাইতেও বেশি জোরে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেবে ওকে।

হ্যাঁ দেবেই তো ! নিশ্চয় দেবে।

সীতুকে যদি কেউ মায়া না করে সীতুই বা করতে যাবে কেন ?

মায়া করতে যাবে কেন, ভাবতে গিয়েও মাটির উপর ঝরঝরিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে, মাটির দিকে তাকানো চোখ দুটো থেকে।

খুকুর থ্যাঁদা নাকওয়ালা লাল লাল মুখটা আপাততঃ দেখতে না পেলেও তার মার খাওয়া মুখটা কল্পনা করে চোখের জল আটকাতে পারে না সীতু।

অতসী একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কিছুই তো খাওয়া হল না। আমারই অন্যায়, ঠিক কথাই বটে, আমার অন্যায়। কিন্তু তুই বা

এমন করিস কেন? কেন আগে খেয়ে নিতে পারিস না ঠাকুরের কাছে, মাধবের কাছে? সেই আমাকে তুলে তবে ছাড়বি। আমি উঠে পড়লেই খুকু উঠে পড়ে দেখতে পাসনা?'

'না পাইনা। আমি কিছু দেখতে পাই না।' বলে ছুটে পালিয়ে যায় সীতু। অতসী হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। হতাশ? তাই কি? আরও অন্য কেমন একরকম না?

কিন্তু কেমন করে তাকিয়ে রইল অতসী?

কি ছিল তার চোখের দৃষ্টিতে? ছেলের উপর রাগ? স্বামীর উপর বিরক্তি? না নিজের উপর ধিক্কার? স্বামীকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারেনি, পারেনি তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা ক্ষইয়ে ভোঁতা করে ফেলতে,এই ধিক্কারেই কি মরমে মরে যাচ্ছে অতসী? কিন্তু তা কেন?

সংসারে রাশভারী কর্তারা তো এমন অনেক বাড়াবাড়ি শাসন করেই থাকে, গৃহিণীরা হয় সেটা সভয়ে মেনে নিয়ে সাবধান হয়, নয়তো চোট-পাট করে প্রতিবাদ জানায়। অতসীর মত এমন মর্মাহত কে হয়?

ছেলেও তেমনি অদ্ভুত! বাপের দিক মাড়ায় না। বাপের দিকে তাকায় যেন শত্রুর দৃষ্টিতে। বয়স্ক ছেলে নয়, মাত্র একটা আট বছরের ছেলে, তাকে নিয়ে অতসীর একি দুঃসহ সমস্যা!

সংসারে ভোগ্যবস্তু বলতে যা কিছু বোঝায়, তার কোন কিছুরই অভাব নেই অতসীর। না, তা' বললেও বুঝি ঠিক হয় না। অভাব তো নেইই, বরং আছে অগাধ প্রাচুর্য।

বাড়ি গাড়ি চাকরবাকর আসবাব উপকরণ সব কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ স্বামী, সুকান্তি পুত্র, সোনার পুতুলের মত মেয়ে।

স্বামী মদ্যপ নয়, চরিত্রহীন নয়, অন্যাসক্ত নয়, স্ত্রীর প্রতি স্নেহহীন নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তো সীমা নেই অতসীর। অগুনতি উপার্জন করেন মৃগাঙ্ক, অনায়াসে অবহেলায় এনে ফেলে দেন স্ত্রীর হাতে। কোনদিন প্রশ্ন করেন না। টাকাটা কোন খাতে খরচ করলে?

আর কি চাইবার থাকে মেয়েমানুষের?

স্বামীর স্বভাব রুক্ষ কঠোর এ কথাই বা কি করে বলবে অতসী? কত কোমল মন ছিল মৃগাঙ্কর। মৃগাঙ্কর মন কোমল না হলে অতসী কোন টিকিটের জোরে এই ঐশ্বর্যের সিংহাসনে এসে বসতো?

কি আছে অতসীর? অগাধ রূপ? অনেক বিদ্যা? অসাধারণ বংশমর্যাদা? কিছু না, কিছু না।

অতসী অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ মৃগাঙ্কর প্রেমই অতসীকে মূল্যবান করেছে। আশ্চর্য, তবু অতসী দুঃখী।

অতসীর আপন আত্মজ নষ্ট করে দিচ্ছে অতসীর সমস্ত সুখ শান্তি।

কেন সীতুর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হল না। ডাক্তার মৃগাঙ্ক এত রোগের চিকিৎসা করতে পারে, পারে না এ রোগের চিকিৎসা করতে?

কতদিন ভাবে অতসী, জিজ্ঞেস করবে মৃগাঙ্ককে। এমন কোন একটা ওষুধ টষুধ খাইয়ে দেওয়া যায় না ওকে, যাতে ওর ওই ঝাপসা-ঝাপসা স্মৃতির ছায়াটা একেবারে মুছে যায়?

বলতে পারে না। মৃগাঙ্ক কি ভাববে?

যদি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'কিন্তু অতসী তোমার? তোমার ব্যাপারটার কি হবে?' তখন অতসী কি বলবে?

ছেলে আর ছেলের মাকে শাসন করে মৃগাঙ্ক ডাক্তার ফের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সত্যি আজ তিনি বড় বেশি ক্লান্ত।

কিন্তু এও ঠিক—শুধু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হচ্ছেন না ডাক্তার। সাংসারিক জীবনটাই দিনের পর দিন ক্লান্ত করে তুলছে তাঁকে।

বেশ বেশি খানিকটা বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতই ছিলেন মৃগাঙ্ক। প্রচুর উপার্জন করেছেন, প্রচুর খরচ করেছেন, বন্ধু পোষণ করেছেন, আত্মীয়-কুটুম্বকে সাহায্য করেছেন, আর করেছেন বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র।

তারপর কোথা দিয়ে কি হ'ল, অতসী এল জীবনে। পালা বদলালো। তা' বিয়ের পর প্রথম দু' একটা বছর তো এক অপূর্ব সুখের ঘোরে কেটেছে, কিন্তু সেই ঘোরের সুর কেটে দিল সীতু। মা

আর বাপের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে উঠল সে, দু'জনের মনে সহজ আদান-প্রদানের দরজা বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল।

মৃগাঙ্কর মধ্যে বাড়তে লাগলো বিদ্বেষ, বিরক্তি, অশান্তি। অতসীর মধ্যে কাজ করতে লাগলো হতাশা, অভিমান আর অপরাধবোধ।

তারপর এল খুকু।

আর খুকু আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃগাঙ্ক সীতুকে একেবারে দূরে ঠেললেন। সীতুর প্রতি বিদ্বেষ আর বিরক্তি তাঁর বেড়েই চলতে লাগলো, কারণে অকারণে তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি অতসীকে মরমে মারতে লাগলো।

খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে পড়লেন মৃগাঙ্ক। ভাবলেন এ অবস্থার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। নেপবাহাদুরকে ডেকে বললেন 'খোকাবাবুকো বোলাও।'

প্রমাদ গণলো নেপবাহাদুর।

'ডাক্তার সাহব বোলিয়েছে' বললেই তো খোকাবাবু বেঁকে বসবে। তবু সেকথা তো আর ডাক্তার সাহেবের মুখের উপর বলা যায় না। অগত্যাই ভারাক্রান্তচিত্তে গিয়ে খোকাবাবুর কাছে বক্তব্য পেশ করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার আশঙ্কা অনুযায়ী উত্তর মিললো, 'যাব না।'

তারপর চললো দুজনের বাকযুদ্ধ।

নেপবাহাদুরের বহু যুক্তিপূর্ণ বাছাই বাছাই বাণ, আর সীতুর সংক্ষিপ্ত এক একটি তীক্ষ্ণ বাণ।

শেষ পর্যন্ত নেপবাহাদুরেরই জয় হলো, অবশ্য গায়ের জোরের জয়। যতই হোক আট বছরের ছেলে তো। ওর সঙ্গে পারবে কেন! পাঁজাকোলো করে নিয়ে এল সে।

'শোনো', গম্ভীরভাবে বললেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'আমার প্রথম কথা হচ্ছে, উত্তর দেবে। যা বলবো শুধু আমিই বলে যাব, আর তুমি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় গুজে বসে থাকবে তা চলবে না। শুনবে একথা?'

বলা বাহুল্য সীতু বুনো ঘোড়ার নীতিই অনুসরণ করে।

মৃগাঙ্ক একটু অপেক্ষা করে আরও গম্ভীরভাবে বলেন, 'খুকুকে এঁটো জিনিস খেতে দিতে বারণ করি, দাও কেন?'

হঠাৎ সীতুর নিজেকে আলাদা একটা লোক আর খুকুটাকে বাবার মেয়ে মনে হয়। তাই বুনো ঘাড়টা ঝট্ করে তুলে রুক্ষভাবে বলে, 'আমি সেধে সেধে দিতে যাই না, ওই হ্যাংলার মতন চাইতে আসে!'

মৃগাঙ্ক বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে বলেন, 'ওর অনেক বুদ্ধি, ও একটা মাতব্বর, তাই ওর কথা ধরতে হবে, কেমন? হাজার বার বলিনি তোমায়, বড়দের এঁটো খেলে অসুখ করে ছোটদের?'

'আর যখন নেপ্‌বাহাদুরের খাওয়া ভুট্টার দানা খায়? তার বেলায় দোষ হয় না? যত দোষ নন্দ ঘোষ!'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকায় সীতু। বাপের ভয়ে নয়, বাপের দিকে তাকাবে না বলে।

মৃগাঙ্ক অসহ্য ক্রোধে মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তিক্তস্বরে বলেন, 'হুঁ, অনেক কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি। কেন নেপ্‌বাহাদুরের কাছেই বা খায় কেন? তুমি যদি দেখতে পাও তো তুমি বারণ কর না কেন?'

বলা বাহুল্য সীতু নীরব

মৃগাঙ্ক বুঝি ভুলে যান তাঁর সম্মুখবর্তী প্রতিপক্ষ একটা বালকমাত্র, ভুলে যান ওর সঙ্গে সমান সমান হয়ে কথা কইলে তাঁরই মর্যাদার হানি হবে, ওর কিছুই না। তাই সেই সমান সমান ভাবেই কথা বলেন, 'না, তুমি বারণ কর না। তার মানে হচ্ছে, তুমি চাও খুকুর ওই সব নোংরা খেয়ে অসুখ করুক। বল তাই চাও কি না?'

'হ্যাঁ চাই-ই তো, খুব চাই।'

সহসা বিদ্যুতের বেগে উত্তর দেয় সীতু, বোধ করি কথার মানে না বুঝেই। বোধ করি শুধু বাবার মুখের উপর কথা বলার সুখে।

'তাই চাও? তাই চাও তুমি?' মৃগাঙ্কর গলা পরদায় পরদায় চড়ে, 'তা বলবে বৈ কি। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমড়া-গাছে আমড়া না ফলে কি আর ন্যাংড়া ফলবে। কিন্তু মনে রেখো,

তোমার এইসব বদমাইসী সহ্য করবো না আমি। ফের যদি ওরকম দেখি, উচিত শাস্তি দেব।'

'বেশ, খুকুও যেন আমাব দিকে না আসে।'

কষ্টে চোখের জল চেপে উচ্চাবণ করে সীতু এই ভয়ঙ্কর শর্তের বাক্য।

'ও বটে নাকি?' মৃগাঙ্ক সেই রকম ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠেন. সে হাসিটা যেন সীতুর কানের পরদাটা পুড়িয়ে দিয়ে, গায়ের চামড়াটা জ্বলিয়ে দিতে দিতে বাতাসে বিলীন হয়। 'বটে? এই সমস্ত বাড়িটা তা হলে একা তোমারই? তোমাব এলাকায় ওর প্রবেশ নিষেধ?'

'হ্যাঁ তো। হ্যাংলা বেহায়াটা তো কাছে এলেই খেতে চাইবে'

'কী! কী বললি?'

মৃগাঙ্ক গর্জন করে ওঠেন, বেয়াদপ অসভ্য ছেলে। দিন দিন গুণ প্রকাশ হচ্ছে। আর যদি কোনদিন এভাবে মুখে মুখে জবাব দিতে দেখি, চাবকে লাল করবো তোমায় আমি।'

এ গর্জন অতসীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছয়।

উঠে এ ঘরে ছুটে আসতে যায়। আবার কি ভেবে থেমে পড়ে। দাঁতে ঠোঁটে চেপে বসে থাকে নিজের ঘরে।

কিন্তু একটা বলবান স্বাস্থ্যবান কর্তা পুরুষের ক্রোধের গর্জন কি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিলীন হয়ে যায়? দেয়াল ভেদ করে ফেলেনা?

ক্ষীণ-কণ্ঠ একটা শিশুর বুকের পাটাটা যতই বেশি হোক, আর তার বিদ্বেষের তীব্রতাটা যতই প্রখর হোক, কণ্ঠস্বরটা ক্ষীণই থাকে। পরদা চড়ে শুধু একটা স্বরই, দুটো দেয়াল ভেদ করে এ ঘরে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে সে স্বর।

'এই জন্যেই বলে, বুকুরকে লাই দিতে নেই। তোমাব এই আসপদ্দার ওষুধ কি জানো? জলবিছুটি। আর এবার থেকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। ছোঁবে না তুমি ওকে।' বুঝলে? আঙুল দিয়ে ছোঁবে না। কী হল! আবার মুখের ওপর চোপা? হ্যাঁ তাই. শুধু তোমাব হাতই কোনো। তোমাব হাত গায়ে পড়লেই বোগা হয়ে

যাবে খুকু। তাই ঠিক। উঃ এক ফোঁটা ছেলে, আমার জীবন বিষ করে ফেলেছে একেবারে এই জন্যেই শাস্ত্রে বলে বটে—আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ—'

না, ঘরে বসে থাকতে পারে না অতসী। ধীরে ধীরে ও ঘরে গিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'শাস্ত্রে কি বলে, সেটা আর পাড়া জানিয়ে নাই বা বললে?'

মৃগাঙ্ক চট্‌ করে উত্তর দিতে পারেন না, কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অতসীর দিকে। বুঝি এতক্ষণ যা কিছু বলছিলেন, উগ্র এক নেশার ঘোরে। এখন অতসীর এই মৃদু কণ্ঠের দৃঢ়তায় ফিরে পেলেন চৈতন্য। নিজের ব্যবহারের রূঢ়তার দিকে তাকিয়ে অশ্রদ্ধা এল নিজের উপর, আর আরও রাগ হল ওই হতভাগা ছেলেটার উপর, যে নাকি এই সব কিছুর হেতু

কিন্তু কটু কথা বলারও বুঝি একটা নেশা আছে। তাই মৃগাঙ্ক মনে মনে অপ্রতিভ হলেও মুখে বলে ওঠেন, 'ছেলের হয়ে ওকালতি করতে আসা হলো?'

'না তোমার জন্যে এলাম। তোমাকে বাঁচাতে। এমন করে নিজেকে আর মেরো না তুমি।' সীতুর দিকে তাকিয়ে আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলে অতসী, 'যা তুই ওঘরে যা। পড়গে যা।'

সীতু অবশ্য নড়ে না, তেমনি ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে।

'যা।' তীব্র চীৎকার করে অতসী।

তথাপি সীতু অনড়।

'যা বলছি। শুনতে পাচ্ছিস না?'

সীতু যথাপূর্বং।

'নিজে থেকে নড়বি না তা'হলে?'

আর ধৈর্য থাকে না। একটা কান ধরে টেনে ঘরের বার করে দেয় অতসী। দিয়ে এসে রাগে হাঁপাতে থাকে।

মৃগাঙ্ক একটুক্ষণ চেয়ে থেকে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'বলতে পারতাম তোমাকে কে বাঁচাতে আসবে অতসী? কিন্তু বললাম না।'

অতসীর চোখ দুটো জ্বালা করে আসে, তবু কণ্ঠে কঠিন হয়ে বলে, 'তুমি মহানুভব, তাই বললে না।'

মৃগাঙ্করও কি চোখ জ্বালা করছে?

তাই অন্যদিকে, খোলা জানলার দিকে তাকাচ্ছেন খোলা হাওয়ার আশায়। সেই দিকে তাকিয়েই বলেন মৃগাঙ্ক, 'আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ক্রমশঃ এতেই দাঁড়াচ্ছে, না অতসী? আঘাত আর প্রতিঘাত!'

অতসী উত্তর দেয় না।

হয়তো দেবার ক্ষমতা থাকে না বলেই দেয় না। মৃগাঙ্কই আবার কথা বলেন, 'যদি আমার উপর এখনো একটু বিশ্বাস তোমার থাকে অতসী তো, বলছি বিশ্বাস কর, ওকে ধমক দেবার জন্যে ডাকিনি আমি, মিষ্টি কথায় বোঝাবার জন্যেই ডেকেছিলাম। কিন্তু—'

আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে মৃগাঙ্কর।

'কিন্তু' কি তা কি আর জানে না অতসী? সীতুর ঔদ্ধত্য, সীতুর একগুঁয়েমি বরফকেও তাতিয়ে তুলতে পারে, সে তো অতসীর হাড়ে হাড়ে জানা। তবু মৃগাঙ্ক যখন বিষতিক্ত স্বরে কটূকাটব্য করে সীতুকে, সীতুর দিকে তাকিয়ে যখন মৃগাঙ্কর চোখ দিয়ে শুধু ঘৃণা আর আগুন ঝরে, তখন আর মেজাজের ঠিক রাখতে পারে না অতসী। তখন তুচ্ছ সীতুর একগুঁয়েমি, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতাগুলো তুচ্ছতার কোঠায় গিয়ে পড়ে, প্রকট হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর অভিব্যক্তিটাই।

'আমাদের ভালবাসার মধ্যে ও যে এতবড় একটা ভীষণ প্রাচীর হয়ে উঠবে, এ তো আমরা কখনো ভাবিনি অতসী!'

'ভাবলে কি করতে?' অতসী তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, 'ওকে মুছে ফেলতে?'

'অতসী!'

বজ্রগম্ভীর দৃষ্টিতে অতসীর দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, 'ওই দুর্মতি ছেলেটা তোমার মতিবুদ্ধি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, তোমার প্রভাব ওকে সুস্থ করে তুললোনা, ওর প্রভাব তোমাকে নষ্ট করে ফেলতে বসলো।'

'আমি যা ছিলাম তাইই আছি,' সহসা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে এতক্ষণকার রুদ্ধ আবেগ, 'তুমিই বদলাচ্ছো। দিন দিন বদলে যাচ্ছো।'

মৃগাঙ্ক আস্তে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখেন, 'আমিও বদলাইনি অতসী! শুধু মাঝে মাঝে কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। হয়তো বেশি পরিশ্রমের ফল এটা, হয়তো বা বয়সের দোষ।'

অতসী মুখটা চেপে ধরে সেই বলিষ্ঠ হাতখানার আশ্রয়ের মধ্যে।

তখনকার মত সমস্যা মেটে। কিন্তু সে মীমাংসা তো সাময়িক।

বড় একটা আলুর মত ফুলে উঠল ছোট্ট কপালের কোলটুকু। পড়ে গিয়ে কঁকিয়ে উঠে সেই যে থেমে গিয়েছিল খুকু, আবার স্বর ফুটলো অনেক কাণ্ড করে। ঠাণ্ডাজল, গরমজল, বাতাস, ধরে ঝাঁকানি, যত রকম প্রক্রিয়া আছে, সবগুলো করে দেখার পর আবার কেঁদে উঠল সে।

কিন্তু এমন করে পড়ল কি করে খুকু? এতগুলো চাকর-বাকরের চোখ এড়িয়ে?

না, চোখ এড়িয়ে কে বললো? চোখের সামনে দিয়েই তো।

খুকুর নিজের দাদা যদি খুকুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়, ওরা কি করবে? মাইনে-খেগো চাকররা?

সেই কথাই বলে ওঠে বামুন মেয়ে। স্পষ্টবাদিতার গুণে যে সকলের চক্ষুশূল আবার ভীতিস্থল।

সারা সংসার মাথায় করে রাখে বলেই অতসীকেও বাধ্য হয়ে হজম করতে হয় বামুন মেয়ের এই স্পষ্টবাদিতা। কাজেই বামুন মেয়ে যখন খর খর করে বলে, 'তা ওরা কি করবে? ওদের না-হক্ বকুনি দিচ্ছ কেন মা, ওরা মাইনে-খেগো চাকর শুধু এই অপরাধে? তোমার নিজের ছেলেটি যে একটি খুনে, সে হিসেব তো শুনতে চাইছ না? এই তো আমার চোখের সামনেই তো—কচি বাচ্চাটা 'দাদ্দা দাদ্দা' করে গিয়ে যেই না হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছে, ওমা ধরে তুমি আমায় জেলেই দাও আর ফাঁসিই দাও, সত্যি কথাই কইব, বললে

বিশ্বাস করবেনা, ঝনাৎ করে হাটু আছড়ে ফেলে দিল বোনটাকে। আর লাগবি তো লাগ ধাক্কা খেলে একেবারে টেবিলের পায়ার কোণে। ওমা না বুঝে ঠেলেছিস তাই নয় তুলে ধর? তা নয়, যেই না মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো, সেই তোমার ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে হাওয়া। যাই বল মা, ছেলে তোমার হয় পাগল, নয় সবনেশে ডাকাত!'

এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে কি বলবে অতসী? কি বলবার মুখ আছে?

খুকুটা যে মরে যায়নি এই ভগবানের অশেষ দয়া। ভাবতে গিয়ে প্রাণটা আনচান করে চোখে জল এসে পড়ে। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বলে, 'কত দয়া তোমার ঠাকুর কত দয়া।'

খুকুর কোন বিপদ হলে অতসীর প্রাণটা যে ফেটে শতখান হয়ে যেত, একথা তত মনে পড়ছে না অতসীর, যতটা মনে পড়ছে, তাহলে অতসী মুখ দেখাতো কি করে?

হে ভগবান! অতসীকে উদ্ধার করো, দয়া করো।

কিন্তু অপরাধীর আর পাত্তা নেই কেন? এদিক ওদিক খুঁজে এসে শেষ পর্যন্ত সেই চাকরবাকরদেরই প্রশ্ন করতে হয়, 'খোকাবাবু কাঁহা হ্যায়?'

খোকাবাবু!

না, খোকাবাবুর খবর কেউ জানেনা। খুকুর পড়ে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর মারাত্মক দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কে আর খোকাবাবুর গতিবিধি দেখতে গেছে?

পাথরের মত মুখ করে মেয়ের কপালের পরিচর্যা করলেন মৃগাঙ্ক। নিঃশব্দে হাত ধুতে চলে গেলেন। অতসীও দাঁড়িয়ে রইল তেমনি নিঃশব্দে। বোঝা যাচ্ছে না, তার মুখে যে অন্ধকার ছায়াটা জমাট হয়ে আছে, সেটা অপরাধের, না অভিমানের।

মৃগাঙ্ক ঘরে এসে বসতেই অতসী কাছে এসে দাঁড়াল। বললো, 'তুমি ওকে যা খুশি শাসন করো, আমি কিচ্ছু বলবো না।'

'শাসন করে কি হবে? একদিন শাসন করে কি হবে?'

অতসী বলে, 'এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু করো, যাতে চিরদিনের

মত ভয় জন্মে যায়।'

'আমি তো পাগল নই!' মৃগাঙ্ক থমথমে গলায় বলেন।

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে ও পাগল হয়ে যাচ্ছে কি না।'

'ওই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দাও।'

'তবে আমি কি করবো বলে দাও।'

'করবার কিছু নেই। ধরে নিতে হবে এই আমাদের জীবন।'

অতসী কি একটা বলতে যায় ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে, বলা হয় না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সীতুকে পাঁজাকোলা করে চেপে ধরে নিয়ে আসে ঘরের দরজায় বাড়ীর দারোয়ান শিউশরণ।

সীতু অবশ্য যথোপযুক্ত হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু শিউশরণের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া তার একখানা হাত তো জোড়া আছে নিজের ভাঙা কপাল সংক্রান্ত ব্যাপারে।

হ্যাঁ, বাঁ হাতের চেটোটা কপালে চেপে ধরে বাকি তিনখানা হাত পা এলোপাথাড়ি চালাচ্ছে সীতু।

সীতুর কপালে আবার কি হলো? শিউশরণের বহুবিধ কথার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করা যায়, কি হল।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে বাড়ির পিছনের দেয়ালের গায়ে ঠাই ঠাই করে নিজের কপালটা ঠুকছিল সীতু! নেহাৎ নাকি জমাদারটা এসে শিউশরণকে এই অস্বাভাবিক কাণ্ডের খবরটা দেয়, তাই কোন প্রকারে এই ক্ষ্যাপাকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছে সে।

শিউশরণ নামিয়ে দিতেই একেবারে স্থির হয়ে গেল সীতু। হাত পা ছোঁড়া বন্ধ করে দাঁড়াল দুখানা হাত দুদিকে ঝুলিয়ে, মুখ নীচু করে। তবু দেখা যাচ্ছে, সীতুর কপালটাও ফুলে উঠেছে বড় একটা আলুর মত। বাড়তি আরও কিছু হয়েছে. সমস্ত কপালটা ছ্যাঁচা ছ্যাঁচা কালশিরে কালশিরে।

হ্যাঁ সীতুর কপালের পরিচর্যাও মৃগাঙ্ককে করতে হলো বৈ কি।

অতসী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও, এ ছাড়া আর কি সম্ভব?

কিন্তু মৃগাঙ্কর পাথুরে মুখটা একটু যেন শিথিল হয়ে গেছে, মুখের

রেখাগুলো একটু যেন ঝুলে পড়েছে। বড় বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে যেন সে মুখ।

'এ রকম করলে কেন?'

সাতু যথারীতি গোঁজ হয়েই রইল।

মৃগাঙ্কর স্বরটা কোমল কোমল শোনায়, 'তোমার কপাল ফুলে উঠল বলে কি খুকুর কষ্টটা কমলো?'

'সেজন্যে নয়।' হঠাৎ একটা দৃপ্তস্বর ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'সেজন্যে নয়?' কোঁচকানো ভুরুর নীচে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর, 'তবে কি জন্যে?'

'ঠুকলে কি রকম লাগে তাই দেখতে।'

'তা' ভাল। বেশ ভালই লাগল কেমন?' ক্ষুদ্ধ একটু হেসে চলে গেলেন মৃগাঙ্ক।

সীতুকে কখনো তুমি ছাড়া তুই বলেন না মৃগাঙ্ক। এ এক আশ্চর্য রহস্য! অন্তত চাকর মহলের কাছে।

দু'দুটো এত বড় অপরাধ করেও এমনি বা কি শাস্তি পেল সীতু? রহস্য এখানেও।

শিউশরণের কাছে নেপ্‌বাহাদুর গিয়ে গল্প করে—কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলে একা শুয়ে আছে। কাছে না মা, না বাপ। ওকে কেউ দেখতে পারে না।

শিউশরণ মন্তব্য করে, ওরকম ছেলেকে যে আছড়ে মেরে ফেলেন না সাহেব এই ঢের। তাদের দেশে হলে ও ছেলেকে বাপ আস্ত রাখত না। সমালোচনা চলতেই থাকে নীচের তলায়। রোজই চলে।

অমন মা বাপের ওই ছেলে!

মামাদের মতন হয়েছে বোধ হয়। কিন্তু মামাই বা কোথা? এই চার পাঁচ বচ্ছর রয়েছে তারা, কোনদিন দেখেনি সীতুর মামা বা মাতুলালয় বলে কিছু আছে।

হ্যাঁ, সাহেবের আত্মীয়স্বজন এক আধটা বরং কালে কস্মিনে

দেখেছে। কিন্তু মাইজীর? না।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ওরা—খুব গরিবের মেয়ে বোধ হয় অতসী। তিনকুলে কেউ নেই ওর।

ওদের অনুমান ভুলও নয়।

সত্যিই কেউ কোথাও নেই অতসীর। শুধু মানুষের জোর নয়, ভিতরের জোরও বুঝি তেমন করে কোথাও কিছুই নেই। তাই সে গৃহিণী হয়েও যেন আশ্রিতা! নিজের ক্ষেত্রটাকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিঃশব্দে থাকতে চায় সে এখানে। সংসারে বামুন মেয়ের একাধিপত্য মেনে নেয় নীরবে। চাকর বাকরকে বকতে পারে না। মৃগাঙ্ক যতই তাকে অধিকারের সিংহাসনে বসাতে চান, সে অধিকার খাটাবার সাহস হয় না অতসীর।

কিন্তু সীতু যদি এমন না হতো?

তা'হলে কি সহজ হতে পারতো অতসী? সহজ অধিকারে গৃহিণী-পণা আর স্বামী সন্তানের সেবায় সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো নিজেকে?

সীতু যেমন অহরহ নিজেকে প্রশ্ন করে, 'সেটা কোথায়? সেটা কোথায়?' অতসীও তেমনি সহস্রবার নিজেকে এই প্রশ্ন করেছে, 'তাহলে কি সহজ হতে পারতাম? তাহলে কি স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম? পারতাম স্বামীকে সুখী করতে, আর নিজে সুখী হতে? শুধু—সীতু যদি অমন না হতো?'

ঝাপসা ঝাপসা ছায়া ছায়া যে ছবিটা সীতুকে যখন তখন উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, সে ছবিটা কি সত্যিই সীতুর পূবজন্মের? সীতু কি জাতিস্মর?

কিন্তু সীতু জাতিস্মর হলে অতসীকেও তো তাই-ই বলতে হয়। অতসীর মনের মধ্যে যে সেই একটা পূবজন্মের ছবি আঁকা আছে। ঝাপসা হয়ে নয়, স্পষ্ট প্রখর হয়ে। সীতুর সেই পূবজন্মেও অতসীর ভূমিকা ছিল সীতুর মায়ের।

সংসারের অসংখ্য কাজের চাপে ছেলে সামলাবার সময় ছিল না অতসীর, তাই তাকে একটা উঁচু জানলার ধাপে বসিয়ে রেখে যেত,

হয়তো বা হাতে একখানা বিস্কুট দিয়ে, কি কাছে চারটি মুড়কি ছড়িয়ে দিয়ে।

জানলা থেকে নামতে পারতো না সীতু, বসে থাকতো গলির পথটার দিকে চেয়ে, হয়তো বা এক সময় ঘুমে ঢুলতো।

খাটতে খাটতে এক একবার উঁকি মেরে দেখতে আসতো অতসী, ছেলেটা কোন অবস্থায় আছে। ঢুলছে দেখে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হাতে টেনে নামিয়ে চৌকিতে শুইয়ে দিত।

মমতায় মন ভরে গেলেই বা ছেলে নিয়ে দু'দণ্ড বসে থাকবার সময় কোথা? পাশের ঘরে আর একটা লোক পড়ে আছে আরো অসহায় শিশুর মত। সীতু তবু দাঁড়াতে পারে, 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করতেও শিখছে। আর সে লোকটা পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে হাঁটার পালা চুকিয়ে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবার দিন গুণছে।

কিন্তু শিশুর মত অসহায় বলে তো আর সে শিশুর মত নিরুপায় নয়? তার মেজাজ আছে, গলার জোর আছে, অধিকারের তেজ আছে, আর আছে কটূক্তির অক্ষয় তূণ। তাই তার কাছেই বসে থাকতে হয় অতসীর অবসরকালটুকু, তার জন্যেই খাটতে হয় উদয়াস্ত।

কিন্তু সে খাটুনির শেষ হলো কেমন করে?

সীতুর আর অতসীর সেই পূর্বজন্মটা কবে শেষ হলো? কোন্ অনন্ত পথ পার হয়ে আর এক জন্মে এসে পৌঁছল তারা?

জন্মান্তরের মাঝখানে একটা মৃত্যুর ব্যবধান থাকে না? থাকতেই হয় যে! তা' ছিলও তো!

যাদের জন্মান্তর ঘটলো তাদের? না আর একটা মানুষের মৃত্যুর মূল্যে নতুন জীবনটাকে কিনল তারা?

জন্মান্তর! তা সত্যিই বৈকি। নতুন জীবন? গলিত কীটদষ্ট জীর্ণ একটা জীবনের খোলস ছেড়ে হৃদয় উত্তাপের তাপে ভরা তাজা একটা জীবন!

তবু কেন সীতু জাতিস্মর হলো?

কেন সে পূর্বজন্মের স্মৃতির ধূসর ছায়াখানাকে টেনে এনে এই

নতুন জীবনটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুললো ?

কেন সে ছায়ায় তিনটে মানুষের জীবনের সমস্ত আলো ঢেকে দিতে শুরু করলো ?

আচ্ছা, ওদের সেই পূর্বজন্মের মৃগাঙ্ক ডাক্তারও ছিলেন না ? কী তার ভূমিকা ছিল ? শুধু ডাক্তারের ? ভাবতে গিয়ে ভাবতে ভুলে যায় অতসী। মনে পড়ে না, ডাক্তারের পরিচয়টা গৌণ হয়ে গিয়ে হৃদয়বান বন্ধুর ভূমিকাটায় কবে উত্তীর্ণ হলো মৃগাঙ্ক ?

তবু !

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে অতসীর, ওই তবুটা ভাবতে গেলেই। কিছুতেই শেষপর্যন্ত ভাবতে পারে না। ভেবে ঠিক করতে পারে না, যে লোকটা মারা গেল, সে বিনা পয়সার চিকিৎসা উপভোগ করতে করতে শুধু পরমায়ু ফুরোলো বলেই মারা গেল, না পরমায়ু থাকতেও বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ?

অদ্ভুত এই চিন্তাটার জন্যে নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় মাথা হেঁট করে অতসী। বারবার বলতে থাকে, 'আমি মহাপাপী, আমি মহাপাপী।' তবু চিন্তাটা থেকে যায়।

কিন্তু শুধু আত্মনিন্দা করলেই কি জগতের সব সমস্যার মীমাংসা হয় ? সমগ্র মানব সমাজ কি আত্মনিন্দায় পশ্চাদপদ ? সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষ আত্মনিন্দায় পঞ্চমুখ হতে শিখেছে।

তবু মীমাংসা হয়নি। তবু সংশোধন হয়নি মানুষের। সংশোধনের হাতই বা কোথায় ?

নিজেই তো মানুষ নিজের কাছে বেহাত। জন্মের আগে না কি তার বুদ্ধি আর চিন্তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে পূর্বজীবনের সংস্কার। আর জন্মের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে নতুন জীবনের পূর্বপুরুষদের সংস্কার। অস্থিতে মজ্জাতে শিরায় শোণিতে, স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে শুধু মা বাপের নয়, তিন কুলের দোষ গুণ, মেজাজ, প্রবৃত্তি। আকৃতি প্রকৃতি দুটোই মানুষের হাতের বাইরে। কেউ যদি ভাবে আপন প্রকৃতিকে আপনি

গড়া যায়, সে সেটা ভুল ভাবে। ইচ্ছা থাকলেও গড়া যায় না। বড় জোর কুশ্রীতাকে কিঞ্চিৎ চাপা দেওয়া যায়, রুক্ষতাকে কিঞ্চিৎ মসৃণ করা যায়।

এর বেশি কিছু না। শিক্ষাদীক্ষা সবই এখানে পরাজিত। শিক্ষা-দীক্ষা বড় জোর একটু পালিশ লাগাতে পারে মানুষের আদিমতার উপর। যার জোরে চালিয়ে যায় মানুষ।

শিশুরা সত্য, শিশুরা অশিক্ষিত অদীক্ষিত। তাই শিশুরা বন্য, বর্বর আদিম।

কিন্তু সীতুর কি এখনও শৈশব কাটেনি? সামান্যতম পালিশ পড়বার বয়স কি তার হয়নি? সে কেন এমন বর্বরতা করে?

অতসী যদি তাকে সুশিক্ষা দিতে যায়, অতসীর চোখের সামনে কানে আঙুল ঢুকিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে সীতু নির্ভয়ে বুকটান করে।

অতসী যদি গায়ের জোরে শাসন করতে যায়, সীতু তাকে আঁচড়ে কামড়ে মেরে বিধ্বস্ত করে দেয়। অতসী যদি অভিমান করে কথা বন্ধ করে, সীতু অক্লেশে সাতদিন মার সঙ্গে কথা না কয়ে থাকে, নিতান্ত প্রয়োজনেও 'মা' বলে ডাকে না।

কোন্ উপায়ে তবে ছেলেকে শোধরাবে অতসী?

অথচ নিরুপায়ের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যেতেও তো পারে না। মৃগাঙ্কর যন্ত্রণাটা কি উপেক্ষা করবার?

তাই আবারও ছেলের কাছে গিয়ে বসে। আবারও সহজ সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করে, 'আচ্ছা সীতু, মাঝে মাঝে তোকে কিসে পায় বলতো? ভূতে না ব্রহ্মদৈত্যে? খুকুকে কেন ফেলে দিয়েছিলি?'

জিজ্ঞেস করেছিল অতসী খুকুর ফুলো কপাল সমতল হয়ে যাবার পর। সীতুর তখনো প্রখর হয়ে রয়েছে ললাটরেখা।

একবারে উত্তর দেওয়া সীতুর কোষ্ঠীতে নেই, তাই আবারও ওই একই প্রশ্ন করে। বলে, 'বকবো না, মারবো না, কিছু শাসন করবো না, শুধু বল ফেলে দিলি কেন? তুই তো ওকে কত ভালবাসিস!'

খুকু প্রসঙ্গে চোখে জল এসে গেল সীতুর, তবু জোর করে বললো,

'পাজীটা আমার কাছে আসে কেন? আমার গায়ে হাত দেয় কেন?'

'ওমা, তা দিলেই বা—' অবোধ অজ্ঞান অকপট সরল অতসী, বিস্ময়ের গুঁড়ো মুখে চোখে মেখে বলে, 'তুই দাদা হস, তোকে ভালবাসবে না!'

'না, বাসবে না। আমাব হাত তো লোনা! আমি গায়ে হাত দিলেই তো রোগা হয়ে যাবে ও, অসুখ করবে!'

'ছি ছি সীতু, এই ভেবে তুই বসে আছিস? ওমা, কি বোকারে তুই! সব বড়দেরই হাত ওই রকম। বাচ্চারা তো ফুলের মতন, একটুতেই ওদের অসুখ করে, তাই তো সাবধান হন তোর বাবা।'

'আমিও তো সাবধান হয়েছি। ঠেলে দিয়েছি।'

'আব তারপর নিজের কপাল দেয়ালে ঠুকে ঠুকে ছেঁচেছিস! তোকে নিয়ে যে আমি কি করবো! ওঁকে তুই অমন কবিস কেন? উনি কি অন্যায় কিছু বলেন?' অতসী দম নেয়, 'কত বাড়ির কর্তারা কত রাগী হয়, কত চেঁচামেচি বকাবকি করে, দেখিসনি তো তুই, তাই একটুতেই অমন করিস। তুই যদি ওঁকে একটু মেনে চলিস, তাহলে তো কিছুই হয় না। বল এবার থেকে ওঁর কথা শুনবি? যা বলবেন তাতেই বিশ্রীপনা করবি না? উনি তোর কি করেছেন? এই যে খুকুকে নিয়ে কাণ্ডটা করলি, কিচ্ছু বকলেন উনি তোকে? বল, বল সত্যি কথাটা।'

সীতু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাটাই বলে, 'না বকলেও ওঁকে আমার ছাই লাগে।'

'বেশ, তাহলে এবার থেকে খুব কসে বকতেই বলবো।'

আট বছরের একটা ছেলের কাছে নীচুর চরম হয় অতসী, হেসে ওঠে কথার সঙ্গে। হেসে হেসে বলে, 'বলবো সীতুবাবু বকুনি খেতেই ভালবাসে, ওকে খুব বকো এবার থেকে।'

আর সীতু? সীতু কঠিন গলায় বলে ওঠে, 'তোমার কথা আমার বিচ্ছিরি লাগছে।'

তবু হাল ছাড়ে না অতসী। তবু বলে, 'সীতুরে তোর কি উপায়

হবে? নরকেও যে জায়গা হবে না তোর। যে ছেলে মা বাপকে এরকম করে, তাকে কি বলে জানিস? মহাপাপী। শেষটায় কিনা মহাপাপী হতে ইচ্ছে তোর?'

একটু বুঝি সঙ্কুচিত হয় ছেলে, পাপের ভয়ে, নরকের ভয়ে। অতসী সুযোগ বুঝে বলে, 'দেখছিস তো ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা কত খাটুনি। দিনরাত খাটছেন। কেন? টাকা রোজগারের জন্যেই তো? কিন্তু সে টাকা কাদের জন্য খরচ করছেন উনি? এই আমাদের জন্যে কি না? সেই মানুষকে যদি তুমি কষ্ট দাও, গুরুজন বলে একটুও না মানো, তা হলে মহাপাপী ছাড়া আর কি বলবে তোকে লোকে?'

না, সঙ্কুচিত হবার ছেলে নয় সীতু।

কথাগুলো যেন বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর মতই হয়। যার উদ্দেশে এত কথা, সে কথাটি পর্যন্ত কয় না, মুখখানা কাঠ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তথাপি অতসী ভাবে একটু বোধ হয় নরম হচ্ছে। যে মনটা মাত্র সাড়ে আটটা বছর পৃথিবীর রোদ জল আলো অন্ধকারের উপসত্ত্ব ভোগ করে সবে শক্ত হতে শুরু করেছে, তাকে আর এতগুলো শক্ত কথায় নরম করতে পারা যাবে না? অতএব আরও এক চাল চালে সে। বলে, 'ভেবে দেখ দিকিনি, তোর জন্যে আমি সুদ্ধ কত বকুনি খাই। এবার প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো ওঁর অবাধ্য হবি না। উনি যা বলবেন—'

'না প্রতিজ্ঞা করবো না।'

'না, প্রতিজ্ঞা করবি না? এত বড় সাহস তোর?' অতসী ক্ষেপে ওঠে হঠাৎ। ক্ষেপে গিয়ে কোনদিন যা না করে, তাই করে বসে। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলের গালে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'অসভ্য জানোয়ার বেইমান!'

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে সীতুর, এ গালের রক্তিমাভা ও গালে ছড়িয়ে পড়ে। তবু উত্তর দেয় না সে। গালে হাতটা বুলোয় না। এক ঝটকায় মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে বুনো জানোয়ারের মতই ঘাড় গুঁজে গোঁ গোঁ করে চলে যায়। অতসী চুপ করে থাকে।

মনের মধ্যে মৃগাঙ্কর একদিনের একটা কথা বাজে, 'একটা বাচ্চা ছেলের কাছে আমরা হেরে গেলাম!' আক্ষেপ করে বলেছিলেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

হার মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল অতসী, ভেবেছিল সমস্ত চেষ্টা দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করে, সীতুকে নরম করবে। মানুষের আদিম কৌশলই 'পাপের ভয়' দেখানো, তাও করে দেখবে। ছোট ছেলের মন, নিশ্চয়ই বিচলিত হবে মানুষের চিরকালীন নিয়ন্তা 'নরকের ভয়ের' কাছে। কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থতা ক্ষেপিয়ে তুললো অতসীকে। তাই মেরে বসলো সীতুকে। এবার কি তবে মারের পথই ধরতে হবে? নইলে মৃগাঙ্ককে কি করে মুখ দেখাবে অতসী?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের বাড়িতে ফালতু কোনও আত্মীয় নেই, সবই মাইনে করা লোক। 'বামুন মেয়ে'কে তো অতসীই এসে দেখেছে। তবু অতসীর উপর টেক্কা মারে ওরা—কাজে, কথায়।

বিশেষ করে বামুন মেয়ে।

সে ছুটে আসে অতসীর এই নীরবতার মাঝখানে। বলে, 'ঠিক করেছেন বৌমা, মারধোর না করে কি আর ছেলে মানুষ করা যায়? যে দেবতার যে মন্তর! আমি তো কেবলই ভাবি এমন এক বগ্‌গা জেদি গোঁয়ার ছেলেকে কি করে বৌমা না মেরে থাকে? আপনি রাগই করুন আর ঝালই করুন না, পষ্ট কথা বলবো এমন ছেলে আমি জন্মে দেখিনি। বাপ বলে কথা, জন্মদাতা পিতা, তাকে কি অগ্যেরাহ্যি! সেদিনকে দেখি বারান্দায় টবে একটা ফুলগাছ পুঁতছে ছেলে, কে জানে কি এতটুকু গাছ। বাবু এসে বকলেন, 'কি হচ্ছে? বাগান?' বকে নয়, ধমকে নয়, বরং একটু হেসে, ওমা বলবো কি, বাপের কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে গাছটাকে উপড়ে তুলে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল! আমি তো অবাক। ধন্যি বলি বাবুর সহ্যশক্তি, একটি কথা বললেন না, চলে গেলেন। আমাদের ঘরে হলে বাপ অমন ছেলেকে ধরে আছাড় মারতো। শুধু কি ওই একটা? উঠতে বসতে

তো বাপকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। শাস্তরে বলেছে, পিতা সগ্‌গো পিতা ধম্মো, সেই পিতাকে এত অমান্যি ?'

'বামুন মেয়ে, তুমি তোমার কাজে যাও।'

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দেয় অতসী। অসহ্য লাগছে ওর স্পর্ধা।

বামুন মেয়ে হঠাৎ আদেশে থতমত খেয়ে চলে যায়। কিন্তু অতসী নড়তে পারে না, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

ওর এসব কথার অর্থ কি ? এত কথা কেন ? এ কি শুধুই বেশি কথা বলার অভ্যাস ? না আর কিছু ?

গালটা জ্বালা করলেও গালে হাত দেবে না সীতু, কাঠ হয়ে বসে থাকবে সেই ওর জানলার ধারে, সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এতো শুধু একটা চড় নয়, এ বুঝি সীতুর ভবিষ্যতের চেহারার আভাস।

তাহলে অতসীও এবার শাসনের পথ ধরবে। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মন রাখতে তার অনুকরণ করবে। বাপের উপর রাগ ছিল, মায়ের উপর আসছে ঘৃণা। ঘৃণা আসছে ওই বিশ্রী লোকটাকে মা ভয় করে বলে, ভালবাসে বলে।

সীতুর বয়েস কি মাত্র সাড়ে আট ? এত কথা তবে শিখলো কি করে সীতু ? কে শেখালো এত প্রখর পাকামি ? এই প্যাঁচালো পাকা বুদ্ধিটা কি তা'হলে সীতুর পূর্বজন্মার্জিত ? কে জানে কি !

সীতু তার ছোট্ট দেহের মধ্যে একটা পরিণত মনকে পুষতে যন্ত্রণাও তো কম পায় না ?

আচ্ছা, তবে কি এবার থেকে বাবাকে ভয় করবে সীতু ? করবে ভক্তি ? মার মত ভালও বাসবে ? ভাববে বাবা কত কষ্ট করছেন তাদের জন্য ? চিন্তার মধ্যেই মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

বাবাকে সীতু কিছুতেই ভালবাসতে পারবে না, কক্‌খনো না। তার জন্যে মায়ের কাছে মার খেতে হলেও না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বোধকরি জলতেষ্টা পাওয়ায় উঠল

সীতু। উঠে দেখল, সামনেই বারান্দার রেলিঙের তারে বাবার রুমাল দুটো শুকোচ্ছে ক্লীপ. আঁটা। বোধহয় মাধব তাড়াতাড়ির দরকারে এখানে শুকোতে দিয়ে গেছে. এইখানটায় একটু রোদ এসে পড়েছে বলে।

রুমাল দুটো ঝুলছে, বাতাসে উড়ছে ফরফর করে, সীতু সেদিক একটু তাকিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পা উঁচু করে হাত বাড়িয়ে আটকানো ক্লীপ্‌টা টেনে খুলে নয়, আর মুহূর্তের মধ্যেই রুমাল দুটো কোথায় ছুটে চলে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে।

ওটা সম্পূর্ণ চোখ ছাড়া হয়ে গেলে সীতুর মুখে ফুটে ওঠে একটা ক্রুর হাসি। দরকারের সময় রুমাল না পেলে বাবা কি রকম রাগ করে সীতুর জানা। লোকসানটা যতই তুচ্ছ হোক, বাবার অসুবিধে তো হবে! অতসী দূর থেকে তাকিয়ে দেখে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে, ছুটে এসে বকবে এমন সামর্থ্য খুঁজে পায় না মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গিয়ে আলমারি থেকে দু'খানা ফরসা রুমাল বার করে রেখে দেয় মৃগাঙ্কর দরকারী জায়গায়।

গালের জ্বালাটা যেন একটুখানি জুড়োল। আবার যেন চারিদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে সীতুর। ঠিক হয়েছে, এই একটা উপায় আবিষ্কার করতে পেরেছে সীতু বাবাকে জব্দ করবার। সব সময় সীতুর দিকে কড়া কড়া করে তাকানো, আর ভারি ভারি গলায় বকার শোধ তুলবে সে এবার বাবাকে উৎখাত করে। আর খুকুটাকে কেবল পাতের খাওয়াবে।

বাবা জব্দ হচ্ছেন এটা ভেবে ভারি মজা লাগে সীতুর। উপায় উদ্ভাবন করতে হবে জব্দ করার।

মোজার তলাটা রক্তে ভেসে গেল!

মোজা ভেদ করে কাঁচের কুচিটা পায়ের চামড়ায় বিঁধে বসেছে। হীরের মত ঝক্‌ঝকে ছোট্ট কোনাচে একটা কুচি।

'বাড়িতে কী হচ্ছে কি আজকাল?' মৃগাঙ্ক ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন,

রুগী দেখতে বেরোবার মুখে নিজেই রুগী হয়ে। 'মাধো! বেপ্ বাহাদুর।'

ছুটে এল ওরা, আর সাহেবের দুরবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পা থেকে কাঁচের কুচিটা টেনে বার করেছেন মৃগাঙ্ক মোজা খুলে, রক্তে ছড়াছড়ি যাচ্ছে জায়গাটা।

এইমাত্র জুতো পালিশ করে ঠিক জায়গায় রেখে গেছে মাধব, এর মধ্যে জুতোর মধ্যে কাঁচের টুকরো এল কি করে?

অতসীও এসে অবাক হয়ে যায়, 'কি করে?' 'কি করে?'

'কি করে আর!' মৃগাঙ্ক তীব্র চীৎকার করে ওঠেন, 'জুতোর পালিশের বাহার করা হয়েছে, ঠুকে একটু ঝাড়া হয় নি। তুমি শিগগির একটু বোরিক কটন আর ডেটল্ দাও দিকি! আর এই মেধোটার এমাসে কদিন কাজ হয়েছে হিসেব করে মিটিয়ে বিদেয় করে দাও।'

মেধো অবশ্য কাঁচুমাচু মুখে প্রতিবাদ করে ওঠে, তারস্বরে বোঝাতে থাকে, অন্তত চারবার সে জুতো ঠুকে ঠুকে ঝেড়েছে, কাঁচের কুচি তো দূরের কথা একদানা বালিও থাকার কথা নয়। কিন্তু মেধোর প্রতিবাদে কে কান দেয়?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের সহ্যশক্তি অগাধ হলেও, এত অগাধ নয় যে, চাকরের এতটা অসাবধানতার উপর এতখানি ধৃষ্টতা সহ্য করবেন। তাঁর শেষ কথা, 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাক ও।'

ডাক্তারের নিজের চিকিৎসা করার সময় নেই। তখুনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফের জুতোয় পা গলাতে হয় তাঁকে, মেধো সিঁড়ির কোণে বসে কাঁদছে দেখেও মন নরম হয় না তাঁর।

'ফিরে এসে যেন তোমাকে দেখিনা,' বলে চলে যান।

বলনে যতটা জোর ফুটলো মৃগাঙ্কর, চলনে ততটা নয়, পাটা রীতিমত জখম হয়েছে।

কিন্তু কোথা থেকে এল এই তীক্ষ্ণ কোনাচে কাঁচ কুচি? মাধবের চোখে 'অন্নওঠা'র অশ্রুধারা, অন্যান্যদের চোখে বিস্ময়ের ভীতি, অতসীর চোখে শঙ্কার ধূসর মেঘ।

শুধু অন্তরাল থেকে ছোট একজোড়া চোখ সাফল্যের আনন্দে জ্বল

জন্ম করে। ছোট চোখ, ছোট বুদ্ধি, সামান্য অভিজ্ঞতা, তবু ডাক্তারের বাড়ির বাতাসে বুঝি এসব অভিজ্ঞতার বীজ ছড়ানো থাকে।

কাঁচের কুচি ফুটে থাকলে যে বিষাক্ত হয়ে পা ফুলে উঠে বিপদ ডেকে আনতে পারে, একথা এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাও জানে।

'টেবিলের ওপর একখানা জার্নাল ছিল, কোথায় গেল অতসী?'

রাত্রে অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করেন ডাক্তার, করেন শোবার ঘরেই, টেবিল ল্যাম্পের আলোয। আগে নীচতলায় লাইব্রেরী ঘরে পড়তেন, খুকুটা হওয়ার পর থেকে উঠে আসেন উপরে। খুকুর জন্যে নয়, খুকুর মার জন্যেই।

মেয়ে জন্মাবার পর অনেকদিন ধরে নানা জটিল অসুখের মধ্যে কাটাতে হয়েছে অতসীকে। তখন মৃগাঙ্ক অনেকটা সময় কাছে না থাকলে চলত না। সেই থেকে রয়ে গেছে অভ্যাসটা।

শুতে এসে তাই প্রশ্ন।

অতসী বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক তাকায়, ঘরের টেবিল থেকে কোন কিছুই তো নড়ানো হয়নি।

'কি হলো সেটা? তাতে যে ভীষণ দরকারী একটা আর্টিকেল রয়েছে, আজ রাত্রেই পড়ে রাখবো ঠিক করেছি। খোঁজ খোঁজ।'

কিন্তু কোথায় খুঁজবে অতসী?

অতসীর ঘরটা তো ঘুঁটে কয়লার ঘর নয়। চাল ডাল মশলার ভাঁড়ার নয় যে, কিসের তলায় ঢুকে গেছে, হারিয়ে গেছে।

ছিমছাম ফিটফাট ঘর, সুতোটি এদিক ওদিক হয় না।

খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও না।

স্বামীর বিশেষ বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ার পরও খুঁজতেথাকে অতসী। কিছু পড়াশোনা না করে মৃগাঙ্কর এরকম শুয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক।

অবশেষে মৃগাঙ্করই মমতা হল। কাছে ডাকলেন অতসীকে। কোমল স্বরে বললেন, 'আর বৃথা কষ্ট কোর না, এসো শুয়ে পড়ো। এখুনি তো আবার খুকু জেগে উঠে জ্বালাতন করবে।'

মা বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামী নয়, মৃগাঙ্ক

অতসীর ভালবেসে পাওয়া স্বামী। বয়সে অনেকটা তফাৎ সত্ত্বেও প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল অতসী মৃগাঙ্ককে, শ্রদ্ধা করেছিল ত্রাণ কর্তার মত, ভক্তি করেছিল দেবতার মত। আর মৃগাঙ্ক?

মৃগাঙ্কও তো কম ভালোবাসেননি, কম করুণা করেননি, কম স্নেহ সমাদর করেননি।

তবু কেন ভয় ঘোচে না অতসার? তবু কেন মৃগাঙ্ক একটু কাছে টেনে কোমল স্বরে কথা বললেই চোখে জল আসে তার?

মা বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামীর জন্যে বুঝি মনের মধ্যে এমন দায় থাকে না, থাকেনা এমন 'হারাই হারাই' ভাব। সেখানে অনেক পেলেও পাওয়ার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ রাখতে হয় না, মনকে দিয়ে বলাতে হয় না, 'তুমি কত দিচ্ছ! তুমি কত মহৎ।'

প্রাপ্য পাওনায় আবার কৃতজ্ঞতা বোধ কিসের? অনায়াসলব্ধকে জমার খাতায় টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে আবার আয়াস কিসের?

যেখানে আমিই দাতা, 'আমি দান করছি আমাকে,' 'সমর্পণ করছি আমাকে,' 'উপহার দিচ্ছি আমার 'আমি'টাকে'—সেখানে অনন্ত দায়!

যে আমিকে উপহার দিচ্ছি, সমর্পণ করছি, দান করছি, সে আমিকে তো উপহারের যোগ্য সুন্দর করে তুলতে হবে? সমর্পণের যোগ্য নিখুঁত করে সম্পূর্ণতা দিতে হবে? দানের উপযুক্ত মূল্যবান করে গড়তে হবে?

তাই বুঝি সদাই ভয়! তাই বুঝি সব সময় কৃতজ্ঞতা!

'কি হল? কাঁদছ নাকি? কি আশ্চর্য!'

অতসী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'তোমার কত অসুবিধে হল! আমার অসাবধানেই তো—'

'আমার অসাবধানেও হতে পারে। আমিই হয়তো আর কোথাও রেখেছি। মিছে নিজেকে দোষী ভাবছো কেন? এটা তোমার একটা মানসিক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।'

অতসী কি উত্তর দেবে?

'ঘুমিয়ে পড়, মন খারাপ কোর না। তোমার মুখে হাসি দেখবার

জন্মেই আমি—কিন্তু রাহুমুক্ত পূর্ণশশী ক'দিনই বা দেখতে পেলাম ?'

নিশ্বাস ফেলেন ডাক্তার।

অতসী নিশ্বাস ফেলে ভাবে, সত্যি ক'দিনই বা ? প্রথমটায় তো অদ্ভুত একটা ভয়, অপরিসীম একটা লজ্জা, আর অনেকখানি আড়ষ্টতা।

মৃগাঙ্কর আত্মায় সমাজ আছে, নিজের পরিত্যক্ত জীবনেতিহাসের গ্লানিকর স্মৃতি আছে, চির অসন্তুষ্টচিত্ত বেয়াড়া আবদেরে সীতু আছে। এ আড়ষ্টতা ঘুচতে সময় লেগেছে। তারপর এল খুকুর সম্ভাবনা। এল আনন্দের জোয়ার, নতুন করে নব মাতৃত্বের সূচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অতসী, উঠলো উচ্ছল হয়ে। কৃতজ্ঞতা বোধের দৈন্যটা'ও বুঝি গিয়েছিল, মূল্যবোধ এসেছিল নিজের উপর।

তাই বুঝি নারী মাতৃত্বে মনোহর!

সেই গৌরবে রমণী আর শুধু রমণী নয়, রমণীয়। তার প্রতি অণুপরমাণুতে ফুটে ওঠে সেই গৌরবের দীপ্তি। সে দীপ্তি বলে, 'শুধু তুমিই আমায় অন্ন আর আশ্রয় দাওনি, আমিও তোমায় দিলাম সন্তান আর সার্থকতা!'

হয়তো সেই গৌরবের আনন্দে ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠতে পারত অতসী। কিন্তু সীতু বুঝি পণ করেছে অতসীকে সহজ হতে দেবে না, সুখী হতে দেবে না। ওদের বংশধারাতেই বুঝি আছে এই হিংসুটেমি।

হ্যাঁ আছেই তো। তিন পুরুষ ধরে এই হিংসুটেপনা করে ওরা জ্বালাচ্ছে অতসীকে।

সেবার তো অতসীর নিজের ভূমিকা ছিলনা কোথাও কোনখানে। সে তো অনায়াসলব্ধ। মা বাপের ঘটিয়ে দেওয়া বিয়ে। ছাঁদনাতলায় প্রথম শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি!

তা তখন তো তাই ভেবেছিল অতসী। সেই দৃষ্টির সময় সমস্তখানি মন একটি শুভলগ্নের আশায় কম্পিত আবেগে থরথর করে উঠেছিল।

কিন্তু সে শুভলগ্ন তেমন করে প্রত্যাশার মুহূর্তে এসে দেখা দিলনা। দিতে দিলেন না শ্বশুর। স্বার্থপর বৃদ্ধ, আপন সন্তানের আনন্দ আহ্লাদ

সহ্য করার ক্ষমতাও নেই তাঁর।

নইলে সত্যিই কি সে রাতে হার্টের যন্ত্রণায় মরমর হয়ে পড়েছিলেন তিনি? যে রাতে অতসীর জন্যে এঘরে ফুলের বিছানা পাতা হয়েছিল।

অতসী বিশ্বাস করেনি। করেনি বাড়ির আর সকলের মুখের চেহারা দেখে। বিয়ে বাড়িতে ছিল তো কতজনা। সকলের মুখে যেন অবিশ্বাসের ছাপ।

তবু সকলেই লোক দেখানো আহা উহু হায় হায় করেছিল। সকলেই হুমড়ে পড়ে তাঁর ঘরে গিয়ে বসেছিল। তার সঙ্গে বসেছিল নতুন বিয়ের বরও। সমস্ত রাত ঠায় বসেছিল।

হাতে তার তখনো হলুদ মাখানো সুতো বাঁধা, রূপোর জাঁতিখানা সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তখনও। যেমন ফিরছিল অতসীর হাতে কাজললতা।

স্বামীর মনের ভাব সেদিন বুঝতে পারেনি অতসী। বুঝতে পারেনি সেও তার বাপকে অবিশ্বাস করছে কি না।

কিন্তু শুধু সেদিন কেন? কোন দিনই কি? কোন দিনই কি বুঝতে পেরেছে তাকে অতসী? শুধু তাকে দেখেছে ভেবেছে মানুষ কেন অকারণে রুক্ষ হয়, কেন নিষ্ঠুরতায় আমোদ পায়।

সবাই ওঘরে। শুধু একা অতসী ব্যর্থ ফুলশয্যার ঘরে খালি মাটিতে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছিল।

একবার কি কাজে যেন সে ঘরে এসেছিল বিয়ের বরটা। এসেছিল কি একটা ওষুধ নিতে ব্যস্তভঙ্গীতে। তবু থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল 'এভাবে মাটিতে কেন? বিছানায় উঠে শুলে ভাল হত।'

বিছানা মানে সেই বিছানা। যার উপর শিশি খানেক এসেন্স ঢেলে দিয়েছিল কে বা কারা, আর ফুল ছিল অনেক। তারা হয়তো পাড়ার লোক, নিষ্পর।

ভয়ানক একটা বিস্ময় এসেছিল অতসীর।

ভেবেছিল ও কি সত্যিই মনে করেছিল অতসী মাটি থেকে উঠে একা ওই সুরভিসিক্ত রাজকীয় শয্যায় গিয়ে শোবে? এত নীরেট ও, এত ভাবলেশশূন্য।

আর তা যদি না হয়, শুধু মৌখিক একটু ভদ্রতা মাত্র করতে এল ফু শয্যার রাতে নব পরিণীতার সঙ্গে? হৃদয়াবেগশূন্য এই সম্ভাষণে!

তবু তখনি মনকে সামলে নিল অতসী। ছি ছি একী ভাবছে সে? বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ, এখন কি ও আসবে প্রিয়া সম্ভাষণে? তাহলেই তো বরং ঘৃণা আসতো অতসীর।

অতএব ধড়মড় করে উঠে বসে খুব আস্তে বলল, 'আমি ওঘরে যাবো?'

'তুমি? না. তুমি আর গিয়ে কি করবে? তোমার যাবার কি দরকার? তুমি ঘুমোতে পার।'

বলে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে চলে গেল সে।

কী নীরস সংক্ষিপ্ত নির্দেশ! একটু মিষ্টি করে বলা যেত না?

তাড়াতাড়ি ভাবল অতসী, ছি ছি ওর বাবার অসুখ। যায় যায় অবস্থা! আবার ভাবল, আচ্ছা, হঠাৎ যদি তাঁর কিছু হয়ে যায়। শিউরে উঠল। তাহলে কী বলবে লোকে তাকে? কত অপয়া।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হল না, ঝি এসে ডাকল, 'নতুন বৌদিদি, পিসিমা বলছে ওঘরে গিয়ে বসতে। যাও শ্বশুরের পায়ে হাত বুলোও গে যাও। এখন কি হয় কে জানে। ছেলে-অন্ত প্রাণ তো! যত আবদার ছেলের ওপর। সেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল, শোকটা সামলাতে পারছে না মানুষটা।'

হাতছাড়া! অতসীর মনে হল, জীবনে এত দিন যে ভাষায় কথা কয়ে এসেছে সে, শুনছে যে ভাষায় কথা, শুধু সেইটুকু মাত্রই বাংলা ভাষার পরিধি নয়। এ ভাষা তার কাছে ভয়ঙ্কর রকমের নতুন।

তবু উঠে গেল সেবায় তৎপর হতে।

আর গিয়েই প্রথম ধরা পড়ল সেই সন্দেহটা।

না, কিছু হয়নি ভদ্রলোকের। অকারণ কাতরতা দেখিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন বড় ছেলের হাত দুখানা। স্বাভাবিক মুখ, স্বাভাবিক নিশ্বাস। যেটা অস্বাভাবিক সেটা চেষ্টাকৃত।

কিন্তু শুধুই কি সেই একদিন? দিনের পর দিন নয়?

মিথ্যা সন্দেহ নয়। সত্যিই রোগের ভান করে রাতের পর রাত ছেলেকে আঁকড়ে বসে রইলেন বৃদ্ধ। ছেলে চোখের আড়াল হলেই না কি মারা যাবেন তিনি।

যতবারই পিসশাশুড়ী বলেছেন, 'ক'রাত জেগেছে ছেলেটা, এইবার একটু শুতে যাক দাদা?' ততবারই বৃদ্ধ ঠিক তন্মুহূর্তেই চেহারায় নাভিশ্বাসের প্রাক্-চেহারা ফুটিয়ে তুলে মুখে ফেনা তুলে মাথা চেলে গোঁ গোঁ করে একাকার করেছেন। 'গেল গেল' রব উঠে গেছে, মুখে গঙ্গাজল, কানে তারকব্রহ্ম নাম! কতক্ষণে একটু সামলানো।

বিয়ের অষ্টাহ এই ভাবেই কেটেছিল।

তা অষ্টাহই বা কেন, যতদিন বেঁচেছিলেন সেই অভিনেতা বৃদ্ধ, তত দিনই প্রায় একই অবস্থায় কেটেছে অতসীর। অনবরত হার্টফেলের ভয় দেখিয়ে দেখিযে দীর্ঘ চারটি বছর কাটিয়ে অবশেষে সত্যই একদিন হার্টফেল করলেন তিনি। কিন্তু ততদিনে জীবনের রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছে অতসীব, দিন রাত্রির আবর্তন যেন একটা যন্ত্রের মত হয়ে উঠেছে।

৫ তারপর সীতু কোলে এল।

নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জীবনের মাঝখানে নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা-হীন সেই আবির্ভাব। দোষও দেওয়া যায় না কাউকে।

অভ্যর্থনার পরিবেশও নেই তখন। আচমকা ওপরওলার সঙ্গে খিটমিটি করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে তখন সেই কাঠগোবিন্দ ধরনের মানুষটা। ছেলের জন্ম সংবাদে শুধু মুখটা একটু কুঁচকে বলল, 'মেয়ে হয়ে এলে নুন খেয়ে খুন হতে হতো সেই ভয়েই বোধকরি ছেলের মূর্তিতে এসেছে।'

পিসি সেই সেবার বিয়েতে এসেছিলেন, আবার এসেছেন এই উপলক্ষে। তিনি বললেন, 'দেখ ছেলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ যেন সত্য দাদার মুখ! দাদাই আবার ফিরে এসেছেন রে, বড্ড আকর্ষণ ছিল তো তোর ওপর!'

ঘরের মধ্যে থেকে ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল অতসীর। এ

কী ভয়ঙ্কর কথা! এ কী সর্বনেশে কথা। যে মানুষটা তার জীবনের রাহু ছিল আবার সে ফিরে এল!

অতসীর ধারণা হয়েছিল প্রথম মিলনের পরম শুভলগ্নটা ব্যর্থ হতেই জীবনটা এমন অভিশপ্ত হয়ে গেছে তার। মন্ত্রের ধ্বনি বাতাসে মিশিয়ে গেছে শক্তিহারা হয়ে, প্রেমের দেবতা প্রতীক্ষা করে হতাশ হয়েই বোধকরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে শর ছুঁড়ে চলে গিয়েছেন, সে শর পঞ্চশরের একটা নয়। আলাদা কিছু। আলাদা কোন বিষবাণ!

আর এ সমস্তর কারণ একজন নিষ্ঠুর লোকের স্বার্থপরতা!

জীবনের দল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেল না, অবকাশ হল না পরস্পারের মধ্যে কোমল লাবণ্যমণ্ডিত একখানি পরিচয় গড়ে ওঠবার।

তার আগেই রেঁধে বেড়ে স্বামীকে ভাতবেড়ে দিতে হল অতসীকে, কাচতে হল তার ছাড়া ধুতি, জুতোয় কালি লাগাতে হল, হল ভাঁড়ারে কি ফুরিয়েছে তার হিসাব জানাতে।

কিন্তু সুযোগ আর অবকাশ পেলেই কি সেই নিতান্ত বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন নীরস আর বিরস ধরনের মনটা কোমল লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারতো?

কে জানে পারতো কিনা। কিন্তু এটা দেখা গেল স্বার্থপরতায় আর ফিচলেমিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। নিজের ছেলের প্রতিই হিংসেয় কুটিল হয়ে উঠছে সে মুহুর্মুহু। ছেলে কাঁদলেই রুক্ষ গলায় ঘোষণা করবে সে, 'দাও দাও গলাটা টিপে শেষ করে দাও, জন্মের শোধ চীৎকার বন্ধ হোক।' ছেলে রাত জেগে উঠে জ্বালাতন করলে বলতো, 'ভালো এক জ্বালা হয়েছে, সারাদিন খাটবো খুটবো আর রাতে তোমার সোহাগের ছেলের সানাই বাঁশি শুনবো। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আপদটাকে নিয়ে। দেব, এবার ঢাকী সুদ্ধুই বিসর্জন দেব।'

ছেলে নিয়ে ছাতে চলে যেত অতসী, শীতের দিনে হয়তো বা ভাঁড়ারের কোণে।

তা সারাদিনের 'খাটা খোটার' গৌরব বেশিদিন ব্যাখ্যানা করতে হল না সেই লোকটাকে, এক দুরারোগ্য ব্যাধি এসে বিছানায় পেড়ে ফেললো তাকে। আর তার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী করলো সে শিশুটাকে। 'অপয়া লক্ষ্মীছাড়া' শিশুটাকে।

ছেলের সঙ্গে রেষারেষি।

অতসীর সাধ্য সামর্থ্য সময় সব নিয়োজিত হোক তার নিজের জন্যে। ওই লক্ষ্মীছাড়াটার কিসের দাবী? বাসনমাজা ঝিটার কাছে পড়ে থাকনা ওটা। নয়তো বিলিয়েই দিকগে না ওকে অতসী।

এরপর তো ওই ছেলেটার হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে? তা আগে থেকেই ভারমুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলের মরণ কামনা করেছে লোকটা।

'মরে না! আপদটা মরেও না! দেখছি কাঠবেড়ালীর প্রাণ!'

রোগবিকৃত মুখটা কুটিল হিংসেয় আরও বিকৃত হয়ে উঠতো।

দুরারোগ্য রোগ, এ ঘরে ছেলে নিয়ে শোওয়া চলে না, আর সেই নিতান্ত শিশুটাকে সত্যিই রাতে একা ঘরে ফেলে রেখে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে মন কোনদিন যুক্তিসহ নয়, সে মন ভাগ্যের এই মার খেয়ে কি যুক্তিসহ হবে? বরং আরও অবুঝ গোঁয়ার হয়ে ওঠে। ভাবে, ওই ছেলেটার ছুতো করে অতসী তার হাত থেকে পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে।

জীবন তো গোনাদিনে পড়েছে, ফুরিয়ে আসছে জীবনের ভোগ, হাহাকার করা বুভুক্ষু চিত্ত নিংড়ে নিতে চায় শেষ ভোগরস।

যে মানুষগুলো আস্ত দেহ নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ছিঁড়ে কুটে ফেলতে পারলে যেন তার আক্রোশ মেটে।

সেই হতভাগা লোকটার মনস্তত্ত্ব তবু বুঝতে পারতো অতসী, কিন্তু সীতু কেন এমন? কোন কিছু না বুঝেই, ও কেন এমন হিংস্র?

অন্যকে সুখী আর স্বচ্ছন্দ দেখলেই কি ওদের ভিতরের রক্তধারা শয়তানীর বিষবাষ্পে নীল হয়ে ওঠে?

সকালবেলা জেগে উঠে দেখলো মৃগাঙ্ক ঘুমোচ্ছে, মুখে নির্মল একটা প্রশান্তি। দিনের বেলায় যেটা প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বদলে গেল মন, ভারি একটা আনন্দে ছলছল করতে করতে স্নান করতে গিয়েছিল অতসী, অনেক উপকরণ সমৃদ্ধ স্নানের ঘরে।

কিন্তু স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই চমকে কাঁটা হয়ে গেল মৃগাঙ্কর প্রচণ্ড চীৎকারে।

ঘুম থেকে উঠেই কাকে এমন বকাবকি করছেন রাশভারী মৃগাঙ্ক ডাক্তার? কেনই বা করছেন? আবার কি সেদিনের মত জুতোর মধ্যে কাঁচের কুচি পেয়েছেন?

না কাঁচের কুচি নয়, কাগজের কুচি।

কাগজের কুচি পেয়েছেন মৃগাঙ্ক! জুতোর মধ্যে নয়, জুতোর তলায়। যে কাগজের গোছাখানা কাল খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ছিলেন মৃগাঙ্ক, হয়রান হয়েছিল অতসী। সকালবেলা বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানটুকুতে একপাক ঘুরে গাছ-গাছালিগুলোর তদারক করা মৃগাঙ্কর বরাবরের অভ্যাস। আজও এসেছিলেন নেমে, এসে দেখলেন সারা জমিটায় কাগজের কুচি ছড়ানো। সেই কালকের জার্নালখানা।

কে যেন দুরন্ত রাগে কুটি কুটি করে দাঁতে ছিঁড়ে ছড়িয়েছে।

কে? কে? কে করেছে এ কাজ?

রাগে পাগলের মত হয়ে চেঁচামেচি করেছেন মৃগাঙ্ক, বাড়ির সবকটা চাকর-বাকরকে ডেকে জড় করেছেন, তারপর হয়েছে রহস্যভেদ।

আসামীকে এনে হাজিরও করেছে নেপ্‌বাহাদুর পাঁজাকোলা করে। কারণ অপরাধটা তার নিজের চক্ষে দেখা।

এখন অপরাধীর কানটা ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন মৃগাঙ্ক, আর প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছেন, 'কেন করেছ এ কাজ? বল কেন করেছ? না বললে ছাড়বো না আমি।'

সকালবেলার ঘুমভাঙা মনে কোন অন্যায় দেখলে রাগটা বুঝি বেশিই হয়ে পড়ে। ঝাঁকুনির চোটে কানটা ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

অতসী নেমে এসেছে কোন রকমে একখানা শাড়ীজামা জড়িয়ে,

খুকুকে কোলে করে তার ঝিটাও।

'দাদা মাত্তে বাবা।' হাঁ করে কেঁদে ওঠে খুকু।

আর অতসীর আর্তনাদটাও খুকুর মত শোনায়।

'মরে যাবে যে! কি করছ?'

'অমন ছেলের মরাই উচিত।' বলে পরিস্থিতিটার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান মৃগাঙ্ক।

আস্তে আস্তে সকলেই চলে যায় আপনকাজে, সময়মত খায়-দায়। শুধু বাগানের এককোণে ঘাড় গুঁজে অভুক্ত বসে থাকে একটা দুর্মতি শিশু, আর নিজের ঘরের এককোণে তেমনি বসে থাকে অতসী। আজ বুঝি খুকুর কথাও মনে নেই তার।

মৃগাঙ্ককে দোষ দেবার তো মুখ নেই অতসীর, তবু তার প্রতিই অভিমানে ক্ষোভে মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বারবার মনে হয়, সে একটা অবোধ শিশু বৈ তো নয়, তার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা সম্ভব হল এ শুধু অতসীর একার সন্তান বলেই তো?

খিদেয়, গরমে ঘাড় গুঁজে বসে থাকার কষ্টে, আর কানের জ্বালা দুঃখের অবধি নেই, তবু আজ মনে ভারি আনন্দ সীতুর।

বাবার খুব একটা অনিষ্ট করতে পারা গিয়েছে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে তার। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা খুব দরকারী।

হোক মার খেতে, হোক বকুনি খেতে, তবু সীতু এমনি করে জ্বালাতন করবে বাবাকে। দরকারী জিনিস নষ্ট করে দিয়ে, জুতোর মধ্যে কাচের কুচি পুরে, আর প্যাণ্টের পকেটে ধারালো ব্লেড ভরে রেখে।

ধারালো ব্লেড। সীতুর মনের মতই ধারালো।

সেটা এখনো বাকি আছে।

প্যাণ্টের যে পকেটে টাকার ব্যাগ আর গাড়ির চাবি থাকে মৃগাঙ্কর, সেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে সীতু সেই সংগ্রহ করে রাখা ব্লেডখানা। পকেটে হাত ভরে জিনিস নিতে গেলেই, হি হি চমৎকার! আরো অনেক জ্বালাতনের চিন্তা করতে থাকে সীতু।

জ্বালাতন করে করে বাবাকে মরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার।

হঠাৎ কোথা থেকে কাদের কথা কানে আসে। ফিস ফিস কথা।

কি কথা এ সব?

কার কথা? কার গলা?

'য্যাতোই হোক, কাঁচা ছেলে বৈ তো নয়, করে ফেলেছে একটা অকম্ম, তা বলে কি অমন মারটা মারে? আপনার ছেলে হলে কি আর পারতো?'

এ গলা বাসন মাজা ঝি সুখদার।

উত্তর শোনা যায় বামুন মেয়ের গলায়, 'তুই থাম্ সুখী, নিজের বাপে শাসন করে না? মেরে পাট করে দেয় অমন ছেলেকে? ছেলের গুণ জানিস তুই? আমার বিশ্বাস পুঁচকে ছোঁড়া জানে সব। তা নইলে কর্তার ওপর অত আক্রোশ কিসের?'

বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকায় সীতু। কার কথা বলছে ওরা? কোন ছেলে সে? কে তাকে শাসন করেছে? 'নিজের বাপ' 'আপনার ছেলে' এ সব কি কথা? কী জানে সীতু?

ভয়! ভয়!

হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে ভয়ানক একটা ভয় করে আসে সীতুর। বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যায়, আর ওর সেই আবছা আবছা ছবিটা কি রকম যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে।

জানালায় বসা সেই ছেলেটা আর কেউ নয়, সীতু।

সীতু সে বাড়ির! নল দিয়ে জলপড়া চৌবাচ্চাওলা ভাঙা ভাঙা সেই বাড়িটার। সীতু এখানের কেউ নয়, এদের কেউ নয়।

ভয়, ভয়, ভয়ানক ভয়! কী কাঁপুনি! কী কষ্ট! ভয়ে এত কষ্ট হয়?

অফিসে আজ আর কিছুতেই কাজে মন বসে না মৃগাঙ্কর। নিজের সকালের সেই মাত্রাহীন অসহিষ্ণুতার কথা মনে পড়ে লজ্জায় কুণ্ঠায়

বিচলিত হতে থাকেন।

ছি ছি, ক্রোধের এমন উন্মত্ত প্রকাশ মৃগাঙ্কের মধ্যে এল কি করে? অতগুলো চোখের সামনে অমন নির্লজ্জ অসভ্যতাও করলেন কি করে তিনি? কানটা কি যথাস্থানে আছে ছেলেটার? না ছিঁড়ে পড়ে গেছে?

অতসী কি আজ কথা বলেছে? খেয়েছে? খুকুকে খাইয়েছে?

বাড়ি গিয়ে কি অতসীকে দেখতে পাবে মৃগাঙ্ক? না কি সে তার ছেলে নিয়ে কোথাও চলে গেছে?

দু'লাইন চিঠির মারফতে নিষেধ করে গেছে খুঁজতে?

বড় বেশি হয়ে গিয়েছিল!

কিন্তু ছেলেটা যে কিছুতেই কাঁদে না, দোষ স্বীকার করেনা, 'আর করবনা' বলে না! মানুষের তো রক্তমাংসের শরীর! কত সহ্য করা যায়? মনে করলেন, যদি ঈশ্বর অনুগ্রহে সব যথাযথ দেখতে পান, তাহলে নিজেকে আশ্চর্য রকম বদলে ফেলবেন তিনি।

অবহেলা করবেন ওই ছোট ছেলেটার সমস্ত দৌরাত্ম্য। শান্ত হবেন, সহিষ্ণু হবেন, উদার ক্ষমাশীল হবেন। আর কিছুতেই বিচলিত হবেন না।

ভাবলেন, ছি ছি, ও কি আমার রাগের যোগ্য, ও কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? ওর বাচ্চা বুদ্ধির শয়তানি কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে ডাক্তার মৃগাঙ্কমোহনের?

অতসীর জন্যে মমতায় মনটা ভরে ওঠে। তার প্রতিও বড্ড অবিচার করা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো তার কি দোষ?

এতদিনের অসাবধানতা আর ত্রুটির পূরণ করে নেওয়ার মত জোরালো কী নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো যায় অতসীর সামনে? একটা স্নেহ সমাদর আদর?

ভাবতে ভাবতে আবার চিন্তার ধারা অন্য খাতে বইতে থাকে।

সাতু অত ওরকম করেই বা কেন?

এই বিকৃত বুদ্ধির কারণ কি শুধুই বংশগত? না কি ও মৃগাঙ্কর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটা বোঝে।

কেউ কি ওকে কিছু বলে? কিন্তু কে বলে দেবে? কার এত সাহস?

মৃগাঙ্কর আদেশ অমান্য করতে পারে এতবড় দুর্জয় সাহসধারী কে আছে? অতসীই বলেনি তো?

কিন্তু অতসীর তাতে স্বার্থ কি?

তবে কি ওর সব মনে আছে? তাই কি সম্ভব?

কত বয়েস ছিল ওর তখন? বড় জোর দুই। কিন্তু তখন থেকেই কি ছেলেটা ওমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নয়?

সেই প্রথম দিনকার স্মৃতি থেকে তন্ন তন্ন করে মনে করতে থাকেন কে কাকে প্রথম বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল। তিনি সীতুকে, না সীতু তাঁকে?

একেবারে প্রথম কবে দেখেছিলেন ওকে?

সুরেশ রায়ের সেই বাড়াবাড়ি অসুখের দিন না? চোখ উল্টে মুখে ফেনা ভেঙে একেবারে শেস হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়।

অতসী পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, বেতপাতার মত, আর রোগা কাঠিসার ছেলেটা অবিরত তার আঁচল ধরে টানছিল আর কাঁদছিল—'মা তলে আয়, মা ওখানে থেকে তলে আয়।'

দেখেই কেন কে জানে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল মৃগাঙ্কর। সহসা ইচ্ছে হয়েছিল ওটাকে টিকটিকি আরশোলার মত ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেন ঘরের বাইরে। সেই প্রথম দেখা। সেই বিরূপতার শুরু।

তারপর অনেক ঝড়ের পর যখন অতসীকে নিয়ে এলেন ঘরে, বিবাহের দাবীর মধ্য দিয়ে, তখন তার ছেলের যত্ন আদরের ত্রুটি রাখেননি ঠিক কথা, কিন্তু সেটা কি আন্তরিক?

আপন অন্তর হাতড়ে আজ সেই দু'বছর আগের দিনগুলোকে বিছিয়ে ধরে নিরীক্ষণ করছেন মৃগাঙ্ক। দেখছেন যা কিছু করেছেন সীতুর জন্যে, তার সবটাই অতসীর মন প্রসন্ন রাখার তাগিদে, না কিছুটাও সত্যবস্তু ছিল?

হতাশ হচ্ছেন মৃগাঙ্ক, নিজের মনের চেহারা দেখে হতাশ হচ্ছেন।

এমন করে তলিয়ে নিজেকে দেখা বুঝি কখনো হয়নি।

নইলে অনেক আগেই বুঝতে পারতেন, সেই রোগা হ্যাংলা কাঠিসার ছেলেটাকে কোনদিনই সহ্য করতে পারেননি তিনি। অবিরতই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত মনে হয়েছে।

হোক সে অতসীর সন্তান, তবু তা'কে মৃগাঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী বললে ভুল হবে না। সে যে সুরেশ রায়েরও সন্তান, সে কথা বিস্মৃত হওয়া যাবে কি করে? সুরেশের সন্তান বলে কি অতসী ওকে এতটুকু কম ভালবেসেছে কোনদিন? বুঝি বা—মৃগাঙ্ক একটু থামলেন, আবার ভাবনাটাকে এগিয়ে দিলেন—বুঝি বা মৃগাঙ্কর সন্তানের চাইতে বেশিই ভালবাসে। হ্যাঁ বেশিই। মুখে যতই ঔদাসীন্য অবহেলা দেখাক, সীতুর দিকে তাকিয়ে দেখতে চোখে সুধা ঝরে ওর।

সেই, সেটাই অসহ্য মৃগাঙ্কর। সেই সুধাঝরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিস্নাত জীবটাও তাই অসহ্য! ওকে অতসীর কাছাকাছি দেখলেই মনে পড়ে যায়, সেই কদর্য কুৎসিত রোগগ্রস্ত লোকটাকে। মনে হয় তাকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না অতসীর জীবন থেকে।

তবু এখন আর এক দিক থেকে ভাবছেন মৃগাঙ্ক। তিনি যদি সেই শীর্ণ অপুষ্ট নিতান্ত অসহায় শিশুটাকে বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে না দেখতেন, যদি অতসীর সামনে সস্নেহ ব্যবহার করে, আর অতসীর আড়ালে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে না তাকাতেন ওর দিকে, তা'হলে হয়তো ছেলেটাও এত হিংস্র হয়ে উঠত না।

এত জাতক্রোধের ভাব থাকত না তার উপর।

কিম্বা কে জানে থাকতো হয়তো। তার সহজাত সংস্কারই জাত ক্রোধের মূর্তিতে ভিতর থেকে ঠেলা মারতো তাকে। সেই সংস্কারই তাকেও শেখাতো মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে দেখতে। ইতর প্রাণীরা তো আপন জন্মদাতাকেও দেখে!

তবু আজ সত্যই অনুতপ্ত মৃগাঙ্ক ডাক্তার। সত্যই তাঁর ভাবতে লজ্জা হচ্ছে যে ভিতরের সমস্ত গলদ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

অতসীকে কি তিনি আর সম্পূর্ণ করে পাবেন? তার মনের দরজা

কি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল না ?

কিন্তু অতসীর সম্পূর্ণ মনটা কি তিনি কোনদিনই পেয়েছেন ? পাওয়া যায় কি ?

কুমারী মেয়ের মন কোথায় পাবে, সংসারে পোড় খাওয়া একখানা পুরনো মন :

পুরনো জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ছিল অতসীর, কিন্তু সেই আগেকার আত্মীয়-স্বজনের উপর তো কই বিতৃষ্ণা নেই।

ওই যে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে আসে, অতসীকে 'কাকীমা কাকীমা' বলে বিগলিত হয় ! ও কি মৃগাঙ্কর ভাইঝি ?

তাতো নয়। ওকে মৃগাঙ্ক চেনেও না। ও সেই সুরেশ রায়ের ভাইঝি। সে এলে অতসীর মুখে যেন একটা নতুন লাবণ্যের আলো ফুটে ওঠে, তাকে আদর-যত্ন করে খাওয়াবার চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে।

দেখে অবশ্য খুব ভাল লাগে না মৃগাঙ্কর, তবু বলেনও না কিছু। হঠাৎ একদিন, এই সেদিন, মেয়েটা না বলা না কওয়া দুম্ করে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ঘরে ঢুকে 'কাকাবাবু' বলে ঢিপ করে এক প্রণাম।

শিউরে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

মেয়েটা কিন্তু বেজায় সপ্রতিভ। তবে হৈ-চৈ করে যতই সে মৃগাঙ্ককে 'কাকাবাবু' 'কাকাবাবু' করুক, মৃগাঙ্ক তো কিছুতেই পারলেন না তাকে সস্নেহে স্বচ্ছন্দে আত্মীয় বলে মেনে নিতে ! বাচ্চা একটা ছেলের চিকিৎসার জন্যে অনুরোধ করলো সে মৃগাঙ্ককে, আড়ষ্টভাবে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন মৃগাঙ্ক, এই পর্যন্ত।

কেন আড়ষ্ট হলেন তিনি ?

ভাবলেন মৃগাঙ্ক। অতসীর যে একটা অতীত ছিল এটা তো স্বীকার করে নিয়েই অতসীকে ঘরে এনেছিলেন, তবে কেন সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেন না ?

মেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণ, মেয়েরা সপত্নী অসহিষ্ণু, মেয়েরা কৈকেয়ীর জাত, কিন্তু পুরুষের উদারতার সোনাটুকু কি কোনদিন বাস্তব আঘাতের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করে দেখা হয়েছে ?

এই তো। যাচাই করতে বসলে তো সব সোনাই রাং। মন থেকে প্রসন্ন হয়ে যদি সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে গ্রহণ করতে পারতেন মৃগাঙ্ক, যদি পারতেন সুরেশ রায়ের সন্তানকে একেবারে নিতান্ত স্নেহের পাত্র বলে গ্রহণ করতে, তবেই না বলা যেত—পুরুষ মহৎ, পুরুষ উদার, পুরুষ স্ত্রীলোকের মত ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্র চিত্ত নয়!

মৃগাঙ্ক ভাবলেন, সপত্নী সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরুষ বোধকরি মেয়েদের চাইতে অনেক বেশি কুটিল ক্ষুদ্রচেতা ঈর্ষাপরায়ণ!

ভাবলেন আরো অনেক আগে এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত ছিল তাঁর।

'কে বলেছে এ কথা?'

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নয়, যেন হতাশ নিশ্বাস। সেই হতাশ নিশ্বাস থেকেই আবার প্রশ্ন হয়, 'বলেছে বলেই তাই বিশ্বাস করেছ তুমি? তুমি কি পাগল?'

কিন্তু প্রশ্ন করবারই বা কি আছে? সীতু যে পাগল নয় এ প্রমাণ তো দিচ্ছেনা। পাগলের মতই তো করছে সীতু। বিছানায় মাথা ঘসটাচ্ছে, আর বলছে, 'না তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমার বাবা মরে গেছে। আমি এখানে থাকব না, আমি চলে যাব, আমি মরে যাব!'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে থাকতে হবে না এখানে,' অতসী তেমনি হতাশ কণ্ঠে বলে, 'তোমার অন্য ব্যবস্থা করবো। শুধু যে কটা দিন তা না হচ্ছে একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!'

'না না', পাগলের মতই গোঁ গোঁ করছে সীতু, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি এক্ষুনি চলে যাব।'

'চলে যাবি! আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?'

'না না না। তুমি খুকুর মা তুমি এদের বাড়ির লোক।'

অতসী এবার দপ্ করে জ্বলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'রোসো সত্যিই তোমাকে বোর্ডিঙে রাখবার ব্যবস্থা করছি আমি!'

'বলছি তো আমি এক্ষুনি চলে যাব ৷'

'যা তবে! কোন চুলোয় তোর পূবজন্মের বাড়ি আছে, যা সেখানে। হবেই তো, এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হবে কোথা থেকে? কৃতজ্ঞতা কি তোদের হাড়ে থাকতে আছে? বলছি যত শিগগির পারি তোমায় বোর্ডিঙে দেব, আজ এক্ষুনি সেটা শুধু সম্ভব নয়। একটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

'তুমি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বলেছিলে ওটা আমার বাবা?'

'বেশ করেছি বলেছি।' একফোঁটা একটা ছেলের কাছে আর হারতে পারে না অতসী। নিষ্ঠুরতার চরম করবে সে। তাই ঝাঁঝালো গলায় তেতো স্বরে বলে ওঠে, 'কি করবি তুই আমার? এখানে যদি না আসতিস, খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, বাড়িওলা দুর দুর করে বাড়িথেকে তাড়িয়ে দিতো রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হতো, বুঝলি? যে মানুষটা এত যত্ন করে মাথায় করে নিয়ে এলো তাকে তুই—উঃ। এই জন্যেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই।'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।'

'মেরে তোকে ফেলব কেন, নিজেকেই ফেলব।' অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'সেইটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি।'

'কাকীমা!'

দরজার বাইরে থেকে ধ্বনিত হ'ল এই পরিচিত কণ্ঠটি। হ'ল বেশ শান্তকোমল স্বরেই, কিন্তু সে স্বর অতসীর শুধু কানেই নয়, বুকের মধ্যে পর্যন্ত ঝনাৎ করে গিয়ে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা শিথিল হয়ে এল তার।

এ কী! এ কী বিপদ! বেড়াতে আসার আর সময় পেল না শ্যামলী? এই ছেলেটা খাটের উপর মুখ গুঁজে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ দৃশ্য তো শ্যামলী এখনি এসে দেখে ফেলবে। কী কৈফিয়ৎ দেবে অতসী তার? শ্যামলী কি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না? ভাববে

না কি কোথাও কোন ঘাটতি ঘটেছে? তাছাড়া সীতু ওকে দেখে আরও গোঁয়াতু'মি, আরও বুনোমি করবে কি না কে বলতে পারে? হয়তো ইচ্ছে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যে অবস্থাকে কিছুতেই আয়ত্তে এনে সভ্য চেহারা দেওয়া যাবে না।

'কাকীমা আসছি।' পরদায় হাত লাগিয়েছে শ্যামলী। মুহূর্তে সমস্ত ঝড় সংহত করে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ওঠে অতসী, 'আয় আয়, বাইরে থেকে ডেকে পারমিশান নিয়ে—এত ফ্যাশান শিখলি কবে থেকে?'

শ্যামলী একমুখ হাসি আর বড় একবাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিজের খুশির ছটায় পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না শ্যামলীর, এগিয়ে এসে সন্দেশটা অতসীর দিকে বাড়িয়ে ধরে, 'নিন! বাটুর সেরে ওঠার মিষ্টি খান!'

'কি আশ্চর্য! এসব কি শ্যামলী? না না এ ভারী অন্যায়।'

'অন্যায় মানে! অতদিন ধরে ভুগছিল ছেলেটা, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোন ডাক্তার রোগ ধরতে পারছিল না। ডাক্তার কাকাবাবুর দুদিনের দেখায় সেরে উঠল, এ আহ্লাদের কি শেষ আছে? নেহাৎ না কি ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করা চলে না, তাই কাকাবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—'

ভারী বাক্যবাগীশ মেয়েটা।

কিন্তু দ্বিধা চিন্তা কিছু নেই, সাদাসিধে সরল। কথা যখন বলে, তাকিয়ে দেখে না তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এই জন্যেই তো সুরেশ রায়ের বংশের মধ্যে এই মেয়েটাকেই বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখত অতসী। সুরেশ রায়ের জ্যেঠতুতো দাদার মেয়ে। শ্যামলা রং হাসিখুশি মুখ, গোলগাল গড়ন, বছর আষ্টেকের মেয়েটা, বিয়ের কনে অতসীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই অতসীর মন হরণ করে নিয়েছিল। শ্যামলীও কাকীমার মধ্যে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিল।

তারপর তো অতসীর দিকে কত ঝড়, কত বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! আর শ্যামলীর দিকে প্রকৃতির অকৃপণ করুণা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই ভাগ্যে জুটে গেছে দিব্যি খাসা বর, সংসার করছে মনের সুখে স্বাধীনতার আরাম নিয়ে। বড়লোক না হলেও অবস্থা ভাল, আর স্বামীটির প্রকৃতি অতীব ভাল। সরল, হাস্য মুখ। দুটো ছেলেমানুষ মিলে যেন খেলার সংসার পেতেছে।

বিধাতার আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে সংসার পেতেছে অতসীরই বাড়ির কখানা বাড়ি পরে। আগে জানত না দু'জনের একজনও, দেখা হয়ে গেল দৈবাৎ।

পাড়ার বইয়ের দোকানে সীতুকে নিয়ে তার নতুন ক্লাশের বই কিনতে গিয়েছিল অতসী, আর শ্যামলীও এসেছে ছোট ছেলের জন্যে রঙিন ছবির বই কিনতে। অসুস্থ ছেলে রেখে এসেছে ঘরে, তার মন ভোলাতে বাছাই করছে নানা রঙবেরঙের ছবি-ছড়া। ছেলে নিয়ে দোকানে উঠেই অতসী যেন পাথর হয়ে গেল!

এ কী অভাবিত বিপদ!

এই দণ্ডে কি সীতুকে টেনে নিয়ে দোকান থেকে নেমে যাবে অতসী? না কি না দেখার ভান করবে?

দুটোর কোনটাই হল না, চোখাচোখি হয়ে গেছে। আর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলী লাফিয়ে উঠেছে, 'কাকীমা!'

এরপর আর কি করে না দেখার ভান করবে অতসী? কি করে চট করে নেমে যাবে দোকান থেকে?

ফিকে হাসি হাসতেই হয়, মুখে কথা জোগাবার আগে। কিন্তু শ্যামলী ওসব ফিকে ঘোরালোর ধার ধারে না। পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, কোন কিছুই তার উল্লাসকে রোধ করতে পারেনা। দোকানের মাঝখানেই একে ওকে পাশ কাটিয়ে অতসীর গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, 'ওঃ কাকীমা, কতদিন পরে! বাবাঃ!'

অতসীর প্রবল শক্তি আছে ঝড়কে মনের মধ্যে বহন করে বাইরে সহজ হবার, তবু বুঝি অবিচলিত থাকা সম্ভব হয় না। তবু বুঝি কথা

কইতে ঠোঁট কাঁপে, 'তুমি এখানে!'

'ওরে বাবা, আমাকে আবার তুমি। এই দুষ্টু মেয়েটাকে বুঝি ভুলেই গেছেন কাকীমা? ওসব চলবে না, 'তুই' বলুন।'

এবার অতসী সত্যিকার একটু হাসে, 'বলছি। এখানে আর কি কথা হবে?'

'এখানে মানে? ছাড়বো না কি? ধরে নিয়ে যাব না? বইটই কেনা এখন থাক, চলুন চলুন। বাবাঃ কতদিন পরে! আপনার কার জন্যে বই? ওমা সাতু না? কত বড়টি হয়ে গেছে ইস! কিন্তু সেই রকম রোগা আছে।' কথা, কথা, কথার স্রোত একেবারে। দোকানের লোকেরা যে হাঁ করে শুনছে তাও খেয়াল নেই মেয়েটার।

শুধু ওই জন্যেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে অতসী। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, 'তুমি এখানের দোকান থেকে কেনাকাটা কর বুঝি?'

'আবার তুমি! অভ্যাস বদলান। এই দোকান থেকে কেনাকাটা করব না! এই তো পাড়া আমাদের। ওই মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড লালরঙা বাড়িটা? ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি। দোতলার ফ্ল্যাট। অত কথায় কাজ কি চলুন।'

অতসী অনুভব করছে তার হাতের মধ্যে ধরা সাতুর হাতটা কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখছে, যাকে বলে বিস্ময় বিস্ফারিত, তেমনি দৃষ্টি ফেলে নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে সাতু এই বাক্যচ্ছটাময়ার হাসিতে উচ্ছল খুশিতে টলমল মুখটার দিকে।

অমন করে দেখছে কেন?

শুধুই অপরিচিতার প্রতি শিশু মনের কৌতূহল? না কি এমন হাসিতে উচ্ছল খুশিতে টলমল মুখ সে জীবনে কখনো দেখেনি বলে অবাক হয়ে গেছে?

নয় তো কি। নয় তো কি! মনে মনে শিউরে উঠছে অতসী, এই আকস্মিকতার সূত্র ধরে এক বিস্মৃত অতীতকে মনে পড়ে যাচ্ছে সাতুর? পরতে পরতে খুলে পড়ছে চেতনার কোনও স্তর?

এ কী বিপদ, এ কি বিপদ।

অন্যমনস্ক মেয়েটা কি শুধু অন্যমনস্ক? ভেবেছিল সেদিন অতসী। না কি এই অজস্র কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভারী জিনিসকে ঠেলে পার করে নিয়ে যেতে চায় সে? তাই অন্যমনস্কতার ভান করে এই ঢেউ দেওয়া, ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শুধু কথা নয়, রাস্তার মাঝখানে প্রায় হাত ধরেই টানাটানি করেছিল সেদিন শ্যামলী অতসীকে, তবু হেসে মিনতি করে সে অনুরোধ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছিল অতসী, আর নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে নিতান্ত মৌখিক ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'বেশ তো, তুইও তো চলে আসতে পারিস!'

'ও বাবা! সে আবার বলার অপেক্ষা?' শ্যামলী হেসে উঠেছিল, 'সে তো আমি না বলতেই যাব। গিয়ে গিয়ে পাগল করে তুলব। একবার যখন সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।'

তা কথা রেখেছে শ্যামলী। কেবলই এসেছে। অতসী অস্বস্তি পাচ্ছে কি বিব্রত হচ্ছে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি তার। ওকে দেখলে অতসীর মনটা স্নেহে কোমল হয়ে আসে—কেবলমাত্র নিজস্ব, এই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির রোমাঞ্চে, যেন নিষিদ্ধ ভালবাসার স্বাদ পায়, তবু অতসীর পূর্বজীবনের একটা টুকরো যে বারবার এসে মৃগাঙ্কর চোখকে আর মনকে ধাক্কা মেরে যাবে, এটাতেও স্বস্তি পায় না।

কিন্তু এই অবুঝ ভালবাসাকে ঠেকাবেই বা সে কি করে? কি করে বলবে, 'তুই আর আসিস না শ্যামলী?'

তার উপর আর এক ঝামেলা।

শ্যামলী তার ছেলেকে দেখাতে চায় মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে। শুনে মনটা বোদা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল অতসীর। বেশ একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল তার উপর। এ তো বড় ঝঞ্ঝাট! এ আবার কী উপদ্রব! মনে হয়েছিল, নাঃ এ সবে দরকার নেই, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দেবে শ্যামলীকে, এতে অতসী অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা যায় না। তাই ছেলের কি এমন হয়েছে সেটাই জিগ্যেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কি হয়েছে! সেইটাই তো রহস্য!

কী যে হয়েছে বুঝতে পারছে না কোনও ডাক্তার বদ্যি। লক্ষণের মধ্যে, শুধু পায়ের হাড়ের ব্যথা, শুধু দুর্বলতা। অথচ বারবার 'এক্সরে' করেও ব্যথার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাইয়েও দুর্বলতা ঘোচানো যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ক যে 'বোন' স্পেশালিষ্ট এটা যেন শ্যামলীরই গ্রহমুক্তির একটা নিদর্শন!

'মনে আশা হচ্ছে কাকীমা, এতদিনে হয়তো ফাঁড়া কাটল। নইলে খোকার যা অসুখ করেছে, ডাক্তারকাকাবাবু ঠিক তারই স্পেশালিষ্ট হলেন কেন?' বলেছিল শ্যামলী।

অতসী অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল ওর মুখের দিকে। কী সুখী এই নির্বোধ মানুষগুলো! এরা কত সহজেই সহজ হতে পারে।

বোঝা গেল না শ্যামলীকে। কি করে যাবে? কোন অমানবিকতায়? একটা শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে কি অতসীর তুচ্ছ মানবিক বাধার প্রশ্ন?

বিবেককে কি জবাব দেবে, যদি শ্যামলীকে ফিরিয়ে দেয়!

বলতে হ'ল মৃগাঙ্ককে।

মৃগাঙ্ক রাগ করল না, বিদ্রূপ করল না, আপত্তিও করল না, শুধু অতসার মুখের দিকে একবার স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে চেয়ে বলল, 'নিয়ে এস।'

তা নিজে নিয়ে আসেনি অতসী। শ্যামলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে সঙ্গে দিয়ে, এবং গম্ভীরমূর্তি মৃগাঙ্কমোহন গভীর যত্নের সঙ্গেই দেখেছিলেন রোগীকে। আর জানিয়েছিলেন, হাড়ে কিছুই হয়নি ব্যথার উৎস পেশীতে।

দুর্বলতা? সেটা ভুল চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া।

বার দুই দেখা আর ওষুধ দেওয়াতেই অদ্ভুতভাবে কাজ হ'ল।

অতসী এতটা আশা করেনি।

ওদিকে শ্যামলী আর তার স্বামী বিগলিত।

তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে ওজন। সেই ওজন বাড়ার সূত্র ধরেই আজ শ্যামলীর এত দুঃসাহস।

হ্যাঁ সেই কথাটাই মনে হল অতসীর। মৃগাঙ্ককে সন্দেশ খাওয়াতে চায়। কী দুঃসাহস, কী ধৃষ্টতা!

অথচ শ্যামলীকে বলা চলে না সে কথা। তাই হাত পেতে নিতে হয় সেই সন্দেশ সম্ভার। যেটা বিপদের ডালর মত।

'ছেলেকে এবার আনিস একদিন।' বলল অতসী, 'এখন তো হাঁটতে পারে।'

'ও বাবা নিশ্চয়!'

শ্যামলী কেন সাধারণ ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যটুকুর মানে বোঝে না? কেন সেই মুখের কথাটাই বড় করে ধরে?

আজ যেন ফেরার তাড়া মাত্রও নেই শ্যামলীর, জাঁকিয়ে বসে কথা কইছে তো কইছেই।

'বুঝলেন কাকীমা, আপনার জামাই বলেন 'ডাক্তার কাকাবাবু শুধু ডাক্তারই নয়, যাদুকরও। নইলে দেখলামও তো এ পর্যন্ত কমজনকে নয়, কেউ বুঝতে পারল না, আর উনি দেখলেন আর—'

'মোটেই ভাল ডাক্তার নয়!'

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় মন্তব্যে শিউরে চমকে উঠল ঘরের আর দুজন। বিছানার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে সাতু।

'ওমা ও কিরে সাতু, ওকথা বলতে আছে?' শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'ভাল ডাক্তার নয় কি, খুব ভাল ডাক্তার তো।'

'ছাই ভাল।' বিদ্বেষে তিক্ত শিশুর কণ্ঠ কি কুৎসিত। ভাবল অতসী।

আর শ্যামলী ভাবল ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী। নিশ্চয় কোন কারণে বাপের উপর রাগ হয়েছে ছেলের। পরক্ষণেই ভাবল—তা, বাপ ছাড়া আর কি। উপকারী আর স্নেহশীল মানুষকে পিতৃতুল্যই

বলা হয় বৈ কি। ইনি যদি এমন উদারচিত্ত না হতেন, কোথায় আজ দাঁড়াত অতসী? কে জানে কোথায় ভেসে যেত সীতু!

ওবাড়ীর ছোটকাকার কী না কী অবস্থা ছিল, শ্যামলী তো আর ভুলে যায়নি? কী হালে কাটিয়েছিল অতসী আর সীতু, তাও দেখেছে সে আর এখন?

এই রাজপুরীর কুমার হয়ে সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা! কম ভাগ্য! এ বাড়ির সাজসজ্জা আরাম আয়োজন ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য শ্যামলীকে মুগ্ধ করে! বাড়িতে বরের সঙ্গে আলোচনাও করে খুব।

মৃগাঙ্ক যদি এমন মহৎ না হতেন, মৃগাঙ্ক যদি এমন ধর্মনিষ্ঠ না হতেন, কী হত অতসীর দশা?

সুরেশের মৃত্যুর পর অতসীর প্রতি মৃগাঙ্কর যে ভাব জেগেছিল, সে কী শুধু নারীরূপের মোহ? শুধুই বেওয়ারিশ একটা মানুষের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধতা?

তা যদি হত, বিবাহের সম্মান দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসতেন? কী দরকার ছিল? তা না দিয়েও, ঘরে ঢোকবার অধিকার না দিয়েও সেই মালিকহীন রূপবতীকে উপভোগ করবার বাধাটা কোথায় ছিল, যদি অভাবগ্রস্ত এবং মোহগ্রস্ত অতসী আত্মসমর্পণ করে বসত?

বাধা সমাজও দিত না, আইনও দিত না। পুরুষের এ দুর্বলতা প্রাহ্যের চক্ষেই আনত না কেউ।

অতসীকে? তা হয়তো সবাই ছিছিক্কার করত, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করত না!

মৃগাঙ্ক না দেখলে সুরেশ রায়ের আত্মীয় সমাজ ডেকে শুধোতো কি তাকে, 'হ্যাঁ গো এখন তোমার কিভাবে চলবে?' বলত কি 'সীতুকে মানুষ করে তুলবে কি করে?'

ভাড়া দিতে না পারলে বাড়িওলা যদি তাড়িয়ে দিত? সীতুর হাত ধরে অতসী কারো বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে কি দরজা খুলে ধরত?

না, মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে কেউ এগিয়ে আসত না। নেহাৎ

যদি অতসী মান অপমানের মাথা খেয়ে কারুর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়ত, চক্ষুলজ্জার দায়ে সে হয়ত দিত এতটুকু ঠাঁই, একমুঠো ভাত, কিন্তু প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে সে অন্নের ঋণ শোধ করতে হত।

নিস্পরের বাড়ির দাসত্বে মাইনে আছে, মর্যাদা আছে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির দাসত্বে দুটোর একটাও নেই! উল্টে আছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অবমাননা!

দুঃখে পড়ে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে বড় দুঃখ বোধ করি জগতে দ্বিতীয় নেই। বেশ করেছে অতসী, ঠিক করেছে।

দুজনেই বলেছিল ওরা—শ্যামলী আর শ্যামলীর বর, 'ঠিক করেছেন কাকীমা।'

বলেছিল, 'ছেলেটাকে পথের ভিখিরি হবার পথ থেকে বাঁচিয়েছেন উনি!'

'তাছাড়া ভালবাসারও একটা মর্যাদা দিতে হয় বৈ কি', বলেছিল শ্যামলী। 'ইনি, মানে ডাক্তারবাবু, কাকীমাকে সত্যিকার স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলেন।'

'তাতো সত্যি,' বলেছিল তার বর, 'নইলে আর বিবাহের মর্যাদা দেন।' আরও বলেছিল সে সীতুকে উপলক্ষ্য করে, 'লাকী বয়! ধর, তোমার কাকীমার যদি শুধু ওই মেয়েই থাকে, আর ছেলে না হয়, ওই অত সম্পত্তি, সবকিছুরই মালিক তোমাদের সীতু। আর হয়ও যদি, বেশ কিছু তো পাবেই।'

কাজেই লাকী বয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্ত শ্যামলী সীতুর এই সহসা উগ্র হয়ে ওঠা রূঢ়তায় বিস্মিত না হয়ে হেসে উঠে বলে, 'কি হল? হঠাৎ এত রাগ কিসের সীতুবাবুর।'

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সীতু, অতসীর অবিচলিত অম্লান মুখ থেকে সহসা উত্তর উচ্চারিত হচ্ছে, 'আরে দেখনা, ওর পেটব্যথা করছে, ওষুধ খেয়ে কমেনি, তাই অত মেজাজ! সেই থেকে পড়ে পড়ে

ছটফট করছিল—'

'ওমা তাই বুঝি!' হি হি করে হেসে ওঠে শ্যামলী, 'সত্যিই তো বাপু, মেজাজ তো হতেই পারে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!'

মায়ের ওই অবিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কি সীতু আর কথা বলতে পারে না?

'মেয়েটি কে গো বৌদিদি?'

বামুন মেয়ের উগ্র কৌতূহল আর বাঁধ মানে না, মনিবানীর ভ্রূভঙ্গীর ভয়েও না। সে কৌতুহল উক্ত প্রশ্নের আকারে এসে আছড়ে পড়ে অতসীর কাছে।

অতসী ভ্রূভঙ্গী করে। বলে, 'কোন্ মেয়েটি?'

'ওই যে কেবলই আসে যায়, দাদাবাবুকে অসুস্থ ছেলে এনে দেখায়, এইতো আজও এসেছিল—'

'আমার ভাইঝি।' গম্ভীর কণ্ঠে বলে অতসী।

'ভাইঝি!' বামুন মেয়ের বিস্ময় যেন আকাশে ওঠে। 'ভাইঝি যদি তো, তোমায় কাকীমা বলে কেন গো?'

'বলে, ওর বলতে ভাল লাগে।' অতসী কঠিন মুখে বলে, 'কে কাকে কি বলে ডাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে?'

'ওমা শোন কথা! মাথা ঘামানোর আবার কি? ডাকটা কানে বাজল তাই বলছি। দেখিনি তো ওকে কখনো এর আগে। আমি তো আজকের নই, কত কালের! তোমার শাশুড়ীর আমল থেকে আছি। এদের যে যেখানে আছে সবাইকে আমি চিনি।' সগর্বে ঘোষণা করে বামুন মেয়ে।

'ভালই তো।' বলে চলে যায় অতসী, আর মনে ভাবে ঠিক এই কারণেই তোমাকে আগে বিদায় করা দরকার। আমার সমস্ত নিশ্চিন্ততার ওপর কাঁটার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় দেবনা আমি।

কিন্তু 'দেবনা' বললেই তো চলে না। পুরনো হয়ে দাঁড়ালে কাঁটাগাছেরও মাটির ওপর একটা স্বত্ব জন্মায়, শিকড়ের বন্ধন জোরালো হয়। তাকে উৎপাটিত করতে অনেক শক্তি লাগে।

কারণ তো একটা থাকা চাই? অনেক দিনের শিকড়কে উৎপাটিত করার উপযুক্ত কারণ।

সুরেশ রায়ের ভাইঝির পরিচয় চেয়েছিল সে, এই অপরাধে বরখাস্ত করা যায়?

নিতান্ত বুদ্ধিসম্পন্নরাও মাঝে মাঝে বোকা হয়ে যায়, এ দৃষ্টান্ত আছে। অতসীর আজকের কাজটা সেই দৃষ্টান্তে একটা নতুন সংযোজনা। নইলে কি দরকার ছিল ওর মৃগাঙ্কর সামনে শ্যামলীর আনা সেই প্রকাণ্ড মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে আসা। খেতে বসেছিল মৃগাঙ্ক, অতসী বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে চামচ করে সন্দেশ তুলে পাতে দিতেই মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন, 'এত সন্দেশ! কেউ তত্ত্ব টত্ত্ব পাঠিয়েছে না কি?'

'তত্ত্ব নয়,' অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'শ্যামলীর ছেলের অসুখ সেরে গেছে বলে আহ্লাদ করে—'

'শ্যামলী কে?' ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক

'শ্যামলী!' অতসী থতমত খেয়ে বলে, 'শ্যামলী, মানে সেই মেয়েটি যার ছেলের অসুখে তুমি—'

থেমে গেল অতসী। দেখল মৃগাঙ্কর ভুরুটা আরো বেশি কুঁচকে উঠেছে, হাতের আঙুল কটা উঠেছে কঠিন হয়ে, সেই কঠিন আঙুলের ডগা দিয়ে সন্দেশ দুটো ঠেলে রাখছে থালার কোণে। মুহূর্তে সহসা কঠিন হয়ে উঠল অতসীও। যে স্বরে কখনো কথা বলে না সেই স্বরে বলল, 'খাবে না?'

মৃগাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বলেন, 'না।'

অতসীরও বুঝি সীতুর হাওয়া লেগেছে, জেগেছে বুনো গোঁ, তা নয়তো অমন জিদের স্বরে বলে কেন, 'না খাবার কারণ?'

'ইচ্ছে নেই!'

'কেন ইচ্ছে নেই বলতে হবে।'

'বলতেই হবে ?' বিদ্রূপে তিক্ত শোনাল মৃগাঙ্কর কণ্ঠ।

আশ্চর্য! এই সেদিন না মৃগাঙ্ক ডাক্তার মনকে উদার করার দীক্ষা নিচ্ছিলেন? মন্ত্রপাঠ করেছিলেন সহনশীলতার? ভাবছিলেন, অতসীর যে একটা অতীত আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন? অথচ কিছুতেই তো সামান্য ওই বাটাছানার মিহি সন্দেশ দুটো গলাধঃকরণ করতে পারলেন না! তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'বলতেই হবে?'

'হ্যাঁ বলতেই হবে।' স্বভাব বহির্ভূত জেদী সুরে রুক্ষ নির্দেশ দেয় অতসী, 'বলতেই হবে, বাধা কিসের? প্রতিবেশীর ঘর থেকে মিষ্টি দিলে লোকে খায় না?'

'প্রতিবেশী! ও হ্যাঁ, নতুন একটা পয়েন্ট আবিষ্কার করেছ দেখছি। কিন্তু প্রতিবেশীর পরিচয় বহন করেই কি সে এখানে এসেছিল?'

'ঠিক কথা, তা সে আসেনি। কিন্তু যে পরিচয়েই আসুক, তার অপরাধটা কোথায় জানতে পারি কি?'

মৃগাঙ্কমোহনের কি সামলে যাওয়া উচিত ছিল না? ভাবা উচিত ছিল না, অতসী তো কই কখনো এমন করেনা? সত্যি স্ত্রীর অধিকারে তর্কাতর্কি জেদাজেদি, অথবা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, এ কবে করেছে অতসী? হয় নিজেকে লুকিয়ে রাখা কুণ্ঠিত মৃদু ভাব, নয়তো বিগলিত অভিভূত কৃতজ্ঞতা। অতসার আজকের এ রূপ নতুন, অপরিচিত। তবু তো কই নিজেকে সামলালেন না মৃগাঙ্ক, বরং যেন আগুনে ইন্ধন দিলেন। বলে উঠলেন, 'অপরাধ কারুর কোথাও নেই অতসী: অপরাধী আমিই। সুরেশ রায়ের আত্মীয়ের হাতের সন্দেশ খাবার রুচি আমার নেই।'

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি!

বোধকরি এতটা স্পষ্টতা আশা করেনি অতসী, তাই স্তব্ধ হয়ে গেল সে, সাদা হয়ে গেল মুখ। তারপর আস্তে আস্তে আরক্ত হয়ে উঠল সে মুখ। তারপর কথা কইল আস্তে আস্তে। বলল, 'এক সময় আমিও ওই নামের লোকেরই আত্মীয় ছিলাম।

মৃগাঙ্ক এবার বোধকরি একটু সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন,

'বৃথা উত্তেজিত হচ্ছো কেন? কারণটা যখন সামান্য। এই সন্দেশটা খেলাম কি না খেলাম, কি এসে গেল তাতে?'

'প্রশ্নটা সন্দেশ খাওয়ার নয়,' স্থির স্বরে বলে অতসী। 'প্রশ্নটা হচ্ছে রুচি না হওয়ার। প্রশ্ন হচ্ছে সহ্য করতে পারা না পারার। সাদা-সিধে হাসিখুসি কমবয়সী একটা মেয়ে এক আধবার তোমার বাড়িতে বেড়াতে আসে, সেটুকু সহ্য করবার মত উদারতা তুমি খুঁজে পাচ্ছনা দেখতে পাচ্ছি।'

মৃগাঙ্ক আবার যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, 'সেটা দেখতে পাচ্ছ অতসী, কারণ মন তোমার আচ্ছন্ন হয়ে আছে সন্দেহে আর অভিমানে। তবু জিজ্ঞাসা করি, যদিই হয়ে থাকে, এই সঙ্কীর্ণতা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'অন্ততঃ যে কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। তুমি কি জানতে না আমার একটা অতীত আছে, আর জীবনের ছাবিবশ সাতাশটা বছর ধরে আমি সমাজ সংসারের বাইরেও কাটাইনি? আমার সেই জীবনে কারুর ওপর একটু স্নেহ জন্মাবেনা, এটাইবা হবে কেন?'

মৃগাঙ্কর খাওয়া শেষ হয়েছিল, তিনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি তো বলিনি অতসি', 'হবে না,' 'হওয়া উচিত নয়' 'হওয়া অস্বাভাবিক!' তুমি যাকে খুশি এবং যতখুশি স্নেহ করে বেড়াও না, আমি তো আপত্তি করতে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু চাইছি, আমাকে তার মধ্যে জড়াবার চেষ্টা কর না।'

অতসী কি আজ ক্ষেপে গেছে?

ও কি মস্তবড় একটা বোঝাপড়া করতে চায়—শুধু মৃগাঙ্কর সঙ্গে নয় নিজের সঙ্গেও? নইলে এমন করে কথা কাটাকাটি করছে সে কি করে? এতগুলো বছরের মধ্যে যে অতসী মৃগাঙ্কর মুখের উপর একটি উঁচু কথা কয়নি?

আজ শুধু কথাই উঁচু নয়, গলাও উঁচু অতসীর।

'তাই বা চেষ্টা করবনা কেন? আমি যদি তোমার পরিচিত সমাজ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে চাই? তোমার প্রীতিকর হবে সেই অবস্থাটা?'

মৃগাঙ্ক একটু ভুরু কোঁচকালেন, তারপর ঈষৎ ব্যঙ্গে বললেন, 'হয়তো হবে না। তবু এটাই স্বীকার করে নেব, জীবনে সব কিছুই প্রীতিকর জোটে না।'

'ওঃ তাই!' অতসা সহসা খুব শান্ত গলায় বলে, 'তাই এই নীতিতেই তা হলে সীতুকে মেনে নিয়েছিলে তুমি? তোমার অগাধ অসীম উদারতায় নয়?'

এবার বুঝি স্তব্ধ হবার পালা মৃগাঙ্কমোহনের।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলেন, 'নিজেকে আমি মস্ত এক উদার ব্যক্তি বলে কোনদিনই প্রচার করে বেড়াইনি, অতসী!'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

আর অতসী কাঠের মত বসে থাকে সেই খাবার টেবিলেরই ধারের একটা চেয়ারে। এখানে যে এখুনি চাকর বাকর এসে পড়বে, সে খেয়াল থাকে না তার!

এ কী করলো সে? এ কী করলো? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ তুলে বসলো?

মৃগাঙ্ককে ছোট করতে গিয়েছিল সে? ছি ছি ছি! তা করতে গিয়ে কত ছোট হয়ে গেল নিজে! মৃগাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে গেল। যাবেই তো।

সীমাহীন স্পর্দ্ধা আর সীমাহীন অকৃতজ্ঞতা, মানুষকে মূক করে দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে?

ডাক্তার মৃগাঙ্কমোহনের সময় নেই অতসীর মত মন নিয়ে রোমন্থন করবার। তবু আজ আর গাড়ির ষ্টীয়ারিঙ্ নিজের হাতে নিলেন না তিনি, ড্রাইভারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিছনে বসলেন হেলান দিয়ে। ভাবতে লাগলেন অতসীর অভিযোগ কি ভিত্তিহীন?

সত্যি বটে, সীতুর অসভ্যতা তাঁকে এত পীড়িত করে যে, কিছুতেই তার প্রতি মনকে প্রসন্ন করে তুলতে পারেন না, কিন্তু ওই মেয়েটা? ওর প্রতি অপ্রসন্নতা আসতে পারে এমন কোন ব্যবহার তো ও করেনি?

খুব একটা কুৎসিৎ কুরূপ, অমার্জিত কি অভব্য, এমনও নয়। সত্যিই অতসী যা বলেছে, সাদাসিধে সরল হাসিখুশি মেয়ে!

তবু? তবু ওকে দেখলে বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ওঠে কেন মৃগাঙ্কর? কেবলমাত্র সুরেশ রায়ের সম্পর্কিত বলেই তো? অতসীর দেওয়া অপবাদ কি তাহলে মিথ্যা?

অনেকবার চেষ্টা করলেন মৃগাঙ্ক সেই মেয়েটার প্রতি মনকে সহজ করেছেন এই অবস্থাটা কল্পনা করতে। ভাবলেন সহাস্যে তাকে বলছেন, 'খুব তো সন্দেশ খেলাম, ছেলে কেমন আছে? আর কোন অসুবিধে নেই তো?' পারলেন না, কল্পনা করতেই মনটা বিস্বাদ ঘোলা হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিজের কাছে স্বীকার করলেন মৃগাঙ্ক জীবনের এই জটিলতার জাল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। হতে গেলে—অতসীর ভাষায় যে 'অসীম অগাধ উদারতা' থাকা প্রয়োজন, তা অন্ততঃ মৃগাঙ্কর নেই।

কিন্তু কারোরই কি থাকে? এ রকম ক্ষেত্রে?

যে বস্তু অসহনীয় তাকে মন থেকে সহ্য করতে কে পারে?

সপত্নী সম্পর্কটা সহ্য করবার বস্তু নয়।

অনেকদিন পরে এক বন্ধুর বাড়ি গেলেন মৃগাঙ্ক।

কলেজের বন্ধু সতীনাথ।

বিশেষ করে এই বন্ধুর বাড়ি যাবার একটু তাৎপর্য আছে। বন্ধুটি কিছু বছর হল বিপত্নীকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, ছিলেন কিছুদিন ওস খাতায়। কিন্তু বছর দুই হ'ল আবার সেখান থেকে নাম খারিজ করে নিয়েছেন, আবার সগৌরবে 'সস্ত্রীক' বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আত্মীয়-জনের বাড়ির কাজকর্মে, 'সপরিবারে' নেমন্তন্ন খেয়ে আসছেন।

দ্বিতীয়বার মস্তক মুণ্ডনের সময়ও বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করেছিল সতীনাথ, মৃগাঙ্ক ইচ্ছে করেই যান নি। অথবা যেতে ইচ্ছে হয় নি।

এতদিন বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়ে, বছর আড়াইয়ের মেয়েটাকে

আট দশ বছরের করে তুলে, তারপর আবার বিয়ে করা, খুব খেলো[মি]
ঠেকেছিল মৃগাঙ্কর। তদবধি বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হয়নি। সময়
হয়নি, কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে সভ্য শহুরে লোকগুলোর যে মরবারও স[ময়]
থাকে না।

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেওয়া?

স্বাদ ভুলে গেছে লোকে সেই পরম রমনীয়তার।

বিনা উদ্দেশ্যে বন্ধুর বাড়িতেও আর যায় না কেউ। যায় না মানে
যেতে পাবে না। সময় হয় না।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার আজ বার করলেন সময়।

কাজের থেকে চুরি করে নিলেন খানিকটা সময়।

কিন্তু মৃগাঙ্কই কি বন্ধুর বাড়ি গেলেন বিনা উদ্দেশ্যে?

যদিও বন্ধুর জীবনটা মৃগাঙ্কর নিজের জীবনের থেকে সম্পূর্ণ
বিপরীত, তবু ইচ্ছে হল মৃগাঙ্কর একবার বন্ধুর এই বিড়ম্বনাময় জীবনটা
দেখে আসেন। দেখেন তারা নিজেদেরকে কোন অবস্থায় রাখতে
পেরেছে?

না, বিড়ম্বনাময় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না মৃগাঙ্ক।

সতীনাথ হৈহৈ করে ওঠেন, 'আরে, আরে, এস এস! ব্যাপারটা
কি? তোমার দর্শন?'

মৃগাঙ্ক ধীরেসুস্থে আসন গ্রহণ করে বললেন, 'দর্শনটা নিতান্তই
যখন দুর্লভ হয়ে ওঠে তখন এক পক্ষকে এগিয়ে আসতেই হয়।'

'খুব যা হোক নিলে এক হাত!' বললেন সতীনাথ, 'অবিশ্যি
নেবার অধিকার তোমার আছে। বাস্তবিকই ভারী কুড়ে হয়ে গেছি,
কোথাও আর যেয়ে উঠতে পারি না।'

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে যা হয়!' বললেন মৃগাঙ্ক মৃদু হেসে।

'যা বল ভাই। বলে নাও যত পারো। তারপর খবর কি?'

'ভালই!' বললেন মৃগাঙ্ক।

এই নিরুত্তাপ 'ভালই'য়ের পর কথাটা যেন স্রোত হারিয়ে থেমে
গেল। থেমে যে গেল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সতীনাথের পরবর্তী

কথায়—'কি রকম গরম পড়েছে দেখেছ ?'

'দেখেছি, খুব পড়েছে।'

গরম হয়তো সত্যিই বেশি পড়েছে। কিন্তু সেটা কখনই দুই বন্ধুর আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, যদি না তাদের কথার ভাঁড়ার ফাঁকা থাকে।

'বোসো একটু চায়ের কথা বলি', বলে সতীনাথ উঠলেন, দরজার কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন, 'ঠাকুর !'

মৃগাঙ্ক বাধা দিলেন, 'এই শোন, মিথ্যে কেন চেঁচামেচি করছ ? জানোই তো আমি রোগীর বাড়ির পোশাকে কিছু খাই না।'

'ও হো হো তাও তো বটে ! তা' এখনও সে অভ্যাসটি বজায় রেখেছ ? এ যুগে তো কেউই ওসব শুদ্ধাচারের বিধিনিষেধ মানে না হে !'

'শুদ্ধাচার বলতে কি বোঝায় জানি না সতী, আচার যদি বল তো বলতে পারি ডাক্তারের ছুঁৎমার্গ হচ্ছে বুদ্ধিমানের আচার। স্বাস্থ্য, বিধির বিধিনিষেধ কোন যুগেই অচল হয়ে যায় না, ওটা চিরযুগের।'

'তোমার এ কথাটি মানতে পারলাম না ভাই', বললেন সতীনাথ, 'বিধিনিষেধেরও ধারা পালটায়। সমাজরক্ষার মতই স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিও নিত্য বদলাচ্ছে। পুরোপুরি কাঠামোটাই বদলাচ্ছে। দেখ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি জ্বরবিকারের রুগীকে এক ফোঁটা জল খেতে দেওয়া হ'ত না, ঘরের জানলা খোলবার জো নেই, গায়ে কম্বল চাপা, আর এখন ? তেমন রুগীকে জল খাইয়ে রেখে দিচ্ছ তোমরা, গায়ে ঢাকা দেবার দরকার বোধ কর না, আর জানলা খোলা বারান্দায় শুইয়ে রাখতেও বোধ হয় আপত্তি নেই। এ তো একটা মাত্র উদাহরণ, কি জ্বরে, কি শূল বেদনায়, কি শিশুপালনে, কি প্রসূতি পরিচর্যায়, আগের থিয়োরি তো কিছুই নেই। বল আছে ?'

'তা নেই বটে !' হাসলেন মৃগাঙ্ক, 'তবে আক্ষেপেরও কিছু নেই।'

'আক্ষেপের কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, একসময় ভালভাল পাশ করা ডাক্তাররাও তো সেই পদ্ধতিতে চলে এসেছে, আজ যে পদ্ধতিকে

তোমরা সেকেলে বলছ। সেই পদ্ধতিতেই চলে 'হাতযশ' দেখিয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে, অথচ আজ তোমরা তাদের অজ্ঞতার কথা ভেবে কৃপা করছ তাদের। পরবর্তীকাল আবার তোমাদের অজ্ঞতায় হাসবে।'

মৃগাঙ্কমোহন হেসে উঠে বলেন, 'তা এসব তো জানা কথা, এখন আসলে তোমার বক্তব্যটা কি?'

'বক্তব্য কিছুই নয়, শুধু বলছি আমাদের সমাজব্যবস্থাও ওইভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, কিন্তু এর শেষ কোথায় জানো?'

'না তা' জানি না।' আবার হাসেন মৃগাঙ্ক।

'শেষ হচ্ছে' —সতীনাথ প্রায় উত্তেজিত ভাবে বলেন, 'আবার সেই আদিমকালের মাতৃতন্ত্র! আমি বলছি মৃগাঙ্ক, সেদিনের খুব বেশি দেরী নেই, যেদিন আবার ফিরে আসবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।'

'হঠাৎ এত বড় ভবিষ্যৎ বাণী?'

'যা দেখছি ভাই! কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, 'বাড়ির কর্তা' বলে শব্দটা স্রেফ্ উঠে গেছে। গিন্নীরাই সব, গিন্নীদেরই সমস্ত, গিন্নীর অঙ্গুলি নির্দেশে সারা সংসার চলছে। গিন্নীর কাজের প্রতিবাদ করেছ কি আগুন জ্বেলেছ। দেখছ না? টের পাচ্ছ না?'

এতক্ষণে বুঝতে পারেন মৃগাঙ্ক আসল ব্যথাটা সতীনাথের কোথায়! মৃদু হেসে বলেন, 'তোমার মত অতটা টের বোধহয় পাচ্ছি না।'

'তা হলে বুঝতে হবে তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি! তোমার গৃহিণী এ যুগের ব্যতিক্রম। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ, বন্ধু এসেছে, বামুনঠাকুরকে ডাকছি চা বানাতে। গৃহিণী হাওয়া! কখন বেরোন কখন ফেরেন, কতক্ষণ বাড়িতে থাকেন কিচ্ছু জানি না। অনুগ্রহ করে যখন দেখা দেন কৃতার্থ হয়ে যাই। জিগোস করতে সাহস হয় না— গিছলে কোথায়? আমার পোস্ট হচ্ছে ব্যাঙ্কের। টাকা দরকার হলেই শুধু আমি।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'তবে আর কি, ওই তো যথেষ্ট। অর্থনৈতিক পরাধীনতা না আসা পর্যন্ত পুরুষসমাজ টিঁকে থাকবেই কোন রকমে। তাছাড়া—'

'আরে ভাই তাও তো যেতে বসেছে। আমার না হোক, পাড়ার অনেকের স্ত্রীই তো চাকরী-বাকরী করছে। আর দু'দিন বাদে বলবে তোমার ভাত আর খাব না।'

বন্ধুর সামনে গম্ভীর মৃগাঙ্ক সহসা বুঝি একটু তরল হয়ে ওঠেন, হেসে বলেন, 'তাতেও চিন্তার কিছু নেই সতীনাথ, এমন দিন যদি আসে মেয়েরা একযোগে বলছে 'তোমাদের ঘরে আব শোবনা,' তবেই বুঝবে পুরুষের যথার্থ দুর্দিন এল। কিন্তু সে কথা আর ক'জন বলবে বল, ক'দিনই বা বলতে পারবে? আমাদের দেহবিজ্ঞান বলছে দেহাতীত হবার শক্তিতে মেয়ে পুরুষ দু'জনেই সমান কাঁচা। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ ব্যতিক্রম আছেই। কিন্তু সংসার যদি কর্তাপ্রধান না হয়ে গৃহিণী প্রধানই হয়—ক্ষতি কি? তাঁরাই তো সংসার। তাঁদের জন্যেই তো সংসার।'

'ওহে বাপু, নিজে ভুক্তভোগী নয় বলেই বলতে পারছ এ কথা। যখন জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয় তোমার সংসারে তোমার কোন অধিকার নেই, তখন—'

'এক সময় আমাদেব সমাজে মেয়েদের তো এই অবস্থাই ছিল সতীনাথ, আজ না নয় পুরুষের হ'ল।'

'বলা সোজা মৃগাঙ্ক'—সতীনাথ উত্তেজিত ভাবে বলেন, 'তোমার স্ত্রী যদি তোমার বিনা অনুমতিতে, তোমাব সঙ্গে পরামর্শ মাত্র না করে তোমার ছেলেটাকে বোর্ডিংএ দিয়ে আসে, আর কেবলমাত্র পাড়ায় চেঁচামেচি লোক জানাজানির ভয়ে তোমাকে সেই অত্যাচার সহ্য করতে হয়, বলতে পারবে একথা?'

মৃগাঙ্ক আর একবার বুঝলেন সতীনাথের যন্ত্রণাটা কোথায়। লোকটা চিরকালই হাসি-খুশি ফুর্তিবাজ, তাই চট্ করে বোঝা যায়নি।

আর হাসলেন না, মৃদুস্বরে বললেন,—'আমার পক্ষে ঠিক এ রকমটা বোঝার একটু অসুবিধে আছে সতী, কারণ আমার বাড়ির ছেলেটা আমার ছেলে নয়। তুমি যে অবস্থাটার বর্ণনা করলে, আমি হয়তো তেমন অবস্থায় পড়লে বেঁচেই যাই, কিন্তু তা হবার আশা

নেই। আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। স্বাধীন ভাবে কিছু করা যায়, এ যেন তিনি ভাবতেই পারেন না।'

'আবার বলবে ভাই তুমি ভাগ্যবান! স্বাধীনা স্ত্রী নিয়ে আমার—' হঠাৎ গলাটা বুজে এল সতীনাথের, একটু পরে গলা ঝেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'বিশ্বাস করতে পারো, আমাকে না বলা না কওয়া, আমার মেয়েটাকে, আমার একলার মেয়েটাকে—বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিয়েছে।'

মৃগাঙ্ক তীব্র বিদ্রূপে বলে ওঠেন, 'দিয়েছেন, খুব ভালই করেছেন, কিন্তু তুমি সেটা মেনেও তো নিয়েছ দেখতে পাচ্ছি।'

'কি করব বল ভাই, করবার আছে কি? যা খুশি তাই করে ও, আর ওর বান্ধবাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে—নিজের কানে শুনেছি আমি, বাহাদুরী করে বলে বেড়ায়—পুরুষমানুষ কোথায় জব্দ জানিস, কেলেঙ্কারীর ভয়ের কাছে। তাই কেয়ার করি না আমি ওকে, মারতে তো পারবে না, আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীদের আমলের মত? তবে আর ভয়টা কি? বোঝ ভাই, যে মেয়েমানুষ এমন কথা বলতে পারে, তাকে কী করা যায়?'

'মারাই যায়!' আরও তীব্রস্বরে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক, 'আমাদের সেই চলতি কথাটা ভুলে গেছ সতীনাথ? হাতে না মেরে ভাতে মারা! তুমি ওঁর সাথে সমস্ত সহযোগিতা ত্যাগ করে, অপরিচিতের মত থাকতে পারো। দেখ কাকে কার আগে প্রয়োজন হয়।'

'সে কি আর হয়!' সতীনাথ ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, 'সমাজে সংসারে বাস করে তা চলে না।'

'না চলবার কি আছে? এ তো ঠাণ্ডা লড়াই।'

'ঠাণ্ডাই ডাণ্ডা হয়ে ওঠেরে, ভাই! আত্মীয়বন্ধুকে জবাবদিহি করতে হবে না? আমার পারিবারিক জীবনের ওপর সমাজের সহস্র চক্ষু তীব্র হয়ে নেই?'

'বেশ তো, তেমন প্রশ্ন ওঠে, স্পষ্টই বলবে স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না।' রায় দেওয়ার ভঙ্গীতে—কথা শেষ করে একটা সিগারেট ধরান

মৃগাঙ্ক। সতীনাথ ধূমপায়ী নয়, তাই একাই ধরান।

সতীনাথ মিনিট খানেক সেই অলস ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'ওইখানেই তো মেরে রেখেছে ভাই 'স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না' এতবড় লজ্জার কথা কি উচ্চারণ করা যায়? ওর থেকে অগৌরব আর কি আছে? লোকের কাছে ওই মাথা হেঁট হবার ভয়ই এত সহ্য করতে বাধ্য করাচ্ছে। সুখ নেই, শান্তি নেই, অন্তরঙ্গতা নেই, স্টেজের থিয়েটারের মত প্রতিনিয়ত শুধু প্লে করে চলেছি!'

সতীনাথের ভাষা সাদা-মাটা, কিন্তু ভাবটা মৃগাঙ্কর হৃদয়কে স্পর্শ করে। না, একেবারে উড়িয়ে দিতে তিনি পারেন না বন্ধুর মর্ম কথা। এ ত একা সতীনাথের জীবনের অভিশাপ নয়। এ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলেন, 'এক্ষেত্রে মেয়েকে ছেড়ে থাকা তো আরোই কষ্টকর তোমার পক্ষে, মন কেমনের কথা তুলে ওকে আনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দেখ না? তাতে তো গোলমালের আশঙ্কা নেই।'

'সেই চেষ্টাই কি করিনি ভাই? বলল কি জানো?—অতবড় মেয়ে আমাদের মাঝখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আমার অস্বস্তি হয়, বিরক্তি আসে। আমার নিজের পেটের মেয়ে হলেও দিতাম।'

'তা ভাল। আশা করি এখন প্রেমের লীলাটা 'অবাধ' চলছে? না, তোমাদের ওপর সহানুভূতি আসেনা সতীনাথ, আসে ঘৃণা। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। মেরে রেখেছে আর কিছুতেই নয় সতী, ওইতেই।'

বলে উঠে দাঁড়ালেন মৃগাঙ্ক। আর পরমাশ্চর্যের কথা, সতীনাথ ক্রুদ্ধ না হয়ে একান্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে আস্তে আস্তে বলেন, 'তুমি ডাক্তার মানুষ তোমাকে আর কি বোঝাবো ভাই, সবই তো বোঝো। আমাদের মতন লোকের জীবনে আছে কি বল? বাঁচতে তো হবে?'

আর কি বলবার আছে? এর পর আর বলবার কি থাকে?
দুর্বলের প্রতি ঘৃণাই বা আসবে কোথায়, আসে শুধু করুণা।

ফেরার সময় গাড়িতে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে যান মৃগাঙ্ক, একা সতীনাথকেই বা দোষ দেওয়া যায় কোন নীতিতে? সতীনাথের চাইতে উচ্চমানের 'খাঁচার মালে' ক'জনই বা আবিষ্কার করতে পারছে?

ওই যে পথের জনারণ্য, সত্যিকার সুখী আর সন্তুষ্ট মানুষ ক'টা আছে ওদের মধ্যে?

ওই যে মেয়েটা আর ছেলেটা—প্রায় হাত ধরাধরি করে রাস্তায় চলেছে যেন প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে, ওরাও হয়তো স্টেজের অভিনয় করছে। মৃগাঙ্কর এক সমস্যা, সতীনাথের এক সমস্যা, এর ওর তার সকলেরই এক এক সমস্যা। আর অন্নবস্ত্র, ঔষধ, আচ্ছাদন, সমস্ত কিছুর চাইতে তীব্র সমস্যা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জটিলতা।

এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতেই হবে মানুষকে, ঠেশাঠেশি ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে। মরে না গেলে পৃথিবীর বাইরে কোথাও পালিয়ে যাবার উপায় নেই। থাকতে হবে রাষ্ট্রবদ্ধ হয়ে, সমাজবদ্ধ হয়ে, পরিবারবদ্ধ হয়ে অথচ কিছুতেই কেউ কাউকে সহ্য করতে রাজী নয়।

প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলছে, 'একটু সরোনা বাপু।'

'সরব কোথায়? সরব কেন?' এ প্রশ্ন তুলতেই লেগে গেল লাঠালাঠি, বেধে গেল যুদ্ধ।

আরও সূক্ষ্মস্তরে চলে গেলে দেখবে প্রধান আসামী হচ্ছে ভুল বোঝা। একে অপরকে যেন ভুল বুঝবেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে।

আঃ বিধাতার সৃষ্টি এই দেহটার মধ্যে মন নামক বালাইটা যদি না থাকতো!

'মন' নামক রোগটাই মানুষকে জেরবার করছে। এই যে মৃগাঙ্ক! কতই তো সুখী হতে পারতেন, দৃশ্যতঃ সুখী হবার সমস্ত উপকরণই তো তাঁর ছিল, কিন্তু হল না। জীবনবীণার তারখানি ঠিক সুরে বাজল না। ওই ছোট্ট ছেলেটা। সীতু।

কী অসহ্য মনোব্যাধিতেই ভুগছে ও। কী দরকার ছিল ওর এ

কষ্ট পাবার? হাসত খেলত, ছুটত লাফাত, যা ইচ্ছে আবদার করত, যত পারত খেত, কী সহজই হত। তা নয়, ও নিজের সুখকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ক্লেদাক্ত করবে বসে বসে।

ওই তো অতসী! হোক না আরও পাঁচটা স্বাভাবিক মেয়ের মত। ওর ওই আহ্লাদী শ্যামলীর মতই হোক না। খুব হাসুক, খুব কথা বলুক, মান করুক, অভিমান করুক, ছেলের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াই করুক মৃগাঙ্কর সঙ্গে, তা নয়। হৃদয়ের দরজায় চাবি কুলুপ লাগিয়ে—শান্ত সমাহিত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর মৃগাঙ্ক নিজে?

'বলি খোকাবাবু আজ খাবে কি খাবে না?'

বামুন মেয়ে এসে দাঁড়াল সীতুর পিছনে, 'তোমার মা বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে তোমাকে খাইয়ে রাখতে, ফিরতে দেরী হবে

সাধারণতঃ বামুন মেয়ের কথা গ্রাহ্য করেনা সীতু। আজও করত না, যদি না শেষ দিকের কথাগুলো কানে এসে বাজত।

মা বেরিয়ে গেছে। ফিরতে রাত হবে। কোথায় গেছে অতসী?

সীতুকে না জানিয়ে আর কবে কোন দিন কোথায় গেছে? কই মনে তো পড়ে না। হয় সীতু সঙ্গেই থাকে, নয় তাকে বলে বুঝিয়ে গল্পের বই ঘুস দিয়ে তবে তো যায়। আজ এটা কি?

হঠাৎ বুকটা একটু কেঁপে উঠল। সেই তখনকার কথাই কি তবে সত্যি? তখন বলেছিল না অতসী—'তুমি কেন চলে যাবে, আমিই চলে যাবো।'

তাই কি? রাগের সময়কার সেই প্রতিজ্ঞাটাই তাহলে পালন করতে বসলো মা?

চোখে জল আসতে না দেবার প্রতিজ্ঞা করে কাঠ হয়ে বসে রইল সীতু পিছন ফিরেই। তবু মান খুইয়ে জিগ্যেস করা তো চলে না, কোথায় গেছে মা।

বামুন মেয়ে আবার বলে ওঠে, 'এই এক কাঠগোঁয়ার এক বগ্গা ছেলে হয়েছে বাবা! খুরে খুরে নমস্কার! এতখানি বয়স হয়েছে

আমার, এমনধারা ছেলে সাতজন্মে দেখিনি। কোন ঝাড়ের বাঁশ যে আনল! নাও বাপু নাও চল।'

'যাবো না আমি' খাবো না কিছু।' তীব্রস্বর, তীক্ষ্ণ গলা।

'তবে খেয়োনা। মা ওবাড়ি থেকে ফিরে এলে তাই বলব।'

ওবাড়ি! সেটাই বা আবার কোন রহস্য?

কিন্তু রহস্য ভেদ করতে হলেই তো ফের কথা কইতে হবে। সীতু তো কথা বলবে না।

বামুন মেয়ে বলতে বলতে চলে যায়, 'আমার বলবার কথা আমি বলেছি, তা বলে তো পায়ে ধরে সাধতে পারব না। অধর্মের ভোগ আমার, তাই এখনো এ বাড়িতে পড়ে আছি। নইলে দাদাবাবু যখন ফলসুদ্ধ গাছ ঘরে নিয়ে এল তখনই তো আমার সব ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যাবার কথা। যেতে পারলাম না, মায়ায় পড়ে রয়ে গেলাম, এই এখন তার ফল ভুগছি। লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারিনে, সবাই বলেছে—ছিঃ ছিঃ তোর অমন মনিবের এই কাজ! তবু রয়ে গেছি, এইবার এস্তফা দেব, আর নয়।'

অতসীর অনুপস্থিতির সুযোগে বামুন মেয়ে বেশ সশব্দেই স্বগতোক্তি করতে করতে চলে যায়। তাকিয়ে দেখেনা ওই জেদি ছেলেটার ভুরু কোঁচকানো মুখেও কী হতাশ অসহায়তা ফুটে উঠেছে!

মা একেবারে চলে যায়নি, আবার তাহলে ফিরে আসবে, এ তথ্যটা যেই নিশ্চিন্ত করেছে তাকে, সেই জেগে উঠেছে এক ক্ষুব্ধ তীব্র অভিমান—সীতুর অজানায় অনেক কিছুই এখন চলছে। কোথায় কোনখানে ওবাড়ি নামক এমন একটা জায়গা আবিষ্কার হয়েছে, যেটা এবাড়ির সবাই জানে, বামুন মেয়ে পর্যন্ত জানে, কিন্তু সীতু ছন্দাংশেও জানে না। আর সবচেয়ে অসহায়তা সীতুর কাউকে সে জিগ্যেস করতে পারবে না।'

না, মরে গেলেও মুখ ফুটে কাউকে জিগ্যেস করতে পারবে না, মা কোথায়? কোথায় সেই ওবাড়িটা? কে থাকে সেখানে? কবে তাদের চিনল মা? সীতু কেন মরে যায় না?

সীতুর বয়সী কত ছেলেই তো মরে। এইতো সেদিন ওই সামনের বাড়ির ওই দোতলার ছেলেটা মরে গেল, কি যেন নাম ছিল তার সীতু জানে না। কিন্তু কি মোটা ছিল তা দেখেছে তো!

হঠাৎ একদিন ও বাড়িতে খুব জোর কান্না উঠল, সীতু হা করে তাকিয়ে থাকল, তারপর সকলের বলাবলিতে জানতে পারল সেই ছেলেটা মারা গেছে।

ভয়ানক রকম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন সীতু। আগের দিনও ছেলেটাকে রাস্তায় বেরোতে দেখেছিল যে।

আর আজ সীতু অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে, সীতু এত রোগা, তবু হঠাৎ ওই রকম মরে যায় না কেন? এই এক্ষুনি যদি মরে যেতে পারত! যদি মা সেই ও বাড়ি না কি থেকে এসে দেখত সীতু এই জানলার ধারে মরে পড়ে রয়েছে! বেশ হয়, ঠিক হয়!

দু'হাতে শক্ত করে জানলার গ্রীল চেপে ধরে তাতেই মাথাটা ঠেকিয়ে সীতু প্রাণপণে প্রার্থনা করতে থাকে—ভগবান এই দণ্ডে মরিয়ে দাও সীতুকে!

ধ্রুবও তো ছিল সীতুর বয়সী ছেলে, তার প্রাণপণ ডাকে তো ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছিলেন, আর সীতুর ডাকে যমরাজকে একবার একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন না? যমরাজাই তো মরার দেবতা!

কিন্তু প্রাণপণ মানে কি? আর কাকে প্রাণপণ বলে?

গাড়ি গ্যারেজে পুরে মৃগাঙ্ক বাড়ি ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল অতসী—পায়ে হেঁটে।

মৃগাঙ্ককে দেখে একটু অস্বস্তি পেল? না কি সপ্রতিভ ভাবেই ঢুকল শুধু মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে। হয়তো বা টানলও না, শুধু একেবারে নির্লিপ্ত থাকবে. তাই টানার ওই ভঙ্গীটুকু করল মৃগাঙ্কর উপস্থিতিকে সম্মান দিতে।

মৃগাঙ্ক ঈষৎ অবাক হয়ে বললেন, 'পায়ে হেঁটে একা কোথায়?'

অতসী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'পায়ে হেঁটে, কারণ গাড়ি চড়ার মত দূর নয়, কাউকে নিয়ে যেতে চাই না বলেই একা, আর কোথায় সে কথা শুনলে হয়তো সুখী হবে না।'

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার মত মনের মধ্যে একটা আবেগের আলোড়ন উঠে আছড়ে পড়ল। সুখী হতে বাধা কি?

সুখী হতে কি পারে না মৃগাঙ্ক? হঠাৎ ভারী একটা ইচ্ছে হল মৃগাঙ্কর, সুখী হলে কেমন লাগে অনুভব করতে। সুখী হওয়াটা কি নিজের হাতের মুঠোয়? শক্তিমানেরা না ইচ্ছে করলেই সুখী হতে পারে? তাই এতক্ষণ ভাবছিল না মৃগাঙ্ক গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে? তবে একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

তাই মৃগাঙ্ক ডাক্তারের কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল না, কোঁচকালো গালের চামড়া, ঈষৎ হাসিতে। 'আমি কিসে সুখী হই আর কিসে হই না, সে খবর রাখো?'

অতসী একটু অবাক হয়েছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেই ভাব। অবাকটা দেখতে বেশ মজা লাগছে।

'খবর রাখবার শক্তি থাকলে তো?'

অতসীও হয়তো ঈষৎ হেসেছে, অবাক হওয়া সত্ত্বেও।

'শক্তি অর্জন করতে হয়!'

'পারলাম আর কই?'

'চেষ্টা করেছ কখনো? শুধু 'পারলাম না' বলে হারই মানলে!'

ততক্ষণে বসবার ঘরে এসে বসে পড়েছেন মৃগাঙ্ক, অগত্যা অতসীও।

জোরালো আলোটা মুখে এসে পড়েছে, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মৃগাঙ্কর সহসা মনে হয় অতসী নেহাৎ ছোট। মৃগাঙ্কর চাইতে অনেক ছোট। এত দুঃখকষ্ট এত ঝড়ঝাপটা পার হয়ে এসেও এখনো ও তরুণী। কালের চাকার দাগ পড়েনি ওর কপালে, মুখে, চোখের কোণায়, ঠোঁটের রেখায়। কোথাও ধরা পড়ছে না ওর জীবনের ইতিহাস।

কিন্তু নিজেকে তো মৃগাঙ্ক আরশির পটে দেখেছেন: সে বড়

স্পষ্টভাষী। মৃগাঙ্কর মুখে কালের চাকা গভীর হয়ে ফুটেছে।

সুখী হবার সাধ জাগলেই কি আর এখন সুখী হবার ক্ষমতা আছে?

তৎক্ষণাৎ নিজের ক্ষণপূর্বের কথাটাই কানে বেজে উঠল, 'ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।' তাই নির্বাক নতনয়না অতসীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'শুনলে আমি অসুখী হবো না। তবে তোমার যদি গভীর গোপনীয় কিছু থাকে—'

হাসিটা গম্ভীর, কণ্ঠে ঈষৎ তরলতা। অতসী বড্ড অবাক হচ্ছে মনে হচ্ছে। অতসীর অবাক হওয়াটা আরো মজার লাগছে।

অবাক হোক, তবু অতসী এবার স্পষ্ট সুর ধরেছে, 'আমার আর গোপনীয় কি? সব জেনেই তো এনেছ।'

'আহা, নতুন কিছু হতেই বা আটকায় কে? এখনো তো প্রায় কলেজ গার্ল।'

'তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করতে চাইছ?'

না, চেষ্টা ছাড়বেন না মৃগাঙ্ক, তাই হেসে উঠে বলেন, 'ব্যঙ্গ কেন, ঠাট্টা হতে নেই? নিজের স্ত্রীকে একটু ঠাট্টা করা চলে না?'

অসম্ভব অবাক হচ্ছে অতসী, বেশ বোঝা যাচ্ছে দিশে পাচ্ছে না ও। এতো বেশ মজার খেলা, নেশা লাগছে! দেখা যাক কি বলে।

অতসী বলছে, 'পৃথিবীকে আমি দেখিনি, জানি না কি চলে আর কি চলে না। শুধু এইমাত্র পৃথিবীর একটুকরো দেখে এলাম, দেখে ধাঁধায় পড়েছি, ওরাই অস্বাভাবিক না ওটাই স্বাভাবিক।'

'দেখে এলে! ও তুমি যে কোথায় যেন গিয়েছিলে? কারুর বাড়ি নাকি?'

'হ্যাঁ, শ্যামলীর বাড়ি!'

হায় ঈশ্বর! মৃগাঙ্কর সুখী হওয়ায় এত আক্রোশ কেন তোমার? কিন্তু তবু মৃগাঙ্ক সহজে হার মানবে না, তোমার ওপর জিতবে।

'শ্যামলী! ও! ওর সেই বাচ্চাটি ভাল আছে?'

তা' অতসীও বোধকরি সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সহজ হচ্ছে। 'বাচ্চাটি ভাল আছে। মা নিজেই হঠাৎ অসুখে পড়েছে।'

'তাই নাকি? কি হয়েছে?'

'কাল একটু জ্বর হয়েছিল। এমন কিছু বেশি না, আজ সকালে ভালই ছিল। হঠাৎ বিকেলের দিকে সেন্সলেস্ হয়ে পড়ে। বাড়িতে শুধু ওই বাচ্চাটা আর ঝি, স্বামী বাড়ি নেই, ঝিটা ভয় পেয়ে এ বাড়িতে এসেছিল ডাক্তার ডাকতে—' অতসী একটু থামল।

এই অবসরে মৃগাঙ্ক বলে উঠলেন, 'তা' ডাক্তারকে না পেয়ে বুঝি ডাক্তার গিন্নীকেই কল দিয়ে নিয়ে গেল?'

অতসীর ভয় হচ্ছে! মৃগাঙ্ক কি ড্রিঙ্ক করে এসেছেন? ডাক্তারদের ক্লাবে ওটা নাকি চালু ব্যাপার।

এমন হালকা চালের কথা মৃগাঙ্ককে কবে বলতে শুনেছে অতসী?

শুনেছে হয়তো সেই প্রথম পর্বে, কিন্তু এখন তো অতসী সর্বদাই আড়ষ্ট। এখনও কি নয়? শুধু শ্যামলীর প্রসঙ্গেই সেদিন সহসা মুখর হয়ে উঠেছিল। উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

তারপর, সেই একবাক্স সন্দেশ চাকরদের বিলিয়ে দেবার পর, শান্ত চিত্তে সংকল্প করেছিল থাক আর প্রশ্রয় দেবে না শ্যামলীকে। অথবা স্পষ্ট করেই বলে দেবে তাকে, অতীতের জের টেনে জীবনকে বিড়ম্বিত করতে ইচ্ছে নেই অতসীর।

কিন্তু কোথায় বসে আছেন এক অদৃশ্য চক্রী? তাই যে বাড়িতে একদিনও যায়নি অতসী শ্যামলীর সহস্র সাধ্যসাধনায়, কেবলি এড়িয়ে গেছে নানা কথায়, সেই বাড়িতেই ছুটে চলে গেল নিজে থেকে।

নিজে থেকেই।

শ্যামলীর বাড়ির ঝি জানত না তার মনিবানির সঙ্গে এবাড়ির গিন্নীর পরিচয়ের যোগাযোগ আছে। সে শুধু হাউমাউ করছিল। 'ওগো বাড়িতে একটা বাচ্চাছেলে আর সেই জ্ঞানশূন্য রুগী! ছেলেটা যদি খোলা দরজা পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে ওগো ডাক্তারবাবু কখন ফিরবে গো? মানুষটা বেঁচে আছে না নেই তাও তো বুঝতে পারছি না, কি করবো গো!'

ওর চেঁচামেচিতে বাড়ির ঝি চাকররা আকৃষ্ট হয়ে অকুস্থলে গিয়ে

উপস্থিত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বামুন মেয়েও ; আর সে-ই এসে সংবাদ পরিবেশন করল। 'বৌদিদি সেই যে মেয়েটা তোমায় 'কাকীমা কাকীমা' করে ; তার বাড়ির ঝি এসে হল্লা লাগিয়েছে 'ডাক্তার ডাক্তার' ক'রে।'

প্রসঙ্গটা এমনই যে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। বামুন মেয়েকে অগ্রাহ্য দেখাবার ইচ্ছেও না। তাই বলতেই হয়েছিল অতসীকে, 'তাদের বাড়ির ঝি মানে? কে বললে?'

'আহা বলবে আবার কে। ওই ঝিটাকে নিয়ে গিন্নী তো যখন তখন বাজার যাচ্ছে দোকানে যাচ্ছে। দেখি যে পথে। ঝিমাগী হাঁউ-মাউ করছে গিন্নী না কি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই। ও জানে এ বাড়িতে ডাক্তার আছে তাই ছুটে এসেছে। এখন ছেলেটা ওর পিছু পিছু পথে বেরিয়ে এসেছে কিনা কে জানে? যে রাস্তাঘাট, বেরোলে আর বাঁচতে হবে না।'

কথা ক'টি নিবেদনের সময় বামুন মেয়ের মুখে উল্লাসের যে অভি-ব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তা যদি দেখতে পেত তাহলে হয়তো বা অতসী বিরক্ত হয়ে যেতই না। নিস্পৃহতার ভান দেখাত কিন্তু অতসী শোনা-মাত্রই মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল। তাই 'আসতে রাত হতে পারে সীতু যেন খেয়ে নেয়' এই বলে বেরিয়ে পড়েছিল ঝিটার সঙ্গেই।

'তাই বুঝি ডাক্তার গিন্নীকেই কল দিয়ে নিয়ে গেল' এই সামান্যতম পরিহাসটুকু এমন করে মনকে তোলপাড় করে তুলল কেন? কেন? চোখে এনে দিল জল! এ কা রোগ অতসীর।

'কি হল? নাঃ এ কাঁদুনে বেবি নিয়ে তো মহা মুশকিল!' আশ্চর্য চেষ্টা করে কথা তৈরি করতে হচ্ছে না! এসে যাচ্ছে আপনা থেকে। সুন্দর করে কথা বলতে যে এত সুন্দর লাগে একথা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

সেই বিয়ের পর প্রথম প্রথম অতসীর ভয় ভাঙাতে সুন্দর করে কথা বলেছেন, কিন্তু সীতুরূপী দেয়ালটি যতদিন থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ততদিন থেকে জীবনের সব সৌন্দর্যই ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ

এই খেয়ালের খেলার ধারে কাছে সীতু নেই বলেই বুঝি আবার মনে হচ্ছে জীবনের সব সৌন্দর্য হারিয়ে যায়নি।

'তোমার এই নার্ভাসনেসের জন্যেই আমি বেচারা মাঝে মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। যাক, ওই কি বলে—শ্যামলীর এখনকার অবস্থা কি?'

'এখন তো কথাটথা বলছে! সুনীল, মানে ওর স্বামী, এসে গেছে। ডাক্তার ডাকবার জন্যে খুব ব্যস্ত হচ্ছিল, শ্যামলীই জোর করে বারণ করল। ভাল আছে দেখে আমিও চলে এলাম।'

'যাক ডাক্তার গিন্নীর চিকিৎসাতেই তাহলে রুগী চাঙ্গা? কিন্তু হঠাৎ এটা হল কেন জানা দরকার। কাউকে দেখিয়ে নেওয়া ভাল।'

অতসী ভিতরে ভিতরে মনকে নাড়া দিচ্ছে—বিহ্বল হসনে, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকিসনে। উপভোগ কর এই হঠাৎ পাওয়া সম্পদটুকু। ভাবতে বসিসনে এ সম্পদ যাদুকরের মায়া রচনা না ভগবানের দান।

'দেখিয়ে নেওয়া ভাল, আমিও বলে এলাম। সুনীল তো—'

'কি হল, কথায় ড্যাশ টেনে ছেড়ে দিলে যে?'

'না মানে ও বলছিল কাকে দেখালে ভাল হয়?'

'তা তোমার সুনীল যদি আমাকে'—হেসে ওঠেন মৃগাঙ্ক—'ডাক্তার বলে গণ্য করে, আমিও গিয়ে দেখে আসতে পারি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ। যদি গণ্য করে।'

'এমন অদ্ভুত ঠাট্টা করছ কেন?'

'কেন? কেন জান অতসী', মৃগাঙ্ক সহসা স্ত্রীর খুব কাছে সরে এসে বলেন, 'কেবল গম্ভীর হয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। জীবনটা বোঝার মত হয়ে উঠেছে। একবার দেখা যায় না হালকা হলে কেমন লাগে?'

হালকা হতে কেমন লাগে সে কথা যদি কেউ জানে তো সে হচ্ছে এরা। শ্যামলী আর সুনীল। এই একটু আগে বাড়িতে প্রায় শোকের

ছায়া পড়ে গিয়েছিল, অকস্মাৎ বাড়ি ফিরে শ্যামলীর ওই অবস্থা য়ে
সুনীল তো নিজেই প্রায় অচৈতন্য হয় হয়, নেহাৎ অতসীর শ
খাড়া হ'ল। কিন্তু এখন দেখো! াপার

পৃথিবীতে যে কোন ভাবনা আছে, চিন্তা আছে, দুঃখ আছে,
আছে, একথা ওরা জানেই না। যদিও সুনীল বারে বারে ব.না
'দেখো তোমার কিন্তু বেশি কথা কওয়া ঠিক হচ্ছে না! এবার ঘুমনো
দরকার।' তবু কথার ধারা সমান বেগেই প্রবাহিত হচ্ছে।

আজকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অতসী প্রধান। সুনীল তো
মুগ্ধ। ও নাকি এমন মহিলা ইতিপূর্বে দেখেনি। শ্যামলী যোগ দিচ্ছে,
'দেখছ তো? সাধে কি আর সেই ছোট থেকে প্রেমে পড়ে আছি?'

'কিন্তু মৃগাঙ্ক ডাক্তারের সঙ্গে মানায় না।'

সুনীলের একথাতেও শ্যামলীর সায়।

মানায় না। সত্যিই মানায় না। ওই আড়ে দীর্ঘে মস্ত, গম্ভীর
বাশভারী মানুষটার সঙ্গে অতসীর মত রোগা রোগা ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ
সুকুমার মানুষটাকে মানায় না।

'কিন্তু ডাক্তার হিসেবে খুব ভাল।' সুনীল বলে, 'শুধু স্পেশালিস্ট
হিসেবে নয়, সাধারণ ভাবেও খুব নাম আর হাতযশ আছে ওঁর। আগে
তো এমনি ডাক্তারই ছিলেন, পরে বিলেত গিয়ে স্পেশালিস্ট হয়ে
আসেন।'

'এত কথা তুমি জানলে কি করে?'

'বাঃ পাড়ায় থাকি, আর এটুকু জানব না? ডাক্তার খুবই ভাল।'

'খোকনের ব্যাপারে দেখলামও তো। কিন্তু কাকীমার সঙ্গে
রিলেশান খুব ভাল মনে হয় না। অবশ্য এ ধরনের বিয়েয় হওয়া শক্ত।'

'তা কেন? এতেই তো হবে। ইচ্ছে করে ভালবেসে যখন বিধবা
জেনেও বিয়ে করেছেন—'

'তা করেছেন সত্যি। তবু যে মেয়ের একটা অতীত ইতিহাস
রয়েছে, নিজে সে সম্পূর্ণ সুখী হবে কি করে? এ জীবনের মাঝখানে
সেই অতীত ছায়া ফেলবেই।'

ঃ 'আহা গোপন কিছু তো নয়?'

হচ্ছেনাই বা হল। তবু উচ্ছ্বসিত হয়ে একটু পুরনো দিনের গল্প

' বাধবে, সে জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-হতাশার কাহিনী বলতে

কিংবা, হঠাৎ কোন ছলে প্রথম প্রেমের অনুভূতির কথা উঠে পড়লে, অব যাবে কেটে, অতএব জীবনের সেই কয়েকটা বছরকে একেবারে সীল' করে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে। স্বচ্ছন্দতাই যদি না থাকল, সুখটা অব্যাহত রইল কোথায়?'

'হুঁ। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই তো চলেও আসছে এ প্রথা।'

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'প্রথা জিনিসটা হচ্ছে প্রয়োজনের বাহন, ওর সঙ্গে প্রকৃত সুখের সম্পর্ক কি? নিঃসন্তান লোকেদের জে দত্তক নেওয়ার প্রথা আছে। তাই বলে কি নিজের সন্তানের মত হয় সে?'

'এ তুলনাটা কি রকম হ'ল?'

'যে রকমই হোক, আমি বলতে চাইছি প্রয়োজনের খাতিরে অনেক প্রথাই চলে আসছে সমাজে, তাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে না।'

'তা পুরুষেরা তো দিব্যি দ্বিতীয়পক্ষ তৃতীয়পক্ষ নিয়ে আনন্দের সাগরে ভাসে।'

শ্যামলী মুখ টিপে হেসে বলে, 'হবে হয়তো। সে সাগরের খবর তো আমি রাখি না। তুমি ভাল করে জানতে পারবে আমার জীবনান্তের পর যখন নতুন পক্ষ মেলে উড়বে।'

হেসে ওঠে দু'জনে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ খুনসুড়িতে! অকারণ হাসি অকারণ কথায়।

এক সময় আবার বলে, 'আচ্ছা তোমার কাকার সঙ্গে ওঁর রিলেশানটা কি রকম ছিল?'

'আমার কাকার কথা আর তুলো না।' শ্যামলী বলে, 'গুরুজন মরেছেন স্বর্গে গেছেন, তবে না বলে পারছিনা, তিনি মানুষ নামের অযোগ্য ছিলেন। নেহাৎ তো ছোটই ছিলাম, তবু কি বলব কেবলই ইচ্ছে হতো ওর কাছ থেকে কাকীমাকে চুরি করে নিয়ে পালাই।'

'সাধু ইচ্ছে। যাক, ভদ্রলোক আর যাই হোন একটা বিষয়ে বুদ্ধির কাজ করেছিলেন, সময় থাকতে মারা গিয়েছিলেন।'

শ্যামলী হেসে ফেলে বলে, 'মারা যাবার পর এমন একটা ব্যাপার ঘটবে জানলে, খুব সম্ভব মারা যেতেন না।'

'আচ্ছা ধর, তোমার কাকা যদি ওরকম হৃদয়হীন প্যাটার্নের না হতেন, ধর খুব প্রেমিক মহৎ স্নেহশীল স্বামীই হতেন, মারা গেলে তোমার কাকীমার প্রয়োজনের সমস্যাটা তো সমানই থাকত? সে ক্ষেত্রে? মানে কেবলমাত্র এদের সম্বন্ধে বলছি না, জেনারেল ভাবেই বলছি, তেমন হলে কিংকর্তব্য?'

'কর্তব্য নির্ধারণ করা অপরের কম নয়', বলে শ্যামলী, 'এই হচ্ছে সাদা কথা। কে যে কোন অবস্থায় কি করতে বাধ্য হয় বলা শক্ত। কারণ হৃদয়ের চাইতে পেটের দাবী বেশি প্রত্যক্ষ। তাছাড়া প্রশ্ন তো কেবল নিজেকে নিয়েই নয়, প্রধান প্রশ্ন আরো পোষ্যবর্গের নিয়ে। নিজে 'না খেয়ে পড়ে থাকব' বলে জোর করা যায়, 'ওরা না খেয়ে পড়ে থাক' বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে অপরের কর্তব্য হচ্ছে সমালোচনা না করা। আমি তো এই বুঝি।'

'হায় অবোধ বালিকা! জগতে যদি সমালোচনা বস্তুটাই না থাকল, তাহলে রইল কি?'

'রইল মানুষ।'

'সমালোচনা আছে তাই মানুষ মানুষ পদবাচ্য। অন্যের সমালোচনার মুখে পড়বার ভয় না থাকলে, কি দায় থাকত মানুষের শৃঙ্খলা মেনে চলবার, নিয়ম মেনে চলবার?'

'যাকগে বাবু এসব বাজে কথা। তুমি একদিন চলনা ওখানে।'

'আমি? ক্ষেপেছ!'

'কেন এতে ক্ষ্যাপার কি হ'ল?'

'বাবা, ডাক্তারকে দূরে থেকেই আমার হৃৎকম্প হয়, যা গম্ভীর মুখ কি করে যে তোমার কাকীমা—'

'ও একটা কথাই নয়। নারকেলের মধ্যে মজুত থাকে চিনির

সবরং। কাকীমাও তো গম্ভীর।'

'তা যাই বল, এই গম্ভীর গম্ভীর মানুষগুলোর মধ্যে প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি বস্তুগুলো যে কোন কোটরে থাকে, তাই ভাবি।'

তা সে কথা কি শুধু অপরেই ভাবে?

অতসীও যে আজকাল ভাবতে শুরু করেছে সেই কথা। মৃগাঙ্কর হালকা হওয়ার ইচ্ছেটা টিঁকল আব কই? হ'ল না। হয় না। তাই—অতসী ভাবে—কোথায ছিল মৃগাঙ্কর মধ্যে অত স্নেহ, অত স্নিগ্ধতা? আজকের এই গম্ভীর রুক্ষ ক্লিষ্ট মৌন মূর্তি মানুষটাকে দেখে কি চেনবার উপায় আছে—মানুষটা একদিন গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিল?

কিন্তু এত বেশি মৌনতা সহ্য করা যায় কি করে?

অতসীর যে কী হয়েছে আজকাল, যখন তখন ইচ্ছে করে মৃগাঙ্কর সঙ্গে ভয়ানক রকম একটা ঝগড়া বাধায়, রাগে ফেটে পড়ে চেঁচামেচি করে, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটিযে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কেন যে এমন ইচ্ছে হয়।

সুরেশ রায়ের সংসারে, সুরেশ বায়েব নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে মেয়ের কখনো মুখ ফোটেনি, তার এমন উগ্র উন্মাদ ইচ্ছা কেন?

তা' সবের কারণই বুঝি সীতু।

সীতুকে বাদ দিযে দু'জনের জীবন কল্পনা করলে, বোঝা যায়—

কিন্তু তাও হয না।

সীতুকে বাদ দেওয়ার মত ভয়ানক অলক্ষুণে চিন্তা এক ধাপের বেশি এগোতে পাবে না।

খুকু আছে সত্যি। খুকু অতসীর চোখের আনন্দ, প্রাণের পুতুল, কিন্তু সীতু যেন বুকেব ভিতরকার হাড়!

অথচ সীতুর কি এক দুর্দান্ত নেশা, মাকেই যন্ত্রণা দেবে। নখে ছিঁড়ে ফেলবে মার সমস্ত সুখ সমস্ত শান্তি।

তাই আবার একদিন তোলপাড় হয়ে ওঠে সংসার সীতুর হিংস্র

দুর্বুদ্ধিতে।

খাওয়ার পর জল খাওয়া অভ্যাস মৃগাঙ্কর। বড় এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে ঘরের টেবিলে। রূপোর গ্লাস, রূপোর রেকাবি চাপা। মৃগাঙ্কর মায়ের আমল থেকে এই ব্যবস্থা।

খাওয়ার পর কিঞ্চিত বিশ্রামের শেষে বেরোবার আগে এক চুমুকে জলের গ্লাসটা খালি করে তবে পোশাক পরতে শুরু করেন মৃগাঙ্ক, আজও তাই করেছিলেন, কিন্তু না শেষ পর্যন্ত নয়।

নিয়ম পালন হয়েছিল জলটা চুমুক দেওয়া পর্যন্তই পরক্ষণেই ভীষণ একটা আলোড়নের বেগে ছুটে যেতে হল মৃগাঙ্ককে বমি করতে।

খাবার জলটা লবণাক্ত!

সন্দেহ নেই যে খুব ধীর হাতে জলের গ্লাসের মধ্যে একটি নুনের ডেলা ছাড়া হয়েছিল, তাই প্রথমটা টের পাননি মৃগাঙ্ক! ঢকঢক করে খেয়ে নিয়েছেন। টের পেলেন গ্লাস খালি করার সময়, জলের তলাটা নুনে ভর্তি।

কোথা থেকে এল! যেমন ঢাকা দেওয়া তেমনিই রয়েছে।

কোন ফাঁকে কে ওই সৈন্ধবের ডেলাটি দিয়ে রেখে ফের চাপা দিয়ে গেছে। এ ঘটনা দৈবের হতে পারে না, কোন সূত্র ধরেই বলা চলে না অসাবধানে কিছু একটা হয়ে গেছে। অবশ্য ভৌতিকও নয়।

তবে? 'তবে'র আর আছে কি?

এহেন ঘটনা তো যখন তখনই ঘটেছে, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

হ্যাঁ, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

একটু নিশ্চেষ্ট ছিল সীতু। যবে থেকে সন্দেহ ঢুকেছিল।

হয়তো বা নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের সাধনাই করছিল, কিন্তু কি থেকে যে কি হয়!

সকালে আজ বাগানে নেমে এসেছিল সীতু। অন্ততঃ সীতু যাকে 'বাগান' বলে। গেটের ভিতর কম্পাউণ্ডের মধ্যে কেয়ারী করা গাছের

সারিতে ফুল ফোটে দৈবাৎ, পাতারই বাহার।

আজ দু'একটা গাছ আলো হয়ে উঠেছিল সীজন ফ্লাওয়ারে।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে এল সীতু। একগোছা ফুল নিয়ে খুকুটার ওই থোকা থোকা চুলের খাঁজে গুঁজে দেবে। গতকাল পার্কে দেখেছে একটা কোঁকড়া-চুল মেয়ের চুলে ফুলসজ্জা।

অবশ্য যা কিছু করবে সবই অপরের চোখ থেকে লুকিয়ে। কারুর সামনে কোন কিছু করতে চায় না সে।

কেন? সেই এক রহস্য।

খুকুর জন্যে প্রাণ ফেটে যায়, কিন্তু কারো সামনে তাকিয়ে দেখেনা পর্যন্ত।

আজ দেখল মৃগাঙ্ক তখনো নিদ্রিত, চাকররা এদিক ওদিকে। নেমে এল চুপিচুপি, চারিদিক তাকিয়ে পটপট করে ছিঁড়ে নিল কয়েক গোছা ফুল, আর আশ্চর্য, এই মাত্র যাকে ঘুমন্ত দেখে এসেছে, সেই মানুষ দো তলার বারান্দা থেকে দিব্যি খোলা গলায় বলে উঠল, 'বাঃ চমৎকার!'

চমকে চোখ তুলেই চোখটা নামিয়ে নিয়ে হাতের ফুলগুলো তক্ষুনি ফেলে দিয়েছিল সীতু, কিন্তু সেই 'বাঃ চমৎকার' শব্দটিকে কোথাও ফেলে দিতে পারল না সে। সে শব্দ অনবরত কানের মধ্যে হাতুড়ির ঘা দিতে লাগল, 'বাঃ চমৎকার!'

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু ওই ব্যঙ্গোক্তিটা তুচ্ছ করবার নয়।

দাহে ছটফট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উপরে আসতে গিয়ে ধাক্কা। মৃগাঙ্ক নামছেন। তারও যে বরাবরের অভ্যাস সকালে এই বাগান তদারক।

যদি মৃগাঙ্ক ধমকে উঠতেন, তাহলে এতটা দাহ হ'ত না, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়েছিল ক্ষুদ্র ওই ব্যঙ্গটুকু।

'বাঃ চমৎকার'—শুধু এই কথাটুকুর মধ্যেই ছিল অনেক কথা।

পরক্ষণেই আবার সিঁড়িতে দেখা।

কিন্তু সেখানে তো ব্যঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেননি মৃগাঙ্ক। শুধু

মৃদু গম্ভীর একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'ফুল চাইলে কি পাওনা? অমন চোরের মত চুপিচুপি নেবার দরকার কি?'

আর কিছু নয়। নেমে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক. সাঁতুও উঠে এসেছিল। কিন্তু সেই থেকে আবার সাঁতুব 'কাঠত্ব' প্রাপ্তি।

সাঁতু আব সাঁতুর পবম শত্রুটাকে থাকতেই হবে এক বাড়িতে? আব কোন উপায় নেই? মা যে বলেছিল অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে—দেখা যাচ্ছে সেটা নেহাৎ স্তোকবাক্য। সেই আশায় কত ভাল হবার চেষ্টা করেছিল সাঁতু, কিন্তু মা'টা মিথ্যাবাদী।

মার বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন তো সাঁতু নিরুদ্দেশ হয়েই যাচ্ছিল, পার্কে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে আসবে না বলে চলেও গিয়েছিল অনেক দুর। কিন্তু একটু রাত্তির হয়ে যেতেই কি রকম ভয় ভয় করল। ফিরে এসে আবার বসে রইল পার্কেব বেঞ্চে। অনেক রাতে বীরবাহাদুর এসে ধরে নিয়ে গেল।

তা' সেদিন কেউ কিছু বলেনি সাঁতুকে। অতসীও না।

শুধু কেমন একরকম করে যেন তাকিয়ে খুব বড় করে নিশ্বাস ফেলেছিল।

মায়ের ওই নিশ্বাসফিশ্বাসগুলো তেমন ভাল লাগে না। তাই না সাঁতু ক'দিন ধরে চেষ্টা করছিল ভাল হবার! কিন্তু কই, কি থেকে যে কি হয়!

এক বাড়িতে দু'জনেব থাকা চলবে না।

দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল সাঁতু। সাঁতুর মরে গেলেই হয়। মরার অনেক উপায় ঠাওরাল সাঁতু। কিন্তু কোনটাই তার সাধ্যের মধ্যে নয়।

তাছাড়া—

সেই কথাটা না ভেবে পারল না সাঁতু—মা? মার সেই কেমন একরকম করে চাওয়া আর নিশ্বাস ফেলা! সাঁতু মরে গেলে, মার প্রাণে লাগবে। তার থেকে ওই লোকটাকে সরিয়ে দিলেই সব শান্তি।

কিন্তু মরে কই? লোকটা যেন 'প্রহ্লাদের' মতন।

কতবার কত চেষ্টা করল সীতু, কিছুই হ'ল না।

বামুন মেয়েরা সেদিন বলাবলি করছিল ওদের পাড়ায় কে যেন ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। বলছিল, 'কি দিনকাল পড়েছে। দু'বার ভেদ দু'বার বমি, ব্যস! জলজ্যান্ত মানুষটা মরে গেল।'

'ভেদ' কথাটার মানে ঠিক জানে না সীতু। কিন্তু পরবর্তী কথাটার মানে জানে।

অতএব 'দিনকালে'র প্রতি পরম আস্থা নিয়ে চুপিচুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা। বেগ পেতে হ'ল না, সহজেই হল। কাঠের একটা বড় গামলায় উঁচু করে ঢালা ছিল সৈন্ধবের টুকরো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল?

শুধু খুব খানিকটা হৈচৈ চেঁচামেচি, কে করেছে, কি করে হল বলে বিস্ময় প্রকাশ, তারপর প্রত্যেকবার যা হয় তাই। মস মস করে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল শত্রুপক্ষ। সীতু দাঁড়িয়ে রইল অনেকগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে।

সাধে কি আর প্রহ্লাদের সঙ্গে তুলনা করে সীতু?

মারলে মরে না, কাটলে কাটা পড়ে না, বমি করেও মরে না।

শুধু সীতুকে অপদস্থ করতে, তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে চলে যায়।

কেন, ও পারে না সীতুকে খুব ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে?

তাতেও বুঝি সীতুর দাহ কিছু কিছু কমত!

কিন্তু সীতু হাল ছাড়বে না, ঠিক একদিন মেরে ফেলবে ওকে।

আচ্ছা, মোটরগাড়ির পেট্রল অনেকখানিটা নিয়ে আসা যায় না লুকিয়ে?

সেদিন বীরবাহাদুর কোথা থেকে যেন এনেছিল। প্রকাণ্ড একটা কাঁকড়াবিছে বেরিয়েছিল রান্নাঘরের পিছনে, বীরবাহাদুর ঝপ্ করে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

সবাই যখন ঘুমোয়, তখন—

পেট্রোল কোথায় থাকে, আদৌ বাড়িতে থাকে কিনা এ সব তথ্য

জেনে নিতে হবে।

দেশলাই? দেশলাই একটা জোগাড় করা কিছু এমন শক্ত নয়।

'আমি বলি কি, ওকে কোন একটা বোর্ডিংএ ভর্তি করে দেওয়া হোক।' অতসী প্রস্তাব করে।

মৃগাঙ্ক অতসীর জলভারাক্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুগম্ভীর স্বরে বলেন, 'মিথ্যে অভিমান করছ কেন অতসী? আমি কি ওর প্রতি ভয়ানক একটা কিছু দুর্ব্যবহার করছি? কেউ কি ছেলে শাসন করতে এটুকু কঠোরতা করে না?'

অতসী বিষণ্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'না, এ আমার মান-অভিমানের কথা নয়। ভেবে চিন্তেই বলেছি। এতদিন নেহাৎ শিশু ছিল, কিছু উপায় ছিল না। এখন বড় হয়েছে, বোর্ডিংএ রাখা শক্ত নয়। ছেলের শিক্ষার জন্যে অনেকেই তো রাখে এমন। খরচ হয়তো অনেক হবে, কিন্তু তোমার তো টাকার অভাব নেই?'

টাকা।

'টাকা! তা' বটে!' মৃগাঙ্ক ডাক্তার হাসেন, 'মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় অতসী, ওটাই আমার একমাত্র কোয়ালিফিকেশন ছিল কি না।'

'কী বললে?' চেঁচিয়ে উঠল অতসী। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'সত্যি করে কিছু বলিনি অতসী, শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হওয়ার কথাটা বলছি। জগতে এ রকম তো কতই হয়।'

'জগতে কত রকম হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত যে আমি, এটা স্বীকার করছি। সন্দেহ করবে, এর আর আশ্চর্য কি?' অতসী ম্লান হেসে বলে, 'ও তর্ক করে কোন লাভ নেই, আমি যা বলতে এসেছি সেই কথাটাই শেষ হোক। ওকে বোর্ডিংএ ভর্তি করে দিলে ওরও লাভ, আমারও লাভ।'

'তোমার কি ধরনের লাভ সেটা তুমিই বোঝ, তবে তাতে আমার একটা মস্ত লোকসান ঘটবে সন্দেহ নেই। ওকে বাড়ি ছাড়া করলে তোমার মনটাই কি বাড়িতে থাকবে?'

অতসী এবার জোর করে হাসবার চেষ্টা করে। আদুরে আদুরে মিষ্টি হাসি। 'আহা, আমি যেন তেমনি অবুঝ? ছেলেমেয়ের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে কত বাচ্চা বাচ্চা বয়সে কত দূর দূর বিদেশের বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকে, দেখিনি বুঝি আমি?'

মৃগাঙ্ক ডাক্তারও হাসেন। মিষ্টি হাসি নয়, ক্ষুব্ধ হাসি।

'সকলের মতো তো নই আমরা অতসী!'

'হতেই তো চাই আমি।'

'চাইলেই হয় না। আমিই কি চাইনি? বল অতসী,' মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা ভরাট ভারি ভারি হয়ে ওঠে, 'আমি কি সাধ্যমত ওকে আপনার করবার চেষ্টা করিনি? আমি ওর প্রতি পিতৃকর্তব্যের কোন ত্রুটি করেছি? ওকে নিয়ে তোমার খুব বেশি ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ ঘটেছে? কিন্তু সেই এতটুকু শিশু থেকে ও আমাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, আমাকে এড়িয়ে চলতে চাওয়া ভিন্ন কাছে আসতে চায়নি কখনো।'

মাথা হেঁট হয়ে যায় অতসীর।

না গিয়ে উপায় নেই বলে। মৃগাঙ্কর কথা তো মিথ্যা নয়। প্রথম প্রথম সীতুর মনোরঞ্জনের জন্যে বহু চেষ্টা করেছে মৃগাঙ্ক। হয়তো সে চেষ্টা অতসীরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা। হয়তো মনের বিরক্তি, চোখের রুক্ষতা চাপা দিয়ে স্নেহের অভিনয় করেছে। হয়তো অনেক সাধনালব্ধ প্রেয়সীর মনে শুধু প্রেমিকেরই নয়, শুধু স্বামীরই নয়, দেবতার আসনের জন্যও একটু লোভ ছিল মৃগাঙ্কর। যে কারণেই হোক, চূড়ান্ত উদারতা দেখিয়েছিল মৃগাঙ্ক, সীতুকে চূড়ান্ত আদর করেছিল। কিন্তু সীতুর দোষেই সব গেল। সীতুই অতসীর মাথা হেঁট করেছে।

সেই একটুখানি শিশু অত যত্ন সমাদরের কোন মূল্য দেয়নি। মৃগাঙ্ক আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, হয়তো বা অপমান বোধ করেছে। অতসী পারেনি তার প্রতিকার করতে, পারেনি সেই একফোঁটা ছেলেকে বাগে আনতে। কিন্তু কেন?

ভেবে ভেবে কোনদিন কূলকিনারা পায়নি অতসী, কেন এমন?

ছোট বাচ্চারা সর্বদা কাছাকাছি থাকতে থাকতে তুচ্ছ একটা ঝি চাকরেরও কত অনুরক্ত হয়, অনুগত হয় পাড়াপড়শী মামা কাকার, অথচ যে মৃগাঙ্ক সীতুকে দু'হাত ভরে দিয়েছে, দিয়েই চলেছে, রাজপুত্তুরের যত্নে রেখেছে, তাকেই সীতু দু'চক্ষের বিষ দেখে আসছে বরাবর। তাও বা ছোটতে যাহোক মানিয়ে নেওয়া যেত অবোধ বলে, শিশুর খেয়াল বলে। এত মাথা কাটা যেত না তখন। কিন্তু সীতু বড় হয়ে পর্যন্ত প্রতিনিয়ত একি লজ্জা, একি অশান্তি অতসীর!

কোন দৈন্যের ঘর থেকে মৃগাঙ্ক অতসীকে তুলে এনেছে এই রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে, প্রেমের সিংহাসন আর সোনার সিংহাসন দুই দিয়েছে পেতে। অতসীর সুখের জন্য কত করেছে, কত ছেড়েছে, অথচ অতসী কিছুই পারল না। সামান্য একটা ক্ষুদে ছেলের মন ঘোরাতে পারল না মৃগাঙ্কর দিকে।

হয়তো মৃগাঙ্ক ভাবে অতসীর তেমন চেষ্টা নেই, চেষ্টা থাকতে কি আর মায়ে পারে না ছেলের মন বদলাতে? কোলের ছেলের? শিশু ছেলের?

কতদিন ভেবেছে অতসী, মৃগাঙ্ক তো এমন সন্দেহও করতে পারে, অতসী ইচ্ছে করেই ছেলের মন ধরে রাখতে চায়, একেবারে সংরক্ষিত রাখতে চায় নিজের জন্যে। সে ছেলে অতসীর একার। সম্পূর্ণ একার।

মৃগাঙ্ক নতনয়না অতসীর দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলে, 'চাইলেই সব হয় না অতসী! যা হবার নয় তা হয় না! তুমি আর মন খারাপ করে কি করবে?'

অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা যদি না হবার হয় তো হওয়ানোর চেষ্টা করেই বা লাভ কি? যত বড় হচ্ছে ততই তো আরও একগুঁয়ে আরও অবাধ্য হচ্ছে। বোর্ডিঙে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে থাকলে হয়তো একটু সভ্য হবে, বাধ্য হবে, ভালই হবে ওর।'

'তুমি থাকতে পারবে না অতসী।'

'কে বললে পারব না?' অতসী জোর দিয়ে বলে, 'ঠিক পারবো। এই তো খুকুর হৈচৈতে কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়। মন কেমনের

সময়ই থাকবে না।'

'অত চট করে সর্বস্ব দানের দানপত্রে সই করে বোস না অতসী।'

অতসীর চোখে সহসা জল এসে পড়ে। উত্তর দিতে দেরী হয়, তবু সামলে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এভাবে কি করে চলবে? তুমিও তো আর ওর ওপর স্নেহ রাখতে পারছ না? তুমিও তো খুকু হয়ে পর্যন্ত—'

এবার আর সামলাতে পারে না। সব বাঁধ ভেঙে নামে বন্যা।

কথাটা মিথ্যা নয়।

খুকু জন্মে পর্যন্তই মেজাজটা বড্ড যেন বদলে গেছে মৃগাঙ্কর। আগে বিরূপতা করত সাতুই, মৃগাঙ্ক চেষ্টা করতো সহজ হতে। এখন যেন দু'জনের হাতেই ধারালো অস্ত্র!

কিন্তু মৃগাঙ্করই বা দোষ কি?

কি করে সে নিজের ওই ফুলের মত মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেবে তার সংস্পর্শে, যার রক্তে রয়েছে সংক্রামক রোগের সন্দেহ।

প্রথম প্রথম যখন মৃগাঙ্ক খুকু সম্পর্কে অস্বস্তি করেছে, খুকুকে কেড়ে নিয়েছে সাতুর কাছ থেকে, তখন হঠাৎ একদিন ফেটে পড়েছিল অতসী, স্বভাব ছাড়া তীব্রতায় বলেছিল, 'অত অমন কর কেন? ও কি তোমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে? দেখতে পাওনা কত ভালবাসে ওকে?'

সেদিন প্রকাশ করেছিল মৃগাঙ্ক নিজের অসহিষ্ণুতার কারণ। বলেছিল, 'হাতে করে বিষ খাইয়ে মারবে, এমন কথা কেউ বলেনি অতসী, কিন্তু পরোক্ষ বলেও তো একটা কথা আছে? এমনও তো হতে পারে ওর রক্তের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। যদি থাকে সুযোগ পেলে বিষ নিজের ডিউটি পালন করবেই। আর কুষ্ঠর বিষ—'

শুনে চুপ করে গিয়েছিল অতসী।

বুঝতে পেরেছিল কোথায় মৃগাঙ্কর বাধা। তারপর একটু থেমে ম্লানস্বরে বলেছিল, 'ওর জন্মাবার পরে তো—'

'প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে হয়তো পরে, কিন্তু ও জন্মের আগেই যে রোগটা

জন্মায়নি, তাও জোর করে বলা যায় না অতসী। রোগ প্রকাশ হবার আগে অনেক দিন ধরে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকে রোগের বীজ, এ শুধু আমি ডাক্তার বলেই জানি তা' নয়, সবাই জানে।'

'তাহলে—' বলতে গলা কেঁপে গিয়েছিল অতসীর, 'তাহলে সীতুকে ভাল করে পরীক্ষা করছ না কেন একবার?'

'করেছি অতসী! তোমার মিথ্যা উৎকণ্ঠা বাড়ানোয় লাভ নেই বলে তোমাকে না জানিয়ে করেছি পরীক্ষা—'

'পরীক্ষার ফল?'

আরও কেঁপে গিয়েছিল অতসার গলা।

'ফল এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু তবুও সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ছোট্ট বাচ্চারা একেবার ফুলের মত, এতটুকুতেই ক্ষতি হ'তে পারে ওদের।'

শুনে আর একবার বুকটা কেঁপে উঠেছিল অতসীর, আর এক আশঙ্কায়। ছোট্ট ফুলের মতটির অনিষ্টের আশঙ্কায়। সেখানেও যে মাতৃহৃদয়! মা হওয়ার কী জ্বালা!

অতসীর ক্ষেত্রে বুঝি সে জ্বালা সৃষ্টিছাড়া রকমের বেশি, এই জ্বালাতেই সমস্ত পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছুই পেল না অতসী।

কিন্তু এমন দুঃসহ যন্ত্রণার কিছুই হ'ত না, যদি সীতুর স্মৃতিশক্তিটা অত প্রখর না হতো! যদি বা সীতু তখন আরও একটু ছোট থাকত!

ঠিক অতসীর এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'হয়তো আমরা সত্যিকার সুখী হ'তে পারতাম অতসী যদি সীতু তখন আরও ছোট থাকত। বলেছি তো একটা বাচ্চা ছেলের কাছে হেরে গেছি আমরা।'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আর হেরে থাকতে চাই না। সুখী হতেই হবে আমাদের। আমি যা বলছি সেই ব্যবস্থাই কর তুমি।'

'বললাম তো—' মৃগাঙ্ক হাসেন, 'এত চট করে দানপত্রে সই করে বসতে নেই। যাক আরও কিছুদিন। হয়তো আর একটু বড় হলে ওর এই বন্য স্বভাবটা শোধরাবে।'

হয়তো অতসী আরো কিছু বলত। হয়তো বলত শোধরাবার ভরসাই বা কি? রক্তের মধ্যে যে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু রোগের বিষই প্রবাহিত হয় তা তো নয়? স্বভাবের বিষ? মেজাজের বিষ? সেগুলোও তো কাজ করে? বলত, 'আর শোধরাবার উপায় নেই। সব জেনে ফেলেছে সীতু।'

কিন্তু বলা হয়নি, টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল, মৃগাঙ্কর ডাব পড়েছিল।

থম থম করে কাটে কয়েকটা দিন। বাড়িটাও স্তব্ধ।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছেন।

অতসী জিদ ধরেছে সীতুকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে না দিলে অতসীই বাড়ি ছাড়বে। মৃগাঙ্ক এর অন্য অর্থ করেছেন। ভেবেছেন অভিমান।

আশ্চর্য! পৃথিবীটা কি অকৃতজ্ঞ! যাক থাকুক বোর্ডিঙে, হয তো সেই ভাল।

ভারি গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন মৃগাঙ্ক। সীতুর দিকে আর তাকিযে দেখেন না, এমন কি স্পষ্ট একদিন দেখলেন নিজের খাওয়া দুধ থেকে খুকুকে দুধ খাওয়াচ্ছে সীতু, বোধকরি ইচ্ছে করেই মৃগাঙ্ককে দেখিযে দেখিয়ে, তবু একটি কথা বললেন না। মিনিট খানেক তাকিয়ে দেখে সরে গেলেন। গেলেন সীতুরই জামা জুতো কিনতে। ছেলেকে অন্য রাখার প্রস্তুতি। বড়লোকের ছেলেদের জায়গায়, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গেই তো থাকতে হবে মৃগাঙ্ক ডাক্তারেব ছেলেকে!

কিন্তু সীতু? সীতু ক্রমশঃই ক্ষেপে যাচ্ছে।

মাকে যেমন করে সেদিন মেরে ধরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুশি বলেছে, তেমনি করে মেরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুশি বলতে ইচ্ছে হয় তার মৃগাঙ্ককে। তাই চেষ্টা করে বেড়ায় কিসে ক্ষেপে যাবে মৃগাঙ্ক।

সেই ক্ষেপে যাবার মুহূর্তে যখন সেদিনের মত কান ঝাঁকুনি দিতে আসবেন, তখন আব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না সীতু, ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে এলোপাথাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলবে, 'কেন কেন

তুমি আমাকে মারতে এসেছ? কে তুমি আমার? তুমি কি আমার সত্যি বাবা? তুমি কেউ নও, একেবারে কেউ নও। তুমি মিথ্যুক! আমার বাবা মরে গেছে।'

কিন্তু সে সুযোগ আর আসে না।

খুকুকে এঁটো দুধ খাওয়ানোর মত ভয়ঙ্কর কারণ ঘটিয়েও না। মৃগাঙ্ক কেবল জিনিসের উপর জিনিস আনছেন।

অতসী হতাশ হয়ে বলে, 'কি করছো তুমি পাগলের মতন? কত এনে জড়ো কবছো? আট বছরের একটা ছেলে আটটা সুটকেস নিয়ে বোর্ডিঙে যাবে, ক্লাশ ফোরের পড়া করতে? একী অন্যায় টাকা নষ্ট!'

'নষ্ট করার মত অনেক টাকা যে আমার আছে অতসী!' মৃগাঙ্ক ম্লান হেসে বলেন, 'তাই করছি।'

'ওকে বাড়ি থেকে সরাতে আমার চাইতে তো দেখছি তোমার অনেক বেশি মনকেমন করছে।'

'কিছু না অতসী, কিছু না। টাকা আছে, টাকা ছড়াচ্ছি, এই পর্যন্ত।'

'ও কথা বলে আমায় ভোলাতে পাবরে না।' অতসী হতাশার নিশ্বাস ফেলে বলে, বংশের গুণ কেউ মুছে ফেলতে পারে না। ওরা অকৃতজ্ঞের বংশ। উপকারীকে লাথি মারাই ওদের স্বভাবগত গুণ। নইলে আর সীতু তোমাকে—'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার কেমন এক রকম স্বরে তাকান, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার ওপর ওর কৃতজ্ঞ থাকবার কথা নয় অতসী, কদিন ভেবে ভেবে আমি বুঝছি এইটাই আমার ঠিক পাওনা। আমার ওপর ওর ভালবাসা হবে কেন? পশু পাখি কীট পতঙ্গও শত্রু চিনতে পারে। সেটা সহজাত। তুমি জানো না, আমি তো জানি, আমি ওর বাপকে চিকিৎসা করার নামে খেলা করেছি, ইসজেকশনের সিরিঞ্জে শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার ভরে নিয়ে গিয়েছি—'

'আমি জানি।' অকম্পিত স্বরে বলে অতসী।

'তুমি জানো? তুমি জানো? জানো আমার সেই ছলচাতুরি?

অতসী! তবু তুমি—'

'হ্যাঁ তবু আমি। আমি জানতাম আমার সেই মরণান্তকর দুরবস্থা তোমার আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই সেই দুরবস্থার মেয়াদকে নিজের চেষ্টায় বাড়িয়ে তোলবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারনি।'

'অতসী! এত দেখতে পেয়েছিলে তুমি? কি করে পেয়েছিলে?'

'তোমার ভালবাসাকে দেখতে পেয়েছিলাম, তাই হয়তো অতটা দেখতে শিখেছিলাম।'

'অতসী! ছেলেটা কাল চলে যাবে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো আর একটু সদ্ব্যবহার করতে পারতাম ওর ওপর। এতটুকু শিশুকে আর একটু ক্ষমা করা যেত।'

'কিন্তু ও…ও তো তোমাকে—'

'ও আমাকে? হ্যাঁ সত্যি ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে সমান হয়ে গেলাম, ওর সঙ্গে সমান হতে গিয়েই তো ওর কাছে হেরে গেলাম অতসী। এখন ভাবছি আর একবার যদি চান্স পেতাম, চেষ্টা করে দেখতাম জিতবার। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তা হোক, ওতে ওর ভাল হবে।'

এত জিনিস কেন? এত জিনিস কার? কে কাকে দিচ্ছে এসব? ভুরু কুঁচকে দেখে সীতু, কিন্তু কে দিয়েছে এই শিশুটাকে এমন নির্লোভের মন্ত্র?

সীতুর মন্ত্র শুধু 'চাইনা'। 'এসব চাইনা আমি। কেন দিচ্ছে ও?'

সীতু ভাবে, বাড়িতে থাকতে এমন হয় না, সেই স্বপ্নে দেখা ছবি থেকে কেউ এসে নিয়ে চলে যায় সীতুকে। যেখানে এত নিতে হয় না, আর শুনতে হয় না 'এত অকৃতজ্ঞ তুই, এত নেমকহারাম!'

এত জিনিস কেন নেবে সীতু?

কার কাছ থেকে? যে লোকটা সীতুর বাবা নয় তার কাছ থেকে? সমস্ত মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না

কি করা চলে। বোর্ডিঙেও যে যেতে হবে তাকে।

কে জানে বোর্ডিঙে হয়তো এত সব না থাকলে থাকতে দেয় না, কম কম জিনিস নিয়ে ঢুকতে চাইলে হয়তো বলে, 'চলে যাও দূর হও।'

লেখাপড়া শিখে সীতু যখন বড় হবে তখন অনেক রোজগার করবে। ওই লোকটার চাইতেও অনেক অনেক বেশি। আর সেই টাকাগুলো দিয়ে দেবে ওকে। আজকাল যেন বড্ড বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা। সীতুর দিকে আর সেরকম করে তাকায় না।

কিন্তু চুপচাপ থাকবার কি দরকার? খুব রাগারাগিই করুক না ও, অসভ্যর মত চেঁচামেচি করুক। তাই চায় সীতু। ও যত রাগ করবে, ততই না অগ্রাহ্য করার সুখ!

কেনই বা এত দমে যাচ্ছি আমি? মৃগাঙ্ক ডাক্তার অবিরতই ভাবতে থাকেন, অতসী তো ঠিক কথাই বলেছে, ছেলের শিক্ষার জন্যে ছেলেকে কাছছাড়া না করছে কে? এই যে 'ভাবী ভারত নাগরিক আবাস', যেখানে ভর্তি করছেন সীতুকে, সেখানে তো সীট পাওয়াই দুষ্কর হচ্ছিল, নেহাৎ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু, যে নাকি আবার সেখানকার অধ্যক্ষরও বন্ধু, তার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আবার তো খোলা হয়েছে শোনা গেল মাত্র দু'বছর, এর মধ্যেই ছাত্র ধরে না। আর সবই রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাদের কি কারো মা নেই? তারা কি সবাই সংসারের জঞ্জাল? সেই জঞ্জাল সরাবার জন্যেই মাসে তিনশোখানি করে টাকা খরচা করতে রাজি হয়েছে তাদের সংসার?

তা' তো আর নয়।

সীতুর বোর্ডিংবাসের ব্যবস্থা একেবারে পাকা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু যেন নরম হয়েছিল সে, একটু যেন সভ্য। অতসী যখন গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ওর জিনিসপত্র গোছায়, সীতুও গম্ভীর গম্ভীর মুখে কাছে

বসে থাকে।

বোর্ডিং সম্বন্ধে কি তার আতঙ্ক নেই? যত প্রবীণ পাকাই হোক, বয়সটা তো আট-নয়।

মার ওপর একটা আক্রোশ ভাব থাকলেও মাকে ছেড়ে যেতে কি তার মন কেমন করছে না? আর খুকু? খুকুকে আর দেখতে পাবেনা বলে মনের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় হচ্ছে না কি?

তাই বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ভাবে, কত ছেলের বাবা তো বিলেত যায়, বিদেশে চাকরী করতে যায়, অসুখ করে মারা যায়, সীতুর এই বাবাটা কেন ওসবের কিছু করে না?

'বাবা নয়' বলে ঘোষণা করলেও মনে মনে মৃগাঙ্কর ব্যাপারে কিছু ভাবতে গেলে, আর কি ভাবা সম্ভব বুঝে উঠতে পারে না সীতু। তাই মনে মনে বলে, 'এ বাড়ির বাবাটা যদি মরে যেত, কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, ঠিক হতো।'

তাহলে হয়তো সীতু মাকে আবার ভালবাসতে পারত।

সব প্রস্তুত, বিকেলে চলে যেতে হবে, গাড়ি করেই পৌঁছে দিয়ে আসবেন মৃগাঙ্ক। কতই বা দূর? কলকাতা থেকে মাত্র তো ষোলো মাইল।

মনোরম পরিবেশ, মনোহর ভবন। অতি আধুনিক উপকরণ. আর অতি পৌরাণিক আদর্শবাদ নিয়ে কাজে নেমেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেদিন কথাবার্তা কইতে এসে ভারি ভাল লেগেছিল মৃগাঙ্কর।

পৌঁছে দিয়ে আসবেন আনন্দের সঙ্গে।

আরও আনন্দের হয়, যদি ফিরে আসবার সময় নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভোগ না করতে হয়। কাছে এসে বললেন, 'অতসী তুমিও চল না?'

'আমি!' অবাক হয়ে যায় অতসী, 'আমি কোথা যাব?'

'কেন সীতুকে পৌঁছতে। ঠিক হয়ে থেকো তাহলে, চারটের সময় বেরোব।' মৃগাঙ্ক চলে গেলেন। চুকে যেত সব, যদি না চালে ভুল করে বসত অতসী।

মনের তার যখন টনটনে হয়ে বাঁধা থাকে, তখন এতটুকু আঘাতেই

ঝনঝনিয়ে ওঠে। এটুকু খেয়াল করা উচিত ছিল অতসীর, ঠিক এই মুহূর্তে কথা না কওয়াই বুদ্ধির কাজ হত। কিন্তু অতসী কথা কইল। বলে ফেলল, 'দেখলি তো খোকা কত ভাল লোক উনি? তোর জন্যে আমার মন কেমন করছে ভেবে বোর্ডিং পর্যন্ত পৌঁছাতে নিয়ে যেতে চাইছেন। এমন মানুষকে তুই বুঝতে পারলি না? একটু যদি তুই—' হয়তো ছেলের জন্যে মনের মধ্যেটায় হাহাকার হচ্ছে বলেই গলার স্বরটা অমন আবেগে থরথরিয়ে উঠল অতসীর, সেই থরথরে গলায় বলল, 'যদি তুই সভ্য হতিস, ভাল হতিস, এমন করে বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হতো না? সেখানে একা পড়ে থাকতে হবে তো? আর ওঁকেও মাসে মাসে তিনশো করে টাকা দিতে হবে।'

'তিনশো!'

অস্ফুট বিস্ময়ে উচ্চারণ করে ফেলে সীতু। এতটা ধারণা করেনি সে কোনদিন।

কিন্তু থাকত থাকত শিশুমনের বিস্ময়। নাইবা বুঝত সে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মহিমা, কি এসে যেত অতসীর? আবাব কেন কথা বলল সে? বোকার মত, ওজন না বোঝা কথা।

'তবে না তো কি? প্রত্যেক মাসে মাসে দিতে হবে। খুব তো বাজে বাজে লোকের কাছে যা তা কি একটা শুনে চেঁচাচ্ছিলি, 'ও আমার বাবা নয় কেউ নয়'—নিজের বাবা না হলে কে করে এত?'

মুহূর্তে কোথা থেকে কি হয়ে গেল, ছিটকে উঠল সীতু। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি চাইনা, চাইনা বোর্ডিঙে যেতে, দিতে হবেনা কাউকে টাকা। সবসময় মিথ্যে কথা বল তুমি। আমি জানি অন্য বাবা ছিল আমার, মরে গেছে সে। আবার বিয়ে করেছ তুমি ওকে।'

না এ কথার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না অতসীর, সীতু ঘর থেকে চলে গেছে।

কিন্তু থাকলেই কি উত্তর দিতে পারত অতসী? দেবার কিছু ছিল? শুধু বার বার ধিক্কার দিল নিজেকে।

কি জন্যে বলা শক্ত। হয়তো মাত্র একটাই কারণে নয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল।

মৃগাঙ্ক তাড়া দিয়েছেন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে।

কাঁটা হয়ে আছে অতসী, কি জানি শেষ মুহূর্তে কি না কি হয়। নিজে বলতে পারেনা, মাধবকে দিয়ে বলায় খোকাবাবুকে পোশাক টোশাক পরে নিতে। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনাখানিও বুঝি শুকিয়ে গেছে আতঙ্কের আশঙ্কায়। কিন্তু না, অতসীর আশঙ্কা অমূলক।

কোন গোলমাল করলো না সীতু, প্রস্তুত হয়ে নিল নির্দেশমত।

মায়ের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর পথে গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বেগে। অতসীর মনও ছুটছে সেই বেগের সঙ্গে তাল দিয়ে। অন্য পরিবেশে অন্য শিক্ষায় মানুষ হয়ে উঠবে সীতু—সভ্য হবে, মার্জিত হবে, বড় হবে। তখন হয়তো মায়ের প্রতি যা কিছু অবিচার করেছে, তার জন্য লজ্জিত হবে। হয়তো মায়ের প্রতি দয়া আসবে ওর, আসবে মমতা।

পৃথিবীর হালচাল আর দুঃখ দুর্দশা দেখে দেখে নিশ্চয়ই বুঝবে, মা তার কত হিতাকাঙ্ক্ষিণী, মা তার কত উপকার করেছে! তখন হয়তো যাকে আজ বাপ বলে স্বীকার করতে পারছে না, তাকেই শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে।

কিন্তু অতসী কি অতদিন বাঁচবে? সেই সুখের দৃশ্য দেখা পর্যন্ত?

'এসে গেলাম!' বললেন মৃগাঙ্ক।

সুন্দর কম্পাউণ্ড দেওয়া আবাসিক আশ্রমের গেটের সামনে গাড়ি থামল।

নতুন করে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে অতসীর। কত ভাল মৃগাঙ্ক, কত মহৎ! নইলে অতসীর ছেলের জন্যে, যে ছেলে মৃগাঙ্ককে বিষ নজরে দেখে, সেই ছেলের জন্যে, নির্বাচন করেছেন এমন সুন্দর সেবা স্থান!

অধ্যক্ষ এদের অভ্যর্থনা জানালেন। সবকিছু দেখে অতসী সন্তোষ প্রকাশ করেছে জেনে ধন্যবাদ জানালেন, কোন ঘরে সীতুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানালেন। তারপর অফিস ঘরে এসে মৃগাঙ্কর সঙ্গে

এটা ওটা লেখালিখি করিয়ে একখানা ছাপানো ফরম এগিয়ে দিলেন সীতুর দিকে, 'আচ্ছা এবার তুমি নিজে এই ফরমটা 'ফিল্‌আপ্‌' করত মাস্টার ? এইখানে তোমার নামটা লেখ ইংরেজিতে।'

কলমটা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখল সীতু নিজের নাম।

'বাঃ বেশ হাতের লেখাটি তো তোমার ?' অধ্যক্ষ ফরমের আর একটা জায়গায় আঙুল বসালেন, 'এবার এখানটায় বাবার নাম লেখ।'

বাবার।

সহসা পেনের মুখটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে সীতু পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, 'বাবার নাম জানি না।'

অধ্যক্ষ প্রথমটা একটু ধাক্কা খেলেন, তারপর কি বুঝে যেন মৃদু হেসে বললেন, 'ওঃ, আচ্ছা। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লেখ, 'এম আর আই—'

'ও বানান বললে কি হবে ? ওতো আমার কেউ নয়। আমার বাবা নেই। মরে গেছে।'

অতসী স্তব্ধ। মৃগাঙ্ক পাথর। 'আশ্চর্য।' ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন অধ্যক্ষ, 'তা'হলে ইনি তোমার কে হন ?'

'বললাম তো কেউ না।'

'সীতু !' অতসী চাপা আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে ? এ রকম করছ কেন ? বল সব ঠিক করে, নাম লেখ।'

'কতবার বলব, আমার বাবার নাম আমি জানি না।'

অধ্যক্ষ ভারি থমথমে মুখে বলেন, 'ডক্টর ব্যানার্জি—'

ডক্টর ব্যানার্জি তাকিয়ে আছেন বাইরের আকাশে দুর্নিরীক্ষ্য দৃষ্টি মেলে।

অতসী উত্তর দেয় ব্যাকুলভাবে, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। থেকে থেকে ওর এরকম একটা খেয়াল চাপে, তখন—'

'থাক্‌।' অধ্যক্ষ প্রায় ভীষণ গলায় বলে ওঠেন, 'বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু এ ধরনের খেয়ালী ছেলেকে আমার এখানে রাখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না—' —মৃগাঙ্ক নিঃশব্দ—কথা চালাচ্ছে অতসী, 'ব্যাপার হচ্ছে—'

'দেখুন আমি হয়তো বুঝি কম। সবরকম ব্যাপার বোঝবার মত হয়তো বুদ্ধি আমার নেই, কিন্তু বললাম তো আপনাকে, কোনরকম অ্যাব্‌নর্ম্যাল ছেলেকে আমরা রাখতে পারি না। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল করেছিল, চান্স দিয়েছিলাম। কিন্তু চোখে দেখে …না! মাপ করবেন আমাকে।'

তবু হাল ছাড়তে চায না অতসী, তবু ধরে রাখতে চায়, তাই বলে, 'সাতু, এ কী দুষ্টুমি করলে তুমি? দেখতো ইনি কত বিরক্ত হচ্ছেন। কেন ঠিক ঠিক উত্তর দিলে না?'

'ঠিকই তো দিয়েছি।' বুক টান টান করে বলে সাতু।

অধ্যক্ষ মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'এঁরা তা'হলে তোমার কে হন খোকা?'

'ইনি আমার মা, আর উনি কেউ না।'

মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছে অতসী। সাতুকে শাসন করবে, এ শক্তিও আর তার কোথাও অবশিষ্ট নেই। একটা কাতর আর্তনাদে যন্ত্রণা প্রকাশেরও শক্তি নেই বুঝি।

নিঃশব্দে আবার সেই শহরতলির পথে ফিরে আসছে তিনজনে। পাথরের মূর্তির মত।

শুধু অতসীই বুঝি দূর আকাশের গায়ে দেখতে পেয়েছে আপন অদৃষ্টলিপি। যে আকাশ গোধূলিবেলার সব রং সমস্ত ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে সন্ধ্যার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

অতসীর ভাগ্যলিপি লেখবার সময় সেই অদৃশ্য লিপিকারের প্রাণটা কি লোহা দিয়ে বাঁধানো ছিল? আর সাতুর ভাগ্যলিপি লিখতে? শুধু হতভাগ্য নয়, শুধু দুঃখী নয়, শুধু নির্বোধ নয়—তার জন্মলগ্নস্থিত গ্রহ তাকে 'মাতৃহন্তা' হতে বলেছে!

অতসী কি শুধু ভালবাসার জন্যেই অকাল বৈধব্যকে অস্বীকার করে নতুন জীবনের আলো দেখতে চেয়েছিল? চায়নি সাতুর জন্যেও অনেকখানি?

খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে, অস্থিচর্মসার হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলবার বাসনাটাও কি অনেকখানি সাহস জাগায়নি অতসীকে লোকলজ্জা ভুলতে? কিন্তু আজ?

হ্যাঁ, মনের অগোচর চিন্তা নেই। আজ মনে হচ্ছে—অত দুর্দশার মধ্যেও সেই অস্থিচর্মসার দেহটুকুন টিঁকে থেকেছিল কি করে?

না টিঁকলেও তো পারত।

সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

এ কি শুধু অতসীর সমস্ত জীবনটা দুঃসহ করে দেবার ষড়যন্ত্রে বিধাতার নিষ্ঠুর কৌশল নয়?

ফেরার পথে গাড়িতে এক অখণ্ড স্তব্ধতা! মৃগাঙ্কের হাতে স্টিয়ারিং, কিন্তু সে যেন একটা কলের মানুষ। যে মানুষ অন্য কিছু জানে না, জানে শুধু ওই চাকাখানা ধরে গাড়িখানা এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওর রক্ত নেই মাংস নেই। মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, ভাব, কোন কিছুই নেই।

অতসী জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার গালের উপর একটা অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা। সেটা বাইরের বাতাসে এক একবার শুকিয়ে উঠছে, আবার চোখ উপচে ঝরঝর করে নেমে আসছে নতুন জলের ধারা।

অতসী কখনো কাঁদে না। সেই অকথ্য অত্যাচারী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সুরেশ রায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও কাঁদেনি কখনো। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে, মৌন হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

ইদানীং সাতুকে নিয়ে নিরুপায়তার এক দুঃসহ জ্বালায় মাঝে মাঝে মাথার রক্ত চোখ দিয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু হয়তো সেই শুধু এক ঝলক! তপ্ত ফুটন্ত এক ঝলক জল গালে পড়ে, গালের চামড়া পুড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তে শুকিয়ে গেছে।

এমন অবিরল অশ্রুধারায় নিজেকে কখনো এমন উজাড় করে দেয়

নি। নিঃশেষ করে দেয় নি। আজ বুঝি সংকল্প করেছে অতসী, যা তার প্রাপ্য নয়, তার জন্যে আর প্রত্যাশার পাত্র ধরে থাকবে না।

ভাগ্য তার জন্যে এককণাও বরাদ্দ করেনি। তার ললাটলিপি লেখা হয়েছে চিতাভস্মের কালি দিয়ে। অতসী বৃথাই সেখানে আশা রেখেছে, বৃথাই ভাগ্যের দরবারে আঁচল পেতে বসে থেকেছে এতদিন। আর থাকবে না।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পরিচিত পথে এসে পড়েছে। এইবার বাড়ির কাছে বাঁক নেবে। হঠাৎ অতসী গাড়ির মধ্যে স্তব্ধতা ভেঙে বলে ওঠে, 'আমাদের একটু আগে নামিয়ে দেবে।'

একটু আগে নামিয়ে দেবে। এ আবার কেমনধারা কথা।

কলের মানুষটা চমকে উঠে ঘাড় ফেরায়। ঘাড় ফেরায় জানলায় মুখ দিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটাও। সীতুও সেই থেকে বাইরে চোখ ফেলে বসে আছে।

তারও এবড়োখেবড়ো দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়টা ভয়ঙ্কর উত্তাল এক অনুভূতিতে তোলপাড় করছে। কী হয়ে গেল? এটা সে কী করে বসল!

কাল থেকেই এই সংকল্প করে রেখেছে বটে সে, কিন্তু তার পরিণামটা তো পরিষ্কার করে ভাবেনি। ওদের সামনে, অন্যলোকের সামনে, মৃগাঙ্ক যে সীতুর কেউ নয় এই সত্যটা উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে মৃগাঙ্ককে একেবারে অপদস্থর শেষ করে দেবে সীতু, এইটুকু পর্যন্ত ভাবা ছিল। কিন্তু সেই সংকল্প সাধনের মাশুল দিতে যে অনেক দিনের আশা আর আশ্বাসের বোর্ডিং বাসটা হারাতে হবে এটা কি করে ভাববে সে? যতই দুর্মতি হোক তবু শিশু তো।

সীতু ভেবেছিল, ওই ভাবে বাবাকে অপদস্থ করে সে স্কুলের কর্তাকে বলবে, 'যেহেতু ওই ডাক্তারটা তার বাবা নয়, সেই হেতু সীতেশ তার দেওয়া টাকা নেবে না। ইস্কুল কর্তারা যেন সীতুকে অমনি অমনি না পয়সা নিয়েই এখানে রাখেন। সীতু বড় হলে টাকা রোজগার করে সব শোধ করে দেবে।

কিন্তু সে সব কথা বলবার তো সুবিধেই হ'ল না। আর সত্যি বলতে সাহসও হল না। বোর্ডিঙের কর্তা যেন মৃগাঙ্কর চাইতেও ভয়ঙ্কর! মুখের দিকে তাকানই যায় না।

বাবা গাড়িতে উঠতে বললে, 'কিছুতেই তোমার সঙ্গে যাব না, এখানেই থাকব' বলে মাটিতে শুয়ে পড়বার সংকল্পটাও কাজে পরিণত করা গেল না। আস্তে আস্তে গাড়ীতেই উঠে বসতে হল।

গাড়ি চলছে। চলছে সীতুর চিন্তার স্রোত।

আচ্ছা, সীতু যদি এই খুকুর বাবাটাকে অপদস্থ করতে না চাইত, যদি বাপের নাম লিখতে বললে ওঁর নামই লিখত! তাহলে তো আর চলে আসতে হত না।

মৃগাঙ্কর বাড়ি ছেড়ে, অন্য একটা জায়গায়, সুন্দর একটা জায়গায় থাকতে পেত সীতু। কিন্তু? ওই কর্তাটা? ওটা যে বাড়ির বাবাটার চাইতেও বিচ্ছিরি। তাছাড়া সেই অতসীর সেদিনের কথা!

মাসে মাসে তিনশো টাকা করে পাঠাতে হবে মৃগাঙ্ককে। কেন নেবে সীতু সে টাকা? সীতুর জন্যে অত কিছু চাই না।

এই যে বাড়িতে? বেশি কিছু খায় সীতু? মোটেই না। সীতুর জন্যে যাতে মোটেই বেশি খরচা না হয় তা দেখে সীতু। অথচ বোর্ডিঙে থাকলে মা সব সময় ভাববে, ওই বাবাটা সীতুকে কিনে রেখেছে।

কিন্তু আবার সেই বাড়ি! সেই বামুনদি, নেপ বাহাদুর, কানাই, মোক্ষদা! সীতু যদি গাড়ির দরজাটা খুলে নেমে পড়ে? অনেকে তো নাকি চলন্ত গাড়ি থেকে নামে। কিন্তু গাড়ি চলতেই থাকে। পেরে ওঠা যায় না।

ঠিক এই সময় হঠাৎ অতসীর গলা কানে এল। অতসী বলছে, 'আমাদের আগে নামিয়ে দেবে।'

ঠিক অনুরোধ নয়, যেন একটা ঠিক করে রাখা ব্যবস্থা, শুধু মনে করিয়ে দেওয়া। আমাদের মানে কি? কাদের?

মার কথাটা অনুধাবন করতে পারে না সীতু। কিন্তু কথাটা যেন

ভয়ঙ্কর একটা আশাপ্রদ। একথা যেন বলছে সীতুকে—আর সেই বামুনদি কানাই নেপবাহাদুরের বাড়িতে ঢুকতে হবে না।

মৃগাঙ্ক কি বলেন শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসে থাকে সীতু। শুনতে পায়—শান্ত মার্জিত মৃদুগলায় মৃগাঙ্ক বলছেন, 'তোমাদের আগে নামিয়ে দেব। কোথায় নামিয়ে দেব?'

'যেখানে হোক।' বলছে অতসী, 'দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে।'

একি! মৃগাঙ্ক হেসে উঠলেন যে! কি বলছেন?

'অত ভাল ভাল জিনিসগুলো এখন চট্ করে কোথায় পাই বলতো?'

কানকে আরও তীক্ষ্ণ করতে হচ্ছে সীতুকে, কারণ এ রাস্তাটা শহর ছাড়ানো ফাঁকা রাস্তা নয়। শব্দ হচ্ছে আশেপাশে। আর অতসীর কণ্ঠ মৃদু।

'উড়িয়ে দিলে চলবে না।' মৃদু তবু দৃঢ় কণ্ঠে বললে অতসী, 'সীতুকে নিয়ে আর আমি ও বাড়িতে ঢুকবো না।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'ছেলেমানুষী করে লাভ কি অতসী?'

'না, না ছেলেমানুষী নয়', অতসীর মৃদুকণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'এ আমার স্থির সংকল্প। তুমি এখন আমাদের এখানে এই শ্যামলীর বাড়িতে নামিয়ে দাও,তারপর যত শিগগির সম্ভব ছোট একখানা ঘর, যেমন ঘরে আমার থাকা উচিত ছিল, সাতুর থাকা উচিত ছিল, তেমনি একখানা দৈন্যের ঘর জোগাড় করে নেব আমি।'

তবুও মৃগাঙ্কর কণ্ঠে কি বিদ্রূপ? সেই বিদ্রূপের কণ্ঠই উচ্চারণ করছে, 'তারপর?'

'তুমি ব্যঙ্গ কর, উড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর, কিন্তু পারবে না। আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে নিয়েছি। তারপর—বাঙলা দেশের অসংখ্য নিঃসম্বল মেয়ে যেমন করে নাবালক ছেলে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে, তেমনই করতে চেষ্টা করব।'

মৃগাঙ্কর গাড়ির গতি মন্দীভূত হয়েছে, তবু মৃগাঙ্ক পিঠ ফিরিয়েই

কথা বলছেন—'ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে না অতসী, যুদ্ধ করে হারে, যুদ্ধ করে মরে।'

'সেইটাই আমার অদৃষ্টলিপি মনে করব।' মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর, মৃত্যুর মত অমোঘ ভঙ্গিতে বলে অতসী, 'মনে করব তাদেরই একজন আমি। আমার জীবনে কোনদিন দেবতার দর্শন হয় নি, কোনদিন স্বর্গ থেকে আলোর আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়েনি। আমি কুষ্ঠব্যাধিতে গলে পচে মরে যাওয়া সুরেশ রায়ের নাবালক পুত্রের রক্ষয়িত্রী মাত্র।...এই যে এসে পড়েছে শ্যামলীর বাড়ি। নামতে দাও আমাদের।'

মৃগাঙ্ক স্থিরভাবে বলেন, 'কি বলবে ওদের ?'

'যা সত্যি তাই বলব! আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ছলনা দিয়ে খেলার স্বর্গ গড়ব না। গাড়ি থামাও।'

মৃগাঙ্ক গাড়ি থামালেন।

বললেন, 'তোমার হিসেবের খাতা থেকে একটা ছোট্ট হিসেব বোধহয় খসে পড়েছে অতসী! এ পৃথিবীতে খুকু বলে একটা জীব আছে সেটা বোধহয় ভুলে গেছ!'

'না ভুলিনি।' অতসী গাড়ির জানলার ধারে মাথা রাখে, 'কত শিশুই তো শৈশবে মাতৃহীন হয়, খুকুর জীবনেও তাই ঘটেছে এটাই ধরে নিতে হবে।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'অর্থাৎ তা'কেও ফেলে দিতে হবে দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে! কিন্তু একা আমার অপরাধে এত জনে মিলে কষ্ট পেয়ে লাভ কি? এ মঞ্চ থেকে যদি মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অন্তর্ধান ঘটে, তাহলেই তো সব সোজা হয়ে যায়। সুরেশ রায়ের বিধবা স্ত্রীর পরিচয় বহন না করে, না হয় সেই হতভাগ্যের স্ত্রীর পরিচয়েই তার নাবালক সন্তানদের রক্ষয়িত্রী হয়ে থাকলে। অন্ততঃ দুটো শিশু হত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।'

অতসী ততক্ষণে নেমে পড়েছে। আঁচলটা মাথায় টেনে নিয়ে বলে, 'সে পাপ থেকে রক্ষা পাবার ভাগ্য নিয়ে সবাই পৃথিবীতে আসে না। খুকুর কোন অভাব হবে না। খুকুর তুমি আছ।'

মৃগাঙ্কও গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তাতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে অতসীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'তুমি পারবে ?'

'মানুষ কি না পারে ? মেয়েমানুষ আরো বেশিই পারে।'

'আমার থেকে, খুকুর থেকে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে চাও তা'হলে ?'

অতসী হতাশ গলায় বলে, 'এখন আমি হয়তো সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। তবু এইটুকুই বলছি, সীতুকে সীতুর যথার্থ অবস্থার মধ্যে রাখতে চাই। অহবহ আর বৃথা চেষ্টা, আর ব্যর্থ আশার বোঝা বইতে পারছি না আমি।···সীতু নেমে এস।'

'কোথায় যাব ?' ক্ষীণস্বরে বলে সীতু।

'সে প্রশ্ন করবার দরকার তোমার নেই সীতু, অধিকারও নেই। ও বাড়িতে ফিরে যাওয়া আর হবে না, এইটুকুই শুধু জেনে রাখ।' বলে মৃগাঙ্কর দিকে পূর্ণ গভীর একটি দৃষ্টি ফেলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্যামলীর বাড়ির দিকে এগোয়। সীতুর হাতটা চেপে ধরে।

মৃগাঙ্ক ধীর স্বরে বলেন, 'সীতুর জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে থেকে যাচ্ছে।'

'ও জিনিস সীতুর জন্যে না।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'আজ তোমার মনের অবস্থা চঞ্চল, তাই এমন সব অদ্ভুত কথা বলতে পারছ। বেশ, আজ রাতটা থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো এখানে, খুকুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতে তোমার কাছছাড়া হয়ে সে কখনো থাকতে পারে ?'

অতসী বোঝে, মৃগাঙ্ক আবার সমস্তটাই সহজ করে নিতে চাইছেন লঘু করে নিতে চাইছেন। তাই দৃঢ় স্বরে বলে, 'খুকুর মা এইমাত্র মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।'

তবু মৃগাঙ্ক বলেন, 'অতসী তোমার সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে, একমাত্র অপরাধী হয়তো আমিই। তাই যদি হয়, আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি।'

অতসী বলে,'ও কথা বলে আর আমায় অপরাধী কোরনা। শাস্তি

যার পাবার, তাকেই পেতে হবে। আর আজ থেকেই তার শুরু। সাতু চল।'

বড় রাস্তা থেকে হাত কয়েক ভিতরে শ্যামলীর বাড়ি। অতসী তার মধ্যে ঢুকে সাতুকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে থাকেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর গাড়িতে ওঠেন।

চিরকালের মত একটা কিছু ঘটে গেল এটা কিছুতেই ভাবা সম্ভব নয়। শুধু ভাবতে থাকেন, খুকুটাকে নিয়ে কি করবেন আজ রাত্রে।

অতসীর ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছিল চিতাভস্মের কালি দিয়ে। এই ভয়ঙ্কর সত্যটা টের পেয়ে গেছে অতসী। টের পেয়ে গেছে বলেই নিজের জীবনের চিতা রচনা করল সে নিজেই। 'জীবন'কে বিদায় দিল জীবন থেকে। জোর করে চলে এল ভালবাসার সংসার থেকে। যে সংসারে আরাম ছিল আশ্রয় ছিল, সমাজের পরিচয় ছিল, আর ছিল একান্ত ব্যাকুলতার আহ্বান।

সে সংসারকে ত্যাগ করে চলে এসেছে অতসী, সে ডাককে অবহেলা করেছে ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ নিতে। ভাগ্য যদি তাকে সব দিয়েও সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে কৌতুক করতে চায়, নেবে না অতসী সেই কৌতুকের দান।

তুমি কাড়ছ?

তার আগেই আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি। কি নিয়ে আত্মপ্রসাদ করবে তুমি কর।

কিন্তু অতসীর সব আক্রোশ কি শুধু ভাগ্যেরই উপর? তার প্রতিশোধের লক্ষ্য কি আর কেউ নয়? নয়, আট বছরের একটা নির্বোধ বালক! তার উপরও কি একটা হিংস্র প্রতিশোধ উদগ্র হয়ে ওঠেনি অতসীর? হ্যাঁ। সাতুর উপরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল অতসী।

তাই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে।

বুঝুক হতভাগা ছেলে পৃথিবী কাকে বলে, দারিদ্র্য কাকে বলে,

অভাবের যন্ত্রণা কাকে বলে। সুরেশ রায়ের পরিচয় নিয়ে এই উদাসীন নির্মম পৃথিবীতে কতদিন টিঁকে থাকতে পারবে সে দেখুক। সে দেখা তো শুধু চোখের দেখা নয়। প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে দেখা।

অতসী সেই দিনই মরতে পারত। কিন্তু মরেনি। মরেনি সীতুর জন্যে। না সীতুর মায়ায় নয়। সীতুকে রক্ষা করবার জন্যেও নয়, মরেনি সীতুর পরাজয় চোখ মেলে দেখবার জন্যে।

তিলে তিলে অনুভব করুক সীতু মৃগাঙ্ক তাকে কী দিয়েছিল, অনুভব করুক মৃগাঙ্ক তার কী ছিল!

সেই রাত্রে অদ্ভুত জিদ করে মৃগাঙ্কর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল অতসী ছেলেকে নিয়ে। সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ির দরজায়।

কী যেন ভেবে মৃগাঙ্ক আর বেশি বাধা দেননি। অথবা ক্লান্ত পীড়িত বিপর্যস্ত মন তাঁর বাধা দেবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতেও পারেনি। হয়তো ভেবেছিলেন 'থাকগে খানিকক্ষণ! হয়তো ছেলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়। এই জায়গাটাই যদি অতসী বেশ প্রশস্ত মনে করে করুক।'

তারপর ঘণ্টা দুই পরে একবার গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'মাইজীকে' নিয়ে আসতে। সে গাড়ি ফিরে গিয়েছিল শূন্যহৃদয় নিয়ে।

'মাইজী আসলেন না।'

মৃগাঙ্ক একটা ভ্রূকুটি করে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। কাল সবেরমে ফিন্ যানে পড়ে গা। সাত বাজে।'

কিন্তু সকালের গাড়িও ফিরে এল সেই একই বার্তা নিয়ে।

'মাইজী আয়া নেই! ওহি কোঠিমে—'

মৃগাঙ্ক হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর মৃগাঙ্ক ডাক্তার, নিজেই গিয়েছিলেন সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ি। বসেছিলেন তার বসবার ঘরে। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন 'পাগলামী করো না অতসী, চল।'

অতসীর চোখের জল বুঝি কালকেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই

অত শুকনো গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'পাগলামী নয়, এটা আমার সিদ্ধান্ত।'

'বৃথা অভিমান করে লাভ কি অতসী? আর কার উপরই বা করছ? আমরা সকলেই ভাগ্যের হাতের খেলনা।'

'অভিমান নয়। কারও ওপর আমার অভিমান নেই, শুধু যে ভাগ্য আমাদের খেলনার মত খেলতে চায়, তার হাত থেকে ছিটকে সরে যেতে চাই। দেখতে চাই সর্বনাশের রূপ কী?'

'সে রূপ তো তোমার একেবারে অজানা নেই অতসী!'

ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

অতসী বলেছিল, 'ভুল করছ। সুরেশ রায়ের সংসারে আমার শুধু অসুবিধে ছিল, যন্ত্রণা ছিল, জ্বালা ছিল আর কিছু ছিল না। তাই সুরেশ রায়ের রোগ আর মৃত্যু আমাকে সর্বনাশের চেহারা দেখাতে পারে নি। যা দেখিয়েছিল সে হচ্ছে চিন্তার বিভীষিকা। আর কিছু না। যেখানে কিছু নেই সেখানে সর্বনাশের প্রশ্ন নেই।'

পরের বাড়িতে আড়ষ্ট পরিবেশের মধ্যে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক। বুঝি অতসী স্থির সংকল্পের দৃষ্টির মধ্যে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাই বলে উঠেছিলেন, 'ইচ্ছে করে সবাই মিলে শাস্তি ভোগ করবার এমন ভয়ঙ্কর সাধ তোমায় পেয়ে বসল কেন অতসী? সীতু কি তোমার রাগের যোগ্য?'

'রাগের কথা নয়।'

'বল তবে কিসের কথা?'

'সে তোমায় বোঝাতে পারব না।'

'বোঝাবার যে কিছু নেই অতসী, কী করে বোঝাবে? হঠাৎ একটা আঘাতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হয়ে গেছে, তাই এমন একটা আজগুবি কল্পনা পেয়ে বসেছে। চল বাড়ি চল। সেখানে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেব।'

'অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা আছে মাথা। এই ঠাণ্ডা মাথাতেই ভেবে দেখেছি তোমার ঘরে ফিরে যাবার উপায় আমার আর নেই। সীতুর

যা সত্যকার ভাগ্য, যে ভাগ্যকেই ও অহরহ চাইছে, সেই ভাগ্যের মধ্যেই সীতুকে নিয়েই বাস করতে হবে আমাকে।'

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি অতসী, সীতুর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি শিগগিরই করে দেব। এখন বুঝতে পারছি ভুলই করেছিলাম। অন্য কোথাও দূর বিদেশে কোন বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেব ওকে, ওর যথার্থ পরিচয় দিয়ে, পিতৃহীন সাতেশ রায় নাম দিয়ে। হয়তো তাতেই ও শান্তি পাবে।'

'না।'

'না?'

'না। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হয়ে উঠতে দেব না আমি।'

'আমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হতে দেবে না? অতসী, আমাকে বুঝিয়ে দেবে কি, এ তোমার অহঙ্কার না অভিমান?'

'বলেছি তো অহঙ্কারও নয় অভিমানও নয়। এ শুধু বিচার বিবেচনার সিদ্ধান্ত। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ আমি দেব না সীতুকে। দুধ কলা আর কাল সাপের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তোমায় সাপের বংশধর, এবার মুক্তি দাও আমায়। সেই একই দৃশ্য আর দেখবার শক্তি আমার নেই।'

'বেশ, আমি ওকে কোন দুঃস্থ ছেলেদের সংস্থায় ভর্তি করে দেব, যেখানে পয়সা লাগে না, ফ্রী সীট।'

অতসী অপলকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'অনাথ আশ্রম?'

এবার মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভয়ঙ্কর একটা চাপা গলায় বলে উঠেছিলেন তিনি, 'যদি তাই-ই হয়। আমার কোন সাহায্যেই যদি নিতে না দাও তোমার ছেলেকে, অনাথ আশ্রম ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় জুটবে ওর?'

'সে আশ্রয় তো জুটিয়ে দিতে হয় না। অবস্থাই ওকে সে জায়গা জুটিয়ে দিতে পারবে।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ফেলেছিলেন, 'কুটিল বুদ্ধির মারপ্যাঁচ শুধু তোমার ছেলের মধ্যেই নেই অতসী, তোমাতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। সহজ কথা, যুক্তির কথা, বুদ্ধির কথা কিছুতেই বুঝবে না, এই যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ। যা বলছ তা যে কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা যেন চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাও। মায়ে ছেলেতে মিলে সব রকমে কেবল আমার মুখ হাসাবে, এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞাই বা কেন তোমাদের? বুঝতে পারছ না কতটা মাথা হেঁট করে এ বাড়িতে আসতে হয়েছে আমাকে! কতটা—'

অতসী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি বলেই তো এইখানেই তার শেষ করে দিতে চাইছি। চাইছি মাথা হেঁটের পুনরাবৃত্তি আর যাতে না হয়।'

'চমৎকার! তুমি এইখানে পরের বাড়িতে বাস করবে এতে আমার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। শুনে অতসী হেসেছিল।

হ্যাঁ, হেসেই বলেছিল অতসী, 'তাই কখনো ভাবতে পারি আমি? না তাই থাকতে পারি? থাকব এখানে না, হয়তো এদেশেও নয়। তোমার চোখ থেকে, তোমার জীবন থেকে নিজেকে একেবারে মুছে নিয়ে সরে যাব।'

লোহাও গলে বৈকি! তেমন তাপে গলে।

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়ে।

'আমার জীবন থেকে নিজেকে মুছে নিয়ে সরে যাবে, এ কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে অতসী?'

'পারলাম তো!'

'হ্যাঁ পারলে তো! তাই দেখছি। আর কত সহজেই পারলে। কিন্তু অতসী, শুধু আমার চোখ থেকেই নিজেকে নয়, নিজের মন থেকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে চাইছ যে, তুমি কেবলমাত্র মৃত সুরেশ রায়ের ছেলের মা নও, খুকুরও মা!'

'তার উত্তর তো কালই দিয়েছি। লোকের তো মা মরে। খুকুর

মত অনেক বাচ্চারও মা থাকে না। খুকুরও মা থাকবে না। ধরে নাও খুকুর মা মরে গেছে।'

'চমৎকার! চমৎকার তোমার প্রব্‌লেম্‌ সল্‌ভ্‌ করার ক্ষমতা। কিন্তু তবুও প্রশ্নের জের থেকে যায় অতসী,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে বলেন, 'শেষ হয় না। ভুলে যেও না তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। সুরেশ রায়ের বিধবাকে প্রলোভিত করে এমনি নিয়ে এসে আটকে রাখিনি আমি। আইনতঃ তোমার ওপর আমার জোর আছে। যা খুশি করবার স্বাধীনতা তোমার নেই।'

অতসী আবার হেসে বলে, 'জোর খাটাবে?'

'যদি খাটাই?'

'তবে তাই দেখ।'

'অতসী, এত নিষ্ঠুর তুমি হলে কি করে? তোমার ওই নিষ্ঠুর নির্দয় ছেলেটা কি তোমায় এমনি করেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এখন কী মনে হচ্ছে জানো অতসী, সুরেশ রায়ের সেই রোগা পাকাটির মত ছেলেটাকে আমি বাঁচতে দিয়েছিলাম কেন? কেন কৌশলে শয়তানের জড়কে শেষ করে দিইনি।'

না অতসী রেগে যায়নি, কেঁদেও ফেলেনি, বরং হাসির মত মুখ করেই বলেছিল, 'এর চাইতে আরও অনেক বেশি কঠিন কথা বললেও আমি তোমায় দোষ দেব না।'

'অতসী, তোমায় হাতজোড় করে বলছি, পাগলামী ছাড়ো। রাগের মাথায় যা মুখে আসছে বলছি, ক্ষমা করতে পার কোরো। না পারলে কোরনা। দোহাই তোমার, এখন অন্ততঃ বাড়ি চলো। তারপর—'

'ও কথা তো আগেও বলেছ। কিন্তু আমায় মাপ করো।'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'না। কিছুতেই আমি তোমাকে মাপ করবো না। কিছুতেই তোমার পাগলামীর তালে চলব না। জোরই খাটাবো। পুলিশের সাহায্যে নিয়ে যাব তোমাকে। এদের নামে চার্জ আনব, আমার স্ত্রী পুত্রকে

দুরভিসন্ধির বশে আটকে রেখেছে।'

অতসী তবুও হেসেছিল।

বলেছিল, 'তা তুমি পারবেনা আমি জানি।'

'জানো? জানো বলে অত সাহস তোমার? তুমি আমার কতটুকু জানো অতসী? ক'দিন তুমি দেখেছ আমায়?'

'তবে ডাকো পুলিশ।' বলে স্থির হয়ে বসে থেকেছিল অতসী।

তারপরেও অনেক কথা বলেছিলেন মৃগাঙ্ক, অনেক সাধ্যসাধনা করেছিলেন। এমন কি এও বলেছিলেন, অতসী যদি মৃগাঙ্কর সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায়, তো সে ব্যবস্থাও করে দেবেন মৃগাঙ্ক। চেম্বারে থাকবেন তিনি, নয়তো অন্যত্র কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নেবেন। অথবা অতসীকেই দেবেন আলাদা ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ। তবু আজ এদের বাড়ি থেকে চলুক অতসী। সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে একান্ত আত্মীয় বলে আঁকড়ে ধরে থেকে এমন করে মৃগাঙ্কর গালে কালি না মাখায় যেন।

কিন্তু অতসী টলেনি। শুধু কথা দিয়েছিল এবাড়িতে ও আর বেশিক্ষণ থাকবেনা। ঘণ্টা কয়েক পরেই চলে যাবে।

'কোথায় যাবে? ছেলেকে গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুবতে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। অসহিষ্ণু হয়ে অস্থির হয়ে বলেছিলেন।

অতসী এত জোর সঞ্চয় করল কখন? কোথায় পেল এত সাহস, এত মনোবল? কী করে থাকল এর পরেও অটল থাকতে?

'তা' আত্মহত্যাও তো করে মানুষ। ধরে নাও এও তাই।'

'সীতুকে একবার ডেকে দেবে আমার কাছে? আমার ভাগ্য দেবতার সেই নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে, আমার জীবনের সেই শনির কাছে একবার হাতজোড় করি আমি!'

'ছিঃ একথা ভেবোনা। তুমি কি ভাবছ শুধু সীতুর জন্যেই আমার এই সংকল্প? তা ভাবলে ভুল হবে। এ আমার নিজের জন্যেও। দেখছি ভাগ্যের কাছে আমার যা প্রাপ্য পাওনা নয়, তাই জোর করে পেতে গিয়েই ভাগ্যের সঙ্গে এত সংঘর্ষ। আমি তো তোমার জীবনে

বেশিদিন আসিনি, মনে করো সেই আগের জীবনেই আছো তুমি। আমি কোন দিনই—'

'খুকুটাকে গোড়া থেকেই হিসেবের বাইরে রাখছ এইটাই এক অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে অতসী! আশ্চর্য! তোমার মাতৃস্নেহধারা কি শুধু শুধু ওই একটা জায়গায় এসেই জমাট হয়েথেমে গেছে আর এগোতে পারেনি? খুকু কি তোমার সন্তান নয়? নাকি ওকে তুমি মনের মধ্যে বৈধ সন্তান বলে গ্রহণ করতে পারনি? অবৈধের পর্যায়ে রেখে দিয়েছ?'

অতসী কি সত্যিই ওর চোখ দুটোকে আর মনটাকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছিল, তাই এ কথার পরও একেবারে শুকনো খটখটে চোখে তাকিয়ে বলতে পেরেছিল, 'বলেছি তো যত কঠিন কথাই তুমি বল, দোষ তোমার দেব না আমি।'

তারপর?

তারপর চলে এসেছে অতসী এইখানে।

শিবপুর লেনের একটা জরাজীর্ণ পচাবাড়ির একতলার একখানা ঘর। শ্যামলীর বর অনুরোধে পড়ে বাধ্য হয়ে এ জায়গা খুঁজে জোগাড় করে দিয়েছে।

সেদিন শ্যামলী অবাক বিস্ময়ে কথা খুঁজে পায়নি। বোবার মত তাকিয়ে ছিল ফ্যালফ্যাল করে। অতসীই আশ্বাস দিয়ে ওর সাড় এনেছিল। বলেছিল, 'জীবনের রহস্য অপার শ্যামলী! সে কারো কাছে আসে বন্ধুর বেশে, কারো কাছে আসে রুদ্রের বেশে! তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, পাথরে নিষ্ফল মাথা কোটার সামিল। জীবনের পঙ্কিল রূপ দেখেছি, সুন্দর রূপও দেখেছি, এবার দেখব ভয়াবহ রুদ্রের মূর্তিটা কেমন।'

'তার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই কাকীমা! হাজার হাজার মানুষ আমাদেরই আশেপাশে সেই রুদ্রের অভিশাপ মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। রোগে ওষুধ নেই, পেটে ভাত নেই—'

'একটু ভুল করছিস শ্যামলী। ওটা তো হচ্ছে কেবলমাত্র অভাবের চেহারা, দারিদ্র্যের চেহারা। আমার সমস্যা আলাদা। আমার জন্যে খোলা পড়ে আছে আশ্রয় আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু ভাগ্য আমাকে তা নিতে দেবে না—'

হঠাৎ রেগে উঠেছিল শ্যামলী। বলে উঠেছিল, 'ভাগ্য না হাতি। নিজের জেদেই আপনি—'রাগ রাখতে পারেনি, কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'নইলে আট ন'বছরের একটা ছেলের দুষ্টুমীকে এত বড় করে দেখার কোন মানেই হয় না। ডাক্তার কাকাবাবুর মত মানুষকে আপনি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এ আমি ভাবতেই পারছি না—'

'ছিঃ শ্যামলী ভুল করিস না!'

'ও আপনার ভুল-ঠিক বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই কাকীমা। কিছু নয়, এ আমারই ভাগ্য। হঠাৎ কাছাকাছির মধ্যে আপনাকে পেয়ে গিয়ে বর্তে গিয়েছিলাম কি না, সেটা ভাগ্যে সইল না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতুর আচরণে শ্যামলীকেও হার মানতে হয়েছিল। বোর্ডিং থেকে ফিরে সেই যে সীতু শ্যামলীদের একটা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল, পুরো দু'দিন তাকে সেখান থেকে মুখ তোলানো যায়নি। অস্নাত, অভুক্ত, এমন কি জল পর্যন্ত না খেয়ে পড়ে থাকা কাঠের মত শক্ত ছেলেটাকে বারবার খোসামোদ করে ওঠানোর চেষ্টায় হার মেনে হতাশ শ্যামলী বলেছিল, 'এ তো দেখছি বদ্ধ পাগল। একে স্কুল বোর্ডিঙে ভর্তি করবার চেষ্টা না করে পাগলা গারদে ভর্তি করে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।'

অতসী বলেছিল, 'এ রকম পাগল ওর বাপ ছিল, ঠাকুর্দা ছিলেন, তারা তো জীবনের শেষ অবধি গারদের বাইরেই রয়ে গেলেন শ্যামলী! কেউ বলেনি ওদের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দাও।'

'বলেনি, তাই আজ এই অবস্থা। শেষ অবধি হয়তো আপনাকেই যেতে হবে।'

'তা যদি হয় শ্যামলী, সমস্ত কর্তব্যের বোঝা, সমস্ত বিচার বিবেচনার বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে হালকা হয়ে বেঁচে যাই। কিন্তু

তা' হবে না। তোর কাকীমার স্নায়ু বড় বেশি জোরালো শ্যামলী!'

'তাই অমন ছেলে জন্মেছে' বলে আর একদফা কেঁদে ফেলেছিল শ্যামলী।

বোঝা যায়নি সীতু এসব কথা শুনতে পাচ্ছে কি না। মনে হচ্ছিল একটা পাথরের পুতুল শুয়ে আছে। দেড়দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় যখন শ্যামলীর বর শিবপুরের এই ঘরখানা জোগাড় করে সে খবর নিয়ে এসে দাঁড়াল, আর অতসী বলল, 'ওঠ সীতু, আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে,' তখন দেখা গেল সীতু বলে এই ছেলেটার শ্রবণেন্দ্রিয় অবিকল বজায় আছে। ভাবলেশশূন্য মুখে উঠে মায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল।

শিবপুর লেনের এই ঘরখানাতেও মায়ে-ছেলের কাছাকাছি থাকা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আটফুট বাই দশ ফুট এই ভাঙা ঘরখানার মধ্যেই অতসীর এই নতুন জীবনের সমগ্র সংসার। এর মধ্যেই তার খাওয়া শোওয়া থাকার সরঞ্জাম।

হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক ডাক্তারের কিছু সাহায্য অতসীকে নিতে হয়েছিল। গলার হারটা আর হাতের চুড়ি কটা তো মৃগাঙ্ক ডাক্তারেরই দেওয়া। ভারী কিছু নয়, ভারী গহনার স্থূলতা অতসীর রুচিতে সইত না, তবু নেহাৎ হালকা ওই আভরণটুকুই অতসীর নতুন সংসারের মূলধন।

এখানে ওই নিরাভরণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই বুঝি অতসী তার শাড়িখানাও সীমারেখাহীন সাদায় পরিণত করে নিয়েছে। এখানে তার পরিচয় নাবালক সীতেশ রায়ের মা বিধবা অতসী রায়।

তা' সন্দেহের দৃষ্টিতে কেউ তাকায়নি।

এ যুগ আগের যুগের মত শ্যেনচক্ষু নয়। এযুগে বাংলা দেশের এমন হাজার হাজার বিধবা মেয়ে আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে নাবালক ছেলে নিয়ে জীবন যুদ্ধে নামে।

কিন্তু অতসীর হাতে যুদ্ধের অস্ত্র কই?

বাড়িওয়ালা গিন্নি মাঝে মাঝে দোতলা থেকে নেমে এসে ভাড়াটের দরজায় দাঁড়ান, সমবেদনা জানান, আর প্রশ্ন করেন, ছেলে তোমার

ইস্কুলে ভর্তি হয় নি?'

মানুষটা সাদাসিদে স্নেহপ্রবণ, কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করেন না, সহৃদয়তার বশেই করেন। বলেন, 'ওটুকুকে মানুষ করে তুলতে পারলেই তোমার দিন কেনা হয়ে গেল মা, ওকে যাহোক করে মানুষ করে তুলতেই হবে। একদিন এই দুঃখিনী তুমিই 'রাজার মা' হয়ে বসবে, তখন পাঁচটা কনের বাপ তোমার দোরে এসে সাধবে। ছেলের মতন জিনিস আর আছে মা? এই যে আমি, তিন তিনটে তো বিইয়েছি, তিনটেই মাটির ঢিপি। এককাড়ি খরচ করে বিয়ে দিয়েছি যে যার আপন সংসারে রাজত্ব করতে চলে গেছে, আমার কথা কত ভাবছে? যাই এই বাড়িটুকু ছিল কর্তার, তাই 'ঘর ঘর' ভাড়াটে রেখে দিন চলছে। তোমার মেয়ে হয়নি বাঁচোয়া!'

মেয়ে হয় নি!

অতসী কি কেঁপে ওঠে? অতসীর মুখটা কি পাংশু হয়ে যায়?

বয়স্থা মহিলা অত বুঝতে পারেন না। তিনি কথা চালিয়ে যান, 'চেষ্টা বেষ্টা করে একটা ফ্রী ইস্কুলে ওকে ভর্তি করে দাও বাছা, আখের ভাব।'

অতসী একদিন সাহস করে বলে ফেলে, 'দেব তো মাসীমা, কিন্তু তার আগে আমাকে তো কোনও একটা কাজে কমে ভর্তি হতে হবে। হাতের পুঁজি তো সবই—' কথা শেষ করেছিল অতসী ভাববাচ্যে। একটু হাসি দিয়ে।

ঘরে সীতেশের উপস্থিতি কি ভুলে গেছে অতসী? না কি সীতেশের আড়ালে কোন জায়গা নেই বলেই নিরুপায় হয়ে সব কথাই তার সামনে উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছে?

ঘরকুনো সীতেশ ঘরেই আছে। ঘরেই থাকে।

হরসুন্দরী দেবীর এই পাঁচ ভাড়াটের বাড়িতে তার সমবয়সী ছেলের অভাব নেই, কিন্তু সীতেশকে বোধকরি তারা চক্ষেও দেখেনি।

হরসুন্দরী দেবী বলেন, 'বললে যদি তো বলি বাছা, আমিও 'দিন ভাবছি, নতুন মেয়ে তো কাজ কর্ম কিছু করে না, অথচ ছেলে

নিয়ে একলা বাস কবতে এসেছে। তো ওর চলবে কিসে? তা ভাবি, বোধহয় স্বামীর দরুণ কিছু আছে হাতে। এযুগে তো আর ভাই-ভাজ ছ্যাওব ভাসুর বিধবাকে দেখেনা মা—'

অতসী শান্ত গলায় বলে, 'আমার ওসব কিছুই নেই মাসীমা। আব স্বামীর টাকাও নেই।' তেমনি নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে একটু হাসে অতসী। খেয়াল করেনা জানালায় পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছেলেটার পিঠের চামড়াটা পুড়ে উঠছে কিনা অতসীর এই হাসিতে।

'তা ভাল! তিন কুলের কেউ কোথাও নেই?'

'নাঃ।'

'হ্যাঁগা তা ওই যে ছেলেটি ঘর খুঁজতে এসেছিল?'

'ওটি আমার দূর সম্পর্কের ভাসুরঝি জামাই হয় মাসীমা।'

হরসুন্দরী বলেন, 'দূর আর নিকট! যার শরীরে মায়া মমতা আছে, সেই নিকট। ছেলেটির আকার-প্রকার তো ভালই মনে হল, কিছু সাহায্য করে না?'

আরক্ত মুখে কোন মতে পাশ ফিবিয়ে অতসী বলে, 'করলেই বা আমি জামাইয়ের সাহায্য নেব কেন মাসামা?'

'তা বটে, তা বটে।' কথাতেই আছে, 'পবদুয়ারী জামাই ভাত্তি, এ দুইয়ের নেই উর্ধ্বগতি—' তা মেয়ে! অপিসে চাকর-বাকরী করবে তা'হলে?'

অতসী মাথা নিচু করে বলে, 'অফিসে চাকরী কবার মত বিদ্যে সাধ্যি নেই মাসীমা, ছেলেবেলায বাপ ছিলেন না, মামাব বাড়ি মানুষ, তাডাতাড়ি একটা বিয়ে দিযে দিয়েছিলেন, লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ হয়নি।'

'আহা! চিরটা কালই তা'হলে দুঃখ! তোমায় দেখলে কিন্তু বাছা এখনকার পাশটাশ করা মেয়ের ধাঁচে লাগে।'

অতসী একথার আর কি উত্তর দেবে?

হরসুন্দরী বলেন, 'মুখ ফুটে তুমি বললে তাই বলতে সাহস করছি বাছা, কিছু মনে না করো তো বলি—কাজ একটা আছে। মানে

আমাকেই একজন বলেছিল লোক দেখে দেবার জন্যে। আমি তো এ পাড়ায় আজ নেই, চল্লিশ বছর আছি, সবাই চেনে।'

'লোক দেখে দেবার জন্যে—'অস্ফুট কণ্ঠে বলে অতসী, 'কি চান তাঁরা? ঝি?'

'আহা হা ঝি কেন, ঝি কেন।' হরসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলেন, 'একটা ভালমুড়ি বুড়িকে একটু দেখাশোনা করা। নার্সের হাতের সেবা নেবেনা এই আর কি! বুড়ির নাকি সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। তবে কিনা বড় মানুষের মা, তাই তারা মাসে একশোর বেশি টাকা দিয়েও লোক রাখতে প্রস্তুত। ছেলের বৌটা মহাপাজী মা, স্বামীকে মুখনাড়া দিয়ে বলবে, 'তোমার মার সুবিধে করতে একটা বাইরের লোক এনে প্রতিষ্ঠা করবে, আর আমি ভাবতে বসবো তার কখন কি চাই, সে কী খাবে, কোথায় থাকবে, কোথায় তার জিনিসপত্র রাখবে। পারব না, রক্ষে করো। ঠিকে লোক রেখে মায়ের সেবা করাতে পার, করাও। ব্যাস।'

'তা বুড়ির ছেলে অশান্তির ভয়ে তাতেই রাজী, কিন্তু ঠিকে বড় কেউ থাকতে চায় না। বলে সারাদিন রুগীর ঘরে থাকব তো রাঁধব বাড়ব কখন? বুড়ির ছেলে তাই বলেছে, 'দিন চার পাঁচ টাকা করেও যদি লোক পাই তো রাখবো।' ছেলেটা ভাল,বৌটা দজ্জাল। অবিশ্যি তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, সে বৌ শাশুড়ীর ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। বুড়ি কত কাঁদে। এই তো মা, পয়সা থেকেও কত কষ্ট। তবে হ্যাঁ, এই যে লোক রাখতে চায়, পয়সা আছে বলেই তো? আমার মরণ কালে যে কী দুর্দশা হবে ভগবানই জানে।'

অতসী সান্ত্বনার্থে বলে, 'তখন কি আর আপনার মেয়েরা আসবেন না?'

'আসবে। মায়ের এই ইটকাঠ টুকুর ভাগ বুঝতে আসবে। আর এসে তিন বোনে ঝগড়া করবে 'আমি একা কেন করবো' বলে। মেয়ে সন্তান পরের মাটি দিয়ে গড়া মা! তোমার মেয়ে নেই রক্ষে।'

অতসী কষ্টে গলায় স্বর এনে বলে, 'ওদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন

মাসীমা, আমি করতে রাজী আছি।'

হরসুন্দরী ইতস্ততঃ করে বলেন, 'অবিশ্যি নার্সের কাজ বলতে যা বোঝায় তার সবই করতে হবে বাছা। তবে কি না জাতে বামুন—'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'জাতে বামুন হোন কায়েত হোন, কিছু এসে যায় না মাসীমা, কাজ করব বলে যখন প্রস্তুত হয়েছি, তখন সবই করব।'

হরসুন্দরী সপুলকে বলেন, 'তবে তাদের তাই বলিগে ?'

হঠাৎ জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটা ছিটকে এদিক মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'না বলবে না।'

'বলব না ?' হরসুন্দরী ভ্যাকচকিয়ে যান।

'না না ! তোমার এখানে আসার এত কি দরকার ?'

'সাতু !'

তীক্ষ্ণ তীব্র গলায় একটি সম্বোধন করে অতসী। যেমন গলায় বোধকরি কোনদিনই সাতুকে ডাকেনি। মৃগাঙ্কর সংসারে সাতুকে নিয়ে অনেক যন্ত্রণা ছিল অতসীর, কিন্তু সাতুকে শাসনের বেলায় কোথায় যেন কান্নায় কান্নায় ভরা ছিল অভিমানের বাষ্প, তাই কখনো গলায় এমন নীরসতার সুর বাজেনি।

সাতু মাথা নীচু করে ফের জানলায় গিয়ে বসে। যে জানলার সঙ্গে তার অস্ফুট স্মৃতির কোথায় যেন একটা মিল আছে। জানলার ওপিঠটা একটা সরু পচা গলি, বছরে দু'দিন সাফ হয় কি না সন্দেহ, দুদিকের বাড়ির আবর্জনা পড়ে পড়ে জমা হতে থাকে।

এ বাড়িতে উঠোনের মাঝখানে চৌবাচ্চাও একটা আছে, আর কলের মুখে লাগানো নল বেয়ে জল পড়ে পড়ে সেটা ভরতে থাকে সারাদিনে। সাতুর স্মৃতির সাথে অনেক কিছু মিল আছে এ বাড়ির।

কিন্তু সাতু ? সে কি তবে এতদিনে স্থির হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়েছে ? তার বিদ্রোহী মন শান্ত হয়েছে ?

এসে পর্যন্ত তেমনি এক অবস্থাতেই ছিল সাতু। মা ডেকেছেন 'সাতু খাবে এসো', সাতু নিঃশব্দে উঠে এসে খেয়েছে।

মা বলেছে, 'সীতু বেলা হয়ে যাচ্ছে ওঠ, এর পরে আর কলতলা খালি পাবে না', সীতু উঠে গিয়ে সেই পাঁচ শরিকের কলের থেকে মুখ ধুয়ে এসেছে। কোন প্রতিবাদ কোন দিন ধ্বনিত হয়নি তার কণ্ঠ থেকে। আজ সীতুর গলায় সেই পুরনো তীব্রতা ঝলসে উঠল।

অতসী হরসুন্দরীর দিকে চোখ টিপে ইশারায় বলে, 'ওর কথা ছেড়ে দিন, আপনি ব্যবস্থা করুন।'

হরসুন্দরী বোঝেন—বালক ছেলে মাকে ছেড়ে থাকার কথায় বিচলিত হয়েছে। পরম আনন্দে তিনি চক্রবর্তী গিন্নীর কাছে সুখবর দিতে ছুটলেন। বুড়ি এমনি একটি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ের জন্যেই হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। হরসুন্দরী জোগাড় করে দেওয়ার গৌরবটা নেবেন।

'সারাদিন নর্দমার ধারে বসে বসে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করে কোন লাভ আছে?'

অতসীর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সীতু জানলা থেকে নেমে এসে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণে পাতা চৌকিটায় গিয়ে বসে।

অতসী বলে, 'কাল তোমায় স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব। হেড্‌মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আমি, ওপরের মাসীমার তিনি চেনা লোক, কাজেই ভর্তি হতে বেশি অসুবিধে হবে না। তবে একটি কথা তোমাকে শিখিয়ে রাখছি—সত্যি কথা নয়, মিথ্যা কথা। হ্যাঁ, এখন অনেক মিথ্যা কথা তোমায় শেখাতে হবে আমাকে, বলতে হবে নিজেকে। নইলে কোথাও টিঁকতে পাব না। তুমি বলবে, এর আগে তুমি কোন স্কুলে পড়নি, বাড়িতে মায়ের কাছে পড়েছ। মনে থাকবে? বলতে পারবে? স্কুলে পড়েছিলে জানতে পারলেই এ স্কুল তোমার পুরনো স্কুলের সার্টিফিকেট চাইবে। জিজ্ঞেস করবে, 'কেন ছেড়ে এসেছ? সেখানের রেজাল্ট দেখি।' তা হলে কি বিপদে পড়বে বুঝতে পারছ? সে স্কুলে তোমার নাম সীতেশ রায় নয়, সীতেশ মজুমদার, তা মনে আছে বোধ হয়? কি কাজের কি ফল

তোমাকে বোঝাবার বয়স নয়, কিন্তু তুমি বুঝতে পার, বুঝতে চাও, তাই এত করে বুঝিয়ে শিখিয়ে রাখলাম। আর যা করো করো, দয়া করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোর না।

'আমিও ভুলে যেতে চেষ্টা করব রায় ছাড়া আর কোনদিন কিছু ছিলাম আমি, ভুলেও যাবো আস্তে আস্তে। যাক আরও একটা কথা শোন—পরশু থেকে আমি মাসীমার দেওয়া সেই কাজে ভর্তি হব। তোমাকে সকালবেলা স্কুলের ভাতটা মাসীমার কাছেই খেতে হবে। সেই ব্যবস্থাই করেছি।'

'আমি খাব না।'

সীতেশের গলায় বিদ্রোহ। কিন্তু সে বিদ্রোহে কি আর্দ্রতার ছোঁয়া?

অতসী নরম গলায় বলে, 'খাব না বললে তো রোজ চলবে না, একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

'তুমি ওপবের বুড়ির কথা শুনলে কেন? ওই বিচ্ছিরি কাজ নিলে কেন?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'বিচ্ছিরি ছাড়া সুচ্ছিরি কাজ কে আমায় দেবে বল? আমি কি বি. এ. এম. এ. পাশ করেছি? আর কাজ না করলে—'

'না না না তুমি কাজ করবে না। তুমি ঝি হতে পাবে না।'

বলে সহসা জীবনে যা না করে সীতু তাই করে বসে। উপুর হয়ে পড়ে উথলে কেঁদে ওঠে।

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে অতসী, সান্ত্বনা দিতে ভুলে যায়। অমনি করে উপুর হয়ে পড়ে কেঁদে ভাসাবার জন্যে তার অন্তরাত্মাও যে আকুল হয়ে উঠেছে।

খুকু খুকু! খুকুমণি! কতদিন তোকে দেখিনি আমি! কী করছিস তুই 'মা-মরা' হয়ে গিয়ে। কে তোকে খাওয়াচ্ছে খুকু, কে ঘুম পাড়াচ্ছে? 'মা মা' করে খুঁজে বেড়ালে কী বলছে তোকে ওরা? 'মা নেই, মা মরে গেছে। মা চলে গেছে, আর আসবে না!' শুনে

কেমন করে কেঁদে উঠেছিস তুই খুকু সোনা। খুকু তুই কেমন আছিস? খুকু তুই কি আছিস?

হরসুন্দরী প্রতি কথায় বলেন, 'তোমার মেয়ে নেই মা বাঁচোয়া।' নিজের মেয়েদের প্রতি দুরন্ত অভিমানের বশেই হয়তো বলেন, কিন্তু তিনি কেমন করে বুঝবেন তাঁর এই সান্ত্বনা বাক্যে অতসীর বুকের ভিতরটা কী তোলপাড় করে ওঠে, জননী হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা কেমন করে 'ষাট ষাট' করে ওঠে।

সারাদিনের বেঁধে রাখা মন রাত্রে আর বাঁধ মানে না। নিঃশব্দ ক্রন্দনে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়।

আলাদা চৌকীতে সীতু।

ঘরে জায়গা কম, এ চৌকী যতটা স্বল্প পরিসর হওয়া সম্ভব ততটা স্বল্প, পাশ ফিরতে পড়ে যাবার ভয়। তবু রাত্রির অন্ধকারে অতসীর মনে হয় যেন তার কোলের কাছে একটা বিশাল শূন্যতা! সেই শূন্যতা অতসীকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, অদৃশ্য দাঁত দিয়ে অতসীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে।

বুকের মধ্যেটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। সর্ব শরীরে সেই মোচড়ানির যন্ত্রণা অনুভব করে অতসী। যেন দেহের কোথাও ভয়ঙ্কর একটা আঘাত করতে পারলে কিছুটা উপশম হবে। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, 'খুকু খুকু, তোর মা নেই। তোর মা মরে গেছে বুঝলি?'

মৃগাঙ্ক কি খুকুকে নিজের কাছে নিয়ে শোন?

ঝাপসা করে এইটুকু শুধু ভাবতে পারে অতসী, এর বেশি নয়। মৃগাঙ্কর কথা ওর থেকে বেশি ভাববার ক্ষমতা অতসীর নেই।

ভয়ঙ্কর ক্ষতের দৃশ্যটা যেমন ঢাকা দিয়ে রাখতে চায় মানুষ, দেখতে পারেনা, তেমনি সেই ভয়ঙ্কর চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখে অতসী, ঢেকে রাখে আতঙ্ক দিয়ে।

শুধু রাত্রে যখন সীতু ঘুমিয়ে পড়ে, যখন আবছা অন্ধকারে ওর রোগা পাতলা ছোট্ট দেহটাকে একটা বালক মাত্র ছাড়া আর কিছু

মনে হয় না, তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মত একটা প্রশ্ন অতসীকে কুরে কুরে খায় 'আমি কি ভুল করলাম? আমার কি আরও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল?'

কিন্তু ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করার মত অবস্থা কি ঘটেনি?

সকাল হতে না হতেই সমস্ত চিন্তা আর সমস্ত প্রশ্নে যবনিকা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে হয় মনিব বাড়ি। ছটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে না পারলেই অনুযোগ শুরু করে বুড়ি, 'আজ তোমার এত দেরী যে আতুসী? কতক্ষণে মুখ ধোওয়াতে আসবে বলে রাত থেকে দুয়োরের পানে তাকাচ্ছি।' দেরী না হলেও অনুযোগটা তাঁর উদ্যত।

অনিদ্রা রোগীর রাত বড় দীর্ঘ।

সকালের আলোর আশায় পলক গোনে সে।

অতসী তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, 'এই একটু দেরী হয়ে গেল দিদিমা। উঠুন, মুখ ধুয়ে নিন।' বলে তৎপরতা দেখায়।

তারপর কাজ আর কাজ।

মুখ ধোওয়ানো, বিশুদ্ধ কাপড় পরিয়ে তাকে জপ আহ্নিক করতে বসানো, নিজে স্নান করে এসে তবে তাঁকে খাওয়ানো, শুধু খাওয়ানো। ঠিক রোগী নয়, বলতে গেলে রোগটা জরা, তবু শুয়ে খেতে ভালবাসেন চক্রবর্তী গিন্নী। ভালবাসেন সেবা খেতে। হাত খালি হলেই তেল মালিশ করতে হয় বসে বসে। আর বসে বসে শুনতে হয় তাঁর ছেলের প্রশংসা আর ছেলের বৌয়ের নিন্দে। এ শোনাও একটা বিশেষ কাজ।

এই কাজ আর অকাজের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে তলিয়ে থাকে চিন্তা ভাবনা। মনে করবার অবকাশ থাকে না অতসী কে, অতসী কি, অতসী এখানে কেন। যেন এই খামখেয়ালী বড়লোক বুড়ির খাস পরিচারিকা, এইটাই অতসীর একমাত্র পরিচয়।

মানুষটা খিটখিটে নয়, এইটুকুই পরম লাভ। মিষ্টিমুখে সারাক্ষণ খাটিয়ে নেন। মালিশ হলেই বলেন, 'অ আতুসী, মালিশের তেলের হাতটা ধুয়ে দুটো পান ছ্যাঁচ দিকি খাই।' পান ছ্যাঁচা হলেই বলবেন,

'আতুসী দেখতো বিছানায় পিঁপড়ে হয়েছে না ছারপোকা? চব্বিশ ঘণ্টা কী যে কামড়ায়।'

সন্ধ্যাবেলা সব মিটে গেলে, চলে যাবার সময় পর্যন্ত ডাক দেন 'আতুসী মশারীটা ভাল করে গুঁজেছ তো? কাল যেন একটা মশা ঢুকেছিল মনে হচ্ছে।'

আসল কথা সারাক্ষণ একটা মানুষের স্পর্শ আর সান্নিধ্যের লোভ! সংসার যার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে, অবস্থা যাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, তার হয়তো এমনিই হয়। মানুষের সঙ্গলালসা, এমনি চক্ষুলজ্জাহীন করে তোলে তাকে। এই কাজের জগতে বার্ধক্যকে সঙ্গ দেবে এমন দায় কার? তাই ওই সঙ্গ দেওয়াটাই যার ডিউটি, তাকে পুরো ভোগ করে নিতে চান চক্রবর্তী গিন্নী সুরেশ্বরী।

আবার ভাল কথাও বলেন বৈ কি!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতসীর জীবন-কাহিনী শুনতে চান তিনি, চান 'আহা' করতে। চান অতসীর আত্মপরিজনকে কটুবাক্যে তিরস্কার করতে। বলেন, 'এই বয়সে, এত ছবির মতন চেহারা, কোন প্রাণে তারা একলা ছেড়ে দিয়েছে। এই যাই ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ তাই রক্ষে। নইলে কার খপ্পরে যে পড়তে!' আবার বলেন, 'ছেলেকে তো কই একদিন আনলে না আতসী। দেখতে চাইলাম!'

অতসী বলে, 'আসবে না দিদিমা। বড় লাজুক।'

সুরেশ্বরী বলেন, 'আহা আসাতে আসাতেই লজ্জা ভাঙবে। আনলে চাইকি আমার আনন্দর নেকনজরে পড়ে যেতে পারে। তখন তোমার ওই ছেলের বই খাতা জুতো জামা কোন কিছুর অভাব হবেনা। আনন্দর যে আমার বড় মায়ার শরীর, গরিবের দুঃখ একেবারে দেখতে পারে না।'

অতসী কাঠের মত শক্ত হয়ে যাওয়া হাতে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মালিশ চালিয়ে যায়, আর সহসা এক সময় বলে ওঠেন সুরেশ্বরী, 'কাজ করতে করতে থেকে থেকে তোমার যে কী হয় আতুসী, যেন কোথায় আছে মন কোথায় আছে দেহ। একটু মন দাও বাছা। মাস গেলে কম

গুলি করে তো শুনতে হয় না আমার অমন্দকে। শুধু এই বুড়িমার আরাম স্বস্তির জন্যে।'

হ্যাঁ, এটুকু স্পষ্ট কথা তিনি বলেন। নিজের গৌরব গরিমা বাড়াতেই বলেন। তা' এ টুকু না সইলে চলবে কেন?

উদয়াস্ত খিটখিট করলেই কি সইতে হ'তনা? মনিব খিটখিটে বলে একশো পঁচিশ টাকার চাকরীটা ছেড়ে দিত? তাই কেউ দেয়? ঘরে যার ভাত নেই?

ওদিকে এদিক ওদিক থেকে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই তিনি হাতছানি দিয়ে ডেকে সহাস্যে বলেন, 'কেমন কাজ চলছে?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'ভাল।'

'তা' ভাল না বলে আর উপায় কি। বলি এক মিনিট বসতে শুতে পাও কোন দিন? ইস তা আর নয়, ওই চীজটিকে আমার জানতে বাকী আছে কি না। চব্বিশ ঘণ্টা খালি ফরমাস আর ফরমাস। বাবাঃ! তা বাপু আমি মুখফোঁড় মানুষ বলে ফেলি। এমন চেহারা খানি তোমার, এমন মিষ্টি মিষ্টি গলা, তুমি মরতে এই অখদ্যে কাজ করতে এলে কেন? সিনেমায় নামলে লুফে নিত।'

অতসী উত্তর দেয় না, শুধু কান দুটো যে তার কত লাল হয়ে উঠেছে সেটা নিজেই অনুভব করে।

ভদ্রমহিলা আবার হেসে হেসে বলেন, 'একটা তো ছেলেও আছে তোমার শুনেছি। তোমার মতই সুন্দর হ'বে নিশ্চয়। মায়ে ছেলেয় নেমে পড়। আজকাল ছোট ছেলের চাহিদা ও লাইনে খুব। হাড়ির হাল থেকে রাজার হাল হবে। নইলে এই দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে আর কতই মানুষ করে তুলতে পারবে? তার চাইতে ও লাইনে অগাধ পয়সা।'

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'আপনারা হিতৈষী, আপনারা অবিশ্যি যা ভাল তাই বলবেন, দেখব ভেবে।'

-হিহি করে হাসেন ভদ্রমহিলা আর বলেন, 'তোমার মতন অবস্থা

আমার হলে, ওসব ভাবাভাবির ধার ধারতাম না, কবে গিয়ে হিরোইন হ'তাম। ভাল থেকে হবেটা কি? কেউ তোমায় ভাত দেবে, না সামাজিক মান মর্যাদা দেবে?'

ভদ্রমহিলার মতবাদকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

না, 'তুমি' ছাড়া 'আপনি' এবাড়িতে কেউ বলে না অতসীকে। বাসনমাজা ঝিটাও বলে, 'তুমি আবার এখন কলে পড়তে এলে? সরো বাপু, সরো, আমায় বাসন কখানা ধুয়ে নিতে দাও আগে।'

সুরেশ্বরীর চা দুধ খাওয়া পাথরের বাটি গেলাস অতসীকেই মেজে নিতে হয়, সুরেশ্বরীর নির্দেশ। সেই দুটো হাতে করে অপেক্ষা করতে হয়ে অতসীকে যুগ যুগান্তর, কলের আশায়।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে কোনদিন দেখে সীতু আধময়লা বিছানাটায় গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনদিন দেখে হ্যারিকেনের আলোর সামনে রক্তাভ চক্ষু মেলে পড়া করছে। বেশিক্ষণ পারে না তখুনি গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। লাইট নেই।

বারো টাকা ভাড়া ঘরে লাইট থাকে না।

ওই দামে কোঠা ঘর পাওয়া গেছে এই ঢের।

অতসী এসে কাপড় ছাড়ে, হাত পা ধোয়, উনুনে আগুন দিয়ে রুটি তরকারি করে ডাক দেয় 'সীতু ওঠ, খাবার হয়েছে।'

সীতু আস্তে আস্তে উঠে খেতে বসে। না বসে উপায়ই বা কি? খিদেয় যে পাকযন্ত্র শুদ্ধ পরিপাক হয়ে থাকে। ইস্কুল থেকে এলে কে হাতের কাছে খাবার জুগিয়ে দেবে?

অতসী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কৌটায় মুড়ি থাকে, নাড় থাকে, পাউরুটি আনা থাকে, কিছু খাসনা কেন সীতু?'

সীতু গম্ভীর ভাবে বলে, 'খিদে পায়না।'

এমনি করে কাটে দিন আর রাত্রি।

কয়েকটা মাস গড়িয়ে যায়।

সুরেশ্বরী আর একটু অপটু হতে থাকেন। আর সুরেশ্বরীর ছেলের

বৌ রোজ একবার করে অতসীকে প্ররোচনা দেন। 'ছেলেকে সিনেমায় না দিলে তোমার কাছে এখানেই নিয়ে এসে রাখনা। সারাদিন তোমার চোখে চোখে থাকবে।'

অবশেষে একদিন অতসীকে সুরেশ্বরীর কাছ থেকে আড়ালে ডেকে আসল কথাটা পাড়ে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, 'কই গো তোমার ছেলেকে একদিন আনলে না?'

অতসী এবার ওই মদগর্ব মণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নীচু করে বলে, 'ছেলে লাজুক, আসতে বললে আসতে চাইবে না।'

'বাঃ দিব্যি তো কথা এড়াতে পারো তুমি?' বৌ যেন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'আসতে বললে আসতে চাইবে, কি না চাইবে, আগে থেকেই বুঝছ কি করে?'

অতসী চোখ তুলে মৃদু হেসে বলে, 'ছেলে কি চাইবে না চাইবে মায়ে বুঝতে পারে বৈকি।'

'হুঁ।' ভদ্রমহিলার মুখখানি থমথমে হয়ে ওঠে! বোধ করি তার সন্দেহ হয় শাশুড়ীর নার্সের এটি তার সন্তানহীনতার প্রতি কটাক্ষপাত। কিন্তু এখন একটি মতলব নিয়ে কথা শুরু করেছে সে, প্রথম নম্বরেই মেজাজ দেখিয়ে কাজ পণ্ড করলে লোকসান। তাই আবার কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলে, 'আহা, বেড়াতে আসার নাম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসবে একদিন। মানুষের বাড়ি মানুষ বেড়াতে আসে না?'

অতসী কষ্টে হেসে বলে, 'তা' একদিন নিয়ে এসেই বা লাভ কি?'

যাক আলোচনাটা অনুকূলে আসছে, বৌ হৃষ্ট হয়ে ওঠে। মুচকি হেসে বলে, 'একদিন থেকেই চিরদিন হয়ে যেতে পারে, আশ্চর্য কি।'

অতসী একথার অর্থ গ্রহণে অক্ষম হয়েই চুপ করে চেয়ে থাকে।

সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, যার নাম নাকি বিজলী, সে ঠোঁটের কোণে একটু বিজলীর চমক খেলিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি বাবু বড় বেশি সরল, কোন কথা যদি ধরতে পার। বলছিলাম তুমি তো ওই হরসুন্দরী বামনীর ভাড়াটে। যা বাহারের বাড়ি তার, দেখেছি তো। সেই ভাঙা ঘরেরও কোন না পাঁচ সাত টাকা ভাড়া নেয়, সেখানে ওই ভাড়া

গুনে নাই বা থাকলে? এখানে আমার এতবড় বাড়ি, নীচের তলায় কত ঘরদোর পড়ে, ছেলে নিয়ে অনায়াসে এখানে এসে থাকতে পার।'

'তাই কি আর হয়!' বলে কথায় যবনিকা টেনে চলে যেতে উদ্যত হয় অতসী। কিন্তু বিজলী তাকে এখন ছাড়তে রাজী নয়, তাই ব্যগ্রভাবে বলে, 'দাঁড়াও না ছাই একটু। বুড়ি আর তোমাবিহনে এক্ষুনি গলা শুকিয়ে মরছে না। 'তাই কি আর হয়' বলছ কেন? এতে তো তোমারই সুবিধে, আর—' গলা খাটো করে বিজলী আসল কথায় আসে, 'দুদিক থেকেই তোমার হাতে কিছু পয়সা হয়। ঘর ভাড়াটা বাঁচে, আর তোমার ছেলে যদি বাবুর ফাই-ফরমাসটা একটু খাটতে পারে তাতেও পাঁচ সাত টাকা—'

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা প্রবল বেগে প্রচণ্ড একটা পাক খেয়ে অতসীকে ধরে আছাড় মারে। সেই আছাড়ের আকস্মিকতা কাটতে সময় লাগে। কথা বলবার শক্তি সংগ্রহ করতে দেরী হয়। ততক্ষণে বিজলী আর একটু বিদ্যুৎ হাসি হেসে বলে, 'বাবুর যা দিলদরিয়া মেজাজ, হাতে হাতে ঘুরে মন জুগিয়ে চলতে পারলে বখশিসেই—'

হ্যাঁ, এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে।

অতসী ঝাঁ ঝাঁ করা কান আর জ্বালা করা চোখ দুটো নিয়েও কথা বলতে পেরেছে। কিন্তু সে কথা শুনে মুহূর্তে বিজলী লক্ষ্মী হয়ে ওঠে। তীব্রস্বরে বলে, 'কী বললে? ভবিষ্যতে যেন কখনো এ ধরনের কথা না বলি? তেজটা তোমার একটু বেশি নার্স! বলি আমার বাড়িতে থেকে ছেলে যদি তোমার ঘরের ছেলের মত একটু কাজ কর্ম করত মানের কানা খসে যেত তার? তবু তো তুমি পাশ করা নার্স নও। মা যার দাস্যবৃত্তি করছে, তার ছেলের এত মান! বাবাঃ! কিন্তু এটি জেন নার্স, এত মান নিয়ে পরের বাড়ি কাজ করা চলে না। মান একটু খাটো করতে হয়।'

অতসী এতক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। স্বাভাবিক রং ফিরে পেয়েছে ওর চোখ আর কান।

সেই স্থির চেহারা নিয়ে ও বলে, 'আপনার আর কিছু বলবার

আছে ? যদি থাকে তো বলে নিন।'

বিজলী এবার বোধকরি একটু থতমত খায়, তবু থতমত খেয়ে চুপ হয়ে যাবার মেয়ে সে নয়। তাই ভুরু কুঁচকে বলে, 'আর যা বলবার আছে, সেটা বাবুকে বলব, তোমাকে নয়। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। এটা মনে রেখো।'

'মনে রাখব।'

বলে চলে এসে অতসী যথারীতি সুরেশ্বরীকে ওষুধ খাওয়ায়। মালিশ করে দেয়। তারপর সহজ শান্তভাবে বলে, 'বিকেল থেকে আমি আর আসব না দিদিমা!'

'তার মানে ? আসবে না মানে?' নেহাৎ অপটু তাই, নইলে বোধকরি ছিটকেই উঠতেন সুরেশ্বরী, 'আসবে না বললেই হল ?'

'তা আসতে যখন পারব না, তখন বলে যাওয়াই তো ভাল।'

'বলি পারবে না কেন বাছা সেইটাই শুধোই। বুঝেছি বুঝেছি আমার ওই বৌটি নিশ্চয় ভাঙচি দিয়েছে। ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই শলা-পরমর্শ-ই দিল তা'হলে এতক্ষণ ? বলি তুমি তো আর হাবার বেটি নও ? শুনবে কেন ওর কথা ? বুঝছ না আমার ওপর হিংসে করে তোমায় ভাঙচি দিচ্ছে ? এই যে তুমি আমায় যত্ন আত্তি করছ, দেখে হিংসেয় বুক পুড়ছে ওর। মহা খল মেয়েমানুষ মা, মহা খল মেয়েমানুষ। কান দিও না ওর কথায়।'

অতসী গম্ভীর ভাবে বলে. 'বৃথা ওসব কথা বলবেন না দিদিমা, উনি আমায় যেতে বলেন নি। আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাই বল—' সুরেশ্বরী সহসা একগাল হেসে বলেন, 'বুঝেছি। চালাকের বেটির আরও কিছু বাড়ানোর তাল। তা বলব আমি, ছেলেকে বলব। বলে কয়ে সাড়ে চার টাকা রোজ করে দেব তোমার। তাতে হবে তো ? হবে না কেন, মাস গেলে পনেরোটা টাকা তো বেড়ে গেল। তা হ্যাঁ মা আতুসী, একথা মুখ ফুটে একটু বললেই হত। দেখছ যখন তোমাকে আমার মনে ধরেছে। না বাছা ছাড়ার কথা মুখে এনো না। এই বুড়ি যে কটা দিন আছে, থেকো।

আমি প্রাতর্বাক্যে আশীর্বাদ করছি, তোমার ভাল হবে।'

অতসী বৃদ্ধার ওই উদ্বিগ্ন আটুপাটু, আবার প্রায় নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনে ভাবে 'একের অপরাধে আরের দণ্ড।' পৃথিবী জুড়ে তো এই লীলা। আমি আর কি করব? বুড়ির জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি? এখানে আর থাকা যায় কি করে?

সুরেশ্বরী তার ছানিপড়া চোখে দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে অতসীর মুখের দিকে তাকান এবং সে মুখে অনমনীয়তার ছাপ দেখে বিচলিত কণ্ঠে বলেন, 'তা' ওতেও যদি তোমার মন না ওঠে, পাঁচ টাকা রোজই কবিয়ে দেব বাছা। আর তো মন খুঁৎ খুঁৎ করবে না? কিন্তু তাও বলি আতুসী, আমার ছেলে খুব মাতৃভক্ত, আর টাকার দুখদরদ নেই বলেই এতটা কবুল করতে সাহস করলাম আমি। নইলে এ তল্লাটে এর অর্ধেক দিয়েও কেউ বুড়ো মায়ের সেবার জন্যে লোক রাখতে চাইবে না। বৌটি হারামজাদা হয়েই হয়েছে আমার কাল। তুই ডাগু খাগু বাঁজা মানুষ, শাশুড়ীর সেবা করতে পারিস না? সোয়ামীর এতগুলো করে টাকা জলে যাচ্ছে, তাই দেখছিস বসে বসে? কী বলব আতুসী, জ্বলে পুড়ে মলাম, জ্বলে পুড়ে মলাম।'

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'দুঃখ যন্ত্রণার বিষয় বেশি আলোচনা না করাই ভাল দিদিমা, ওতে কষ্ট বাড়ে ভিন্ন কমে না।'

সুরেশ্বরী সহসা বিগলিত স্নেহে অতসীর হাতটা চেপে ধরে বলেন, 'এই দেখতো মা এই জন্যেই তোমায় ছাড়তে চাই না। কথা শুনলে বুক জুড়োয়। আর আমার বৌটি! কথা নয় তো, যেন এক একখানি চ্যালা কাঠ! যাকগে বাছা, তুমি মনকে প্রফুল্ল করো, দিন পাঁচ টাকা করেই পাবে।'

অতসী দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'পাঁচ টাকা দশ টাকা কথা নয় দিদিমা, দিন কুড়ি টাকা করে হলেও আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না।'

সুরেশ্বরী স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলেন, 'বুঝেছি, ওই হারামজাদী তোমায় কোনও অপমানের কথা বলেছে। আচ্ছা

ডাকাচ্ছি ওকে আমি একবার। দেখি কী তোমায় বলেছে? যতই হোক তুমি হলে ভদ্দর ঘরের মেয়ে, তোমাকে একটা মান অপমানের কথা বললে তো গায়ে লাগবেই। কে যাচ্ছিস রে ওখানে? নন্দ? তোদের বৌদিদিকে একবার ডাক তো।'

অতসী ব্যাকুলভাবে বলে, 'মিথ্যে কেন এসব মনে করছেন দিদিমা? আমি বলছি উনি কিছু বলেননি। আমারই থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এমনিই হচ্ছে না। আগে বুঝতে পারিনি—।'

সুরেশ্বরী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে বলেন, 'আগে বুঝতে পারিনি বলে আমায় তুমি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে? এই যে আমার সেবার অভ্যেসটি ধরিয়ে দিলে, তার কি?'

সুরেশ্বরীর অভিযোগের ভাষা শুনে এত যন্ত্রণার মধ্যে হাসি পেয়ে যায় অতসীর। প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'ওর আর কি, যে থাকবে সেই করবে। এত টাকা দিলে এক্ষুনি লোক পেয়ে যাবেন।'

সুরেশ্বরী নিজের আগুনে নিজেই জল ঢালেন।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'লোক পাব না তা বলছি না। লোক পাব। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। কিন্তু মা আতুসী, সব কাকই যে দাঁড়কাক। যারা আসবে, তারা হয় একেবারে ঝি চাকরানীর মতই নোংরা ইল্লুতে ছোটলোক হবে, নয় হাসপাতালের নার্সদের মত গ্যাড্ ম্যাড্ ফ্যাড্ হবে। তোমার মতন এমন সভ্য ভব্য শান্ত ভদ্দর মেয়ে আর কোথায় পাব শুনি?'

অতসী চুপ করে থাকে আর ভাবে, ভেবেছিলাম মনকে পাথর করে ফেলেছি, মমতাকে জয় করেছি। কিন্তু দেখছি বড্ড বেশি ভাবা হয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বরী আবার ভাবেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। অতসীর বোধ হয় মন ভিজেছে। তাই আকুলতার মাত্রা আর একটু বাড়ান তিনি। আবার হাত ধরেন, চোখের জল ফেলেন, অতসীকে কাজের শেষে সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন বলে শপথবাক্য উচ্চারণ করেন, তার কাঁকে কাঁকে নিজের বৌ সম্পর্কে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করেন। কিন্তু

অতসী অনমনীয়। মমতাকে সে জয় করতে পারে নি সত্যি কিন্তু ওইটুকুই, তার বেশি নয়। মমতায় বিগলিত হয়ে সংকল্পচ্যুত হবে, সে এমন দুর্বল নয়।

অনুরোধ, উপরোধ?

তাতে টলানো যাবে অতসীকে? যদি তা যেত, অতসীর ইতিহাস অন্য হত। অতসী চলে এল।

শেষের দিকে সুরেশ্বরী রাগ করে গুম হয়ে রইলেন। অতসী নিঃশব্দে চলে এল। বিজলী দোতলার বারান্দা থেকে দেখল। আর একই সঙ্গে বিপরীত দুই মনোভাবে কেমন বিচলিত হল।

অতসী এসে পর্যন্ত সুবিধা হয়েছিল তা'র অনেক, সুরেশ্বরী যতই ভালমন্দ করুন এবং নিজে সে যতই বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শোনাক শাশুড়ীকে, তবু শাশুড়ী সম্পর্কে একটা দায় তার ছিল, অতসী এসে পর্যন্ত সেই দায়টা ঘুচেছিল। আবার সেই দায়টা ঘাড়ে এসে পড়বে এই ভেবে মনটা বিরস হচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা হিংস্র পুলকে ভাবছিল—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, বুড়ি জব্দ হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! ভাল বসতে গিয়ে মন্দ হওয়া!

ছেলেকে চাকর রাখায় আপত্তি।

বেশ বাপু আপত্তি তো আপত্তি। তোমার ছেলে না হয় জজ ম্যাজিস্ট্রেটই হবে, তুমি লোকের বাড়ি পা টিপে আর কোমরে তেল মালিশ করে ছেলেকে রূপোর খাটে বসিয়ে মানুষ করগে, কিন্তু দুম করে চাকরীটা ছেড়ে দেবার দরকার কি ছিল?

এতই যদি তেজ, তো পরের বাড়ি খাটতে আসা কেন?

এইভাবে যুক্তি সাজিয়ে বিজলী নিজেকে দোষমুক্ত এবং অতসীকে দোষযুক্ত করে তুলল, কিন্তু তবু তেমন নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

স্বামী এসে কি বলবেন?

মায়ের আবার পুনর্মূষিক অবস্থা দেখে খুশি নিশ্চয় হবেন না এবং সন্দেহ নেই বিজলীকেই এ ঘটনার নায়িকা মনে করবেন।

তাই করে লোকটা। সব সময় করে। বলে না কিছু, কিন্তু

নীরব থেকেও শুধু চোখ মুখের ভাবে বুঝিয়ে ছাড়ে, সব দোষ বিজলীর। আর সুরেশ্বরী ?

তিনি বিশ্ব সংসারের সকলকে শাপশাপান্ত করছেন, এমন কি হরসুন্দরীকেও রেহাই দিচ্ছেন না।

জেনে শুনে এরকম নিষ্ঠুরপ্রাণ মেয়েমানুষকে সে কোন হিসেবে দিয়েছিল ?

হরসুন্দরীকে সামনে পেলে আরও যে কী বলতেন তিনি।

অতসী অবশ্য বাড়ি এসে কিছুই বলল না।

সামনের ঘরের পড়শীনি চোখাচোখি হ'তে বললেন, 'দিদি যে আজ এক্ষুনি।'

অতসী বলল 'এমনি। চলে এলাম।'

সীতু তখনও স্কুল থেকে আসে নি, ঘরের দরজায় একটা সস্তা দরের তালা ঝুলছে। এ ব্যবস্থা হরসুন্দরীর নিজের। ভাড়াটের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তাঁরই এই বোঝেন তিনি। কিছু যদি চুরি যায়, তাঁর বাড়ির বদনাম হবে।

কিন্তু অতসীর কি চুরি যাবে। কি আছে তার ?

তালার চাবিটা নিতে দোতলায় উঠতেই হ'ল। হরসুন্দরী অবাক হয়ে বললেন, 'এমন সময় যে ?'

অতসী একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে ?' হরসুন্দরী আঁতকে ওঠেন, 'কেন গো ? বুড়ি হয়ে গেল নাকি ?'

'না না, কী আশ্চর্য, তা' কেন ? এমনিই।'

হরসুন্দরী হাঁ করে তাকিয়ে বলেন, 'এমনি! ঘরে তো অভ্যভক্ষ্য বসুগুণ, এমনি তুমি কাজটা—ছেড়ে দিলে ? বুড়ি খুব খিটখিট করেছিল বুঝি ?'

'না না, কিছুই বলেননি তিনি।'

'তবে ওই বৌ ছুঁড়ি ক্যাটকেঁটিয়ে কিছু বলেছে নিশ্চয়। ওর কথাই অমনি। দেখনা শাশুড়ী পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে মরে। তবু বলি,

রাগের মাথায় ঝপ করে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি মেয়ে। এ জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই।'

অতসী আস্তে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তর তর করে চলে আসতে পারে না।

হরসুন্দরী আবার বলেন, 'বুঝেছি তোমার কপালে এখন অশেষ দুঃখ তোলা আছে। নইলে অমন কাজটা ছেড়ে দিলে! আর কোথাও কিছু জোগাড় করেছ নাকি?'

অতসী ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'আমি আর কোথায় কি জোগাড় করব?'

'তাও তো সত্যি। কিন্তু এও বলি অতসী, ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে না দিয়ে একবার বাড়ি এসে বিবেচনা করা উচিত ছিল। পরের দাসত্ব করতে গেলে গায়ে গণ্ডারের চামড়া পরতে হয় মা!'

'সেটা পরতে সময় লাগবে মাসীমা!'

বলে অতসী চলে আসতে যায়। হরসুন্দরী বাধা দিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে বলেন, 'শাশুড়ীও কিছু বলেনি বলছ, বৌও কিছু বলেন নি, তবে ব্যাপারটা কী হল বলত? বুড়ির ছেলেকে তো ভাল বলেই জানতাম সেই কোন রকম কিছু বেচাল দেখাল নাকি?'

'আঃ ছিঃ ছিঃ? কী বলছেন মাসীমা!'

অতসী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'কী করে যে এই সব আজগুবি কথা মাথায় আসে আপনাদের!' বলেই চলে আসে, আর দাঁড়ায় না।

স্কুল থেকে ফিরে সীতু কোনদিন মাকে বাড়িতে দেখতে পায় না। অতসী আসে সন্ধ্যার পর। আজ ঘরের দরজা খোলা দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে দরজায় উঁকি দিয়েই পুলকে রোমাঞ্চিত হল সে। তার 'সীল' করা মনও এই পুলককে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

বই রেখে মার কাছাকাছি বসে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল সীতু, 'মা এখন?'

অতসী কী এই উজ্জ্বল মুখে কালি ঢেলে দেবে? বলবে, 'ঘুচিয়ে এলাম চাকরী? এবার নেমে আসতে হবে দুর্দশার চরমে?'

না, এই মুহূর্তে তা পারল না অতসী। শুধু মৃদু হেসে বলল, 'দেখে

বুঝি রাগ হচ্ছে ?'

'ইস রাগ বৈ কি ! রোজ তুমি থাকবে না। ইস্কুল থেকে এসে তালা খুলতে বিচ্ছিরি লাগে।'

অতসী তেমনি ভাবেই বলে, 'বেশ রোজ আমি থাকব, তোকে আর দরজার তালা খুলতে হবে না। কিন্তু রোজগারের ভার তুই নিবি তো ?'

না, কালি ঢেলে দেওয়া রদ করা গেল না। সুর কেটে গেল।

সীতু আস্তে আস্তে উঠে গেল মুখ হাত ধুতে।

কিন্তু নিজে ছাড়লেও 'কমলি' ছাড়ে না।

পরদিন হরসুন্দরী এসে জাঁকিয়ে বসলেন, 'শুনলাম, বাছা তোমার কাজ ছাড়ার কাবণ কাহিনী !'

অতসী অনুভব করল সীতু হেঁটমুণ্ডে অঙ্ক কসতে কসতেও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক্ মাসীমা ও কথা।'

কিন্তু হবসুন্দরী তো এসেছেন দূত হয়ে, কাজেই এক্ষুণি থাকলে তাঁব চলবে কেন ? তাই প্রবল স্বরে বলেন, 'তুমি তো বলছ বাছা থাক ও কথায়। কিন্তু তারা যে আমায় আবার খোশামোদ করছে। বুড়ি তো মা আমার হাতে ধরে কেঁদে ভাসাল। শুনলাম সব। বৌটা না কি তোমার ছেলেকে বাবুর ফাই ফরমাস খাটতে চাকর বাখতে চেয়েছিল ? অহঙ্কার দেখো একবার। তুমি না হয় অভাবে পড়ে দাসীবিত্তি—'

মুখের কথা মুখেই থাকে হরসুন্দরীর, হঠাৎ সীতু খাতা ফেলে উঠে এসে তীব্র চীৎকারে বলে, 'তুমি চলে যাও।'

একে 'তুমি' তায় 'চলে যাও।'

হবসুন্দবীর আগুন হয়ে উঠতে পলক মাত্রও দেরী হয় না।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'তোমাদের মায়ে বেটার তেজটা একটু বেশি সীতুর মা ! কপালে তোমার দুঃখ আছে। আচ্ছা চলে আমি যাচ্ছি। ঠিক ঠিক সময়ে ঘর ভাড়াটা জুগিও বাছা, তোমার ছায়া মাড়াতেও আসব না। আত্মজন ছেড়ে কেন যে তুমি ওই ছেলে নিয়ে

অকূলে ভেসেছে, বুঝতে, পারছি এবার।'

হরসুন্দরী বীরদর্পে চলে যান।

অতসীর অকূলের তৃণের ভেলা—অসময়ের একমাত্র হিতৈষী হরসুন্দরী বাড়িওয়ালী।

অতসী কি ছুটে গিয়ে ওই ভেলাকে আঁকড়ে ধরবে? বলবে, 'জানেনই তো মাসীমা, ছেলে আমার পাগল।'

না, অতসীর সে শক্তি নেই। ছুটে যাওয়ার শক্তি নেই। স্থাণু হয়ে গেছে সে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, নির্বাক দুটো প্রাণী বসে থাকে সেই অন্ধকারে। এমনি করেই কি লেখাপড়া চালাবে সীতু? মানুষ হবে, বড়লোক হবে? মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অর্থঋণ শোধ করবে?

হঠাৎ এক সময় অতসী পিঠে একটা স্পর্শ অনুভব করে। একটা চুলে ভরা মাথা আর হাড় হাড় রোগা মুখের স্পর্শ।

'ও কেন ওকথা বলবে?' রুদ্ধ অস্ফুট স্বর।

অতসী নির্বাক।

আর একবার সেই রুদ্ধস্বর বলে ওঠে, 'আমার বুঝি বিচ্ছিরি লাগে না?' আপসের স্বর, কৈফিয়তের স্বর।

অতসী স্থির স্বরে বলে, 'পৃথিবীর কোনটা তোমার বিচ্ছিরি লাগে না, সেটা আমার জানা নেই সীতু। নতুন করে আর কি বলবে?'

'চাকর বললে, দাসী বললে, চুপ করে থাকব?'

'হ্যাঁ, থাকবে।' অতসী দৃঢ় স্বরে বলে, 'তাই থাকতে হবে—আমারই ভুল হয়েছিল কাজ ছেড়ে আসা। ঠিকই বলেছিল ওরা। আমাদের অবস্থার উপযুক্ত কথাই বলেছিল। অহঙ্কার আমাদের শোভা পাবে কিসে? জানো, একমাস যদি এ ঘরের ভাড়া দিতে না পারি, রাস্তার বার করে দিতে পারেন উনি। জানো, জেনে রাখো! এসব জানতে হবে তোমায়। জেনে রাখো তোমার বিচ্ছিরি লাগা আর ভাল লাগার বশে পৃথিবী চলবে না।' অতসী যেন হাঁপাতে থাকে,

'কাল থেকে আবার আমি ওখানে কাজ করতে যাব। পায়ে ধরে বলব, আমার ভুল হয়েছিল—।'

'না না না!'

বাণ খাওয়া পশুর মত আর্তনাদ করে ওঠে বাক্যবাণবিদ্ধ ছেলেটা।

আশ্চর্য, এত নিষ্ঠুর কি করে হল অতসী?

না কি ছেলেকে চৈতন্য করিয়ে দিতে ওর এই নিষ্ঠুরভাবে অভিনয়? অভিনয় কি এত তীব্র হয়? না কি অহরহ খুকুর মুখ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে?

ওই আর্তনাদ একটু সামলায় অতসী। একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর সহজ গলায় বলে, 'না, তো চলবে কিসে তাই বল?'

'নাই বা চলল?' সীতু তেমনি একগুঁয়ে স্বরে বলে, 'আমরা দু' জনেই মরে যাই না?'

অতসী উঠে দাঁড়ায়, যথাসম্ভব দৃঢ় স্বরে বলে, 'কেন? মরে যাব কেন? মরে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া তা' জানো? হারতে চাও তুমি? যদি হেরেই যাব, তা হলে তো ও বাড়িতেই মরতে পারতাম। এ খেয়ালকে মনে আসতে দিও না সীতু। মনে রেখ তোমায় বাঁচতে হবে, জিততে হবে। দেখাতে হবে, যে অহঙ্কার করে চলে এসেছ, সে অহঙ্কার বজায় রাখবার যোগ্যতা তোমার আছে।'

উঠে গিয়ে উনুন ধরাতে বসে অতসী। কিন্তু ক'দিন উনুন ধরাবে? কোথা থেকে আসবে রসদ?

কী করে কি করছে ওরা? কি করে চালাচ্ছে?

এই কথাটাই আকাশপাতাল ভাবেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার। ভাবেন সত্যিই কি এইভাবে ভেসে যেতে দেবেন ওদের?

না, অতসীর আস্তানা এখন আর তাঁর অজানা নেই। অনেকদিন ভেবে ভেবে অবশেষে মাথা হেঁট করে শ্যামলীর বাড়ি গিয়ে সে খোঁজ করে এসেছেন। যদিও অতসীর সহস্র নিষেধ ছিল, তবু শ্যামলী বলতে মুহূর্ত বিলম্ব করে নি। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, 'লজ্জায়

আমি আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারি না কাকাবাবু, না হলে কবে গিয়ে বলে আসতাম! আমি বলি কি, আপনি আর ওঁদের জেদের প্রশ্রয় দেবেন না। এবার পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোর করে ধরে এনে বাড়িতে বন্ধ করে রেখে দিন। আবদার নাকি, ওই ভাবে একটা বস্তির বাড়ির মত বাড়িতে থেকে আপনার মুখ পোড়াবে?'

বোকাদের মুখরতা মৃগাঙ্কর অসহ্য, তবু সেদিন ওই বোকা মেয়েটার মুখরতা অসহ্য লাগে নি। সহসা মনে হয়েছিল, জগতে এইসব সরল সাদাসিধে অনেক-কথা-বলা লোক কিছু আছে বলেই বুঝি পৃথিবী আজও শুকিয়ে উঠে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়নি। ভেবেছিলেন, আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর এত বিরূপই বা ছিলাম কেন!

'তোমরা কোনদিন গিয়েছিলে?' সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছিলেন মৃগাঙ্ক।

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'উপায় আছে? একেবারে কড়া দিব্যি। দেখা করবো না, খোঁজ করবো না, কোন সাহায্য করবো না—'

'সাহায্য' শব্দটা উচ্চারণ করে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। চলে এসেছিলেন মৃগাঙ্ক। চলে তো আসতেই হবে। নিতান্ত কাজ ব্যতীত বাইরে থাকার জো আছে কি? 'খুকু' নামক সেই ভয়ঙ্কর মায়ার পুতুলটা আছে না বাড়িতে? সারাক্ষণ যাকে ঝি চাকরের কাছে পড়ে থাকতে হয়। মৃগাঙ্ক এলেই যে কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটে এসে 'বাব্‌বা বাব্‌বা' বলে ঝাঁপিয়ে কোলে ওঠে।

শুধু ওই 'বাবা' ডাকেই চিরদিন সন্তুষ্ট থাকতে হবে খুকুকে। 'মা' বলতে পাবে না। মা নেই ওর। হঠাৎ একদিন মোটর অ্যাকসিডেন্টে মা মারা গেছে ওর।

বাবাই তাই বুকের ভেতর চেপে ধরে খুকুকে।

কিন্তু থাকে না। বেশিদিন থাকে না এই অভিমান! থাকানো যায় না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক।

শিবপুরের এক অখ্যাত গলির ধারে কাছে ঘুরে বেড়ান। একদিন নয়, অনেক দিন। কিন্তু কী যে হয়, কিছুতেই সাহস করে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সেই বাই-লেনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে

যেতে পারেন না। বুকটা কেমন করে ওঠে। পা কাঁপে।

যদি অতসী পরিচয় অস্বীকার করে বসে।

যদি অন্য পাঁচজনের সামনে বলে ওঠে, 'আচ্ছা লোক তো আপনি? বলছি আপনাকে চিনি না আমি—'চলে আসেন।

আবার যখন গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কান্নায় উদ্দাম খুকুকে কিছুতেই ভোলাতে পারেন না, কোলে নিয়ে পায়চারি করে বেড়ান, তখন মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন, 'কাল নিশ্চয়ই।' কিন্তু আবার পিছিয়ে যায় মন।

এই 'কাল কাল' করে কাটে কত বিনিদ্র রাত, আর অশান্ত দিন।

তারপর সেদিন। সেদিন খুকু—

কিন্তু এমন কি হয় না? ডাক্তার হয়েও এত বেশি নার্ভাস হলেন কি করে? হয়তো অত বেশি নার্ভাস হয়ে উঠেছিলেন বলেই খুকু—

সেদিন অপদস্থ হয়ে ঘরে গিয়ে রাগে ফুঁসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরসুন্দরী, 'রোসো! ঝেটিয়ে বিদেয় করছি। ও মা আমি গেলাম তোদের ভাল করতে, আর তোরা কি না! পুঁচকে ছোঁড়াটা যেন কেউটের বাচ্চা!

আসল কথা দু'দিকে জ্বালা হল তাঁর।

হঠাৎ অতসী কাজটা ছেড়ে আসায় সন্দেহাকুল মনে গিয়েছিলেন তল্লাস নিতে, ভেবেছিলেন খুব একটা কিছু ঘটে গেছে বোধ হয়।

কিন্তু, এমন আর কি!

হ্যাঁ, বুঝলাম ভাল ঘরের মেয়ে। ছেলেটাকে মানুষ করে তোলবার জন্যে শরীর পতন করতে বসেছে, চাকর রাখা কথাটা ভাল লাগে নি। তাই বলে ঝপ করে কাজটাই ছেড়ে দিবি? সুরেশ্বরী হাত ধরে কেঁদেছিলেন।

'তুমি যেমন করে পারো তাকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে এসো বাপু। সেবার হাতটি তার বড় ভাল। এমনটি আর পাব না। আর যে আসবে, সেই তো হবে কি না কি জাত! এমন ভাল জাতের মেয়ে—'

হরসুন্দরী ভেবেছিলেন, অনুরোধ উপরোধের জাল ফেলে মাছকে টেনে তুলবেন।

উপরোধে ঢেঁকি গেলান যায়, আর এত ছানার মণ্ডা। অভাবের জ্বালায় মান অভিমান কতক্ষণ থাকে? নিজের ওপর অগাধ আস্থা ছিল হরসুন্দরীর।

বলেই এসেছিলেন সুরেশ্বরীকে, 'আচ্ছা আমি ওকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে আসব আবার। ভাল ঘরের মেয়ে তো, মান অপমান বোধটা একটু বেশি।'

কিন্তু এখন তাদের কী বলবেন?' উপরোধ করার স্পৃহা তো আর নেই হরসুন্দরীর।

এই ঢেঁটা ছেলেটা তার চিত্ত বিষ করে দিয়েছে। তাই একমনে দিন গুনছেন তিনি মাস কাবারটা কবে হয়। কবে ভাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার দায়ে ওই আঝাড়া বাঁশ ছু'খানাকে ঘরছাডা করেন।

গরিবের উপকার করতে বুক বাড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি গরিব গরিবের মত নত থাকে। গরিবের অহঙ্কার অসহ্য।

হরসুন্দরী মাস কাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে আছেন, কিন্তু অতসীর যে দিন কাটে না। তার স্বল্প সঞ্চয় ভাড়ারের সব কিছুই তো শেষ হয়ে গেছে। কাল পর্যন্ত চালটা ছিল, আজ তাও নেই।

চাল নেই!

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী চালের শূন্য কলসীটার সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী কাঁদবে? না হেসে লুটিয়ে পড়বে?

কলসীটা নেড়ে নাচাতে নাচাতে এসে বলবে, 'ওরে সীতু কী মজা! আজ আর বেশ রান্না করতে হবে না। বেশ কেমন যত ইচ্ছে ঘুমাবো মজা করে।'

হ্যাঁ, সেই কথাই বলতে গিয়েছিল অতসী।

সত্যিই কলসীটা হাতে করে গিয়েছিল।

নাচাতে নাচাতে বলেওছিল, 'ওরে সীতু আজ কী মজা! আজ

আর রাঁধতে হবে না আমায়—'

কিন্তু এত হাসি যে কোথা থেকে এল অতসীর ?

প্রগল্‌ভ প্রবল হাসি !

সেই হাসির ধমকে মাটির কলসীটা হাত থেকে ছিটকে গড়িয়ে ভেঙেই পড়ল একদিকে। আর অতসী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এক ঝাঁক স্কুলের মেয়ে একত্রে থাকলে যেমন করে তুচ্ছ কথায় হেসে লুটোপুটি খায়, একা অতসী তেমনি লুটোপুটি খাবে না কি ?

এই হাসির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কবিহ্বল একজোড়া দৃষ্টি যেন পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আর ঠিক এই সময় হরসুন্দরী দরজায় এসে দাঁড়াল, তাঁর বড় মেয়েকে নিয়ে।

মহিলা দুটি ঘরের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি একেবারে যাকে বলে অবলোকন করে গালে হাত দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁ গা, ব্যাপার কি ! ও খোকা, মা পড়ে গিয়ে কাৎরাচ্ছে নাকি গো !'

খোকা অবশ্য এক ডাকে কথা কয় না, এখনো কইল না।

হরসুন্দরী এগিয়ে এসে বলেন, 'অ সীতুর মা, কাৎরাচ্ছো কেন ? কলসীটাই বা ভেঙে গড়াচ্ছে কেন, মায়ে ছেলের মুখে রা নেই যে।'

এবার ছেলে 'রা' কাড়ে।

স্বভাবগত তীব্র স্বরে বলে, 'কাৎরাবেন কেন ? হাসছেন।'

'হাসছেন !'

মা মেয়ে দু'জনে বোধকরি হাঁ করে হাঁ বন্ধ করতে ভুলে যান।

কিন্তু অতসী উঠে পড়ছে না কেন ? কেন উঠে পড়ে বলছে না, 'বোকাটার কথা শুনছেন কেন মাসীমা ! হঠাৎ পেটটা বড্ড ব্যথা করছে বলে !…ওই ব্যথার দাপটেই হাত থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে—'

না অতসী উঠছে না। মাটিতে মুখ গুঁজেই পড়ে আছে সে। সে দেহটা যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেটা স্থির হয়ে গেছে।

হরসুন্দরী যদিও নিজের মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই বিদ্বেষবাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু আপাতত দেখা গেল মায়ে ঝিয়ে একতার অভাব

নেই। মেয়েও অবিকল মায়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে, 'হঠাৎ এত হাসির কি কারণ ঘটল যে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে হচ্ছে? সিদ্ধি খেয়েছ না কি গো অতসী?'

'তোমরা সববাই এত অসভ্য কেন?' সীতুর স্বর আরও তীব্র, 'কলসীতে চাল নেই, রাঁধতে হবে না বলে মা হাসছেন। সিদ্ধি! সিদ্ধি মানুষে খায়? শুধু তো দারোয়ানরা খায়।'

সহসা মাতা কন্যা চুপ করে যান, এবং পরস্পর একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। আর মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে হরসুন্দরীর চোখে যে আলোটি ফুটে ওঠে, সেটি প্রেমেরও নয়, করুণারও নয়, স্রেফ—জয়োল্লাসের।

সেই আলোঝরা চোখে বলে ওঠেন হরসুন্দরী, 'তোমাদের রঙ্গলীলা তোমরাই জানো। ঘরে চালের দানা নেই, মেজাজ চালে মট্‌মট। এই অবধি বুড়ি কী খোসামোদটাই করল আমাকে। তোমাদের মতিগতি দেখে আব বলে অপমান্যি হলাম না। এতদিনে তারা হতাশ হয়ে অন্য লোক রাখল। যাক গে—মরুক গে! ভেতরের কথা তোমরাই মায়ে পোয়ে জানো। আমার কথা বলে যাই। ভাড়া না নিয়ে ভাড়াটে পুষি এমন সঙ্গতি আমার নেই। মাসের আর দু'দিন মাত্র আছে, এর মধ্যে অন্য ব্যবস্থা করে ফেল, পয়লা থেকে আমার মেয়ের ভাগ্নী এসে থাকবে। এর যেন আর নড়চড় না হয়।'

দুম দুম করে চলে আসেন দু'জনে। কিন্তু দোষ হরসুন্দরীকে দেওয়া যায় না। এক অসহায়া বিধবাকে দেখে তাঁর মায়া পড়েছিল। ওদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টাও কম করেন নি। কিন্তু মায়া যে নেয় না, ভাল যে চায় না, তার ওপর কতক্ষণ আর কার চিত্ত প্রসন্ন থাকে? তার উপর আজকের এই পরিস্থিতি।

বলতে এসেছিলেন অবশ্যি বাড়ি ছাড়ারই কথা। কিন্তু রয়ে বসে আর একবার শেষ চেষ্টা দেখে বলবেন ভেবেছিলেন। ও মা এ আবার কী ঢং! ঘরে চাল নেই, রান্নার ছুটি বলে আহ্লাদে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে! হয় পাগল, নয় তলে তলে অন্য ব্যাপার! হয়তো আসলে

গরিব নয় ঘর ভেঙে পালিয়ে টালিয়ে এসেছে। আবার হয়তো ফিরে যাবে। তবে আর মায়া করার কী দরকার?

মেয়ে বলে, 'তুমি মোটেই আশা কোর না মা, যাবে। দেখো—ও ঠিক ঘর কামড়ে পড়ে থাকবে।'

হরসুন্দরী থম থমে গলায় বলেন, 'নাঃ, সেদিকে তেজ টনটনে। ছেলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবে, তবু মচকাবে না।'

হ্যাঁ, হরসুন্দরী বাড়িওয়ালী চিনেছিলেন অতসীকে। মানুষ চেনবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

'এই তালাচাবিটা রইল মাসীমা, ঘরটা ধুয়ে রেখে গেলাম।' বলে ভাঙা নড়বড়ে সেই তালাটা হরসুন্দরীর কাছে নামিয়ে দিয়ে একটা নমস্কারের মত করে অতসী।

হরসুন্দরী নীরস গলায় বলেন, 'আশ্রয় একটা জোগাড় করেছ, না তেজ করে ছেলের হাত ধরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ?'

অতসী ঈষৎ হেসে বলে, 'আপনাদের আশীর্বাদই আশ্রয় মাসীমা, উপায় হবেই যাহোক একটা কিছু।'

হরসুন্দরী নিশ্বাস ফেলে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'ধর্মে মতি থাক ছেলেটা মানুষ হোক। তবে এও বলি অতসী, তোমার যত দুগগতি ওই ছেলে থেকেই। ওর চেয়ে এক গণ্ডা মেয়ে থাকাও ভাল।'

মেয়ে সম্পর্কে বিরক্তি-পরায়ণা হরসুন্দরী আজ এই রায় দিয়ে বসেন।

আর কি শোনবার আছে? আর কি বলবার আছে?

এখন শুধু দেখতে বেবোনো পৃথিবীটা কত ছোট।

না, মাস পয়লায় হরসুন্দরীর মেয়ের ভাগ্নী এসে ভাড়াটে হল না তাঁর। ওটা ছল। ঘরটা শূন্য পড়ে রইলো আরও দশ বিশ দিন। এ ঘরের উপযুক্ত খদ্দের আমার জোটা চাইতো?

কিন্তু পয়লা তারিখে হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর ওপর একটা মস্ত ধাক্কা এসে লাগল। ওই সরু বাই লেনের মুখে এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একখানা গাড়ি। আর সেই গাড়ি থেকে রাজার মত চেহারার একটা

মানুষ নেমে এল। খুঁজল হরসুন্দরী বাড়িয়ালীকে।

আচ্ছা, তাঁর সীমানা কি ওইটুকু পর্যন্তই ছিল? তা'হলে হরসুন্দরী অমন করে কপালে করাঘাত করেছিলেন কেন?

'এই ঘর বাবা! দুদিন আগেও ছিল। হঠাৎ কী মতি হল—'

নিজের দুর্মতির কথাটা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না হরসুন্দরী। সেটা মনের মধ্যে পরিপাক করে তুষের আগুনে জ্বলতে থাকেন।

কী কুকাজই করেছেন!

আর দুটো দিনও যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন তা'হলে আজকের এই নাটকটা কতখানি জমে উঠত এক বার প্রাণ ভরে দেখে নিতেন।

তা' কি করেই বা জানবেন হরসুন্দরী যে বলতে মাত্রই পরদিন সকাল বেলাতেই দম্ভ দেখিয়ে চলে যাবে ছুঁড়ি দুটো দিনও থাকবে না!

আহা-হা ইস!

এই রাজার মত মানুষটা তাকে খুঁজতে এসে ফিরে যাচ্ছে!

এবারে বোঝাই যাচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে চলে আসা নিছক রাগের ব্যাপার। যা তেজ যা রাগ! এই মানুষটা অতসীর কি রকম আত্মীয় সেটা জানবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে থাকেন হরসুন্দরী। এই হোমরা-চোমরা দার্ঘদেহ সাহেবী পোশাক পরা লোকটাকে জিগ্যেস করতে সাহস হয় না। তবু মনে মনে অনুভব করেন, হয় বড় ভাই নয় ভাসুর। তা' ছাড়া আর কি হতে পারে? ভাসুর হওয়াই সম্ভব, ভাই হলে যতই হোক চেহারায় আদল থাকত।

'কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি?'

'নাঃ!' হরসুন্দরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন, 'মানুষকে তো মনিষ্যি জ্ঞান করে না! কেমন যে একবগ্‌গা জেদী মেয়ে!'

একবগ্‌গা জেদী! সে কথা মৃগাঙ্কর চাইতে আর বেশি কে জানে!

ঘরটা এমন কিছু বিশাল বিস্তৃত নয় যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখা যায় না, বলতে গেলে তো এ দেওয়ালে ও দেওয়ালে হাত ঠেকে তবু মৃগাঙ্ক সহসা চৌকাঠের মধ্যে পা রাখলেন।

দেখতে চেষ্টা করছেন কি, দুদিন আগেও যারা এঘরে ছিল, তাদের উপস্থিতির রেশ এখনো এর মধ্যে সঞ্চরণ করে ফিরছে কিনা? না তা নয় মৃগাঙ্ক শুধু অস্ফুট একটা শব্দে শিউড়ে ওঠাটা দমন করলেন।

এই ঘরে বাস করে গেছে অতসী। এই দুদিন আগে পর্যন্ত ছিল।

রাত্রে দরজা বন্ধ করলে তারের জাল ঘেরা ঘুলঘুলির মত ওই জানালাটা ছাড়া নিঃশ্বাস ফেলার দ্বিতীয় আর পথ নেই, আর সেই পথ থেকে উঠে আসছে নীচের কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধবাহী বাতাস।

কিন্তু এত বিচলিত হচ্ছেন কেন মৃগাঙ্ক, সুরেশ রায়ের বাড়ি কি তিনি দেখেন নি?

তবু ব্যাকুল মৃগাঙ্ক ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'যদি কোন দিন আসে, যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয়, বলবেন, তার যে ছোট্ট বাচ্চা একটা মেয়ে আছে, তার খুব বেশি অসুখ—'

মেয়ে!

কথা শেষ করতে দেন না হরসুন্দরী, চমকে উঠে গালে হাত দেন, 'মেয়ে! বলেন কি বাবা? মেয়ে আছে তার? আপনি যে তাজ্জব করলেন আমাকে! ছেলের থেকে ছোট মেয়ে! সেই মেয়ে ছেড়ে—'

মৃগাঙ্ক বোধকরি এবার সচেতন হন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ! দুর্ভাগা শিশু! যাক্ যদি কোন রকম যোগাযোগ—আচ্ছা—একদম একা গেছে? না কোন—'

'না বাবা, কেউ না। একেবারে একা। মায়ে ছেলে দুজনে চলে গেল একটা রিকশ ডেকে। তাই সে রিকশর ভাড়াটাই যে কি করে দেবে ভগবান জানেন? ঘরে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। আপনাদের মতন এমন সব আত্মীয় থাকতে—'

মৃগাঙ্ক ততক্ষণে উঠোনে নেমেছেন। না, মৃগাঙ্কর পক্ষে সম্ভব নয় নিজেকে এর থেকে বেশি ব্যক্ত করা, যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক অন্তর।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! দুদিন আগে এলেন না মৃগাঙ্ক!

খুকুর টাইফয়েড্। খুকু প্রবল জ্বরের ঘোরে 'মা মা' করছে, এ শুনলেও হয়তো কাঠ হয়ে বসে থাকত সেই পাষাণ মূর্তি! বলত,

'খুকুর মা অনেকদিন আগে মরে গেছে।' হয়তো তাই বলত।

জ্বরে আচ্ছন্ন খুকুকে নার্সের কাছে রেখে এসেছেন মৃগাঙ্ক। আর স্বেচ্ছায় এসে বসে আছে সেই মেয়েটা। যে মেয়েটা সুরেশ রায়ের ভাইঝি।

গতকাল খুকুর একটা 'টাল' গেল। শহরের সেরা সেরা ডাক্তারের ভিড় হয়ে উঠল বাড়িতে, নার্সের উপর নার্স এল। আর সহসাই সেই সময় ওই মেয়েটা খুকুর খবর নিতে এল। পথে এ বাড়ির কোন ঝি চাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুনেছে খুকুর অসুখ।

ভাবলে অবাক লাগে, সেই কাল থেকে মেয়েটা মৃগাঙ্কর বাড়িতেই রয়ে গেল। নার্সের সঙ্গে মিলেমিশে দেখাশোনা করতে লাগল খুকুকে।

মৃগাঙ্গ অস্বস্তি বোধ করে বারবার অনুরোধ করেছেন বাড়ি ফিরে যেতে, তার যে একটা ছোট ছেলে আছে—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শ্যামলী কিন্তু গ্রাহ্য করেনি ব্যাপারটা। বলেছে ছেলে তার যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটা কত সহজে সহজ হয়ে গেল। পরের বাড়ি থেকে গেল। সময় মত চান করে খেয়ে নিল, 'কাকাবাবু আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে—' বলে জোর করে পাশের ঘরে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিল মৃগাঙ্ককে। কোথাও ঠেক্ খেল না। সরল—মানে বোকা! আর বোকা বলেই হয়তো বা নিজের জীবনকে কোনদিন জটিল করে তুলবে না।

হয়তো মৃগাঙ্কর ভাবনাই ঠিক।

অতসী আর অতসীর ছেলের বুদ্ধি প্রখর, তাই ওরা জীবনকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে।

নইলে খেটে খাওয়া ছাড়া যার জীবনে আর কোনও গতি রইল না, সে তুচ্ছ একটু অভিমানের বশে সুরেশ্বরীর কাজটা ছেড়ে দেয়।

সে তো তবুও মোটা মাইনের সম্ভ্রম ছিল।

এখন যে 'খাওয়া পরা রাঁধুনীর' কাজ।

হ্যাঁ তাই মেনে নিতে হয়েছে। ঘণ্টা কয়েকটার মধ্যে আহার আর আশ্রয় জোগাড় করবার এছাড়া আর উপায় কি?

এই যে জোগাড় হয়েছে সেটাই আশ্চর্য। এমন হয় না। রিকশা করে অনেকটা দূর এগিয়ে অতসী হঠাৎ একটা গেটওয়ালা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেকে বলেছিল, 'দাঁড়া তুই এই জিনিসপত্র আগলে, আমি আসছি।'

আর একটু পরে বেরিয়ে এসে ছেলেকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, 'আয়।'

'এখানে কি! সীতু আড়ষ্ট হয়ে হয়েছিল, 'এরা তোমার চেনা?'

'না! চেনা করে নিতে হবে। করে নিলাম।'

অতসীর অনেক ভাগ্য যে ঠিক যে সময় বাড়ির গিন্নী রাঁধুনীহীন অবস্থায় 'কারে' পড়ে রয়েছেন, সেই সময় অতসী গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল, 'রান্নার লোক রাখবেন?'

রান্নার লোক!

গিন্নী ভাবলেন তাঁর আকুল প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান কি ছদ্মবেশিনী কোন দেবীকে পাঠিয়ে দিলেন। বিহ্বলতা কাটতে কিছুক্ষণ গেল। তারপর থতমত সুরেই বললেন, 'রাখব তো, লোকের তো দরকার। কিন্তু তুমি কে কি বৃত্তান্ত না জেনে—'

অতসী মনকে দৃঢ় করে এনেছে. এনেছে স্নায়ুকে সবল করে। তাই স্পষ্ট গলায় বলে, 'আমাকে দেখে কি আপনার চোর ডাকাত অথবা খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে?'

'না না খারাপ কেন? সরস্বতী প্রতিমাখানির মত তো চেহারা। তা বলছি না। মানে—'

'মানে ভাববার কিছু নেই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার জন্যে কোন বিপদে পড়তে হবে না আপনাকে।'

'তা' তুমি হঠাৎ এমন ভাবে কোথা থেকে—'

'বুঝতেই পারছেন খুব একটা অসুবিধেয় না পড়লে এভাবে মানুষ আসে না। সেইটা মনে করে আমার সম্বন্ধে বিচার করবেন।'

আঘাত খেয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে অতসী, শিখেছে কথা বলতে।

'তা' বেশ, থাকো তবে। আজ থেকেই থাকো। রান্নাটান্না জানো তো?

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'চালিয়ে নেব।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে জানো। তা মাইনে টাইনে—'

এবার অতসী আরও বুক শক্ত করে ফেলেছে। তাই অবলীলার ভানে বলে, মাইনে লাগবে না, তার বদলে আমার ছেলের ভার নিতে হবে।'

'ছেলে।'

গিন্নীর মুখটা পাংশু হয়ে যায়। 'ছেলে আছে।'

অতসী শান্ত দৃঢ় স্বরে বলে, 'হ্যাঁ। ছেলে না থাকলে শুধু নিজের জন্যে কে অপরের দরজায় দাঁড়াতে আসে বলুন? পৃথিবীতে মৃত্যুর উপায়ের অভাব নেই।'

গিন্নী আরও থতমত খেয়ে বলেন, 'কিছু মনে কোর না বাছা, মানে কর্তাকে না জিগ্যেস করে ছেলের বিষয়—'

'তিনি বাড়ি নেই?'

'আছেন। ওপরে আছেন। বেশ তুমি বোসো, জিগ্যেস করে আসি। কত বড় ছেলে?'

'ক্লাস সিক্সে পড়ে।'

''ওমা তাহলে তো বড় ছেলে।'

গিন্নী অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'দেখে তো তোমায় খুব ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে, এ অবস্থা কত দিন হয়েছে?'

অতসী মাথ, নীচু করে বলে, 'ওকথা জিগ্যেস করবেন না।'

ভদ্রমহিলা আসলে ভদ্র-প্রকৃতি।

এবং অতসীর মধ্যে তিনি সাধারণ রাঁধুনীর ছাপ দেখতে পাননি বলেই আকর্ষিত হলেন। ভাবলেন ঠাকুর মুখপোড়া যদি দেশ থেকে আসে তো একে ঘরের কাজের জন্যে রাখব। বাড়ির মেয়ের মত থাকবে। ছেলেটা? তা ওর মাইনের বদলে তো ছেলেটার ইস্কুলের

মাইনে আর খাওয়া দাওয়া একটু বেশি পড়বে বটে। থাক্‌, ভদ্রঘরের মেয়ে বিপাকে পড়েছে।

মিনিট তুই তিন পরেই নেমে এলেন তিনি, বলেন, 'কর্তার অমত নেই। তা'লে ছেলেকে নিয়ে এস। কখন আসবে?'

'এখনই।' বলে বেরিয়ে গেল অতসী।

কর্তা গিন্নীর বয়েস হয়েছে। মেয়ে নেই, আছে তুটি বিবাহিত ছেলে। তুটিই বিদেশে কাজ করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে বছরে একবার ছুটিতে আসে। বাকী সময় কর্তা গিন্নী এত বড় বাড়িটায় একাই থাকেন। চাকর বাকর নিয়েই সংসার।

অবস্থা ভাল, তাই সাধারণ নিয়মে গিন্নীর হার্টের অসুখ, বাতের কষ্ট। রান্নার লোক বিহনে তুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠেন।

অতসীকে দেখে তাঁর মনটা আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। বৌর চলে গিয়ে পর্যন্ত এমনি ঘরের মেয়ের মত একটি ভদ্র মেয়ে তাঁর কল্পনার জগতে ছিল।

কর্তাও এক কথায় রাজী হয়ে যান। বলেন 'নাতিপুতি কেউ তো থাকে না, একটা ছেলে থাকুক পড়ালেখা করুক, ভালই।'

আশ্রয় জুটল। নিরাপদ আশ্রয়। ভাল ঘর, সৎ পরিবেশ। আর তবে কিছু চাইবার নেই অতসীর?

গভীর রাত্রে তখন সীতু ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। হ্যাঁ, দোতলাতেই ঠাঁই পেয়েছে সে। গিন্নী বলেছেন, নীচে চাকর বাকরের আড্ডা। ওখানে আমি তোমাকে থাকতে দিতে পারব না বাছা, ওপরেই আমাদের ঘরের কাছাকাছি থাকো। সকল ঘর দোরই তো পড়ে।

বারান্দার কোণে ছোট একটা ঘরে মা ছেলে আশ্রয় পেল।

রাত্রে যখন ঘুম আসেনা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। নিজেকে যেন আর সেই হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর ভাড়াটের মত দীন হীন মনে হয় না, আর সেই সময় ভাবতে থাকে অতসী। তাহলে আর কিছু চাইবার রইল না তার? এই পরম পাওয়ার ভেলায় চড়ে সমুদ্র পার

হবার সাধনা করে চলবে? পৃথিবীর আরো অসংখ্য দুঃখী মেয়ের মত দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে কোন রকমে বড় করে তুলবে, তারপর ছেলের উপার্জনের ভাত খেয়ে মনে করবে জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান মিলল তবে? মিলল দীর্ঘ সংগ্রামের পুরস্কার?

জীবনে মৃগাঙ্ক বলে কোনদিন কোন এক দেবতার দর্শন মিলেছিল সে কথা নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে হবে সমস্ত চেতনা থেকে। আর তুলোর পুতুলের মত সেই একটা জীব যে কোনদিন পৃথিবীতে এসেছিল, একেবারে ভুলে যেতে হবে সে কথা।

আশ্চর্য! তবু বেঁচে থাকবে অতসী। এখনো বেঁচে আছে। সহজ সাধারণ মানুষের মত খাচ্ছে ঘুমচ্ছে, নিশ্বাস নিচ্ছে, কথা বলছে, এমন কি হাসছেও।

সেই তুলোর পুতুলটার কোন বার্তা আর কোনদিন জানতে পারবে না। সে বার্তা নিয়ে যে অতসীর দরজায় দাঁড়াতে এসেছিল একজন, জানতেও পারল না অতসী।

হরসুন্দরী বাড়িওয়ালী অতসীদের 'খবর 'খবর' করে হাঁপিয়ে মরলেন, অথচ এ বুদ্ধিটুকু মগজে আনতে পারলেন না, সীতুর স্কুলে একবার খোঁজ করে দেখলে হত! অতসীর যে একটা মেয়ে আছে, তার বাড়াবাড়ি অসুখ শুনলে কী করত অতসী সেটা আর দেখা হ'ল না হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর।

'বেইমান! মস্ত বেইমান! ভাবলেন হরসুন্দরী। নইলে এত যে উপকার করলেন তিনি, সে সব ভস্মে গেল। এত টুকু কি একটু বললেন, বড় হয়ে উঠল সেইটাই? একবার কি দেখা করতে আসতে পারত না?

অতসীও স্তব্ধ রাত্রে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে সীতু অকৃতজ্ঞ, সীতুর মা-ই বা অকৃতজ্ঞতায় কী কম যায়। নইলে শ্যামলীর কাছ থেকেও নিজেকে লুপ্ত করে নিল কি করে? শ্যামলী হরসুন্দরীর বাড়ি জানত, এ বাড়ির সন্ধান পাবার উপায় তার নেই।

কিন্তু চিঠি লিখে ঠিকানা জানাবে অতসী কোন পরিচয় বহন করে?

শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ির রাঁধুনী ?

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশে নক্ষত্রের সভা। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে কেমন একটা ভয় ভয় আর মন ঝিম ঝিম করা অনুভূতি আসে। তেমনি অনুভূতিতে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থেকে অতসী ভাবে, এমন করে হারিয়ে গিয়ে, আবার কোনদিন কি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে ?

ছেলেকে তো দৃঢ়চিত্তে শাসন করেছিল সে সেদিন, 'মরে যাব কেন ? মরে গেলেই তো হেরে যাওয়া হ'ল। তোমাকে মানুষ হতে হবে, মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর উপযুক্ত হতে হবে।'

কিন্তু কবে সেই উপযুক্ততা আসবে সীতুর। আর যখন আসবে তখন কি তারা অবিকল থাকবে! যাদের সামনে উঁচু মাথা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানোর মূল্য ?

যদি তা না হয়, যদি এই হারিয়ে যাওয়া দিন থেকে কূলে উঠে দেখে অতসী, যাদের দেখবার জন্যে এই কাঁটাবনের সংগ্রাম, তারাই গেছে হারিয়ে ? আর সেই পুতুলটা—

অসম্ভব অসহ্য একটা যন্ত্রণায় মাথাটা দেওয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করে অতসীর। ইচ্ছে করে 'খুকু খুকু' করে চীৎকার করে কাঁদে।

কিছুই করতে পারে না।

শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে উর্ধ্বলোকের নক্ষত্র সভায়।

মৃগাঙ্ক কি কোন দিন রাত্রে জেগে থাকেন ? তাকিয়ে থাকেন ঐ আকাশের দিকে ?

কিন্তু যদি বা থাকেনই—সে খবর জানবার দরকার কি শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ির রাঁধুনীর ?

বর্ষা যায় শরৎ আসে, গাঙ্গুলীদের 'মেয়ের মতন' রাঁধুনীর দিন কাটে মৃদু মন্থরে। ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত ছন্দ, 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার' একটানা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে।

কাজের চাপ বেশি থাকলেও বুঝি ছিল ভাল, তাতে তাল উঠত

কত। কিন্তু এঁদের সংসার ছোট, চাহিদা কম, পুরনো চাকর আছে সে প্রায় সবই করে, অতসীর অনেক অবসর।

কিন্তু সে অবসরকে কাজে লাগাবার সুবিধে কোথায়? অতসী ভাবে, আমি কি আবার লেখাপড়া করব? আমি কি চেষ্টা করে কোথাও সেলাই শিখব? আমি কি আমার আয়ত্তাধীন বিদ্যে পশম বোনাটাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করব? একটা কিছু না করে কি করে কাটাবো আমি? আর কতদিন বহন করব এই রাঁধুনীর পরিচয়।

ভাবে, ভেবে ভেবে উত্তাল হয়ে ওঠে তার দিনের অবসর, বিনিদ্র রাত্রি মর্মরিত হয়ে ওঠে সে ভাবনার দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারে না। ভয়ঙ্কর এক ভয় গ্রাস করে থাকে তাকে, পথে পা বাড়াতে দেয় না।

এ তো হরসুন্দরীর পাড়ার সর্পিল গলি নয়, এটা বড় রাস্তা। আর জীবনের সম্ভ্রম খুঁজে নিতে পা বাড়াতে হলে তো বড় রাস্তার পথ ধরেই চলতে হবে।

কিন্তু বড় রাস্তায় পা ফেলতে যে সেই দুর্দমনীয় ভয়। যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দেখা হয়ে গেলে কী হয়!

অনেক দিন ভেবেছে অতসী, আর ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলেছে। কী হয়, সেটা আর সম্পূর্ণ একটা ছবিতে পরিণত করতে পারেনি।

খেই হারাতে হারাতে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত জীবন। শ্লেট পাথরের মত একটা বিবর্ণ ভারী ভারী অনুভূতি ছাড়া সবই যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে এ বাড়ির রাঁধুনী ছাড়া আর কোন পরিচয় অতসীর ছিল।

তা এমন অতীত হারানো বিস্মৃতির কুয়াশা অনেক মেয়ের জীবনেই তো ক্রমশঃ পাকা বনেদ নিয়ে বসে। বিদেশে বাসায় রাজার হালে কাটাতে কাটাতে হঠাৎ ওঠে কালবৈশাখীর ঝড়, তচনচ করে উড়িয়ে নিয়ে যায় পাখির বাসাটুকু, ভাগ্যহতের পরিচয় সর্বাঙ্গে বহন করে এসে আশ্রয় নিতে হয় তাদের কাছে, যারা এ যাবৎ তার সুখসৌভাগ্য

আনন্দের থেকে ঈর্ষা অনুভব করেছে বেশি। সেখানে গৃহকর্মের সমস্ত দায় মাথায় নিয়ে সেই মেয়েকে টিকে থাকতে হয় সংসার নামক বৃক্ষের শাখায়। যদি তাকে টিকে থাকাই বলা হয়।

তখন, সেই দাস্যবৃত্তির অন্তরালে কোন দিন কি কখনো মনে পড়ে একদা অনেক সুখ তার হাতের মুঠোয় ছিল?

ভুলে যায়। অতসীও ক্রমশঃ ভুলছে। ভুলছে বললে ঠিক বলা হয় না, মনে আনার চেষ্টাই করছে না। কেন করবে, অতসীকে তো তার ভাগ্য প্রত্যক্ষ আঘাত হানেনি। আপাতদৃষ্টিতে তো দেখলে মনে হয় অতসী নিজেই হাতের মুঠো আলগা করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে তার সুখ, তার জীবন।

তাই অতসীর অনেক ভয়। ভয়, যদি পথে বেরিয়ে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যেতে হয় সেই অনেক সুখের অতীত জীবনের সঙ্গে।

কিন্তু অতসী কি বুঝতে পারে সীতুও আজকাল ওই একই রোগে ভুগছে। ওই ভয় রোগে। 'যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!' এই আতঙ্কে সীতু স্কুলে যায় আসে প্রায় চোখ বুজে।

না, অতসী জানে না। সে দিনের সে কথা সীতু অতসীকে বলে নি। তা কবে আর কোন কথা মার কাছে বলে সীতু? তাই সেদিন বলবে পথে কী ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটেছিল? সেদিন সীতু শুধু আরক্ত মুখ আর ভয়ঙ্কর ওঠা পড়া বুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। আর অতসীর ব্যাকুল প্রশ্নে বলেছিল 'রাস্তায় পড়ে গেছি।'

অতসী কি করে জানবে সেদিন স্কুল থেকে বেড়িয়ে মোড় পার হবার মুহূর্তে সীতুর পাশ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল একখানা ভয়ঙ্কর পরিচিত মোটরগাড়ি। আর তার চালকের আসনে যে বসেছিল সে সীতুর দিকে চোখ ফেলেনি বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সীতু।

হ্যাঁ, সে লোকটার এদিক-ওদিক কোনদিকেই যেন দৃষ্টি ছিল না।

গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন বিশ্বাস হয়নি সীতুর, যা দেখল সত্যি কি না, অথচ ভেবে দেখলে

সত্যি হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

আশ্চর্য নয়, তবু দাঁড়িয়ে রইল মিনিটের পর মিনিট।

ও যে কোথায় ছিল, কোথায় যাচ্ছিল, সবই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই অদ্ভুত মুহূর্তগুলিতে। চেতনার জগতে ফিরে এল ঘাড়ের ওপর একখানা ভারী হাতের থাবার চাপে আর একটা দুর্বোধ্য চীৎকারে—

চমকে পিছন ফিরে কাঠ হয়ে গেল সীতু।

হরসুন্দরী বাড়িওয়ালী।

তীব্রস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'ও সর্বনেশে ছেলে, এখনো তোরা এ তল্লাটেই আছিস? আর আমি—'

'আঃ লাগছে ছেড়ে দিন—'

সীতু কাঁধটায় ঝাঁকুনি দিয়ে সেই ভারী থাবার কবলমুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু থাবাটি বড় শক্ত ঘাঁটি। তাছাড়া হরসুন্দরী তখন রাগে দুঃখে আবেগে উত্তেজনায় মরীয়া। তিনি বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'এইখানেই আছিস! এখনো এই ইস্কুলেই পড়িস! ও মা আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে গো! অতবড় একটা মান্যি-মান লোক রোজ আসছে আমার দরজায় তোদের তল্লাস নিতে, রোজ আমি লজ্জায় অধোমুখ হয়ে যাচ্ছি, দিতে পারছি না একটা খবর। বলি কী ব্যাপার তোদের? অতবড় গাড়ি চড়ে অমন মানুষটা হ্যাং হ্যাং করতে করতে আসে তোদের মা ব্যাটার খবর নিতে, আর তোরা ঘাপটি মেরে বসে আছিস এখানেই? হা আমার কপাল! বলি তোর মার এত তেজ কেন বলতো?'

'চুপ করুন। আপনাকে মার কথা বলতে হবে না।'

'না তা তো হবেই না। যেমন তুমি আর তেমনি তোমার মা! এদের জন্যে আবার মানুষ খবর খবর করে খুঁজে বেড়ায়! আমি হলে তো—'

সীতু হঠাৎ কেমন শিথিল ভাবে বলে, 'কে খুঁজতে আসে?'

'কে তা তোমরাই জানো। তোমার মামা-দাদা কি জ্যাঠা-খুড়ো। হোমরাচোমরা চেহারা, তাই দেখি। এই নিত্যদিন আসছে, খবর আছে কিনা।'

আমিও আজ শুনিয়ে দিয়েছি, 'তারা খবর দেবার লোক নয় মশাই, বেইমানের ঝাড়। মিথ্যে আপনি আশা করছেন। যে মেয়েমানুষ কোলের কচি মেয়ে ফেলে তেজ করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে—'

'ছেড়ে দিন।' কাঁধ ছাড়িয়ে পথে নামে সীতু।

আর হরসুন্দরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনেক বিষাক্ত রস মিশিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'এই শোন ছোঁড়া, শুনে যা। সেই আহাম্মুক লোকটা বলে গেছে যদি তোদের সঙ্গে দেখা হয় তো—যেন জানাই তোর মার কোলের সেই কচিটার মরণ-বাঁচন অসুখ। বুঝলি? যায় যায় অবস্থা। বাড়িতে দিন দশটা করে ডাক্তার আসছে।'

প্রতিহিংসা চরিতার্থের বিষাক্ত আনন্দে হাঁপাতে থাকেন হরসুন্দরী। আর সীতু? সে যেন হঠাৎ স্থানু হয়ে যায়। ভুলে যায় সে পুতুল নয়। কিছু না হোক নিশ্বাস ফেলাও তার একটা ডিউটি।

যখন চেতনা ফেরে, দেখে অনেক দূরে হরসুন্দরীর পিঠের চাদরটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

সীতু কি ছুটে যাবে? ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলবে, 'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শিগগির!'

না সীতু ছুটে যেতে পারে না। বলতে পারে না।

শুধু তার সমস্ত প্রাণ আছড়াপিছড়ি খায় সেই প্রশ্নটার ওপর।

'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শিগগির!'

তবু অতখানি যন্ত্রণার ভার নিজের মধ্যে সংহত রেখেছিল সে: বাড়ি এসে বলেছিল রাস্তায় পড়ে গেছি।

কিন্তু মাকে যা হোক বলে বোঝানো যত সহজ, নিজেকে বোঝানো কি তত সহজ? প্রত্যেকটি মুহূর্ত যে ছুঁচের মত ফুটিয়ে ফুটিয়ে একটা কথা উচ্চারণ করছে, 'সেটার মরণ-বাঁচন অসুখ!'

তুলোর পুতুলের মত গোলগাল থ্যাঁদা থ্যাঁদা সেই ছোট্ট মানুষটারও ওই রকম ভয়ানক বিচ্ছিরি একটা অসুখ করতে পারে? হরসুন্দরী যাকে বলে 'মরণ-বাঁচন'।

আর যদি শেষের কথাটা আর না থাকে? শুধু প্রথম কথাটাই—

শিউরে কেঁপে ওঠে সীতু, আর ভাবতে পারে না। সেই বিশেষ একটি রাস্তার উপরকার বিশেষ একখানি বাড়ি তীব্র একটা আকর্ষণে অহরহ টানতে থাকে চির-নির্মম চির-উদাসীন একটা বালক চিত্তকে। অথচ পথে বেরোতে তার ভয় করে পাছে দেখা হয়ে যায় কারো সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য রহস্য! সীতু কি স্বপ্নে এমন কোন মন্তর পেয়ে যেতে পারে না যাতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়, আর উড়ে যেতে পারা যায়—যেখানে ইচ্ছে ?

যে ভগবানকে মানে না সেই ভগবানের কাছে রোজ রাত্রে ঘুমের আগে কাতর প্রার্থনা করে সীতু। প্রার্থনা করে যেন সেই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে, যাতে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে মৃদু হেসে বলছেন, 'বর চাস ? কী বর ?'

হায়, প্রতিটি সকাল আসে ব্যর্থতা বহন করে। সীতুর জ্ঞানের জগতে যত কটূক্তি আছে, সমস্ত বর্ষণ করে সে অক্ষম ভগবানের উপর অথচ আবার ঘুরে ফিরে সেই অলৌকিকের কথাই ভাবতে থাকে।

ধর, পথ চলতে চলতে পায়ের কাছে কুড়িয়ে পেল সীতু একটা শিকড়, সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে আর উড়তে আরম্ভ করল।

তারপর ?

তারপর—সেই একখানি ঘরের একটি বিশেষ জানালার বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে এক অদৃশ্যদেহী বালক, তার বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে।

ঘরের মধ্যে 'দশটা ডাক্তার' ঘুরে বেড়ায়, ফিসফিসিয়ে কী যেন বলাবলি করে, বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওই ছেলেটার।

ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে সেই পুতুলটা কোথায় ?

ছোট্ট খাটের মধ্যে লেপচাপা দিয়ে শুয়ে প্রবল জ্বরে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে ? না কি নিশ্বাস আর কোনদিন ফেলবে না সে ?

হঠাৎ কেঁদে ওঠা ঘুমন্ত ছেলেকে 'ষাট ষাট' করে ভোলায় অতসী,

বলে 'জল খাবি সীতু? গরম হচ্ছে সীতু? খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস?'

সীতু আর সাড়া দেয় না। শুধু মায়ের হাতটা আঁকড়ে ধরে।

অতসী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

অস্বাভাবিক সীতুর মধ্যে কি তা'হলে তীব্র কোন মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে?

সকাল বেলা মনিব গিন্নী প্রশ্ন করেন, 'রাত্তিরে ছেলে কেন কেঁদে উঠেছিল সীতুর মা?'

অতসী ম্লান ভাবে বলে, 'স্বপ্ন দেখে মা।'

হ্যাঁ, আর মাসীমা নয়, মা।

শ্রদ্ধার ডাক, ভালবাসার ডাক, আবার প্রভুভৃত্যের চরম মামুলী ডাক। তবু 'মা' বলতেই হয়। মনিব গিন্নীর তাই বাসনা।

'মাসীমা কেন গো? মা বলবে। আমার মেয়ে নেই।' বলেছিলেন তিনি মেয়ে নেই তাই তো 'মেয়ের মতন'।

তাই তো অতসীরও এ এক পরম বন্ধন।

'স্বপ্ন দেখে?' মনিব গিন্নি বলেন, 'পেট গরম হয়েছে হয়ত। একটু মৌরি মিশ্রীর জল করে খাইয়ে দিও দিকি, ঠাণ্ডা হবে।'

সরল মানুষ এর চাইতে বেশি কিছু জানেন না, বোঝেনও না। সত্যিই ভারী সরল।

আজ সকালে কিন্তু তাঁর কথাতেও একটু অসারল্যের ছোঁয়াচ লাগলো। অতসীকে ডেকে বললেন, 'শুনেছ অতসী, আমার ব্যাটা ব্যাটার বৌ যে দয়া করে গরিবের কুঁড়েয় পদার্পণ করতে আসছেন।'

অতসী ঈষৎ বিস্মিত হয়। আনন্দের বদলে এমন সুর কেন?

তবে সে সহজ ভাবেই বলে, 'পুজোর ছুটি হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই লিখেছিলেন বাবু? পুজোর আগেই বেরোচ্ছি, দিন পনের ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছি।' তা তোমায় মিথ্যে বলব না অতসী, বৌ আমার মন্দ নয়, মতি বুদ্ধি ভালই ছিল। কিন্তু কথায় আছে, শত গুণ নাশে। তোমার কাছে তো সব কথাই বলি—আমার ওই ছেলেটিই যেন বিলেতের সাহেব! যত ফ্যাশান, তত কি কথায় নাক

ঝাঁকানি। ওর সঙ্গে পড়ে বৌও—'

অতসী শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কি জানি আবার কোন ঝড় ওঠে। কে জানে এই স্তিমিত নিস্তরঙ্গতার উপর সে ঝড় কোন তরঙ্গ তুলবে। যে ছেলে 'বিলেতের সাহেবটি,' সে কি বরদাস্ত করবে রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলের উপর তার মায়ের এই স্নেহাতিশয্য ?

আর সেই বৌ? সঙ্গদোষে যার শতগুণ নাশ হয়েছে। বৌ জাতীয়াকে বড় ভয়! যদি সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের মত হয় ?

'কবে আসবেন ?'

'কবে কি গো, আজই।' মনিব গিন্নী স্বভাবছাড়া একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসেন, 'ট্রাঙ্ককলের টেলিফোন জানো ? তাই করে খবরটা দিল যে এক্ষুনি। আমার ছেলের কোন কিছুতেই দিশিয়ানী নেই। দু'দিন আগে খবর দেবে না। পথে বেরিয়ে কোন ইষ্টিশন থেকে টেলিফোন করবে। বললে বলে নিজের বাড়িতে আসব তার আবার খবর কি! কিন্তু শুনতেই ওই 'নিজের বাড়ি.' এক মাসের ছুটি তো কুড়ি দিন শ্বশুরবাড়িতেই কাটাবে।'

ছেলে বৌয়ের সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য পরিবেশন করে ফেলেন ভদ্রমহিলা।

অতসী আর কি বলবে ?

সমস্ত রকম অবস্থার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা ছাড়া ? ওঁর বৌ ছেলে যদি রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলেকে নিজেদের পাশাপাশি সহ্য করতে না পারে, যদি নীচে নামিয়ে দেয়, তাও মেনে নিতে হবে বৈকি।

নীচের তলায় নামাটা তো কিছু নয়, অন্য সব চাকরবাকরদের চোখে অনেক নেমে যাওয়া এই যা! তবু তাই যেতে হবে। সেইটাই প্রস্তুতির সাধনা।

শুধু সীতু ? বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন!

কিন্তু অতসীর আশঙ্কা অমূলক। ওরা ওরকম নয়।

অতসী দোতলায় কেন আছে, বা একতলায় কেন থাকবে না, এ

নিয়ে মাথা ঘামালো না ওরা। ট্রেন থেকে নেমেই স্নান সেরে বাপেরবাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বৌ বললে, 'মা আপনার ঘরের পাশে ওই ছোট ঘরটায় কাকে যেন দেখলাম? কেউ এসেছেন না কি?'

'মা' বলে ওঠেন, 'ওটি আমার একটি কুড়নো মেয়ে বৌমা। ঈশ্বর প্রেরিত। ঠাকুর দেশে চলে যাওয়ায় যখন অসুবিধেয় মরছি, তখন হঠাৎ একদিন—'

বৌ কথায় যবনিকাপাত করে বলে, 'ওঃ রান্নার লোক? তা দেখতে তো বেশ পরিচ্ছন্ন, নেহাৎ 'লো' ক্লাশ বলে মনে হ'ল না।'

অতসী পাশের ঘর দিয়ে যাচ্ছিল। দেওয়ালটা ধরল।

শুনতে পেল না তারপর আর কি কথা হ'ল। সচেতন হ'ল তখন যখন বৌ ব্যস্তভাবে এদিকে যেতে যেতে অতসীকে দেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা ওই ছেলেটি তোমার তো?'

অতসী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৌ দালানে টাঙানো আরশির সামনে তাকিয়ে বেশবাসে দ্রুত আর একটি 'সমাপ্তি স্পর্শ' দিতে দিতে বলল, 'ওকে আমার সঙ্গে আমার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাবো?'

'আপনার বাপের বাড়িতে!' অতসী অবাক হয়। অতসী কারণ নির্ণয় করতে পারে না। অতসী দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে, 'ছেলেটা বড্ড লাজুক, যেতে চাইবে কি?'

'চাইবে না?' সভ্য তরুণী আর জোর করে না, 'বলে তবে থাক। গেলে একটু সুবিধে হত। ওখান থেকে বেবিকে ধরার লোকটিকে আনতে পারিনি, বেচারার অসুখ করেছে। একটি ঠিক তোমার ছেলের মতই ছেলে। তাই ভাবছিলাম ওকে পেলে হয়তো—যাকগে আমার বাপের বাড়িতে তো লোকজনের অভাব নেই। তবে যেত, ভাল ভাল খেত, খেলত—'

হঠাৎ অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আচ্ছা দাঁড়ান আমি বলছি।'

ঘরে গিয়ে তেমনি দৃঢ় স্বরেই বলে, 'সীতু ওই যিনি এসেছে, ওর

সঙ্গে ওর বাপের বাড়ি যেতে হবে তোমায়।'

সীতু এ আদেশের মর্ম ঠিক ধরতে পারে না, থতমত খেয়ে বলে, 'কেন, আমি লোকেদের বাপের বাড়ি যেতে যাব কেন?'

অতসী আরও দৃঢ়স্বরে বলে, 'কেন যাবে শুনবে। ওর সঙ্গে ওর ওই বাচ্চাটিকে কোলে করে বেড়াতে।'

'ইস!' সীতু তীব্রকণ্ঠে বলে 'টিকটিকির মত ওই মেয়েটাকে আমি কোলে নেব বৈকি। ছুঁতেই ঘেন্না করে।'

'চুপ। এসব কথা মুখে আনবে না। যাও ওই আলনা থেকে জামা পেড়ে পরে চলে যাও ওঁর সঙ্গে, সেখানে খেতে পাবে। খুব ভাল ভাল। বুঝলে। যাও ওঠ।'

মায়ের এই নিষ্ঠুরতায় কঠিন কঠোর সাতুর বুঝি চোখে জল এসে যায়। লাল মুখে বলে, 'না যাব না। আমি কি চাকর?'

অতসী হঠাৎ ফেটে পড়ে।

চাপা গর্জনে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ তাই। বুঝতে পারনি এতদিন? টের পাওনি চাকর হওয়াই তোমার বিধিলিপি। আমি হুকুম করছি চাকরই হওগে। যাও ওঁর সঙ্গে, সারাদিন ওঁর মেয়ে কোলে নিয়ে বেড়াওগে। ওঁরা যদি উঠোনের ধারে খেতে বসতে দেয় মাথা হেঁট করে তাই খাবে, একটি কথা বলবে না। যাও—যাও বলছি। অপেক্ষা করছেন উনি। কী, তবু বসে রইলে? পেড়ে আনো জামা—'

মাটিতে বসে পড়ে অতসী। হাঁপাতে থাকে।

আর সীতুর চোখের সামনে বুঝি সমস্ত পৃথিবী ঝাপসা হয়ে আসে। মার ওই বসে পড়া চেহারাটির দিকে তাকাতে আর সাহস হয় না। উদভ্রান্তের মত আলনা থেকে শার্টটা পেড়ে গায়ে গলাতে গলাতে নীচে নেমে যায়।

গিয়ে দাঁড়ায় বাইরে গাড়ির কাছে। যে গাড়ি বৌকে নিতে এসেছে তার পিতৃগৃহ থেকে। বৌ বোধ করি হাতে চাঁদ পায়, হৃষ্টচিত্তে বলে, 'ও তুমি যাচ্ছ? এস, গাড়িতে উঠে এস।'

সত্যিই গাড়িতে উঠে বসে সীতু। কিন্তু সে কি সত্যিই সীতু?

নাকি কোন যন্ত্রচালিত পুতুল ?

বৌ ওর কোলে নাইলনের ফ্রক পরা সেই 'টিকটিকি' বিশেষণ প্রাপ্ত শিশুটিকে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলে, 'নাও বেশ ভাল করে ধরো, ফেলে দিও না যেন।'

না সীতু ফেলে দেবে না। কিন্তু সেই 'কাঠির মুঠি' মেয়েটাই প্রবল আপত্তি তুলে সীতুকে তচনচ করে দেয়। অচেনা কোল বলে ? না কি শিশু বোঝে না অনাগ্রহের অনুত্তাপ ?

'এই দেখ, তুমি যে সামলাতেই পারছ না ?' বৌ রেগে ওঠেন। হেসে ওঠে। সহজ ভাবে বলে, ভাল করে ধরতে পারছ না কিনা, তাই মহারানীর মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। তোমার তো কোন ছোট ভাই বোন নেই তাই অভ্যাস নেই। দাও আমায়, কী...বে...তুষ্টু বাহন পছন্দ হল না ?'

মেয়েকে কোলে করে ভোলাতে ভোলাতে শান্ত করে বলে সে, 'চিনে যাবে। দু'দিনেই চিনে যাবে। দেখো তখন তোমাকে ছাড়তেই চাইবে না। তুমি যে আমার স্কুলে পড় শুনলাম। তাছাড়া তোমার মার তুমি এক ছেলে, মা নিশ্চয় ছাড়তে রাজী হবে না। নইলে তোমায় আমার সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে যেতাম। ঠিক এই রকম একটি কমবয়সী বাঙালীর ছেলেই খুঁজছি আমি।'

সীতু কি রূঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল ? তীব্র চীৎকারে প্রশ্ন করে উঠল, আমায় কী ভেবেছ তুমি ? আমি চাকর ? না ওসব কিছু করল না সীতু। ওসব কথা বোধকরি ওর কানেও ঢোকেনি। ও গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে।

এ কী ! এ কোথায় আসছে সে ?

এই শিবমন্দির কোন পাড়ার ? ওই গম্বুজ দেওয়া লাল বাড়িটা কোন রাস্তায় ? নীল কাচের জানলা বসানো ওই ফটো তোলার দোকানটা ? আর ওই সিনেমা বাড়িটা ? গাড়ি দ্রুত পার হতে থাকে আর সীতুর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

একবার দরদর করে ঘাম ঝরেছিল, এখন একটা শুকনো দাহ।

বুঝতে পেরেছে সীতু, বুঝতে পেরেছে এবার।

এ সমস্তই ষড়যন্ত্র। ওই বৌটার বাপের বাড়ি যাওয়াটাওয়া সব বাজে, সীতুকে ভুল বুঝিয়ে ফন্দীফিকির করে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানকার লোক রোজ 'এতবড় মোটর হাঁকিয়ে' হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর বাড়ি যায় সীতুকে খুঁজতে!

আগে থেকেই তা হলে তৈরি হয়ে আছে এই সব ব্যাপার। আর মা? সীতুর মা! সন্দেহ নেই তিনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন।

আর এমন বোকা যে তাতেই ভুলে—

উঃ! মা নিজে যেতে পারলেন না, বেচারী সীতুর ওপর দিয়েই—

ওঃ ওঃ এই এসে গেছে···পার্কের রেলিঙ দেখা যাচ্ছে। পার্কটা পার হলেই —

সীতু জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে তীব্র প্রশ্ন করে, 'এটা কোন রাস্তা? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

এ প্রশ্নে গাড়ির চালক পর্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। বৌ অবাক হয়ে বলে, 'কেন আমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। সব্যসাচী রোডে যাব। কেন তোমার মা বলেনি?'

কিন্তু ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে গেছে সীতু, ততক্ষণে সন্দেহ সরে গেছে তার। গাড়িটা পার হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের জায়গা।

আতঙ্কটা ঘুচল। কিন্তু আশা? যে আশা শিশুমনের অজ্ঞাত অবচেতনে জন্ম নিচ্ছিল পরিচিত পথের ছলনায়?

'এ রাস্তা তুমি চেন?'

সীতু মাথা নেড়ে বলে, 'না'

গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় থামে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই অনেক ছোট বড় মাঝারি বয়সের মেয়ে পুরুষ এসে কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, একটি মধ্যবয়সী মহিলা সীতুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেই ফেলেন, 'এটি কে রে ছন্দা?'

এতক্ষণে সীতু জানতে পারে বৌটার নাম ছন্দা।

ছন্দা ওর দিকে একটি স্নেহদৃষ্টি ফেলে বলে, 'এ? এ হচ্ছে আমার

শ্বশুরবাড়ির নতুন বামুন দিদির ছেলে। বেবির চাকরটাকে নিয়ে আসিনি বলে ভাবলাম ওকেই বরং—'

গরম সাঁসে কানে ঢেলে দিলে কি কানে এর চাইতে দাহ হয়?

মধ্যবয়সী মহিলাটিও সস্মিত কণ্ঠে বলেন. 'খাসা ছেলেটি। তোর শাশুড়ী জোটায়ও বেশ। বুড়োবুড়ি একা থাকে, এ বেশ নাতির মত—'

ছন্দা হেসে ওঠে, 'ও মা, সে আর বোলোনা। আমার শাশুড়ীর তো এমন ব্যবস্থা, নাতি কোথায় লাগে। দোতলার ঘর, খাট বিছানা মশারি, টেবলফ্যান. পড়বার টেবিল চেয়ার—'

কথা শেষ হয় না, সমবেত হাস্যরোলে চাপা পড়ে যায়।

বামুনদি আর বামুনদির ছেলের জন্য এ হেন অভিনব ব্যবস্থা রীতি-মত হাস্যকর বৈ কি। বামুনদির মনিব গিন্নীর পাগলামীর পরাকাষ্ঠা।

সীতু কি সকলের অলক্ষ্যে কোন এক সময় এই কুৎসিত কদর্য বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যাবে? কিন্তু এরা কি খারাপ? এরা কি হৃদয়হীন? তা তো নয়।

ছন্দার মার এবার মেয়ের দিক থেকে নাতনীর দিকে মন যায়, হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নাতনী তারস্বরে আপত্তি জানায়। অনেক ভুলিয়ে কোলে নিয়েই ভদ্রমহিলা যেন শিউরে ওঠেন, 'ও মা! মেয়ের সমস্ত শরীরটুকুই যে হাড়! কী মেয়ে কী করে ফেলেছিস ছন্দা?'

ছন্দা মলিন ভাবে বলে, 'কত বড় অসুখে ভুগল তা বল? লিখেছিলাম তো সবই। একেবারে—যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।'

যায় যায় অবস্থা? সীতুর প্রত্যেকটি লোমকূপের মধ্যে থেকে কি ওই নতুন শেখা শব্দটা উঠছে? যায় যায় অবস্থা!

ছন্দা তখনো বলে চলে, 'একদিন তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। পাড়ার সবাই আমায় বলতে লাগল, বেঁচে উঠেছে নেহাৎ তোমার কপাল জোরে।'

দিদিমা নাতনীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বোশেখ মাসে স্বপ্না তোর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তো আহ্লাদে কুটিকুটি,

বলে, 'মা দিদির মেয়েটা হয়েছে যেন মাখনের পুতুল! আর তেমনি হাসিখুশি—'

'হাসি-খুশি' ততক্ষণে সানাই বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে।

দিদিমা বিরক্ত চিত্তে বলেন, 'বাবা, আমার কাছে জন্মাল, মানুষ হল, এখন আমাকে একেবারে ভুল?'

ছন্দা মেয়ে কোলে নিয়ে অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'অসুখ করে পর্যন্ত ওই রকম মেজাজী হয়ে উঠেছে। এই তো ছেলেটাকে আনলাম, তা গেলে তো ওর কাছে! কি যেন তোমার নাম খোকা? সীতু না কি? সীতানাথ না সীতারাম?'

বলাবাহুল্য উত্তর পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে না!

ছন্দার মা বলেন, 'বড্ড দেখছি মুখচোরা। যাও খোকা, ওদিকে বাইরের বারান্দায় বোসোগে।'

বাইরের বারান্দা! মুক্তির আহ্বান বয়ে আনছে কথাটা!

ছন্দার অনেকখানি সময় কেটে যায় অনেক কথায় আর অনেক হুল্লোড়ে। স্বপ্না এসেছে, এসেছে স্বপ্নার বর। খুশির স্রোত বইছে।

হঠাৎ এই স্বচ্ছন্দ স্রোতে ঢেল পড়ে। ছন্দার মা এসে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করেন, 'তোর সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল, কোথায় গেল বল দিকি? দেখতে পাচ্ছিনা তো। গণেশকে দিয়ে খেতে ডাকতে পাঠালাম, বলছে বাইরে দাওয়ায় নেই। রাস্তায়ও নেই—'

কিন্তু সত্যিই কি সীতু রাস্তায়ও নেই? আছে। রাস্তাতেই আছে সীতু। নেশাচ্ছন্নের মত পথ চলেছে।

তার চোখের সামনে শুধু বারে বারে ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছে একটা তুলোর পুতুলের ধ্বংসাবশেষ! 'যায় যায়' অবস্থা হয়ে যে না কি টিকটিকির মত হয়ে গেছে!

মূর্তিটা ঠিক গড়তে পারছে না সীতু, কি রকম যেন হারিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে একটা ভীষণ দর্শন দাঁতাল জন্তু উঁকি মেরে মেরে বলছে, 'ওরকম হলে বেঁচে যায় শুধু মায়ের কপাল জোরে বুঝলে?' কিন্তু যার মা নেই? অবহেলায় ফেলে চলে গেছে?

সীতু কি জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবে? কিন্তু তারপর?

অদৃশ্য হয়ে যাবার শিকড় কই তার? কই আর কুড়িয়ে পেল সে বস্তু? তবে? সীতু কি নীচু হবে? ছোট হবে? বলবে 'একবার শুধু খুকুকে—' ওরা যদি সকলে মিলে হেসে ওঠে?

বামুনদি, নেপ বাহাদুর, বাসন মাজা সেই ঝিটা?

সীতু কি তাহলে সোজা মাথা তুলে সেই মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? স্পষ্ট গলায় বলবে, 'তুমি আমাদের খুঁজতে গিয়েছিলে কেন?' বলবে 'খুকুর কি এখনো যায় যায় অবস্থা?'

কিন্তু সেই মানুষটা যদি ভয়ঙ্কর লাল লাল চোখে তাকায়? বদ ভারী ভারী গলায় বলে, 'খুকু নেই।'

টেলিফোন ঝনঝনিয়ে ওঠে শিবনাথ গাঙুলীর বাড়ি।

গিন্নী যথারীতি বলে ওঠেন, 'অ অতসী, দেখতো মা কে ডাকে—'

কিন্তু ততক্ষণে গিন্নীর পুত্ররত্ন কর্মভার হাতে তুলে নিয়েছেন। আর পরক্ষণ থেকেই তাঁর কণ্ঠযন্ত্র লহরে লহরে ঝঙ্কার তুলতে শুরু করেছে।

'আঁা! বল কি? কতক্ষণ?...আঃ কী মুশকিল, তোমারও যেমন কাণ্ড! চেন না জান না, কী নেচারের ছেলে না খোঁজ করেই—'

ছেলে! অতসী দরজার বাইরে আটকে যায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝি শ্রবণেন্দ্রিয়ে এসে ভিড় করে। কে কোথা থেকে খবর দিচ্ছে! কার ছেলের কথা বলছে? কী হয়েছে তার?

এদিকে তারযন্ত্র আর কণ্ঠযন্ত্র পাল্লা চালিয়ে যাচ্ছে...'আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি। যাচ্ছিলামই—কি বলছ? বিপদ? তা ইচ্ছে করে বিপদকে ডেকে আনলে সে আসবে বৈ কি!...কী বললে? গাড়ি চাপা? না না অতদূর ভাববার দরকার নেই। তোমার কল্পনা শক্তি দূরপ্রসারী বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে পালিয়ে এসেছে।'

এখানে! তাহলে আর সন্দেহের অবকাশ নেই অতসীর, কোন ছেলের কথা হচ্ছে।

'কী হল? বাসে ট্রামে চড়তে জানে না? হুঃ! কলকাতায়

এই সব বামুন চাকর ক্লাশের ছেলেদের তো চেনো না? ওরা সাত বছর বয়স থেকে পাকা হয়ে ওঠে। আমি বলছি অত উতলা হবার কিছু নেই। ঠিক শুনবে দিব্যি বিকশিত দন্তে বিড়ি খেতে খেতে এখানে এসে হাজির হয়েছে।...যাক আমি এখনই যাচ্ছি। তোমার যখন দায়িত্ব।'

অতসী কি ছুটে গিয়ে রিসিভারটা কেড়ে নেবে ওই হৃদয়হীন লোকটার হাত থেকে? না কি ছুটে বেরিয়ে যাবে রাস্তায়?

কিন্তু তারপর?

মনিব গিন্নীর বেহাই বাড়ি কোন রাস্তায় সে কথা কি জেনে নিয়েছে অতসী? ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চরম নিষ্ঠুরতার আঘাত হেনেছে সে সেই অবোধ অভিমানী বালকচিত্তের উপর। আর কিছু করেনি। এখন অতসী 'ছেলে ছেলে' বলে উদভ্রান্ত হলে ভগবান ভ্রূকুটি করবেন না?

'ফোন কে করছে রে খোকা?' অতসীর মনিবানী এগিয়ে আসেন, 'বৌমা বুঝি?'

'হ্যাঁ? যত সব ঝামেলা!' খোকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমাদের যেমন কাণ্ড! বুদ্ধি-সুদ্ধি যদি কোন কালে হবে। খামোকা তোমার রাধুনী না কার ছেলেকে ওদের ওখানে পাঠাবার কি ছিল? সে ছেলে না কি ওখান থেকে হাওয়া।'

'ও মা! সে কী কথা!' চোখ কপালে তোলেন ভদ্রমহিলা, 'ওখানে অচেনা পাড়ায় একা একা সে আবার কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাবে তোমরাই জানো। এখন ছুটতে হবে আমাকেও। ভেবেছিলাম সন্ধ্যের দিকে যাব। এখন তোমার বৌমা অস্থির হচ্ছে। বলছে, পরের ছেলে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি!'

শিবনাথ গিন্নী কাতর বচনে বলেন, 'এত সব আমি কি করে জানব বাছা? বৌমা বলল নিয়ে যাই, আমি বললাম যেতে চায় তো নিয়ে যাও। মুখচোরা ছেলে। তা' অনিচ্ছেয় জোর করে নিয়ে গেছে নাকি —হ্যাঁ অতসী, তোমার ছেলে...কই গো! তুমিই বা কোথায় গেলে?

অতসী·· অ সীতুর মা।···ও মা এই তো এখানে ছিল, সে আবার কোথায় গেল।···এ সব কী ভূতুড়ে কাণ্ড গো। অ খোকা, দেখ দেখ—ছেলে হারানো শুনে সে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল কি না। ছেলে অন্ত প্রাণ। কিন্তু একা মেয়েমানুষ বেরিয়ে কি করবে? অ খোকা—ও মা আমি কেন মরতে তার ছেলেকে যেতে দিতে রাজী হলাম।'

মৃগাঙ্ক চুপচাপ বসে ভাবছিলেন, টেবিলে কনুই রেখে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে। একটু আগে রোগী দেখে ফেরার সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না ঘটনাটা সত্যি কিনা।

আসলে এটা কোনও ঘটনা কি? না, ঘটনা বলতে কিছুই নয়, শুধু একটা চকিত ছায়া, একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়। তখন থেকে বার বার মনে মনে ভাবছেন মৃগাঙ্ক, তিনি কি ঠিক দেখেছেন? না কি তাঁর একাগ্র বাসনাটাই ছায়ামূর্তি ধরে তাঁকে ছলনা করছে? কিন্তু ছলনাটা বড় নির্মম।

গাড়িতে আসতে আসতে হঠাৎ দেখতে পেলেন পাশ দিয়ে একটা গাড়ি সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তার মধ্যে সীতু। সীতু এতবড় একখানা গাড়ির আরোহী হয়ে বসেছে এটাও যেমন অবিশ্বাস্য, মৃগাঙ্ক সীতুকে চিনতে পারবেন না সেটাও তেমনি অসম্ভব!

কিন্তু সে গাড়িতে আর কে ছিল?

দেখতে পাননি মৃগাঙ্ক, আদৌ দেখতে পাননি, দেখবার অবকাশও পাননি, শুধু যা দেখেছিলেন তাতেই দিশেহারা হয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, আর সেই বিমূঢ়তার মুহূর্তে হঠাৎ গাড়িটাকে আড়াল করে ফেলেছিল প্রকাণ্ড একটা লরী। আর ট্রাম চলছিল এপাশ দিয়ে।

লরীর শত্রুতাপাশ থেকে উদ্ধার হয়ে যখন কোন রকমে নিজের গাড়িখানা উদ্ধার করলেন মৃগাঙ্ক, তখন সেই মায়ামৃগ মিলিয়ে গেছে

ধূসর শূন্যতায়।

গাড়ির নম্বরটাও দেখে নেবার সুবিধে হয় নি। এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন মৃগাঙ্ক যা দেখেছেন তা কি সত্যি? সত্যি হওয়া সম্ভব? না প্রখর সূর্যালোকের মাঝখানে দিবাস্বপ্ন?

শিবপুরের হরসুন্দরী দেবীর বাড়ি আর যাওয়া হয় নি। অনবরত যেতে যেতে ভয়ানক একটা কুণ্ঠা আসছিল। আর শেষ দিন তো ভদ্রমহিলা প্রায় ক্ষেপেই উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'মিথ্যে আপনি খোঁজাখুঁজি করছেন। যে মেয়েমানুষ কোলের কচি বাচ্চা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সে আবার ঘরে ফেরে নাকি? আপনার যে এখনো তার ওপর রুচি আছে, এই আশ্চর্য। জানি না আপনার কে হয়, তবে মুখের ওপরই বলছি—তাদের নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়। নইলে আমি কি কম ঈয়ে করেছিলাম বাবা—'

ভয়ানক একটা লজ্জা হয়েছিল সেদিন মৃগাঙ্কর।

আর ভেবেছিলেন সত্যিই তো ইচ্ছে করে যে হারিয়ে থাকতে চায়, তাকে খুঁজে বার করা কি সহজ? আর খুঁজে বার করে লাভই আছে না কি কিছু?

কিন্তু এতটা করবার কি সত্যিই দরকার ছিল অতসীর? এই নিষ্ঠুরতা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়? ছেলে নিয়ে আলাদাই যদি থাকত, মৃগাঙ্কর ব্যবস্থা না নিত, তাই হত। কিন্তু একটু ঠিকানা একটু সন্ধান, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তার একটু খবর, এটা জানাতে দোষ কি ছিল?

খবরের আশায় শ্যামলীদের বাড়ি গিয়ে গিয়েও আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। তবু নিজের নাম না দিয়ে একটা আবেদন করেছিলেন কয়েকটা সপ্তাহের কাগজে, 'অতসী, অন্ততঃ খবর দাও কোথায় আছ।' সাড়া এল না তার। অতসী যে খবরের কাগজের জগৎ থেকে অনেক দূরের গৃহে বাস করছে, সেটা ভাবেনি মৃগাঙ্ক। ভেবেছেন ইচ্ছাকৃত।

ক্রমশঃই শিথিল হয়ে যাচ্ছিলেন মৃগাঙ্ক, কঠিন করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন মনকে, কিন্তু আবার এ কী আলোড়ন!

মৃগাঙ্ক কি আবার শিবপুরে যাবেন? আবার নির্লজ্জের মত বলবেন, কোন ছলে কোন প্রয়োজনে তারা কি আবার এসেছিল?

যদি সেই প্রৌঢ়া মহিলা ধিক্কারে ছিঃ ছিঃ করে ওঠেন। সইতেই হবে সেই ধিক্কার। তবু জানতে চেষ্টা করতে হবে মৃগাঙ্ককে, সীতু কার সঙ্গে গাড়ি চড়ে চলে গেল, অতসী কোথায় রইল।

তখন সামনে আড়াল করে দাঁড়ান সেই লরিটাকে যদি মৃগাঙ্ক ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন!

চলমান সেই গাড়িখানার নম্বরটা টুকে নিতে পারলে মৃগাঙ্ক কি এখন এমন করে বসে থাকতেন যন্ত্রণায় খাক হয়ে? কিন্তু সত্যিই কি সীতু? অস্নাত অভুক্ত মৃগাঙ্ক আবার গাড়ি বার করবার আদেশ দিলেন।

দিনের আলোয় সম্ভব নয়।

মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। পার্কের কোণের দিকে গাছের আড়ালে ঢাকা একটা বেঞ্চে বসে থাকে সীতু সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায়। দুঃসহ হচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর, অথচ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে ইচ্ছে। সীতু এখন ভেবে পাচ্ছে না ছোট্ট সেই পুতুলটা, যে সীতুকে দেখলেই 'দাদদা দাদদা, বলে ছুটে আসত, তাকে এতদিন একবারও না দেখে কি করে ছিল সীতু!

খুকুটা যদি পার্কে আসে!

সেই লাল সিল্কের ফ্রকের নীচে থেকে নেমে আসা মোট্টা মোট্টা গোল গোল পা দু'খানা নিয়ে থপ্‌থপিয়ে হেঁটে ছুটে আসে সীতুর দিকে! সেই নরম ফুলের বস্তাটাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেবার দুরন্ত আকুলতাটা সীতুকে ভুলিয়ে দেয়, তার নাকি 'মরণ বাঁচন' অসুখ হয়েছিল, যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।

আস্তে আস্তে দুপুরের রোদ ঢলে পড়ে। প্রায় ঢলে পড়ে সীতুও।

পেটের মধ্যে খিদেয় পাক দিচ্ছে। সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অবাক

জলপান, ঘুগনিদানা, ঝালমুড়ি, আইসক্রীম!

ওদিকে সীতুর তাকাতে নেই। কিন্তু যখন তাকাতে ছিল?

তখন কি তাকাতো সীতু?

না, সীতু শুধু মুখ বিষ করে বসে থাকত বেঞ্চে। নেহাৎ চাকরদের সঙ্গে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত তাকে পার্কে তাই আসত।

আজ পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে সীতুর হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা সীতু সব সময় অমন বিশ্রী হয়ে থাকত কেন? থাকে কেন?

জগতে এত ছেলে, আহ্লাদের সাগরে ভাসছে যেন, সীতু কেন পারে না সে সাগরে ভাসতে!

পারে না মৃগাঙ্ক ডাক্তারের উপর আক্রোশে আর বিতৃষ্ণায়? কিন্তু মৃগাঙ্ক ডাক্তার কি সত্যিই অত খারাপ? যদি অত খারাপ, তাহলে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন সীতুকে আর সীতুর মাকে?

সীতুরা তো তাঁকে অপমানের চূড়ান্ত করেছে।

নিজের বাবা না হলে কি হয়? কি হয় তাকে 'বাবা' বলে ডাকলে! অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সীতু।

যে বাড়িতে তারা থাকত, সে বাড়িব কর্তা বুড়োটা তো তার নিজের দাদু নয়। তবু তো সীতু তাদের বাড়িতেই থাকে, তাকে দাদু বলে। অতসী বলে বাবা। বুড়িটাকে বলে মা।

কিন্তু কই তাতে তো রাগ হয় না সীতুর, অপমান বোধ করে না অতসী। তবে কেন সীতু মৃগাঙ্কর বেলাতেই—'

সীতুই খারাপ, সীতুই যত নষ্টের মূল। সীতুর জন্যেই সীতুর মাকে রাজরানী থেকে ঘুঁটেকুড়ুনি হতে হয়েছে। হরসুন্দরীর বাড়ির মতন বিচ্ছিরি বাড়িতে থাকতে হয়েছে, লোকেদের বাড়িতে ঝি হতে হয়েছে।

এ বাড়িটায় বিচ্ছিরি ঘর নয়, কিন্তু ভাল ঘরে রেখেও কী বলে ওরা সীতুর মাকে? রাঁধুনী! বামুনদির মত ভাবে সীতুর মাকে!

নিজের মাকে ঝি করেছে সীতু, রাঁধুনী করেছে। মৃগাঙ্ক খুব খারাপ লোক নয়, তবু তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে।

আর খুকুকে? খুকুকে সীতু মেরে ফেলেছে। —হ্যাঁ হ্যাঁ মেরেই

ফেলেছে। খুকুর মাকে কেড়ে নিয়েছে সীতু, কেড়ে নিয়েছে মায়ের 'কপাল জোর'।

তবে মেরে ফেলা ছাড়া আর কি?

শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠা রোধ করে সীতু। তারপর, অনেকক্ষণের পর আস্তে আস্তে বেঞ্চ থেকে নামে।

খুকু পার্কে আসবে এ আশা আর নেই সীতুর। খুকু যেন একটা বিভীষিকার ছায়া নিয়ে ঝাপসা হয়ে আছে।

তবু—তবু সীতু—সন্ধ্যার অন্ধকারে জমাদারেব সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই সরু বারান্দাটা পার হয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে একবাব দেখে নেবে খুকুর খাটটায় কেউ শুয়ে আছে কি না। টিকটিকিব মত রোগা কাঠির মত রোগা।

আর যদি সেখানে কিছু না থাকে? যদি দেখে খাটটা খালি, খাটের পায়েব কাছের সেই ছোট্ট নীচু আলনাটা খালি! আলনার তলায় সাজানো নেই লাল নীল সবুজ ছোট্ট জুতো, আর খাটের ধারে ঝোলানো নেই রঙিন রঙিন তোয়ালে!

কী করবে সীতু? কী করবে তখন? কী করবে তা জানে না। আর বেশি ভাবতে পারছে না। শুধু জানে সীতুকে যেতেই হবে।

খুকুর সম্পর্কে ভয়ঙ্কর একটা দাঁত খিচানো অন্ধকারের ভয় নিয়ে টিঁকতে পারবে না সীতু।

হরসুন্দরী কপালে করাঘাত করে বলেন, 'আগে কি করে জানব বলুন এখনও এই চত্বরেই আছে তারা! পাড়ার ইস্কুলেই পড়ছে। ইস্কুলের কথা আমার মাথায় আসেনি। সেই সেদিন যেদিন শেষ এসেছিলেন আপনি, আপনিও গেলেন, আমিও ঘুরে দেখি মূর্তিমান। তা' দাঁড়ায় একদণ্ড? আপনার কথা বলতে গেলাম। কানেই নিল না ঠিকরে চলে—'

'স্কুলটা দেখিতে দিতে পারেন?'

'ইস্কুল তো ওই—ও রাস্তার মোড়ে। 'জগদীশ স্মৃতি বয়েজ ইস্কুল।'

কিন্তু এখন তো ইস্কুল বন্ধ, পুজোর ছুটি পড়ে গেছে।'

শূন্যগাড়ি নিয়েই ফিরে আসেন মৃগাঙ্ক। ফিরে আসেন বিশ্বনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে দিয়ে। যখন টেলিফোনে ওরা সীতুর অন্তর্ধান বার্তা বলাবলি করছে। যার এক মিনিটে পরে গাঙ্গুলী গিন্নী অতসীকে খুঁজে পাননি।

কিন্তু মৃগাঙ্ক কি ক্রমশঃ পাগল হয়ে যাচ্ছেন? জলাতঙ্ক রোগী যেমন জলের দিকে তাকালেই লক্ষ লক্ষ কুকুরের ছায়া দেখতে পায়, মৃগাঙ্ক কি তেমনি,—সর্বত্রই তাঁর পরম শত্রুর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন? নইলে এই ঘণ্টাকয়েক আগে দূরে যে মূর্তিকে একখানা চলন্ত গাড়িতে দেখেছিলেন, সেই মূর্তিকে কেন বসে থাকতে দেখবেন পার্কের মধ্যেকার একটা বেঞ্চে?

এও চকিত ছায়া? দূর রাস্তা থেকে চলন্ত গাড়িতে বসে দেখা!

গাড়ি পিছিয়ে আনলেন মৃগাঙ্ক, নামতে উদ্যত হলেন, তারপর সহসাই সামলে নিলেন নিজেকে। ভ্রান্ত দৃষ্টির বিভ্রান্তিতে আর ভুলবেন না মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক বুদ্ধিমান। কিন্তু আশ্চর্য, সর্বত্র অতসীর ছায়া দেখছেন না মৃগাঙ্ক, দেখছেন কিনা সীতুব!

এই জন্যই কি মহাপুরুষেরা বলেন, 'ঈশ্বরকে শত্রু রূপে ভজনা কর।' কিন্তু সেই হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রংশ ছেলেটাকে কি আর এখন নিজের প্রতিপক্ষ বলে মনে হয় মৃগাঙ্কর? মনে হয় শত্রু বলে?

হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর ঘর দেখবার পরেও?

সেই বাড়িতেও ভাড়া জোগাতে পারেনি বলে চলে গেছে অতসী। কোথায় তবে গেছে? আরও কত সঙ্কীর্ণ গলিতে? আরও কত জঘন্য ঘরে?

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অনেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরে এলেন মৃগাঙ্ক। আস্তে আস্তে উঠে গেলেন ওপরে ভুলে গেলেন আজ অভুক্ত আছেন।

ঘরটা এখনও অন্ধকার। অন্ধকারেই একবার শুয়ে পড়লে হয়। শুধু তার আগে একবার স্নানের দরকার।

বাইরের পোশাক ছেড়ে বাথ রুমের দিকে এগতেই জমাদারের সিঁড়িটার দিকে চোখ পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা একটা বিকৃত আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন মৃগাঙ্ক, বাথ রুমে যাবার প্যাসেজটায়। মৃগাঙ্ক এবার বুঝতে পেরেছেন পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেই বুঝতে পারার মুহূর্তে এই আর্তনাদ?

তারপর চলে গেল সেই বোধশক্তিটুকুও।

পড়ে গেলেন। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন সরু প্যাসেজটায়।

সারাদিন শ্যামলী কাছে রাখে মেয়েটাকে।

মেয়েটারও অসুখ থেকে উঠে পর্যন্ত শ্যামলীর ওপর ভয়ঙ্কর একটা ঝোঁক হয়েছে। তার কাছে ছাড়া নাইবে না, খাবে না, ঘুমোবে না।

শ্যামলীরও এ এক পরম আনন্দ। সারাদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় এ বাড়িতে নিয়ে আসে তাকে, তা'ও বেশিরভাগ দিনই ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ফিরতে পায়।

আঁচল ধরে আগলায় খুকু। বলে, 'শ্যাম্মী যাবে না। শাম্মী থাকবে। খুকুকে গপ্পো বলবে।' নিজের ছেলেটার অযত্ন হয় তবু শ্যামলী পারেনা তাকে বিমুখ করতে।

আজও যথারীতি সন্ধ্যার পর খুকুকে নিয়ে পথে পা দিয়েছিল শ্যামলী, আর যেন ভূত দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'কে? কে দাঁড়িয়ে? সীতু না? তুই এখানে? একা যে? মা কই?'

সীতু কাঁপছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তা'র বুকের ওঠাপড়া বুঝি দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

'মা কই, বল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে? বল! মরে গেছে বুঝি? মাকে মেরে ফেলে—' চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

আর সীতু শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চেপে কেঁদে ওঠে, 'মা আছে বাবা মরে গেছে।'

'কে মরে গেছে?' চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

'বাবা?' ক্লান্ত ভাঙা গলায় বলে সীতু। খুকুকে—যে টিকটিকির

মতন হয়ে গিয়েছে—কাঠের মতন হয়ে গিয়েছে এ বুঝি আর দেখতে পাচ্ছেনা সীতু।

তার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

একদা অহরহ যে লোকটার মৃত্যু কামনা করেছে সীতু, তার মৃত্যু যে সীতুর কাছে এমন ভয়ানক যন্ত্রণাকর হতে পারে, এ সীতুর বোধের বাইরে, ধারণার বাইরে।

সীতুর সমস্ত শরীরটাকে চিরে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললে যদি সেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা মানুষটা উঠে বসে তো এক্ষুনি সীতু নিজেকে চিরে ফেঁড়ে শেষ করে ফেলতে পারে।

এ বাড়িতে তখন ভয়ঙ্কর একটা ছুটোছুটি চলছে। সারাদিনের অভুক্ত সাহেবকে এখন খানা দেওয়া হবে কি না তাই জিগ্যেস করতে এসে নেপ বাহাদুর এমন একটা আর্তনাদ করে উঠেছে যে, বাড়িতে যতগুলো লোক ছিল সবাই ছুটে এসেছে মৃগাঙ্কর শোবার ঘরে।

কিন্তু 'লোক' মানে তো চাকর বাকর? আর কে লোক আছে মৃগাঙ্কর বাড়িতে? হয়তো বাড়ির কাজের ব্যাপারে ওরা বুদ্ধিমান—নেপ বাহাদুর, মাধব, বামুনদি, কানাই, সুখদা। কিন্তু এমন আকস্মিক বিপদপাতে তারা সব বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। সকলে মিলে জটলাই করছে, খেয়াল করছে না এখনই একজন ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন। বামুনদি আর সুখদা তারস্বরে মুখে চোখে জল দেবার নির্দেশ দিচ্ছে আর ওরা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করছে।

নাটকের এই জটিল দৃশ্যের মাঝখানে সহসাই এসে দাঁড়াল শ্যামলী, যথারীতি খুকুকে নিয়ে। কিন্তু তার পিছনে ও কে?

ওই ছেলেটা। আধ ময়লা নীল ডোরাকাটা শার্ট আর বিবর্ণ খাকি প্যাণ্ট পরা!

এতগুলো লোকের এত জোড়া চোখ যেন পাথর হয়ে গেছে। সাহেবের জ্ঞানশূন্যতার মত ভয়ঙ্কর বিপদটাও ভুলে গেছে ওরা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওই ছেলেটার দিকে।

কিন্তু ছেলেটা তো শ্যামলীর পিছন পিছন নীরবে এসে দাঁড়ায়নি,

বসে পড়েছে ঘরের মেজেয়। যেখানে মৃগাঙ্কর অচৈতন্য দীর্ঘ দেহখানাকে কোনরকমে টেনে এনে মাথার তলায় একটা বালিশ গুঁজে শুইয়ে রেখেছে ওরা।

খুকুকে সুখদার কোলে ছেড়ে দিয়ে শ্যামলীও বসে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'কী হয়েছে ?'

সবগুলো লোক একসঙ্গে 'কী হয়েছে' বোঝাতে চেষ্টা করে সবটাই দুর্বোধ্য করে তোলে। আর সেই গোলমাল ছাপিয়ে একটা তীব্র বেদনার্ত ভাঙা গলা গুমরে ওঠে, 'মরে গেছে, বাবা মরে গেছে।'

'আঃ সীতু থাম্! ওকি বিচ্ছিরি কথা ? ছি ছি!' শ্যামলী বকে ওঠে, 'দেখতে পাচ্ছিস না অজ্ঞান হয়ে গেছেন।...ওই তোমরা শুধু গোলমাল করছ কেন ? একটা ডাক্তার ডাকতে পারনি ?'

তাই তো! ডাক্তার সাহেবের বাড়ির লোক তারা, বাইরের ডাক্তারের কথা মনে পড়েনি! কাকে ডাকবে তা'হলে ? কোন ডাক্তারকে ? সাহেবের তো চিনা জানা অনেক ডাক্তার বন্ধু আছে। কিন্তু কে তাদের নাম জেনে রেখেছে ?

শ্যামলী হঠাৎ মুখ গুঁজে বসে থাকা সীতুকে একটা ঠেলা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, 'এই সীতু শোন্। তুই জানিস কাকাবাবুর কোনও ডাক্তার বন্ধুর নাম ?'

সীতু বিভ্রান্তের মত মুখ তুলে তাকায়। তারপর সমস্ত পরিস্থিতি-টার উপর চোখ বুলোয়। এই তার সেই আশৈশবের পরিচিত জগৎ। ওই টেবলের উপর টেলিফোন যন্ত্রটা, ওই তার পাশে তার গাইড বুক।

যখন আরো ছোট ছিল, যখন সীতু ওই অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে বাবা বলেই জানত, তখন একদিন অতসী বলেছিল, 'দাওনা ওকে ফোন করতে শিখিয়ে। ভারী কৌতূহল বেচারার।'

তখনো সম্পর্কে অত তিক্ততা আসেনি, তখনো মৃগাঙ্ক 'এই যে সীতুবাবু—' বলে ডেকে কথা বলতেন। তাই অতসীর অনুরোধ রেখেছিলেন, কাছে ডেকে বসেছিলেন, এই দেখ। এই ভাবে নম্বর ঘোরাতে হয়। আর এই বই দেখে দেখে লোকেদের নাম বার করতে

হয়। এখন তুমি ইংরিজি পড়তে পার না, যখন পড়তে পারবে তখন সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা এখন দেখ—'

নমুনা স্বরূপ নিজের একজন সহকারী ডাক্তারকে ডেকেছিলেন মৃগাঙ্ক। আর একটু হেসে সীতুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ, শিখলে তো? এখন ধর যদি হঠাৎ আমার কোনদিন বেশি অসুখ করে গেল, আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি এই ভাবে ডাকবে, '—ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র?···হ্যাঁ, আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ি থেকে বলছি—'

মানুষ কি কোনও একটা মুহূর্তে হঠাৎই এক একটা বয়সের সীমা অতিক্রম করে? শৈশবে থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে? সীতু সহসা এই মুহূর্তে অতিক্রম করে গেল তার শৈশবকে? তাই শ্যামলীর একবারের ডাকেই উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে, গাইড দেখে বার করল প্রার্থিত নাম, আর ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলতে থাকল—'ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র? আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ি থেকে বলছি···'

'হ্যাঁ···বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এখুনি আসতে হবে।'

হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন বেশি অসুখ করে গেছে মৃগাঙ্কর, কথা বলতে পারছেন না, তাই সীতু—সীতু পারছে। সীতু এখন ইংরিজি শিখেছে।

কিন্তু সীতু শুধু ইংরিজিই শিখেছে?

আরও কিছু বুঝতে শেখেনি? বুঝতে শেখেনি নিজের হিংস্র নিষ্ঠুরতা? যে নিষ্ঠুরতায় এই রাজবাড়ির রানীকে ভিখিরির সাজ সেজে পরের বাড়ি দাসত্ব করতে হচ্ছে, ওই চির কঠিন শক্তিমান লোক জীর্ণ হতে হতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর—আর খুকু—

এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ে সীতুর খুকুর কথা। যখন জ্ঞান ফেরার পর ঔষধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছেন মৃগাঙ্ক। তাঁর শান্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠাপড়া দেখা যাচ্ছে।

শ্যামলীর কাছে এসে দাঁড়ায় সীতু। অস্ফুট দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, 'খুকু কোথায়?'

শ্যামলী এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও হেসে ফেলে বলে, 'খুকু কোথায় কিরে? এই তো খুকু। চিনতে পারছিস না?'

নিজের কোলের দিকে চোখ ফেলে শ্যামলী বলে, 'কিছুতে ঘুমুতে চাইছে না। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তো? তাই দেরী হচ্ছে।'

কিন্তু এত কথা কে শোনে?

সীতু অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে থাকে শ্যামলীর ক্রোড়স্থিত জীবটার দিকে। ওইটা খুকু? ওই রোগা সিরসিরে ঢ্যাঙা ন্যাড়ামাথা, সত্যিই টিকটিকির মত মেয়েটা খুকু? ওকে তো এতক্ষণ ধরে শ্যামলীরই মেয়ে ভেবেছিল সীতু।

সেই লাল লাল থ্যাদা থ্যাদা মুখ আর সোনালী চুলওয়ালা খুকুটা তা'হলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে? আর তার হত্যাকারী সীতু!

'ও কার খুকু?' তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদীর্ণ করে ফেলতে চায় শ্যামলীকে সীতু। 'বলনা কার খুকু?'

'কী মুশকিল! কার আবার, তোদেরই। চিনতে পারছিস না!'

সীতু আস্তে মাথা নাড়ে।

'তা' চিনতে আর পারবি কোথা থেকে।' শ্যামলী আক্ষেপ করে—'চেনবার কি জো আছে? এমনিই তো কতদিন দেখা নেই। তাছাড়া —যা হয়েছিল!' শ্যামলী খুকুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলে—'সবচেয়ে শক্ত টাইফয়েড। আর তার মধ্যে জ্বরের ঘোরে অবিরত শুধু 'মা মা' বলে—হ্যাঁ, এইবার বল দিকি তোদের খবর? এতক্ষণ তো—তিনিই বা কোথায়? তুই বা কোথা থেকে—'

মৃগাঙ্ক যখন চোখ মেললেন তখন সকাল হয়ে গেছে। চোখ মেলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তা'হলে ভুল নয়? সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন তিনি? যদি পাগল না হন, তা'হলে বিশ্বাস করতে হয় তাঁর ঘরে তাঁরই বিছানার কাছাকাছি অতসীর খাটটায় পড়ে যে ছেলেটা

অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সে সীতু।

আর সীতুর গা ঘেঁষে, সীতুর গায়ে হাত পা বিছিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে, সেটা খুকু! চুপ করে এই দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক। ডাকলেন না। যেন ডাক দিলেই এই অপূর্ব পবিত্রতার ছবিখানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

তা'হলে কাল ছায়ামূর্তি দেখেন নি মৃগাঙ্ক? কিন্তু কোথা থেকে এল ও? কে ওকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেল?

কিন্তু ও একা কেন? অতসী কোথায়? তবে কি অতসী—তাই ছন্নছাড়া ছেলেটা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে—কেঁপে উঠলেন মৃগাঙ্ক। ভুলে গেলেন, এই ছবিখানি নষ্ট করতে চাইছিলেন না। ডেকে উঠলেন।

হয়তো আকস্মিকতায় একটু বেশি জোরালো হল সে ডাক।

চমকে চোখ মেলে চাইল সীতু। উঠে বসল। চোখ নামাল।

মৃগাঙ্ক মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে গম্ভীর মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তুমি একা এসেছ?'

সীতু চোখ তুললো, 'হ্যাঁ।'

'তোমার মা মারা গেছেন?'

'না না, ওকি?' শিউরে ওঠে সীতু।

'তবে?'

সীতু প্রতিজ্ঞা করেছে এবার থেকে সে সভ্য হবে, ভদ্র হবে, কেউ কথা বললে উত্তর দেবে। তাই ক্ষীণস্বরে বলে, 'আমি এমনি একা—খুকুকে দেখতে—'

'খুকুকে দেখতে। খুকুকে দেখতে এসেছ তুমি!'

'হ্যাঁ'।

এবার আর হরসুন্দরীর বাড়ির দরজায় নয়।

শিবনাথ গাঙুলীর দরজায় এসে থামে সেই মস্ত চকচকে গাড়িখানা।

কাকে চাই?

এ বাড়ির রাঁধুনীকে!

যেন রূপকথার গল্প! ঘুঁটেকুড়ুনির জন্য চতুর্দোলা!

কিন্তু এখানেও কপালে করাঘাত। 'এই দু'দিন আগেও ছিল বাবা! হঠাৎ 'ছেলে ছেলে' করে বিভ্রাট হয়ে—গোড়া থেকেই বুঝেছি আমি, সে যেমন তেমন নয়, শাপভ্রষ্ট দেবী আমাকে ছলনা করতে এসেছিল।...কিন্তু তুই দুষ্টু ছেলে হঠাৎ অমন করে কোথায় চলে গিয়েছিলি? ছেলে হারিয়েছে শুনেই তোর মা যে পাগলের মত—'

কিন্তু মৃগাঙ্ক আর পাগলের মত হন না। হবেন না।

ফিরে এসে সীতুকে হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'কাঁদিসনে সীতু, কাঁদলে চলবে না। খুঁজে তাঁকে আমরা বার করবই। খুঁজে না পেলে চলবে কেন, আমাদের বল! কিন্তু আর আমার ভয় নেই। তখন একা ছিলাম, তাই হেরে গিয়েছিলাম, আর তো আমি একা নই? আর হারব না। দেখব আমাদেব দু'জনকে হারিয়ে দিয়ে, কতদিন সে হারিয়ে বসে থাকতে পারে!

বৃত্তপথ

গ্রাম তেঁতুলগোড়ার তেরশো সত্তর সালের প্রথম আর প্রধান খবর হ'ল সস্ত্রীক জিতু লাহিড়ীর গ্রামের বাড়িতে এসে বসা। বড় লাহিড়ী বাড়ির শ্যাম লাহিড়ীর মেজ ছেলে জিতু লাহিড়ী।

প্রধান খবর হচ্ছে এই জন্যে যে, ওর চাইতে জোরালো খবরের ঘটনা তার পর থেকে এই তেঁতুলগোড়া গ্রামে আর ঘটল না! ওর ধারে কাছে পৌঁছয় এমন ঘটনাও নয়।

কিন্তু শুধুই কি এই তেরশো সত্তর সালে? তার আগে?—নাঃ মনে তো পড়ে না। সেই বোমা-পালানোর আমলেই যা কিছু জোরদার ঘটনা ঘটেছিল, তারপর আর নয়। বন্যার জল সরে যাওয়ার মত শহরের 'বোমা-পালানে' লোকগুলো গ্রাম ছেড়ে আবার শহরে চলে যাবার পর গ্রাম তেঁতুলগোড়া ফের সেই তার একশো বছর আগের শান্ত চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। যেন অনন্তকালের ঘুমের বিছানায় হঠাৎ দুটো পোকামাকড় এসে হানা দিয়েছিল তাই চমকে আর ছটফটিয়ে জেগে উঠেছিল তেঁতুলগোড়া, পোকাগুলো উড়ে গেল, ও আবার নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল, ঘুমিয়ে পড়ল।

শান্ত তেঁতুলগোড়ার পাঁজর থেকে দৈবাৎ যদি কোনো অশান্ত নিশ্বাস প্যাক খেয়ে ওঠে, সে নিশ্বাস তেঁতুলগোড়ার বাতাসকে চঞ্চল করে না। সে নিশ্বাস চার মাইল মাঠ ভেঙে তাহুকী স্টেশনে গিয়ে শহরের টিকিট কেটে পালায়। শহরের সদা-উত্তাল চির-অশান্ত নিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে ফেলে বাঁচে।

তেঁতুলগোড়ার পাঁজরাটা হয়তো কিছুদিন শূন্য শূন্য ঠেকে। ক্রমশই যেন হালকা হয়ে আসে, কিন্তু তার জন্যে তার কোনো পরিবর্তন হয় না শুধু ঘুমের ছন্দটা আর একটু ক্লান্ত হয়ে আসে তেঁতুলগোড়ার।

কিন্তু অনেকদিন আগে তেমনি এক অশান্ত নিশ্বাসে লাহিড়ী বাড়ির জিতু যখন তেঁতুলগোড়ার মাটি ত্যাগ করেছিলো, তখন আর যেখানেই শূন্যতা ধরা পড়ুক তেঁতুলগোড়া গ্রামের পাঁজর ভরাট ছিল।

ছিল, কারণ তখনও বড় লাহিড়ীবাড়ির শ্যাম লাহিড়ী বেঁচেছিলেন, বেঁচেছিলেন ছোট বাড়ির ভুবন লাহিড়ীও। ওঁরা ওঁদের দেব দ্বিজ গুরু জমি জমা বাগান পুকুর নিয়ে এযাবৎ যে ছন্দে কাটিয়ে আসছিলেন, সেই ছন্দের ছন্দপতন হতে দিলেন না। উদ্ধত অবিনয়ী জিতু ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেল।

ওরা আরো অনেকদিন রইলেন, তারপর একে একে মরলেন আর শ্যাম লাহিড়ীর মরার পর দেখা গেল তিনি তাঁর গৃহত্যাগী মেজছেলের জন্যে একটা মহল সারিয়ে সুরিয়ে চাবি বন্ধ করিয়ে রেখে গেছেন, এবং উইলে লিখে গেছেন, যদি দূর ভবিষ্যতে সে কখনো ফেরে, যেন উচিত অধিকারে বাস করতে পারে।

তা, সে উইলের কথা শুনে তাঁর জ্ঞাতিভাই ভুবন লাহিড়ী, আর ভুবন লাহিড়ী মারফৎ গ্রামের সবাই হেসেছিল। জিতু লাহিড়া বাপের ওই পুরনো ইটের দুর্গটুকুর ভাগ নিতে আসবে, এ চিন্তা ততদিনে হাস্যকর। ভুবন লাহিড়ার এক শালা দিল্লীতে চাকরি করে, তার সূত্রে জিতু লাহিড়ীর বোলবোলাওয়ের কাহিনী শুনেছেন ভুবনরা।

গৃহত্যাগী জিতু নাকি কে জানে কোন মন্ত্রবলে সেক্রেটারিয়েটের এক কেষ্টবিষ্টুর মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং নিজে বিরাট এক কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসে আছে। ভুবনের শালা তার অধস্তন স্টাফ। সাহেবের সাহেবীআনার বর্ণনার আর মহিমায় ভদ্রলোক বোন ভগ্নীপতিকে প্রায় স্তব্ধ করে রেখেছিলেন।

তা তার কথাটা অপ্রমাণিত হল না। জিতু লাহিড়ী জীবনে কোনো চিঠি-পত্র দিল না, বাপ-মার মৃত্যু সংবাদ শুনেও কোনদিন গ্রামে পদার্পণ করল না। শালা মারফৎ অনেকদিন পরে ভুবন লাহিড়ী জানলেন, জিতু মাতৃ-পিতৃবিয়োগে মাথা ন্যাড়া তো দূরের কথা, পা-টা পর্যন্ত খালি করেনি। যথানিয়মে জুতো মসমসিয়ে অফিসে এসেছে, চপ কাটলেট টিফিন খেয়েছে।

শুনে কেউ বলেছিল 'কুলাঙ্গার' কেউ বলেছিল 'নির্ঘাৎ ধর্মত্যাগী।' সন্দেহ কি, ওই শ্বশুরটা বেহ্ম অথবা খিস্টান। পাড়ার বুড়োরা ছিল

তখন অনেকে। বলেছিল খুব। তারা মরে হেজে গেছে, মাঝারিরা এখন বুড়ো হতে চললো।

এরা সঠিক মনে করতে পারে না জীতু লাহিড়ী কি রকম যেন দেখতে ছিল। বলে, ছেলেবেলায় খেলেছি বটে একসঙ্গে, তবে—

যারা খেলেছে, তারা তো বলেই, যারা কস্মিন কালেও খেলেনি তারাও বলে। নিজেকে জিতু লাহিড়ীর বাল্যকালের খেলুড়ি বলতে ভাল লাগে, কারণ জিতু লাহিড়ী সম্পর্কে হঠাৎ হঠাৎ কিছু কিছু খবর আসে দেশে। আর খবরগুলো রোমহর্ষক। জিতু লাহিড়ী নাকি এখন এম.পি. হয়েছে, জিতু লাহিড়ীর হুকুমেই এখন নাকি পার্লামেণ্ট চলে, মহলাল নাকি জিতু লাহিড়ীর পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজে এক পা এগোন না। এই তেঁতুলগোড়ার শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে জিতু লাহিড়ীই নাকি এরপর মন্ত্রী হবে। এমন কত কি!

একবার নাকি ভুবন লাহিড়ার সেই অগাবগা বড় জামাইটা 'জয় মা কালী' বলে দিল্লি গিয়েছিল জ্ঞাতি জ্যাঠতুতো শালাকে ধরে একটা চাকরী বাগাতে। ভুবনের প্ররোচনাতেই গিয়েছিল, তা সেই জামাই নাকি জিতুর বাড়ি গাড়ি আর উর্দিপরা চাকর দারোয়ান দেখে ভেবড়ে গিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় মেরে ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছিল। আর ভুবন গঞ্জনা দিতে গেলে উল্টে ভুবনকেই গঞ্জনা দিয়েছিল সে, 'যাতায়াতের ট্রেন ভাড়াটাই বরবাদ গেল আমার। আপনার ইয়েতেই গেল। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি যে, সেই অট্টালিকার গেটে ঢুকে পরিচয় দেব —মশাই আমি আপনার জ্ঞাতি বোনাই।'

এই সব কারণেই জিতু লাহিড়ীকে তেঁতুলগোড়া একেবারে ভুলে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। আর এই কারণেই তেরশো সত্তরের প্রধান খবর হল জিতু লাহিড়ীর প্রত্যাবর্তন। তাছাড়া আরও কারণ ছিল —যেটা প্রতিনিয়ত ওই খবরটায় রস জোগান দিয়ে চলেছে। যার জন্যে বড় লাহিড়ী বাড়িটা এখন গ্রামসুদ্ধ লোকের আরো কৌতূহলের জায়গা হয়ে উঠেছে। যে সব ছেলেরা এখন কলকাতায় চাকরী করে মাসে দুমাসে ছুটিতে বাড়ি আসে /তারাও তাদের অমূল্য সময় খরচ

করে একবার উঁকি দিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, মাস দুই হল এসেছেন জিতু। তখনো বৈশাখের যত 'কুমারী ব্রতে'র কুমারীরা ফুল তুলতে বেরোয় নি, শিব গড়বার মাটিতে জল দেয়নি। লোকেদের গোয়ালে গোয়ালে 'ভগবতী যাত্রা'র আয়োজন তো দূরস্ত, গোয়ালের ঝাঁপই ওঠেনি তখনো। চাষাদের ঘরের পুরুষরা তখন বোধকরি সবে আড়মোড়া ভাঙছে, মেয়েরা ঘুমের ঘোরে তাদের নড়াচড়া টের পাচ্ছে। ভদ্দরদের ঘরে পুরুষরা ঘুমে অচেতন, তাদের মেয়েরা কেউ কেউ গোবরজলের হাঁড়ি নিয়ে উঠোনে নেমেছে, কেউবা বিছানায় বসে বিড়বিড় করে ভুল উচ্চারণে প্রাতঃস্তোত্র আওড়াচ্ছে। শুধু ছোট লাহিড়ীবাড়ির মেয়ে জন্মবিধবা সরযূ স্নান সেরে কমণ্ডলুহাতে ঠাকুরদোরে জল দিতে বেরিয়েছে। তা' জল অনেক জায়গাতেই দিতে হয় তাকে। তেঁতুলগোড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ তো বড় কম নেই। গ্রামদেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' আর 'পুরানো কালী' ছাড়াও ষষ্ঠী, শীতলা, বুড়ি মনসা, জোড়াশিব, আছেন কয়েকজন।

তা' সরযূ যখন জল দিতে বেরোয়, মন্দিরগুলো তখন বন্ধ থাকে। তেঁতুলগোড়ার দেবতাদের সাধ্য নেই যে ভোরে ওঠার ব্যাপারে সরযূর সঙ্গে তাল দেন।

সরযূ বলে, 'তাল দেবে কোথা থেকে? হাত পা ওঁদের ঠুঁটো যে! নিজে জাগবার ক্ষ্যামতা আছে? ওই গাঁজা-গুলিখোর পুরুতের পোয়েরা বেলা দশটায় খোঁয়াড়ি ভেঙে এসে হাঁড়ামুখে একটু জলের ছিটে মেরে এসে তালাচাবি খুলে বাছাদের নড়া ধরে ধরে টেনে তুলবেন তবে তো বাছারা জাগবেন! আমার এত সময় নেই যে সেই পিত্যেশে বসে থাকি।'

বসে থাকে না। বন্ধ মন্দিরের দরজায় দরজায় খানিক করে জল ঢেলে ঢেলে দৈনিক জোগান সারে সরযূ। সব শেষে অশ্বত্থতলা। তা' সেই অশ্বত্থতলায় জল দিতে গিয়েই প্রথম চোখে পড়ল সরযূর। প্রণাম করে মুখ তুলছে, দেখল ক্যাঁচ কোঁচ করে একখানা গরুরগাড়ি আসছে দক্ষিণের মাঠের ওপর দিয়ে।

সরযূ দাঁড়িয়ে পড়ল। না, গোরুরগাড়িটা একটা দুর্লভদর্শন বস্তু বলে নয়। গরুরগাড়িই তো ভরসা এখানের। সরযূ দাঁড়াল এত ভোরে কার গাড়ি আসছে তাই দেখতে। তার মানে কোন্ গাড়োয়ানের। এ তল্লাটের সবাই তো চেনা সরযূর। ভবল কার গাড়ি, কার মাল। আর মালের হলে মাত্র একখানাই বা কেন? প্রায়শই একাধিক গাড়ি থাকে মাল বইতে। সারি দিয়ে চলে ইটের গাড়ি, বালি মাটি চুন সুরকির গাড়ি। ধান চাল অড়হর ছোলার গাড়িও থাকে। শেষের এগুলো অবশ্য এ পথ থেকে আসে না, এ পথ দিয়ে যায়। ডাহুকীর কাছে আড়তদারের গুদামে যায়। সেখান থেকে মালগাড়িতে।

কিন্তু সে যাক, এটা কি?

গাড়িটা যেন সরযূর ধৈর্যের পরীক্ষা করছে! তবু ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল সরযূ, আর খানিকটা পরেই দেখল মাল নয়, মানুষ। দুজন মানুষ আসছে গরুরগাড়িতে। যার মধ্যে একজন আবার মেয়েমানুষ। হ্যাঁ, মেয়েমানুষই বলে এখনো সরযূ, মহিলা বলতে শেখে নি। শিখবেও না, কারণ আজকালের কিছু শেখবার ইচ্ছে নেই সরযূর। ঘুমন্ত তেঁতুল-পাড়ায় যেটুকু 'আজকাল' সেটুকুও না।

মানুষ দেখে অবাক হল সরযূ। অবাক হবার দুটো কারণ। প্রথম হচ্ছে কে এরা? গ্রামের সকল ভদ্রলোকের বাড়ির খবরই তো সরযূর নখদর্পণে, চাষা-ভূষোদেরও বাদ যায় না। কারো বাড়িতে এ সময়ের কোনো কুটুম আসার খবর তো শোনেনি সরযূ, তাছাড়া বছর পয়লা ভোরে এসে পৌঁছচ্ছে—মানে, চৈত্র সংক্রান্তিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ভাবনার কথা। অহিন্দু নয় তো? তাই বা কে?

বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ, ইদানিং গরুরগাড়িকে আর বড় একটা মানুষ বইতে হচ্ছে না, ডাহুকীতে বেশ দু-চারখানা সাইকেল রিকশ হয়েছে। ওদিক থেকে আসতে সাধাপক্ষে বাবুভাইরা আর কেউ গরুরগাড়ি চড়ছে না।

গাড়িখানা কণ্ঠস্বরের নাগালে আসা মাত্রই সরযূ চাঁচাছোলা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কার গাড়ি রে?'

পরিচিত বিশেষ একটা স্বরে গাড়োয়ানও উত্তর দিল, 'আজ্ঞে চরণ ঘোষের গো।'

'অ! চালাচ্ছিস তুই বিধু বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাবা বেরোয়নি?'

'না পিসিমা, বাবার দেহটা ভাল যাচ্ছে না।'

তা' চরণ ঘোষের খবর নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই সরযূর, দুশ্চিন্তা তার গাড়ির আরোহীদের নিয়ে। তাই গাড়িটা মাঠের কোণা পথ ধরে আবার কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে হাঁক পাড়ে— 'আসছিস কোথা থেকে?'

'এস্টেশন'।

'রাত চারটের গাড়িটা ধরতে গেছলি বুঝি?'

বিধু চেঁচিয়ে বলে, 'মাল পৌঁছে রাতে ওখানেই ছিলাম—'

'তা ভাল—' একটু থামল সরযূ, বলতে যাচ্ছিল, সাইকেল রিকশ-বাবুদের ঘুম ভাঙেনি বুঝি, তাই তোর কপাল ফিরেছে? বলল না। বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'আজ্ঞে—বড় লাহিড়ীবাড়ি।'

বড় লাহিড়ীবাড়ি! শুনে হাঁ হয়ে গেল সরযূ। ওবাড়িতে আবার এল কে? আসবার মত এখন আছেই বা কে? বিধু ছোঁড়া ভাল করে কথাই কইল না। সরযূও কিছু মাড়িয়ে মরবার ভয়ে অশ্বথতলা ছেড়ে বেশিদূর এগোতে পারল না। মুশকিল করল তো!

অবিশ্যি মুশকিল বললেই মুশকিল। কে কী বৃত্তান্ত শুনলেও তো সরযূকে যেতে হ'ত বড় লাহিড়ীবাড়ি। ও পথটায় রাজ্যের ওঁচলা জঞ্জাল থাকলেও যেতে হতো। বাড়তি একবার চান করবার ভয়ে গ্রামের তত্ত্বতল্লাসরূপ মহান দায়িত্বটি তো এড়াতে পারত না সে!

তবু বিধুর বাবা চরণ ঘোষ হলে নিশ্চয় ওই উত্তরটাকে লম্বা করে বলতো, 'শ্যাম লাহিড়ী মশাইয়ের মেজছেলে জিতু লাহিড়ী মশাই এলেন গো দিদিমণি! 'রিটায়ার্ট' করে দেশঘরে বসতে এলেন।

রেক্‌ছাগাড়ি নিলেন না আজ্ঞে, আমায় ডেকে বললেন,—গরুরগাড়ি চড়েই গাঁ ছেড়েছিলাম বাপু, আবার গরুরগাড়িতেই ফিরতে চাই।'

বলতো এসব বিশদ করে, কথার জাহাজ চরণ ঘোষ। কিন্তু বিধু বেশি কথা বলে না। যেটুকু প্রশ্ন ঠিক সেটুকুই উত্তর। বিধু নিজেকে দামী রাখতে চায়।

কমণ্ডলু নিয়ে 'নে থো' করে হরি সভার তুলসী মঞ্চে একটু জল দিয়ে বাড়ি ফিরল ছোটবাড়ির ভুবন লাহিড়ীর শেবতলানি সন্তান জন্মবিধবা সরযু।

ঘণ্টা দু তিনের মধ্যে সারা তেঁতুলগোড়ার ইতর ভদ্র আর, ওই যে কি বলে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জেনে ফেলল, বড় লাহিড়ীবাড়ির মরচেধরা তালায় আবার চাবির মোচড় পড়েছে, শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে জিতু লাহিড়ী দেশে ফিরেছে।

কিন্তু মরচে পড়া ওই তালার চাবিটা জিতু লাহিড়ী পেল কোথায়? শেষ যে তালাটা লাগিয়েছিল, সে তো গ্রামের কোনো বিশ্বস্ত ভদ্র-সন্তানের কাছে রেখে যায়নি চাবিটা? বলে যায়নি তো—'রইল তাহলে? আমি ফিরি আর না ফিরি, বাড়ির মালিকদের কেউ যদি কখনো ফেরে, খুলে দিও তাকে দরজাটা।'

না বলেনি।

বড় লাহিড়ীবাড়ির শেষ অধিবাসী গুণদা সরকার কবে কখন কোন্ সময়ে যে ওই প্রকাণ্ড তালাটা বাড়ির সদরে ঝুলিয়ে দিয়ে বাড়ির দায়িত্ব ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তা কেউ টের পায়নি। মস্তবড় বাগান ঘেরা বাড়িটার কোনো একটু গহ্বরে গুণদা সরকার বাস করে এই জানতো সবাই, আর জানতো বুড়ো কোনোদিন ওইখানেই কোথাও হুমড়ে পড়ে মাটি নিয়ে নিমকের ঋন শোধ করবে।

সেটাই জানা স্বাভাবিক ছিল, কারণ বাড়ির যারা দাবিদার, তারা তো একে একে দাবি ত্যাগ করে চলে গেছে, ফিরে এসে ফের দখল নেবে এমন কে আছে? কেউ নেই।

শ্যাম লাহিড়ীর বড় ছেলে হিতু, অর্থাৎ হিতেন তো বাপ থাকতেই

অপুত্রক মরেছে, তার বৌটাও দীর্ঘকাল শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে আর তারপর দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে শেষ পর্যন্ত বাপেরবাড়ি গিয়ে মরল। আর ছোট বৌ, মানে ছোটছেলে রীতেনের বৌ? সে তো স্বামী মারা যেতে না যেতেই মেয়েটাকে নিয়ে—না, তার কথা উচ্চারণের যোগ্য নয়।

তবে সে অথবা তার সেই মেয়েটা কোনদিন তেঁতুলগোড়ায় ফিরে এসে বসবাস করবে না সেটা নিশ্চিত। করতে চাইলেও গ্রামের লোক করতে দেবে না। সেকালের সমাজ বলে বস্তুটা একালে না থাক, আর সমাজপতিরাও না থাক, তবু গ্রামে যারা আছে, তাদের বংশ বলে কিছু তো আছে? শ্যাম লাহিড়ীর মেয়ে ছিল না।

অতএব বাকী থাকে দীর্ঘ দিনের গৃহত্যাগী মেজছেলে তু অর্থাৎ জিতেন লাহিড়ী। তা' তার কথা তো প্রশ্নের অতীত। অতএব জানা কথা, শেষ অবধি ওই চিরদিনের গুণদা সরকারই থাকবে। থাকবে ঘাঁটি আগলে।

তারপর তার অবর্তমানে গাঁয়ের লোক জানালা দরজা খুলে নেবে তারপর ফাঁকা বাড়িটা চোর ছ্যাঁচোড়ের আড্ডা হবে, আর তারও পর বয়সের ভারে হুমড়েপড়া বাড়িটা ভাঙা ইটের স্তূপ হয়ে কালের ইতিহাস রচনা করবে। যেমন করছে ঘোষালদের ভিটেটা, বসু-রায়দের ভিটেটা। দীর্ঘকাল ধরে পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয় ইটকাঠের জোগানদার হয়ে ওদের স্তূপগুলো শেষ পর্যন্ত এখন শুধু আগাছার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে

কিন্তু গুণদা সরকারের শেষ পরিণতি তেঁতুলগোড়া গ্রামে হ'ল না। তার অন্তর্ধানটা রহস্য হয়েই রইল। হঠাৎ একদিন সবাই দেখল লাহিড়ীবাড়ির গেটে তালা ঝুলছে। কোথায় গেল বুড়োটা? প্রথম প্রথম পাঁচজনে কৌতুকচ্ছলে বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে গুণদা সরকার, তাই লোক দেখিয়ে বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে ভিতরে ঢুকে খুঁড়ছে।

অবিশ্যি কৌতুকের কথা কৌতুকেই পর্যবসিত হ'ল, গুণদা সরকারের

আর পাত্তা পাওয়া গেল না। প্রকাণ্ড সেই তালাটায় আস্তে আস্তে মরচে ধরতে লাগল।

সেই তালায় আজ চাবি লাগালেন জিতু লাহিড়ী। অদ্ভুত একটু হেসে পার্শ্ববর্তিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ক বছর আগে সরকার চাবিটা পার্শেল করে পাঠিয়ে দিয়েছিল?'

পার্শ্ববর্তিনী, যিনি এযাবৎ মিসেস লাহিড়ী নাম নিয়ে এক উঁচুতলার সমাজে বিচরণ করে এসেছেন, একদা যাঁর এক কণা হাসির দাম ছিল লাখ টাকা, আর সেদিনও যাঁর ধারে কাছে আধ প্রৌঢ় স্তাবককুলের মধুগুঞ্জন লেগেই থাকতো। উগ্র তরুণী তিন তিনটে মেয়ে, আর কৃতবিদ্য দুই ছেলের মা হয়েও যাঁর আকর্ষণ উপেক্ষার বস্তু ছিল না, তিনি তার পাথরে গড়া মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলেন মাত্র উত্তর দিলেন না।

জিতু লাহিড়ী তালার চাবিটায় মোচড় দিলেন, বলিষ্ঠ পুষ্ট হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠল, বললেন, 'ভাগ্যিস চাবিটা তখন হেসে হেসে রাস্তায় ফেলে দিইনি, কি বল? কে জানতো সেই চাবি আমিই নিজের হাতে এসে খুলব!'

পাথরের মুখের কয়েকটা পেশী একটু বিকৃত হ'ল শুধু—'আমি জানতাম।'

'জানতে না কি? বল কি? কই বলোনি তো?'

মিসেস লাহিড়ী বলে—'কিন্তু তেঁতুলগোড়া গ্রামে কি মিসেস লাহিড়ী মানায়? না ওই শাদাসিধে একখানা লালপাড় শাড়ি আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটা শাদা ব্লাউজ পরা শুধু শাঁখা হাতে ওই মহিলাটিকে সে নামে খাপ খায়? খাপ খাচ্ছে না।

অতএব প্রায়-ভুলে-যাওয়া পরিত্যক্ত একটা নামকেই আবার নতুন করে কুড়িয়ে তুলে নিতে হচ্ছে। বাল্যজীবনের পোশাকী নাম। ডাকনাম একটা ছিল, বহু দিনাবধি চালুও ছিল। লাহিড়ীসাহেবের মেয়েরা যখন তরুণী হয়ে ওঠে নি, তখনও লাহিড়ীসাহেব সে নামটাকে যখন

তখন ব্যবহার করতেন। আদরে সোহাগে কৌতুকে। কিন্তু মেয়েরা তরুণী হয়ে ওঠার পর থেকেই আস্তে আস্তে কি রকম যেন বদলে যেতে শুরু করলেন লাহিড়ীসাহেব, আর সেই বদলানোর সূত্রেই বরুণা লাহিড়ীর সেই বেবি নামটা লাহিড়ীবাড়ির দরজায় ঝোলানো এই তালাটার মতই মরচে পড়ে গেল।

অতএব বরুণা লাহিড়ী। হয়তো বা বরুণা দেবী বললেই আরো যুৎসই হয়। কিন্তু তাই কি কেউ ডাকবে এই হতভাগা অজ তেঁতুলগোড়া গ্রামে? ডাকতে জানে কেউ? হয়তো বা বরুণা লাহিড়ীর শাশুড়ীর নামটাতেই ডাকবে তাকে লোকে। বলবে লাহিড়ীগিন্নী।

কিন্তু এখনো ওরা আসেনি।

এখন সবে পুরনো লাহিড়ীবাড়ির বন্ধ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ভিতরে পা দিয়েছেন জিতু লাহিড়ী, এখন বরুণা নামটাই চলুক। বরুণা! বরুণা লাহিড়ী বললেন, 'বলার সময় আসেনি তাই বলিনি? কিন্তু দেশকে ভালবাসতে এসে প্রথমেই দেশের সাপখোপের ভালবাসায় ধরা নাই বা দিলে? এতদিনের বন্ধ বাড়ি। ওই বাজে লোকটা ঢুকে দেখুক না আগে।'

'বাজে লোক!' অতএব সাপের ছোবলে মরে তো ওই মরুক? জিতু লাহিড়ী গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'এখনো তোমার অনেক শিক্ষার বাকী আছে বরুণা! হয়তো বা কিছুই হয়নি।'

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা আর একটু পাথুরে দেখাল। কিন্তু শুধুই মুখটা। গঠনভঙ্গীটা কেমন যেন ঢিলে ঢিলে আর অসহায় লাগছে বরুণা লাহিড়ীর। বহুবিধ প্রসাধনে টাইট করা দেহে শিফন নাইলন চড়ানো যে মহিলাটি অনেক তরুণীকে টেক্কা দিয়ে দুরন্তবেগে ড্রাইভ করে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে বেড়াতেন রাজধানীর রাজপথে, রাজধানীর আশেপাশে, তাঁকে আর চেনার উপায় নেই যেন।

বরুণা স্বামীর মত অত ফরসা নয়। লাহিড়ী বংশের দুধে ধোওয়া রং, যা নাকি জিতু লাহিড়ীর মধ্যে এখনো টিঁকে আছে, তা নেই বরুণার। তার ধারে কাছেই নেই। মাজা মাজা বলে পাথরের মত রং

বরুণার, কিন্তু নিখুঁত মুখ আর ওই নিটোল গঠন ভঙ্গিমার গুণে পাথরে গড়া পুতুলের মতই দেখতে লাগতো বরুণাকে। আকর্ষণীয়া মোহিনী।

কিন্তু এখন আর লাগছে না। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই নিটোল কঠিন লাবণ্যটুকু ঝরে পড়েছে বরুণার। লালপাড় শাড়িতে ঢাকা দেহটা কাদামাটির পুতুলের মত লাগছে।

শুধু মুখটা আছে। আঁকা ভুরু চোখা রং মুছে ফেলেও আছে। খাটো করে কাটা রুক্ষ ফাঁপানো চুলগুলো টানটান করে আঁচড়ে গোড়া বেঁধে খোঁপা করার জন্য আরো বড় বেশি পাথুরে দেখাচ্ছে। জিতু লাহিড়ী বোধ করি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে 'বাজে লোক' বিধু এগিয়ে এসে নিবৃত্ত করে, 'ক্ষপ করে পা দেবেন না বাবু, উঠোন ভর্তি জঙ্গল, গোড়ায় গোড়ায় এখনো আঁধার। আমি দেখছি—'

'তুমি দেখবে? সাপ বুঝি তোমায়—'

'আমাদের অভ্যেস আছে' বলে বিধু হাতের খেটে লাঠিটা দিয়ে উঠোনের লতাপাতা আগাছা জঙ্গলগুলো ঠেঙাতে ঠেঙাতে চকমিলোনো বাড়ির এক দিকের দাওয়ায় উঠে পড়ে। উঠোনটা এক কালে শান বাঁধান ছিল, এখন ভেঙে ফেটে খাবলা উঠে এই জঙ্গল স্তূপকে রচিত হতে দিয়েছে।

লাহিড়ীর পরনে একখানি থান ধুতি, খালি গায়ে মোটা একখানা চাদর জড়ানো, অনভ্যাসের দরুণ বারে বারে খসে যাচ্ছিল সেটা, আর দুধ-শাদা রঙের গাটা বারে বারে যেন ঝলসে উঠছিল বরুণার চোখের সামনে।

স্বামীর এই নগ্নতার কুশ্রীতায় যেন চোখ বুজতে ইচ্ছে হচ্ছিল বরুণার। ঈশ্বরের এইটুকু কৃপা, মানে, ঈশ্বর বলে সত্যিই যদি কেউ থাকেন, ওই কুশ্রীতা দেখবার জন্যে চোখ নেই কোথাও। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, গায়ে একটা জামা দিলে কিছু আর আধুনিক সভ্যতা তোমাকে দাঁত বসিয়ে দিত না। কিন্তু বললেন না বরুণা লাহিড়ী। মনে পড়ে গেল, কথাটা যেন বলেছিলেন ট্রেনে ওঠার আগে। ঠিক

ঠিক কথাটা না হলেও ওই রকম কথা।

জিতু লাহিড়ী উত্তর দেননি, মৃদু হেসে গায়ের চাদরটা ভাল করে সাপটে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। এখনো কথাটা না বলতেও তেমনি সাপটে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে এলেন, 'বলছিলে না, বাজে লোক? তা কথাটা মিথ্যে নয়, বাজে লোক না হলে কেউ অপরকে ঠেলে [illegible] সাপের মুখে নিজেকে এগিয়ে দেয়?'

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা অবজ্ঞায় বেঁকে গেল, 'সাপ থাকলে যেত না। [illegible] নেই।'

'মানে, [illegible]!'

গরুর গাড়ি থেকে [illegible] কিছু মাল [illegible] এনে [illegible] তুলে দিয়ে বিধু পাওনা পয়সা গুনে নিতে নিতে বলে, 'মজুর [illegible]?'

'[illegible] মজুর—!'

'আজ্ঞে এই জঙ্গল উপড়োতে তো প্রথমেই দুটো মজুর চাই, তারপর আপনার মেরামতের মিস্ত্রীরা এলে—।'

'কিন্তু বাড়ি তো আমি মেরামত করাব না বাবা'—জিতু লাহিড়ী নরম গলায় বলেন

'মেরামত করাবেন না?' স্বল্পবাক বিধু বাক্‌শক্তি হারিয়েই ফেলে প্রায়। তবু কষ্টে বলে, 'তবে যে বললেন বাস করতে এলেন?'

'[illegible] বলেছি, এখনো বলছি, কিন্তু মিস্ত্রী লাগিয়ে হৈ হৈ তুলে বাস করবো [illegible] তো বলিনি—কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকবো।'

বিধু মুখে আর কিছু বলল না, চলে গেল, কিন্তু মনে মনে বলল ভারি নাকি বাস করবেন। কাঁচকলা! ওই শখ হয়েছে, তাই একবার দেখতে [illegible] এসেছে। কিন্তু বাড়ি মেরামতের মুরোদ নেই বলেও তা মনে হচ্ছে না, হালচাল যা দেখছি 'অন্তভক্ষ্য' মতন। তিনি আবার লাহিড়ীবাড়ির কোন ছেলে? এ জন্যই তো শুনেছিলাম [illegible] মস্ত বড় লোক, দপ্তরের মন্ত্রী না কি যেন, তিনি নয় তো। আরো ছেলে ছিল তবে? চেহারাটা কিন্তু রাজরাজড়ার মতন, গিন্নীও কম যায় না।

হালচাল দারিদ্দির, অথচ হাবভাব বড় মানুষের মতন, আশ্চয্যি!

জিতু লাহিড়ীও তখন চমকে অস্ফুটে উচ্চারণ করে উঠেছেন, 'আশ্চর্য। ঠাকুর্দার অয়েলপেটিং পোর্ট্রেটটা রয়েছে এখনো!'

ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে বটে, তবু আছে।

কিন্তু চমকাবারই বা কি আছে? অয়েল পেন্টিং তো থাকেই, শ্যাম লাহিড়ীর বিয়ের সময় তোলা বর-কনের ফটোটাও তো ঝুলছে তাঁর ঘরের দেওয়ালে মাকড়সার ঝুলে আবরিত হয়ে। জিতু লাহিড়ী যদি এখন ছবিটা পেড়ে ধুলো ঝেড়ে দেখতে যান, পোকা কাটার মধ্যে থেকেও সেই মাথায় টোপর চড়ানো বোকা বোকা ছেলেটাকে, আর মাথায় সোনার মুকুট পরা গাল ফুলো ফুলো বাচ্চা মেয়েটাকে দেখতে পাবেন। ছেলেবেলায় যাদের মা আর বাবা ভাবতে ভারী হাসি পেত জিতুর। ছবিটা পেড়ে নিয়ে দেখতো আর হাসতো।

আচ্ছা সেই সোনার মুকুটটা কোথায় গেল? যেটা নাকি তার ঠাকুমাও বিয়ের সময় মাথায় এঁটেছিলেন। ঠাকুমার বাবা নাকি মস্ত বড়লোক ছিলেন, আপাদমস্তক সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন মেয়েকে।

কী সস্তা ছিল তখন সোনা। কী সরল ছিল জীবনযাত্রা!

ভাবলেন জিতু লাহিড়ী।

মনে পড়ল না, ওই জীবনযাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল জিতু নামক চাবুকের মত সেই ছেলেটা। বলেছিল, 'সোনার পাহাড় ঘরে মজুত রেখে ভিখারির মত বেঁচে থাকবার কোনো মানে হয় না। একটা ছেলেকে অন্ততঃ কলকাতায় রেখে পড়াবার পয়সা নেই আপনার?'

শ্যাম লাহিড়ী বলেছিলেন, 'থাকবে না কেন, পাঁচটা ছেলেকে পড়াবার পয়সাও আমার আছে। কিন্তু পয়সা থাকলেই অনর্থক অপব্যয় করতে হবে?'

'অপব্যয়? ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোটা আপনার কাছে পয়সার অপব্যয়?'

'অপব্যয় লেখাপড়া শেখানোয় নয়। শহুরে বাঁদর করায়।'

'শহরে গেলেই মানুষ বাঁদর হয়?'

'সবাই হয় না, তোমার মত ছেলেরা হয়। দেখতে পাচ্ছি তোমার পাখনা উঠেছে। কলকাতায় পাঠালে উড়তে দুদিনও লাগবে না।'

উদ্ধত অবিনয়ী বংশছাড়া ছেলেটা বাপের মুখে মুখে চোপা করে বলেছিল, 'পাখনা যদি উঠেই থাকে, আটকাতে পারবেন?'

'কী, কী বললি'—বলে বোধকরি স্তব্ধই হয়ে গিয়েছিলেন শ্যাম লাহিড়ী। আর ভিতুর সেই মা, সোনার মুকুট পরা ফুলো ফুলো গাল ওই ছবিটা ছাড়া যাঁর আর কোনো ছবি ছিল না, আর ছবিটার সঙ্গে যাঁর তখন কিছুমাত্র মিল ছিল না, সেই মা হঠাৎ ছুঁৎমার্গ ভুলে কোথা থেকে যেন এসে তেরো চোদ্দ বছরের মাথা ছাড়ানো লম্বা হয়ে যাওয়া ছেলেটার মাথাটা ধরে ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে বলেছিলেন, 'গুরুজনের মুখে মুখে চোপা? হতভাগা কুলাঙ্গার ছেলে। জন্মেই তুমি মরনি কেন?'

ছেলেটা আঘাতের জায়গায় হাত বুলোয় নি, শুধু দ্বিতীয়বার আঘাতের আগে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'জন্মেই মরিনি, সে আক্ষেপটা ঘোচাবো তোমার। মরে আবার জন্মাব। মনে মনে জেনো তোমার মেজছেলে মরেছে।' আর কাউকে কিছু বলার অবকাশ দেয়নি ছেলেটা, ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

আশ্চর্য! শ্যাম লাহিড়ী ফেটে পড়ে ছুটে গিয়ে তার কান ধরেন নি, পায়ের খড়ম খুলে মারেন নি, শুধু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েও খড়মের খটখট শব্দ শুনতে পেয়েছিল বুনো রাগী ছেলেটা। দ্রুত পদক্ষেপের ঈষৎ এলোমেলো শব্দ।

সেদিনের সেই কথাগুলো তেমন মনে নেই জিতু লাহিড়ীর, মনে করতেও পারলেন না। শুধু যেন খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দটা শুনতে পেলেন। কোথায় কোন ঘর থেকে শব্দটা উঠছে? উৎকর্ণ হলেন, থেমে গেল। আবার অনুসন্ধানের জন্যে এগিয়ে গেলেন, ধ্বনিত হয়ে থাকল কানের পরদায়, কান থেকে মাথায়। কী এ? কার খড়মের শব্দ?

সহসা লজ্জিত হয়ে প্রায় শব্দ করে হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী।

খড়মটা তার নিজেরই পায়ে। দিল্লির বাজারে অনেক খুঁজে ঠিক শ্যাম লাহিড়ীর মত হাতীর দাঁতের গুল দেওয়া যে খড়ম জোড়াটা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি বত্রিশ জোড়া জুতো ত্যাগ করে, বহুদিনের রুদ্ধ শূন্য ঘনে প্রতিধ্বনি উঠছে তার। অনভ্যাসে খেয়াল হচ্ছিল না।

অথচ তেঁতুলগোড়াতেও এখন খড়মটা হাস্যকর। গ্রাম তেঁতুল-গোড় তার মাঠ ঘাট ধুলো জঙ্গল আর কাঁচা রাস্তায় একশো বছর আগের চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও মানুষগুলোর সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বৈকি।

খড়ম একজোড়া এখন সারা তেঁতুলগোড়া গ্রামটা উটকে ফেললেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। যাবেই না। হয়তো কারো রান্নাঘরের মাচায় জ্বালানীকাঠের নীচে সঙ্গীহীন একটা পাটি পড়ে আছে। অন্য প্রথম পাটিটা জ্বলন্ত উনুনের জ্বাল বাড়াতে ঠেলে দিয়ে বৌমার হয়ত মনে পড়ে গেছে, জিনিসটা তার মরা শ্বশুরের, তখন বিবেকের দংশনে তাড়াতাড়ি বাকি পাটিটা মাচায় ছুঁড়ে দিয়েছে।

এটাও 'হয়তো'। মোটকথা, খড়ম আর এখন তেঁতুলগোড়ায় নেই। আর সেকালের শ্যাম লাহিড়ীর মত, অথবা বর্তমানে জিতু লাহিড়ীর মত, শুধু চাদর গায়ে দিয়ে কাটায় না কেউ। পুরুতরাও মোটর গাড়ির ছেঁড়া টায়ারে বানানো চটি পায়ে দেয়, আর শীতকালে পুরোহাতা সোয়েটার গায়ে পুজো করে।

কিন্তু জিতু লাহিড়ী সে পরিবর্তনটুকু টের পাননি এখনো। স্টেশনে গরুরগাড়ি দেখে পুলকিত হয়ে চড়ে বসেছিলেন, আর সন্ত প্রত্যূষের গ্রাম্য প্রকৃতি যেন এক অনাদিকালের বার্তা বয়ে এনেছিল তার কাছে। দেখছিলেন যেমনটি দেখে গিয়েছিলেন তেঁতুলগোড়াকে, ঠিক তেমনটিই আছে। সেই গাছপালা ধানক্ষেত ধূসর মাট, সেই গরুরগাড়ির চাকার খাঁজ কাটা রাস্তা, সেই পানা, মজা পুকুর, কাকচক্ষু দীঘি। কী মধুর কী মধুর! আজো পৃথিবীতে এই শুচিতা, এই পবিত্রতা আছে। আধুনিক সভ্যতার পঙ্কিল স্পর্শহীন আদিম ভূমি আছে।

জ্বলন্ত জ্বালাময় চিত্তের উপর যেন স্নিগ্ধ স্নেহময় একটা প্রলেপ

পড়েছিল। মনে হয়েছিল নিজের থান ধুতি, মোটা চাদর, কাষ্ঠপাদুকা যেন একটা গৌরবময় কালের প্রতীক স্বরূপ হয়ে অনির্বচনীয় মহিমা বিস্তার করছে।

একটার পর একটা দরজা খুলছিলেন জিতু লাহিড়ী। এসব ঘরে তালার পাট নেই। শুধু শেকল খুলে খুলে কপাট হাট করে দিচ্ছেন, প্রথমটায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ যেন ভিতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, তারপর আবার করুণ অভিমানের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকছে। যেন অনেক কথা বলার আছে তার, শুধু যদি একটু এসে বসো।

তা' ঘরে ঘরে বসবার জায়গাও যে নেই তা নয়। জরাজীর্ণ হয়ে এলেও দু-তিনটে ঘরে পালঙ্ক আছে ছেঁড়া গদির তুলোর বাক্স নিয়ে, বাকী ঘরে তক্তপোষ। পায়ায় উই লেগেছে, ভিতরে ঘুণ ধরেছে, বসতে গেলে হয়তো মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু দেখতে অবিকল, মনে হচ্ছে ধুলোটা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়।

চাবির সঙ্গে যে চিঠিখানা ছিল গুণদা সরকারের, তার দু'চার লাইন মনে পড়ল জিতু লাহিড়ীর।

'দাদাবাবু' লেখেনি গুণদা, 'আপনিও' লেখেনি। লিখেছিল 'মেজ খোকা', ভাবিয়াছিলাম নিজের হাড় কখানা লাহিড়ীবাড়িতেই শেষ করিয়া তিন পুরুষের নিমকের ঋণ শোধ করিব, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ভিতরে ভিতরে ভয়ায়ক একটা যন্ত্রণা বোধ করিতেছি। জেলখানার কয়েদীর মত এই যন্ত্রণা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া মারিতেছে, তাই শেষ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া ভারমুক্ত হইতে চাহিতেছি। বৃদ্ধের অক্ষমতা মার্জনা করিও।'

ভার। তা' ভার বৈকি।

গচ্ছিত সম্পত্তির মত ভার আর কি আছে?—ভাবলেন লাহিড়ী, তাই না বংশের মানসম্ভ্রম রক্ষার দায় এতবড় দায়। পূর্বপুরুষের গচ্ছিত সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে না পারলে পীড়িত হয় মানুষ।

সেদিন কিন্তু হেসেছিলেন জিতু লাহিড়ী। অথবা লাহিড়ী সাহেব।

পুরুষানুক্রমে বঞ্চিত সম্পদ 'বংশ মর্যাদার' দায় যখন তাঁর কাছে হাস্যকর ছিল তখন ভেবেছিলেন, কি দায় আমার গুণদা সরকারকে দায়-মুক্ত করবার? তেঁতুলগোড়ার লাহিড়ী বংশের নাম নিশ্চিহ্ন হচ্ছে তো হোক না। তিনি তো মরে আবার নতুন জন্ম নিয়েছেন। মায়ের সামনে উচ্চারণ করা শপথ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

সেই শপথ পালনের আনন্দে হা হা করে হেসেছিলেন লাহিড়ী সাহেব। বেবি লাহিড়ীকে ডেকে বলেছিলেন, 'শুনেছ, শ্যাম লাহিড়ী তাঁর মেজছেলের মহল আলাদা করে রেখে গিয়েছিলেন। আর এখন নাকি সবগুলো মহলই সেই মেজছেলের। চাবিকাঠিটি হাতে এসে গেছে। আর ওয়ারিশান নেই।'

কিন্তু বারবারই বুঝি জন্মান্তর ঘটছে লাহিড়ীদের মেজ ছেলেটার? তাই আবার সে তিন চারটে ওয়ার্ডরোব ভর্তি সিল্ক রেয়ন টেরেলিন গ্যাবার্ডিন ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ত্যাগ করে, শ্যাম লাহিড়ীর মত থান ধুতি পরে ফের তেঁতুলগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ঐতিহ্যের দায় বহন করতে?

আচ্ছা জিতু লাহিড়ী না হয় ফিরলেন? বেবি লাহিড়ীকেও না হয় তার সমস্ত বিলাস-বৈভবের জাল থেকে মুক্ত করে লাহিড়ী গিন্নীদের সাজে সাজিয়ে টেনে নিয়ে এলেন নিজের সঙ্গে,—কিন্তু তার পর? পরবর্তীকাল? কে রক্ষা করবে পরবর্তী কালকে?

জিতু লাহিড়ীর যে গোল্ড মেডালিস্ট এঞ্জিনিয়ার ছেলেটা একটা মার্কিন মহিলার তৃতীয় পক্ষের স্বামী হয়ে মার্কিন মুলুকেই বাস করছে, সে? না তাঁর যে ছেলেটা ব্যারিস্টারি পাস করে একটা আধাবয়সী গোয়ানিজ মেয়েকে নিয়ে মদ খেয়ে মা-বাপের সামনে বেলেল্লাপনা করে সে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। পাথরের মুখ থেকে একটা ধাতব কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে অনেকগুলো শব্দে বেজে উঠল, 'এইখানেই তুমি বরাবর বাস করবে?'

মুখ ফিরিয়ে হাসলেন জিতু লাহিড়ী, 'করবো বলেই তো এলাম।'

'পারবে?'

'আমিতো পারবোই ঠিক করেছি।'

'আর যদি আমি না পারি?'

'তুমি?' হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী।

'তুমি যদি না পারে? তোমার দরজা তো খোলাই আছে, খোলাই থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার বড়ছেলের কাছে আমেরিকায় গিয়ে থাকতে পারো, তোমার ছোটছেলের গোয়ানিজ বৌয়ের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে বসবাস করতে পারো, তোমার বর্মী আর বাঙালী দুই জামাইয়ের সংসারে পালা করে অতিথি হয়ে বছর কাটিয়ে নিতে পারো, অথবা তোমার সেই ছোট মেয়ের জাহান্নামটা খুঁজে বার করে নিয়ে সেখানেই আড্ডা গাড়তে পার। সেই জাহান্নামটার হদিস পেলে, চাই কি তোমার হারিয়ে যাওয়া সেই জুয়েলারি সেট্টা আর দামী দামী শাড়িগুলোর হদিসও মিলে যেতে পারে।'

বরুণা লাহিড়ী অবিচলিত কণ্ঠে বলেন, 'অপমান করে তুমি আমায় বিচলিত করতে পারবে তা' ভেবো না। তা' পারলে অনেক আগেই সুইসাইডের ছেলেমানুষী পথটাই বেছে নিতাম, তোমার সঙ্গে এত দূর এসে সঙের ভূমিকা নিয়ে স্টেজে উঠতাম না। তবে এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কিছুতেই কেন মনে থাকে না তোমার, ওই জানোয়ারগুলো তোমারও সন্তান!'

'মনে থাকে না! বল কি? অহরহই মনে থাকে। মনের মধ্যে শেলের মত বিঁধে থাকে। আর সেটা থাকে বলেই তো সেই পিতৃত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে—'

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা ব্রোঞ্জের মূর্তির মত টানটান কঠিন কঠিন দেখতে লাগে, আর গলার শব্দটাও তেমনি ধাতব শব্দের মতই শোনায়, 'ওটা যে তোমার মুখের কথা, সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। মানে, জানো সব অপরাধ আমার।, কিন্তু তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো, ছেলেমেয়েদের উশৃঙ্খলতার জন্য দায়ী একা আমিই কিনা। নিজেও কি তুমি অলওয়েজ—'

'উঁহু উঁহু, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাচ্ছ। ইংরিজি নয়, ইংরিজি নয়, বাংলা

প্রতিশব্দ খোঁজ—'

'প্রতিশব্দ খুঁজে খুঁজে তোমার সঙ্গে গল্প করি এ শখ আমার নেই আর। শুধু এই টুকুই বলতে চাইছি, জোয়ারের জল চিরস্থায়ী নয়। তোমার এই অতি অবাস্তব ভাবের জোয়ারটা কাটলেই দেখতে পাবে তার নীচেও কাদা। যে কাদায় পা বসে গিয়ে দূর্গতিই ডেকে আনবে, গতি রুদ্ধ হবে।'

জিতু লাহিড়ী তেমনি হাসির সঙ্গে বলেন, 'দুর্গতি? মন্দ কি? সেটাই না হয় কেমন দেখতে দেখা যাক্।'

'ওঃ। দ্রষ্টব্য হিসেবে ওটা বোধকরি বেশ আকর্ষণীয়?'

'তা গতির স্বাদ তো পাওয়া গেল অনেক, মোটরের গতি, প্লেনের গতি, স্পুউইয়ের গতি, রকেটের গতি যে গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তোমার বান্ধবীদের স্বামীরা স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত হতো, আর তোমার অনুরক্ত ভক্তরা পিছিয়ে পড়ে যাবার রাগে তোমার স্বামীকে মনে মনে অভিশাপ দিত, থামুক না সেই গতির ঝাঁকুনি? টগবগিয়ে ফোটা রক্তটা ঠাণ্ডা মারুক না একটু?'

'চমৎকার? শুধু ভাবছি তোমার থিওরিটা যদি পৃথিবী একবার নিতে চাইতো। অনেক ছুটেছি বলে যদি একবার ঠাণ্ডা হতে চাইতো।'

'আর একবার তুমি প্রতিশব্দ খুঁজতে ভুললে, থিওরি কথাটারও বাংলা আছে। কিন্তু সে যাক, আর একটা বড় ভুল করছো, পৃথিবী বেপরোয়া ছোটে না, শুধু নিজের কেন্দ্রে আবর্তিত হয়। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছুটতে শুরু করলে—'

স্ত্রীর ভুল সংশোধন করা আপাতত থামাতে হল জিতু লাহিড়ীকে, নীচের তলা থেকে একখানি ধারালো গলা বেজে উঠল, 'ওমা, নতুন মানুষরা যে এসেই ওপর তলার উঠেছে। ওপরতলার মানুষ কিনা! কিন্তু এতদিনের বন্ধ বাড়িটা, সিঁড়িতে চামচিকের আড্ডা, চট করে ওঠাটা ঠিক হয়নি। তা' এ অধম মানুষটা যাবে নাকি?'

জিতু লাহিড়ী এবং বরুণা লাহিড়ী দুজনেই সচকিত হলেন, জিতু এগিয়ে এসে বারান্দার জাফরিতে ঝুঁকে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কে?'

'কেউ না। এই লাহিড়ীদেরই একটা হতভাগা মেয়ে।'

'আসুন।' বলে স্বামী স্ত্রী পরস্পর একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দুজনের দৃষ্টিতে দুরকম ভাষা।

একজনের ভাষাটা কথায় পরিণত করলে এই দাঁড়ায়: 'দেখ, এই বার অডিয়েন্স এসে গেছে, যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে, অভিনয়ে যেন ত্রুটি না থাকে তোমার।'

অপর জনের ভাষাটা অনেকটা এই: 'পেয়েছ তো এইবার মনের মত মানুষ? তোমার মতে আধুনিক সভ্যতার প্রলেপে যারা ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠেনি? তা ওসব তুমিই বোঝ। আমি কিছুর মধ্যে নেই।'

অনুক্ত কথাগুলি অবশ্য অনুক্তই থাকলো। নীচের তলার মানুষটি ওপরতলায় উঠে এল।

মুহূর্তে দু-পক্ষেরই মনে হল' 'এ রকমটি তো ভাবছিলাম না।'

আড়ষ্ট হল দুপক্ষই।

কয়েকটা মুহূর্ত।

বেশিক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সরযূ নয়। মানে বছর চল্লিশের এই বিধবাটিকে মহিলা না বলে যদি মেয়েই বলা হয়। চোদ্দ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত তো একই ভাবে কাটিয়ে এল সরযূ। তাই বোধকরি মেয়ে শব্দটাই তার সম্পর্কে ব্যবহার করে সবাই।

ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এল না, মা হল না, তাই নতুন কোনো পরিচয়ের ছাপ পড়ল না তার গায়ে। অথচ চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই একখানা থানমাত্র সম্বল করেছে, পিসি আর খুড়ির সঙ্গে কৃচ্ছ সাধনের যাবতীয় বিধি পালন করে আসছে, বাড়ার ভাগ শুচিবাই। সকলকে টেক্কা দিয়েছে তাতে। আর টেক্কা দিতে পারে গলার জোরে।

পাড়ার এ-প্রান্ত থেকে কথা বললে ও-প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। গ্রামের কোনো মেয়ের খরখরে কথা হলে লোকে তুলনা দিয়ে বলে, 'এটার দেখছি ভুবন লাহিড়ীর মেয়েটার মতই গলা হচ্ছে।'

তা' সে গলাকে একটু খাটো করল সরযূ। ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত গলায়

বলল, 'তবে যে বিধু বলল, বড়লাহিড়ী মশায়ের ছেলেবৌ এলেন—'

বরুণা লাহিড়ীর হঠাৎ কেন যে তাঁর থেকে বয়সে বেশ খানিকটা ছোট এই মেয়েটাকেই প্রতিপক্ষ মনে হল কে জানে! তবে মনে হল। আর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুরুটা কুঁচকে এল, বললেন, 'বিধু কে?'

'ওই যে গাড়োয়ান ছেলেটা। ফেরার মুখে দেখা হতে, কে এল শুধোতে বলল, বড়লাহিড়ী মশায়ের ছেলেবৌ এলেন—'

জিতু লাহিড়ীর মনে হল, একে যেন আগে কোথাও দেখেছেন, কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব! তিনি যখন দেশ ছেড়েছেন, তখন এ জন্মেছে কিনা সন্দেহ। তবে কি এর মত আর কাউকে দেখেছেন। বেশ যেন পরিচিত। অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, মৃদুহাস্যে বললেন, 'তাঁরা যে আসেননি, সেটা কে বলল?'

সরযূ বেশ নিরীক্ষণ করে আর একবার যুগল মূর্তিটি দেখে নিয়ে বলে, 'তা তাঁর ছেলে বলতে তো একজনই আছেন—'

'একজনকেই তো দেখছেন—'

'ওমা!' সরযূ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তিনি কি এই আপনার মত?'

'আমার মত নয়? দেখেছেন তাঁকে?'

'নাঃ—দেখবো আর কোথা থেকে? তিনি কি আর কখনো এই হতভাগা দেশে পদধূলি দিয়েছেন? তবে শুনেছি তিনি নিজে নাকি সাহেব, গিন্নি মেম, বাংলা বুলি মুখে আসে না, বাঙালীর খাদ্য জিভে রোচে না, কর্তা-গিন্নি নাচের আসরে গিয়ে নাচ করেন।'

বরুণা বোধকরি আর বরদাস্ত করতে পারেন না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আরও কি কি শুনেছেন তার একটা লিস্ট করে আনলে সুবিধে হত না? আর আপনার সংবাদদাতা—'

'কী মুশকিল!' জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন, 'তুমি চটে উঠছ কেন? সত্যি কথা শুনলে রেগে ওঠা রোগটা তোমার গেল না। সংবাদদাতা যেই হোক, ভুল সংবাদ তো আর পরিবেশন করেনি। কিন্তু আপনি লাহিড়ীদের কে যেন হন সেটা তো বললেন না?'

'লাহিড়ীদের কেউ সে কথা আর বলতে দেয় কই? গোত্তর পদবী

সব তো কোন কালে কেড়ে নিয়েছে। এঁদের বাড়িতে জন্মেছিলাম, সেইটুকু দাবীর জোরেই তো আজন্ম এঁদের অন্ন ধ্বংসাচ্ছি। সে যাক, আপনাদের পরিচয়টা না শোনা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না। হঠাৎ দেখে যেন আচমকা জ্যাঠামশাইয়ের চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। অথচ—'

'জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই কাকে বলছেন বলুন তো?'

গুরুজনের নাম উচ্চারণে মফস্বলীদের যে ধরনের ইতস্ততঃ ভাব দেখা যায়, সরযূর কণ্ঠেও সেই সুর ধ্বনিত হল। থেমে আস্তে বলল, 'আমি শ্যাম লাহিড়ী মশাইয়ের কথা বলছি—'

'শ্যাম লাহিড়ী আপনার জ্যাঠামশাই হতেন? আপনি—'

'ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে। ছোট মেয়ে।'

জিতু লাহিড়ী সকৌতুকে বলেন, 'ওঃ! ও বাড়ির ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে আপনি? তাই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন দেখেছি। নিশ্চয় আপনি আপনার বাবার ধরনের দেখতে?'

'লোকে তো তাই বলে। আবার এও বলে 'পিতৃমুখী কন্যা সুখী'। তা' আজন্ম তো সুখের সাগরে ভেসে শাস্তর বাক্য সত্যি করছি। কিন্তু যাই হোক আপনার নামটা বলে সন্দেহ ভঞ্জন করুন বাবু—'

'নাম? তেঁতুলগোড়ায় কি আর আমার নাম কেউ মনে রেখেছে? এখানে যখন ছিলাম, লোকে তো 'জিতু জিতু' করে ডাকতো।'

'ওমা! সে কি!' সরযূ গালে হাত দেয়। 'তাহলে তো দিল্লীর সেই সাহেবই হচ্ছেন গো। তবে তো দেখছি লোকের সব বানানো। হিংসে করে সেই সব কথা রটিয়েছে। এ তো দেখছি একেবারে কাশীর টুলো পাণ্ডিত। নাঃ, রটা কথায় বিশ্বাস করতে নেই—'

বলেই সরযূ সহসা থানের আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে ঘট ঘট করে দুজনার পায়ের কাছেই এক একটা প্রণাম ঠুকে বলে, 'অপরাধ নেবেন না দাদা, এতক্ষণ কে না কে বলে পেন্নামটা তুলে রেখেছিলাম। তবে এও বলবো, অবিকল জ্যাঠামশাইয়ের মত দেখতে না লাগলে বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম জাল প্রতাপচাঁদের মতন—'

জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন। এবং সম্পর্কটা স্থির হয়ে যাওয়ায়

ওকে আর আপনি না বলে আপনি-তুমি বর্জিতভাবে বলেন, 'সর্বনাশ। ভেজাল-টেজাল নয়, একেবারে পুরোপুরি জাল। কিন্তু জাল করতে কি কেউ চাল বদলে আসে? বরং প্রাণ পণে ময়ূরপুচ্ছটা আঁকড়েই থাকে। ভেজালের জাল ছিঁড়ে ফেলে দেখতে এলাম তেঁতুলগোড়ায় এখনো কেউ আমায় মনে রেখেছে কিনা।'

সরযূ হেসে ফেলে। বলে, 'ও বাবা, মনে খুব রেখেছে। বেশি রকম মনে রেখেছে। তবে এ রকম খড়ম পরা টুলো পণ্ডিত জানলে কি আর মনে রাখতো? হোমরাচোমরা সাহেব বলেই মনে রেখেছে।'

'তাই নাকি?' হেসে ওঠেন জিতু লাহিড়ী।

আর বরুণা র মনে হয় বহু কাল স্বামীর এমন কৌতুকোজ্জ্বল সরস হাসি শোনেন নি। যেটুকু হাসেন, যা এত দিন ধরে হেসে এসেছেন, সে শুধু ব্যঙ্গ হাসি। রাগে হার জ্বলে যায় বরুণার। এই একটা গ্রাম্য বিধবা, অসভ্যর চরম, গায়ে একটা জামা পর্যন্ত দিতে শেখেনি, ভদ্র-ভাবে কথা কইতেও জানে না, তার সঙ্গে কথা বলতে ওনার মন একেবারে আহ্লাদে উথলে উঠল।

আর কিছু নয়। মূল গোড়ায় যে এই তেঁতুলগোড়ার গ্রাম্যতা। ছিটকে বাইরে গিয়ে, আর বেবি লাহিড়ীর হাতে পড়ে, ওপরে একটু পালিশ পড়েছিল। এতটুকু একটু ধাক্কাতেই সেই পালিশের পলস্তারা খসে পড়ল। নইলে এযুগে, সভ্যসমাজেই কটা ছেলেমেয়েই বা জাতি গোত্র মিলিয়ে বিয়ে করছে, অথবা সুবোধ সুশীল হয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এতটুকু একটু এদিক-ওদিক করেছে বলে বাপ একেবারে আধুনিক সভ্যতার ওপরই খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন।

অথচ এখানকার এই বাচালতা অসভ্যতা আর ধৃষ্টতাটি দিব্যি উপভোগ করেছেন। হবেই তো, ওই দেখে দেখেই তো বনেদ গড়েছে।

কথা বলতে নেহাৎ প্রবৃত্তি হচ্ছেনা তাই চুপ করে আছেন বরুণা। নইলে ওকে এমন দু-একটি কথা শুনিয়ে দিতেন যে চিরদিনের মত ওর ওই বাচালতা বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু সত্যিই কি শুধু প্রবৃত্তি হচ্ছে না বলে?

চিরদিনের নির্ভীক বেবি লাহিড়ীও কি চিরদিনের প্রশ্রয়দাতা তার এই স্বামীটিকে আজকাল বেশ একটু ভয় করছেন না? মুখে স্বীকার না করলেও মনের মধ্যে আশঙ্কা রয়েছে, হয়তো সেই প্রশ্রয়ের অবসান হয়েছে। অবসান হয়েছে যবে থেকে বেবি লাহিড়ীর তিন মেয়ে শীলা শেলি আর সোমা বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনদিন ভেবে পান নি বেবি লাহিড়ী, তার সর্ববিধ বাচালতাকেও যিনি চিরদিন সকৌতুকে অবহেলা করে এসেছেন, মেয়েদের ব্যাপারেই বা তিনি এমন কঠিন হয়ে উঠলেন কেন? বেবি লাহিড়ীর দৌড়টা নেহাৎই তাঁর নিজের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলেই কি খেলাচ্ছলে দৌড়তে দিতেন? কিন্তু বেবি লাহিড়ীর দৌড় সীমাবদ্ধ না হয়ে উপায় কি? বেপরোয়া হবার জোরটা তার কোথায়? মেয়েদের মত তো তাঁর এম-এ বি-এ পাশ করা বিদ্যের জোর নেই? ওইখানেই যে তার অসহায়তা।

স্বামী সঙ্গে না থাকলে বাইরের হাটে সেই 'না বিদ্যের' হাঁড়িটি ফেটে যাবার ভয়ে সর্বদা স্বামীর খুঁটিটি আঁকড়ে থাকতে হয়েছে বেবি লাহিড়ীকে। কিন্তু ওদের সে ভয় থাকবে কেন? ওদের বিদ্যেই যে ওদের বুকের বল।

ওরা জানে বাপ ভাই স্বামীর সঙ্গে না বনলে নিজে করে খেতে পারবে। জানে ইংরিজি ভাবাটা ভাল মত রপ্ত থাকলে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। অতএব পৃথিবীকে ভোগ করবার নেশায় মাততে ভয় পায়নি ওরা। অবিশ্যি ছেলেমেয়েগুলো ওইভাবে বেইমানী করে মা বাপকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্যে পাঁজর ভেঙে গেছে বরুণার, তবু স্বামীর কাছে অপ্রতিভ হওয়ার লজ্জাটাই বেশি বেজেছে। ওরা যদি একজনও মা বলে জায়গা দিত, লাহিড়ীর সাধ্য ছিল বরুণাকে এই কারাবাসে এনে ফেলতে? এই সঙ সাজাতে?

তবু সঙ সাজার বিরুদ্ধে লড়তে কি চেষ্টা করেননি বরুণা?

কিন্তু ক্রমশঃ ভয় হল, মানুষটা বুঝি ক্ষেপে যাবে। ডাক্তাররাও আড়ালে পরামর্শ দিল, উনি যা বলেন শুনে যান। নইলে ক্ষেপে

যাওয়া বিচিত্র নয়। অথচ ক্ষেপে যাওয়া কি আটকাতে পারলেন বরুণা? এই খড়ম, এই চাদর, এই গরুরগাড়ি, আর এই পচা ভাঙা বাড়িতে এসে শাকভাত গ্রহণের সংকল্প, এসব কি সুস্থতার পরিচয় দিচ্ছে? না, দিচ্ছে না। তার উপর যদি তাল দিতে এমনি সব প্রতিবেশী এসে গায়ে পড়ে! জনমানবশূন্য দেশে সেলে থাকা কয়েদীর মতই থাকবেন ভেবে এসেছিলেন বরুণা, অর্থাৎ যতদিন না স্বামীর এই 'ভাবের ফেনা' শুকোয়। কিন্তু মনে হচ্ছে সে ফেনা এরা শুকোতে দেবে না। এই ভাবে এসে গায়ে পড়বে, জিইয়ে রাখবে।

অনেকক্ষণ নিজের তীব্র বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন বরুণা। ওরা যে এতক্ষণ কি বলাবলি করছিল ঠিক শুনতে পাননি। শেষ কথাটা শুনতে পেলেন, 'আচ্ছা সে যখন করবেন তখন করবেন, আজ আপনাকে ছাড়ছে কে! সরযুকে তো চেনেন না? ওই কথাই থাকল তাহলে। আর বৌদিদি তো এই গাঁইয়া ননদের সঙ্গে কথাই কইলেন না। আচ্ছা বাবা এ খোঁট্ ক'দিন রাখতে পারেন দেখবো। এখন বলে যাইগো বৌদি. ছোটলাহিড়ী বাড়িতে হরগৌরীর নেমন্তন্ন থাকলো। না গেলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।'

বলে আর একবার গলবস্ত্র হয়ে গড় করে সরযু। আর অসতর্কে পিঠের কাপড়টা একটু সরে গিয়ে পাঁজরের কাছের একাংশের দুর্দান্ত ফরসা রঙের একটুখানি যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠা এক চিলতে আগুনের মত ঝলসে ওঠে বরুণার চোখে। আগুনই মনে হল, মুখ হাত পা তো এতটা ফরসা নয়।

কটু একটা বিদ্বেষে মনটা বিষিয়ে ওঠে বরুণার। যেন সরযুর সেটা প্রাপ্য পাওনা নয়, বিধাতা পুরুষ সেটা ওকে অন্যায় করে দিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া কী অসভ্যতা! কী অশ্লীলতা!

কিন্তু শুধু কি অসভ্যতা? কী ধৃষ্টতা! কী দুঃসাহস! নেমন্তন্ন করতে চাইছে! লাহিড়ীসাহেব আর বেবি লাহিড়ীকে।

তা' সরযুর নিকটজনেরাও সে কথা বলে ওঠে। পিসি আর খুড়ি

গালে হাত দিয়ে বলে, 'ধন্যি বুকের পাটা তোর। নেমন্তন্ন করে এলি তাদের?

সরযূও গালে হাত দেয়, 'ওমা নেমন্তন্ন কিসের? বাড়ির ছেলে এতকাল পরে বাড়ি ফিরল, প্রথমদিন ছুটো খেতে বলব না? বলি লাহিড়ীবাড়িতে তো এখনো মানুষজন রয়েছে, ভাতের হাঁড়ি চড়ছে—'

সরযূব বিধবা ভাজ বলে, 'সেই হাঁড়ি আর ওরা? ওরা তোমার ডাল ভাত মাছের ঝোল খাবে?'

'দেখো খায় কিনা! ওগো বলি তাহলে, যা শুনে এসেছ তার কিছু নয়। সাহেব-টাহেব কিছু না, সত্য যেন শ্যাম জ্যাঠা দাঁড়িয়ে। ঠিক তেমনি থানধুতি, মোটা চাদর, হাতির দাঁতের গুলোদেওয়া খড়ম—'

'ধুতি! চাদর! খড়ম!'

'তবে আর বলছি কি গো? যতদূর বুঝলাম, সাহেবীআনা আর বড়মানুষী করে আশা মিটে গেছে, অরুচি ধরে গেছে, তাই বানপ্রস্থ নিতে এসেছেন কর্তা গিন্নী! কোনো সদ্‌গুরুর দীক্ষার ফলও হতে পারে। এমন হয়। লালাবাবুর কথা তো জানা আছে? তবে গিন্নীর এখনো সে মন হতে বাকী আছে। দাঁড়িয়ে আছে.. যেন কাঠ-পাথরের পুতুল। যা বুঝলাম আমার ওপর রেগে লাল হয়ে গেছে।'

'এই মরেছে! তুই আবার এক্ষুনি কী বলতে গেলি তাকে?'

'তাকে আবার কী বলব? গাঁইয়াভূত দেখেই ভদ্দরমহিলার পিত্তি চটে গেছে আর কি! অবিশ্যি সাজসজ্জা করেছে খুব হিন্দুয়ানী। কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে যেন, ঠিক থিয়েটারের সাজা গিন্নী! যাকগে বাবা পরচর্চা, খুড়ি তোমার হেঁসেলের খবরটা শুনি—

'পোড়া কপাল! আমার হেঁসেলের আবার খবর! এই কাঁঠাল-বীচি দিয়ে ভাজা কড়ায়ের ডাল নামিয়েছি, কুমড়োডাঁটার চচ্চড়ি আর আলুপটলের সর্ষে ঝাল কুটেছি। একটু বড়ির টক যদি করি।'

'হবে হবে ওতেই হবে। এখন সাহেবের মুখে দিশী রান্নাই রুচবে। ছুখানা বরং কুমড়ো ফুলের বড়া কর, আর পায়েস চড়িয়ে দাও একটু। আমি ছুলালের মাকে একবার মাছের কথা বলে আসি।'

সরযূর ভাজ বলে, 'দুলালেই মা তো গেল কাল খয়রা মাছ বৈ কিছু আনেনি, তোমার ছোটো ভাইপো রেগে লাল। বলে, উঠোনে ইট পেতে হাঁসের ডিম রেঁধে খাবে—'

'ওবে বাবা খয়রা মাছ, খয়রা মাছই ভাল। সাহেব হয়তো দেশ ছেড়ে পর্যন্ত ও জিনিস চোখেই দেখেনি। আমার জন্মের ক'বছর আগে দেশ ছেড়েছিল গো ?'

'তা' বছর চার পাঁচ হবে।'

'বাবা। একেই বলে নিরুদ্দিশ রাজার উদ্দিশ। যাকগে। তোমরা হাত চালিয়ে নাও। পাবো তো সহজের মধ্যে রান্নার আর দু-একটা পদ কোরো—আমি চললাম গাঁয়ে খবর দিতে '

'তা তো যাবিই,' পিসি হাঁক দেয়, 'তুই হ'ল গেজেট। তা ভিজে কাপড়ে চললি যে ?'

'আবার তো ডুব দিয়ে ফিরবো গো ?'

'মরতে তবে এক্ষুনি ডুব দিলি যে ?'

'ওমা! শোনো কথা। এই বন্ধ বাড়ির উঠোনে কি না কি জমেছে এতকাল ধরে, মাড়িয়ে মরিনি ? কত ডিঙিয়ে যাবো ? ভিজে কাপড় কতক্ষণ ভিজে থাকবে ? যা ধুপ ফুটছে—'

দ্রুত ছুটে বেরিয়ে পড়ে সরযূ। খবরটা বিলি করা দরকার।

শুধু ওদের খবর দেওয়াই নয়, দুলালের মা আবার মাছগুলো না আর কারো ঘরে জোগান দিয়ে বসে। গয়লানীকেও বলতে হবে। বাড়িতে মজুর মিস্ত্রী লাগিয়ে বসবাসযোগ্য করে নিতে ওদের এখন লাগবে দু-দশদিন, সে কদিন তো ওদের জোর করে এখানেই খাওয়াতে দাওয়াতে হবে। তাছাড়া যা বোঝা যাচ্ছে, সাতটা দাস দাসীর ওপর থেকেছে চিরকাল। এখনই হঠাৎ খেয়ালে পড়ে···তবু নিজে আর রেঁধেছে গিন্নী। একটি বামুনের মেয়ে জোগাড় করে দিতে পারলে—

সমস্ত দায়িত্ব যেন সরযূরই। কে যে তার ওপর চাপিয়েছে সে দায়িত্ব, কে জানে। কিন্তু শুধুই কি আগন্তুক মানুষটা লাহিড়ীবাড়ির বলে ? গ্রামে যত বাড়ি আছে, সকলের সব দায়িত্বই কি সরযূর নয় ?

বাগদি বাড়িও তো বাদ যায় না। গ্রামের সব্বাই সরযূরই হেফাজতে আছে যেন। কেউ কোনো অসুবিধেয় পড়েছে কি সরযূ মাথায় সাপ বেঁধে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সরযূর ভাজ বলে, 'পারবে না কেন। আপন সংসারের দায় দায়িত্ব তো আর নিতে হল না কোনদিন—সারা রাজ্যি টহল দিয়ে এসে বাড়া ভাতটি খেতে পাচ্ছে—'

পিসি কুটুস কামড় দিয়ে বলে, 'এই বুড়ি ছুটো যে ক'দিন সেই ক'দিনই পাবে বৌমা। তারপর তো আর নয়।'

ভাজ মনে মনে বলে, তাঁরা তো চিরদিনই থাকবেন। তা বলে মেয়েমানুষ কখনো হাঁড়িতে হাত দেবো না? মুখে বলতে সাহস পায় না। তেঁতুলগোড়া এখনো অত সাহস যোগান দিতে শেখেনি।'

তা সরযূর সত্যিই দোষ আছে। রান্নাঘরের দিকে নেই সরযূ।

বলে, 'রক্ষে কর বাবা, তোমাদের ওই চালার নীচে ঢুকলেই প্রাণ যেন হাঁপিয়ে আসে আমার। রন্ধন না বন্ধন। তা ছাড়া ওর ভেতর ঢুকলেই তো আমার মনে হবে সব সকড়ি ঠেকা। ধুতে মুছতেই দিন কাবার হবে, রান্না আর হবে না।'

ভাজ বলে, 'জ্ঞানপাপী।'

পিসি বলে, 'ওই নিয়েই তো ওর জীবনটা কাটালো। একটা কিছু অবলম্বন তো চাই মানুষের।'

ভাজ মনে মনে বলে, অবলম্বনটা বেশ ভালই। পাড়া বেড়ানো, গালগল্প আর শুচিবাই। মনে মনে বলে, মুখে বলার সাহস নেই। মাথার ওপর দু দুটো শাশুড়ী। অথচ নিজেরই তার শাশুড়ী হবার সময় হয়ে এল। ছেলে বড় হয়ে উঠল।

সরযূ অবিশ্যি বলে, 'এমন তপস্যা কে কোথায় বসে করেছে বৌ, যে তোমার ওই সোনার চাঁদ ছেলেদের জামাই করবে?'

কিন্তু সরযূ কাকে কি না বলে? নইলে আর বরুণা লাহিড়ীকে ঠোকর মেরে যায়?

সেই ঠোকরের ঘায়ে সরযূ চলে গেলে বরুণা লাহিড়ী মিনিট-

খানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন দাঁতে ঠোঁট চেপে। তারপর তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে ওঠেন, 'এটাই বোধ করি তোমাদের দেশের 'দেশীয় সভ্যতার' নিদর্শন ?'

জিতু লাহিড়ীও স্তব্ধ হয়েছিলেন। বোধ করি চিন্তা করছিলেন যখন দেশটা ছেড়ে গিয়েছিলেন, আর কে কে ছিল। যাদের সঙ্গে সম্পর্কের কণিকাটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে চাননি, তাদের সকলকে এত মনে আছে ? অথচ স্মরণ করেননি কখনো। ভুবন কাকার বড় ছেলেটা বোধহয় জিতুর বয়সই ছিল। ঢের দুষ্টুমী করা গেছে তার সঙ্গে। বেঁচে আছে না নেই জিজ্ঞেস করা হল না সরযূকে। হয়তো নেই। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বড় তাড়াতাড়ি মরে। তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়, তাড়াতাড়ি মরে। হিতু তার নিজের দাদা, সেও তো কোন কালে মরে গেছে। চিরকালই হিতু একটু রুগ্ন রুগ্ন ছিল বটে, বনত না দুরন্ত জিতুর সঙ্গে, রাতদিন ঘরে বসে থাকতে ভালবাসতো, তবু মরে গেল। ছোটটাও তো গেছে। তাকে অবিশ্যি খুব একটা মনে পড়ে না। মা, পিসির কোলে কোলেই থাকতো তখনো। পিসি-টিসি আরো কতই সব ছিল, সব নিঃশেষ। শেষ অবধি সরকার মশাই। তিনিই কিভাবে জিতুর ঠিকানাটা সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে বিশেষ ঘটনায় সংবাদ দিয়ে এক একখানি চিঠি দিতেন। বরাবরই দিতেন। কেন কে জানে!

বিশেষের মধ্যে মৃত্যুটাই প্রধান। সেই খবরগুলো খবরের কাগজের শোক-সংবাদের মত গ্রহণ করতেন জিতু লাহিড়ী। কাগজ মুড়ে সরিয়ে রাখার মত সরিয়ে রাখতেন।

শুধু মায়ের মৃত্যুর খবরে মনের মধ্যে তোলপাড় একটা হয়েছিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বসেছিলেন বেশ খানিকক্ষণ। ভেবেছিলেন কালীবাড়ির পুরুতের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করবেন কিনা কতদূর কি করণীয়, তারপর মনের জোর করে দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যথারীতি জুতো জামা পরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বরুণাও জানেনি। পরে বাবার মৃত্যুর খবরটা বরুণার হাতেই আগে

পড়েছিল। সে সময় সে বলেছিল, 'তা হলে এখন কী করবে ?'

জিতু লাহিড়ী জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'করবার আবার কী আছে ? আমি সে বংশের কে ? আমি তো তেজ্যপুত্র। তেজ্যপুত্রের কী জাতি গোত্র থাকে ? না বংশধারার সঙ্গে যোগ থাকে ? থাকলে বাড়ির সরকারের কাছ থেকে মা বাপ মরার খবর—'

কথাটা অসমাপ্তই থেকেছিল।

'তাহলে কিছু করা হবে না ?' বরুণা অসমাপ্ত কথারই জের টেনেছিল।

'না না না।'

'খাওয়া দাওয়া—'

'বলেছি তো কিছু করতে হবে না। বার বার ওকথা তুলছ কেন ?'

'বেশ আমার কি ? আমার বলবার কথা, বললাম। এরপর কেউ যেন না বলে আমার বলা উচিত ছিল।'

'নিশ্চিন্ত থাক, তোমায় কেউ কিছু বলবে না।'

সন্দেহ নেই স্বামীর ওই আত্মীয়দের প্রতি ক্ষুব্ধ বিদ্রোহাত্মক উক্তিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন বরুণা।

আর জিতু লাহিড়ী পাঁচ সাত দশদিন পর্যন্ত অনরবত জপ করেছেন, ঠিকই করেছি। সত্যিই তো আমি কে তেঁতুলগোড়ার লহিড়ীবাড়ির ? আমি তো কেন্দ্রচ্যুত, বংশচ্যুত। আমি জল পিণ্ড দিতে গেলেই কি শ্যাম লাহিড়ী সে জল নিতে আসতেন নাকি ?

আশ্চর্য নিয়তি! আজ জিতু লাহিড়ী নিজে এসেছেন সেই বংশধারার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। আধুনিকতার তীব্র বিষে জর্জরিত জীবনটাতে একটুখানি কোমল শান্তির প্রলেপ লাগাতে।

এই শুচিস্নিগ্ধ সুনির্মল সকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন নতুন করে অনুভব করছেন জীবনটাকে কী অপচয় করেছেন। সারাটা জীবন তাঁকে যেন একটা উন্মাদ প্রভু চুলের ঝুঁটি ধরে তাড়িয়ে নিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে গ্লানির মধ্যে, ক্লেদাক্ত আবিলতার মধ্যে, আর তিনি 'ভাগ্যের ঘরের চাবিকাঠিটি পেয়ে

গিয়েছি' ভেবে গর্বে আর পুলকে সেই প্রভুর দাসত্ব করেছেন।

'উঠতে হবে, আরো উঠতে হবে, ছুটতে হবে, আরো ছুটতে হবে—' এই নেশার ঘোরে কেটে গেছে এমন কত সকাল কত সন্ধ্যা, কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেননি।

আলো ঝলমলে শহর কোনোদিন টের পেতে দেয়নি পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামে। মনে পড়িয়ে দেয়নি জীবনেও সন্ধ্যা নামে।

সুখ? সুখ পেয়েছেন কখনো? পেয়েছেন আনন্দ?

পেয়েছেন বৈকি। সুখ পেয়েছেন অপরের ঈর্ষার মধ্যে, অপরকে অবজ্ঞা করার মধ্যে, অন্যকে ক্ষুদ্র প্রাণী বলে ভাবার মধ্যে। মনুষকে মানুষ মনে না করার মধ্যে পেয়েছেন সুখের উপাদান।

আর আনন্দ খুঁজেছেন নতুন গাড়িতে, বড় বাড়িতে, বেপরোয়া অপব্যয়ে, বিলাসিতার উন্মাদনায়। আর দুরন্ত ছোটাছুটির ক্লান্তিতে বিশ্রাম খুঁজতে গেছেন নাচের আসরে, ককটেল পার্টিতে। বেবি লাহিড়ীর কায়দাদুরস্ত উন্নাসিক অফিসার বাপকে থ করে দিয়েছেন বেবি লাহিড়ীকে ড্রিঙ্ক করার কুসংস্কার ভাঙিয়ে।

প্রথম জীবনে বেবি লাহিড়ী তার পতিগৃহকে পিতৃগৃহের তুলনায় ফ্যাশানে আর রুচিতে খাটো ভাবতো, এইটুকুই হয়তো ছিল ওই ছোটার চেষ্টায় মূল বনেদ। বেবি লাহিড়ীকে তাক লাগিয়ে দেবার ছেলেমানুষী দুর্মতি শুরু করাল জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

কিন্তু তবু জিতু লাহিড়ীই যেন হারলেন শেষ অবধি।

তাক লাগানোর এই খেলায় বেবি লাহিড়ীই অবিরত জিততে থাকলো। আর তার সহায় হয়ে উঠলো ছেলেমেয়ে পাঁচটা? জিতু লাহিড়ীর পয়সার শ্রাদ্ধ করে করে যারা সবচেয়ে নামী আর দামী বিলিতি স্কুলের বোর্ডিঙে থেকে লেখাপড়া করলো, আর সেই লেখা-পড়ায় সমাপ্তির রেখা টানতে সমুদ্র পারাপার করল। মেয়েরা অবশ্য নয়, ছেলেরা। মেয়েরা তো তখন দিল্লির আকাশে উড়ছে। আর

বেবি লাহিড়ী লাটাইয়ের সুতো ছাড়ছেন।

কিন্তু বেচারা বেবি লাহিড়ীর আত্মবিশ্বাসটা বড় বেশি খর্ব হয়ে গেল। ছাড়া সুতো গোটাতে গিয়ে দেখলেন ঘুড়ি হাতছাড়া। বল বুদ্ধি ভরসা তিন তিনটে মেয়ে বেবি লাহিড়ীর, একটাও হাতে রইল না। বিলকুল বেহাত হয়ে গেল। ছেলে দুটো তো আগেই গেছে। তাদের কথা ভাবতে ঘৃণা হয়। কী অশুচিতা! কী অপবিত্রতা!

কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করে নিজে তিনি উন্নতির এক একটি সোপান গেঁথেছিলেন, সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ে না জিতু লাহিড়ীর। বিলাস-বৈভবের লবণ রসে জারিত ফেনিল সেই অতীত জীবনটাই শুধু ব্যঙ্গ হাসি হেসে হেসে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু প্রথমটা কি নিজেই চোখ বুজতে চেষ্টা করেন নি লাহিড়ী সাহেব? পরিচিত সমাজে যখন লাহিড়ী সাহেবের মেয়েরা একটা মুখরোচক আলোচনা হয়ে উঠেছে, তখনও কি সেই নিন্দাকারাদেরই 'ননসেন্স' বলে অগ্রাহ্য করেননি তিনি?

তারপর? তারপর যখন মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠল, তখন—

স্ত্রীর প্রশ্নে চিন্তাভঙ্গ হল। সচকিত হলেন জিতু লাহিড়ী, বললেন, 'কি বলছ?'

বলছি এটাই বোধ করি তোমাদের গ্রামীন সভ্যতা?

'কোনটা?'

'বলছি, এই যে চেনা নেই, জানা নেই, গায়ে পড়ে আত্মীয়তা জানাতে এসে যাকে যা খুশি বলা, এই বাচালতা, বেহায়াপনা—'

'বেহায়াপনা! বেহায়াপনার কী দেখলে?'

'সভ্যতারও কিছু দেখলাম না। গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। মেয়েরা একটু খাটো ব্লাউজ পরলে চক্ষুশূল হতো তোমার, সেবার রাউথ সাহেবের স্ত্রীর বার্থডে পার্টিতে যাবার দিন গাড়িতে উঠতে গিয়ে তুমি শেলিকে সাজবদল করতে বাধ্য করেছিলে, আর একদিন সোমার একখানা দামী শিফন শাড়ি একটু বেশি পাতলা এই অপরাধে

জানালা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে। সে কথা ভোলনি নিশ্চয়? অথচ এই খালি গায়ে পিঠ পাঁজরা দৃশ্যমান করে প্রণাম করার ঘটাকে বেশ অম্লান বদনে—'

শুধু 'দৃশ্যমান' নয়, বলতে যাচ্ছিলেন 'দৃশ্যলোভন', বরুণা নিজেকে সামলালেন। সামলালেনও নয় ঠিক। সামলাতে হল।

ধমকে উঠেছেন জিতু লাহিড়ী। 'থামো! যা মুখে আসে তাই বলতে হয় এ অভ্যাসটা ত্যাগ করো। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছো ভেবে করো!'

'ভেবেই করেছি! তফাৎটা আমাকে বোঝাও।'

জিতু লাহিড়ী নির্নিমেষ নেত্রে একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, 'বোঝালেও বুঝবে না। ওটা নিজে বোঝবার। আর সে বোধশক্তি তোমার নেই।'

বরুণা ঈষৎ গুম হয়ে থেকে বলেন, 'না, তোমাদের দেশীয় সভ্যতা বোঝবার মত বোধশক্তি সত্যিই নেই, আমার! বোঝার সত্যিই দরকারও দেখি না। যাক্ মনে হচ্ছে, আপাতত হবিষ্যান্নের শখটা মুলতুবি থাকল। মহোৎসাহে নেমন্তন্নটা গ্রহণ করলে।'

'তা বোধহয় করলাম।'

'প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ বোঝবার মত বোধশক্তিও আমার নেই বোধ হয়।'

'থাকলে তো 'কারণ' জানতেই চাইতে না! কিন্তু তোমার আর এতে রাগ কেন? তুমি সেই কল্পিত হবিষ্যান্নে খুব যে একটা উৎসাহ বোধ করছিলে তাও তো নয়?'

'অবশ্যই নয়। তবে নেমন্তন্নেও উৎসাহ বোধ করছি না। তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝো। আমি যাবো না।'

'সেই অনুমানই আমি করছিলাম। কিন্তু যেতে পারলে হয়তো লাভবানই হতে।'

'লাভবান? থাক আমার লাভ-লোকসানটা তুমি একটু কম করে দেখো।'

'তা হলে দেখবো না। নইলে মনে পড়িয়ে দিতাম আজ হয়তো তোমার ভাগ্যে উপবাস। এই বাড়ি সাফ না করানো পর্যন্ত—'

'সেটা বোধকার এইমাত্র মনে পড়ল? নাকি জ্ঞাতি বোনের ভরসাটা মনের মধ্যে ছিল?'

'জ্ঞাতি বোনের খবরটা জানা থাকলে ভরসা থাকতো। ছিল না। সেটাকে আকস্মিক লাভের অঙ্কেই জমা দিচ্ছি।'

'লাভের মাপকাঠিটার এই উন্নত পরিবর্তনে বাহবা দিচ্ছি।'

'ভাল! তবে আমিও তোমার সুন্দর বাংলা বলার জন্যে বাহবা না দিয়ে পারছি না। সত্যি ইংরিজি আর হিন্দি ছাড়া তো কথাই বলতে না এতদিন। এত ভাল ভাল বাংলা শব্দ তুমি শিখলে কখন?'

'তোমার স্মৃতিশক্তিটা যখন এত তীক্ষ্ণ, আশা করি ভাবলে মনে করতে পারবে, নিজেও তুমি ইংরাজি ছাড়া আর কিছু বলতে না।'

জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন। বলেন, 'কী মুশকিল! ভাবতে হবে কেন? মনে তো সর্বদাই জ্বলজ্বল করছে। নিজের চেহারা তো নিজের চোখে দেখতে পায় না মানুষ, দেখে আশির গায়ে। মনে কর তুমিই সেই আর্শি। ওর মধ্যেই নিজেকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছি।'

বরুণা লাহিড়ী রূঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আমাকে এভাবে গড়েছ তুমিই।'

'না, এটা কিন্তু ঠিক বললে না।' জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন, 'গড়নের জন্যে বাকি কিছুই ছিল না।' সেটা তোমার বাবার হাতেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পালিশ! ওটা বাকি ছিল।'

'রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যখন রাস্তার ভিখিরির মত শূন্যহাতে আমার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যদি বাবা সাহায্য না করতেন, এত অহঙ্কার তোমার থাকতো কোথায়?' তীব্র এই প্রশ্নের আবেগে বরুণা লাহিড়ীর মুখটা লালচে দেখায়।

কিন্তু জিতু যেন নির্বিকার। সেই নির্বিকার হাসি হেসে বলেন তিনি, 'আরে একটা কথা তুমি ভুলেই যাচ্ছ বোধ, ভিখিরির মত তোমার 'বাবার' কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কোথায়? দাঁড়িয়েছিলাম

তোমার বাবার মেয়ের কাছে। ভুলে যাচ্ছ? তোমার স্মৃতি শক্তি তো এত দুর্বল নয়।...কতদিন তারপর হেসেছিলাম সেই কথা নিয়ে মনে নেই? হাসতাম, 'কচ-দেবযানীর ঘটনা বারে বারেই ঘটে পৃথিবীতে' বলে। সেই যে তার কী যেন চমৎকার লাইনটি বলতাম? সেই যে—'দেবী, আসিয়াছি তব দ্বারে, তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে—।' তার গোড়াটা কি?'

'থাক! তোমার সঙ্গে কাব্য আউড়ে পুরনো স্মৃতির রোমন্থন করবার সময় আমার নেই। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি—ড্রিঙ্ক করবার জন্যে তুমি অন্ততঃ দশদিন অনুরোধ উপরোধ করেছ আমায়।'

'দিনটা হয়তো একটু বাড়াচ্ছ বেবি,' জিতু হাসেন, 'তবে হ্যাঁ অনুরোধ করতে হয়েছে! ওই তো, ওটাই তো সেবা পালিশ, শেষ পালিশ। ওতেই তো, তোমার বাবাকে টেক্কা দিয়েছিলাম। ওটা পেরে ওঠেন নি তোমার বাবা তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে। তবে হ্যাঁ, সাহায্য তুমি আমায় সব সময় করেছ বৈ কি। সেই যখন আমি ভিখিরির মত ছিলাম, তুমি সেকালের রাজকন্যাদের মত লুকিয়ে আমার সঙ্গে প্রেম করে তোমার বাবার কাছে আমার উন্নতির জন্যে আবদার করেছ, সে কথা ভুলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই!'

বরুণা লাহিড়ীর আজ কদিন ধরে 'নিরম্বুপ' পালা চলছে, তাই ভয়ানক একটা ছটফটানি ধরেছিল শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু শিরায়। তার উপর এই অদ্ভুত জীবনে এসে পড়া! জীবনে আর কোনদিন সেই মদকতার স্বাদ পাবে কিনা কে জানে! কে জানে জিতু লাহিড়ী সত্যিই এদের সঙ্গে মিশে এখানেই বসবাস করবে কিনা! ...হয়তো—আর কখনো শীলা শেলি সোমাকে দেখতে পাবেন না, দেখা হবে না 'টম' আর 'জিমে'র সঙ্গেও এই পাগল লোকটার সাহচর্যে ধীরে ধীরে 'ফসিল' হয়ে যেতে হবে বরুণা লাহিড়ীকে: এসব ভেবে ভিতরটা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

এতদিন পরে কি বরুণা লাহিড়ী সুইসাইড করার ছেলেমানুষীটাই বেছে নেবেন। হার মানবেন পৃথিবীর কাছে? যে পৃথিবী তাঁকে ভয়ানক

ভাবে ঠকিয়েছে! ঠকিয়েছে বৈ কি, নির্লজ্জভাবে ঠকিয়েছে।

নইলে এখনো পর্যন্ত যে স্তাবকদের দল অহরহ তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন করেছে, তাঁর মেয়েদের নির্লজ্জতা দেখে এবং ছেলেদের নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার দেখে সহানুভূতি জানিয়েছে, লাহিড়ীর হঠাৎ মতি পরিবর্তনে ব্যঙ্গ হাসি হেসে তাঁর 'মিসেস'কে সান্ত্বনা জানিয়েছে—'একে বলে শ্মশান-বৈরাগ্য বুঝলেন মিসেস লাহিড়ী, ও বৈরাগ্য বেশি দিন টেঁকে না। আবার নিজের জীবনে ফিরে আসতেই হবে তাঁকে—', তাদের মধ্যে একজনও তো বরুণার চলে আসার খবরে বলল না, 'পাগল হয়েছেন? আপনি যাবেন কি? লাহিড়ীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে কি আপনারও হতে হবে? আপনি সেই গণ্ডগ্রামে কোথায় যাবেন? থেকে যান থেকে যান, আমি আপনার দেখাশোনা করবো।'

কেউ বলেনি। বরং ঘৃণায় লজ্জায় ধিক্কারে মাথা কাটা গেছে বরুণা লাহিড়ীর, তাদের লুব্ধতায়।...লাহিড়ী যখন তাঁর সমারোহময় জীবনযাত্রার পরিসমাপ্তি টানতে দীর্ঘদিন সঞ্চিত, আর দীর্ঘদিনের আহরিত সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্যময় উপকরণ জলের দরে বেচে দিচ্ছিলেন, ওদের মধ্যে যেন কামড়াকামড়ি পড়ে গিয়েছিল। কী ঘৃণ্য দেখিয়েছিল তখন ওদের!

অবশ্য ওদের সেই লুব্ধতার উপর একটা আবরণ দেবার চেষ্টা ওরা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল ওদের চকচকে চোখ। ওদের সেই চোখকে নিজেরা ওরা দেখতে পায়নি, তাই কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঞ্জনা মিশিয়ে বলেছিল, 'জিনিসের জন্যেই নয় মিসেস লাহিড়ী, ফার্নিচারের তো আর অভাব নেই, বরং জায়গাই নেই আর আমার বাড়িতে, তবু আমি এটা নিতে চাইছি কেবল মাত্র স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রাখবার জন্যে। ওগুলো যখনই দেখবো, মনে পড়বে আপনার কথা, মনে পড়বে আপনার এখানের এই মনোরম সন্ধ্যা।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'আপনার ব্যবহার করা আলমায়রা পালং ডিভ্যান সোফা, যে কেউ কিনে নিয়ে যাবে, যথেচ্ছ ব্যবহার করবে, এ আমি ভাবতেই পারছি না মিসেস লাহিড়ী। তাই নিজেই আমি,

…ছেলেমানুষী একটা সেন্টিমেন্টই বলতে পারেন।'

সেই 'ছেলেমানুষী সেন্টিমেন্টের' বশেই তাঁরা অপরিচিত লোক পাঠিয়ে বেনামীতে কিনে নিয়েছিলেন লাহিড়ী সাহেবেরও দামী-দামী সুট, টাই, জুতো, এবং প্রসাধনেব অজস্র টুকিটাকি। কিনে নিয়েছিলেন পাপোস, কার্পেট, ফ্যান, টেবিল ফ্যান, আর অজস্র পুতুল, আলো, ফুলদানী, কাচের বাসন।

বাড়ি খালি করে ফেলেছিলেন জিতু লাহিড়ী। কে একজন বলেছিল, 'আপনি যে দেশবন্ধুকেও ছাড়ালেন মিস্টার লাহিড়ী!'

মিস্টার লাহিড়ী হেসে উঠে বলেছিলেন, 'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? সিংহের সঙ্গে ছুঁচোর? আমি তো বেচে খাচ্ছি।' তবে বেচে অবশ্য 'খাননি' লাহিড়ী সাহেব, সব কিছু বেচে দিয়ে তার টাকাটা মিশন হাসপাতালে দান করে দিয়েছিলেন।

বরুণা বলেছিলেন, 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বলতে তো কিছু নেই, এ টাকাটাও দাতব্যে গেল, দেশে গিয়ে বোধহয় ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করবে?'

লাহিড়ী সাহেব বলেছিলেন, 'পেনসনের টাকাটা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। ইনসিওরেন্সগুলোও আছে।'

'তাতেই সব চলবে?'

'যতটুকু চলে, তার বেশিটা বাদ দিতে হবে।'

বরুণা লাহিড়ীর মনে হয়েছিল ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, হাতের কাছে যা পান তাই একটা ছুঁড়ে মারেন এই বৈরাগ্যের মুখোশ ঢাকা শয়তানের মুখটার উপর, তবু নিজেকে সামলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বেশ কিছুকাল থেকেই স্বামীর মনের গতির এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন বরুণা এবং আগুন হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও কম করেন নি। কখনো ক্রোধ, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো অগ্রাহ্য, নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন স্বামীর বোকামি আর পাগলামী, তথাপি পারেন নি দাবাতে। বেড়েই চলেছে অপ্রকৃতিস্থতা। দিন দিন একগুঁয়ের চরম হয়ে উঠেছেন লাহিড়ী, আর অভ্যস্ত জীবন-

যাত্রার প্রতি যেন খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন।

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন, পাগল হয়ে গেছে লোকটা!

বরুণারও দুর্ভাগ্য। যে সময় থেকে লাহিড়ী সাহেবের এই ক্ষ্যাপামি দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ই যেন ছেলেমেয়েগুলোও যা তা করতে লেগেছে। আশ্চর্য!

হয়তো কার্যকারণটা উল্টে ধরলে দুর্ভাগ্যের মানেটা সহজে পাওয়া যেত, কিন্তু উল্টে ধরেন নি মিসেস লাহিড়ী। আপন দুর্ভাগ্যকেই দোষ দিয়েছেন। তবু ওই—প্রথম দিকে অনেক লড়তে চেষ্টা করছেন।

বড় মেয়ে শীলা যখন একটা বাজে ধরনের বর্মী ছেলের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছিল, লাহিড়ী সাহেব মেয়েকে ডাকিয়ে এনে তীব্র প্রশ্ন করেছিলেন, কে ও? কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে শীলা ওর সঙ্গে? এবং কঠোর নিষেধ করেছিলেন মেয়েকে ওর সঙ্গে মিশতে, তখন বরুণা কি লাহিড়ীর এই শুচিবাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি, ব্যঙ্গ হাসির শাণিত ছুরিকা নিয়ে? বলেন নি কি, 'পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া উচিত হচ্ছে তোমার।...মনে রাখতে চেষ্টা কোরো এটা ফার্স্ট' গ্রেট ওয়ারের পরবর্তীকাল নয়, সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারের পরের যুগ। যে যুগে মানুষ চাঁদে পৌঁছচ্ছে।'

লাহিড়ী বলেছিলেন, চাঁদে পৌঁছচ্ছে বলেই যে ফাঁদে পড়তে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই? শীলার এই রুচিহীনতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না আমি।'

বরুণা তিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র তোমার রুচির নির্দেশেই পৃথিবীটা চলবে না?'

'আমার সংসারে চলবে!'

'না, তাও চলবে না। সংসারটা একটা ইট কাঠের বস্তু নয়, সেটা জীবন্ত প্রাণী দিয়ে তৈরী।'

লাহিড়ী তখনো ক্রোধ দমন করতে শেখেন নি, তখনো উগ্র হয়েছেন। বলেছেন, 'প্রাণী? ও! তা' মানুষ না ভেবে যদি শুধু 'প্রাণী' মাত্রই ভাবতে হয় তাহলে তো প্রবলেম সল্‌ভড্ই হয়ে যায়!

যে কোনো প্রাণীকে শায়েস্তা করার ওষুধ কি জানো তো?'

'শীলা সাবালক হয়েছে তা' জানো?'

'হয়েছে বুঝি? জানতাম না—' লাহিড়ী সাহেব টেবিলে ঘুষি মেরে বলেছেন, 'ডাকো একবার তোমার সেই সাবালিকা হয়ে ওঠা মেয়েকে। দেখবো কতটা স্বাধীনতা খাটাতে পারে সে!'

সত্যি কথা বলতে, বরুণা লাহিড়ীও মেয়ের এই শিথিল রুচিকে খুব প্রশংসা করছিলেন না, এবং মুখে যতই বলুন—'একটা মেয়ে আর একটা ছেলে দু'জনে একবার একসঙ্গে ঘুরলেই তারা বিয়ে করতে বসবে, এমন অদ্ভুত মনোভাব কেন তোমাদের? বন্ধুত্ব, প্রীতি, এসব নেই জগতে?' তবু—ভীষণ একটা অস্বস্তিতেই ছিলেন। কিন্তু স্বামীর কাছে তর্কে পরাস্ত হবেন বরুণা লাহিড়ী? এটা তো হতে পারে না!

কাজেকাজেই নিজের অস্বস্তির পক্ষেই সমর্থনের যুক্তি তোলেন, 'একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একটু একত্র হলেই ধরে নিতে হবে তারা বিয়ে করবে? বন্ধুত্ব প্রীতি এসব হয় না?'

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'হবে না কেন? সোনার পাথরবাটিও তো হতে পারে। কিন্তু সব সময় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না? অতএব পাথরটাকে পাথর আর সোনাটাকে সোনা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

বরুণা বলেছিলেন, 'সভ্য সমাজ ভৌগোলিক ব্যবধানটাকে বড় করে দেখে না। শীলা যদি সত্যিই ওকে বিয়ে করে, দেখো আমাদের কেউ কিছু বলবে না।'

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'সমাজ সম্পর্কে তোমার জ্ঞানটা খুব প্রখর দেখছি। তবে আমিও তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, শীলা যদি এ বিয়ে করে, আমাকে মনে করতেই হবে ওই নামের কোনো মেয়ে আমার কোনোদিন ছিল না!'

বরুণা ভাগ্যের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তেমন ভয়াবহ দুর্মতি যেন না হয় শীলার, যেন সে নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে, যেন এই রাজধানীর সমাজে বরুণার মাথাটা হেঁট না করে, তবু বলে উঠেছিলেন 'বাঃ বাঃ। একেবারে মধ্যযুগীয় জমিদারের রাজকীয় মেজাজ!'

'ভুল করছ ! সে মেজাজ থাকলে তোমার ওই মেয়েটিকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ রেখে তার ওই 'বন্ধু'কে গুলি করতাম !'

অনবরত এই তীব্রতার মুখোমুখি হ'তে হ'তে ক্রমশঃ ভয় ধরছিল বরুণার। গোপনে ডাক্তারের পরামর্শ চেয়েছিলেন, এবং ডাক্তার বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় এখন ওঁকে বেশি উত্তেজিত না করাই ঠিক। ওঁর কথার প্রতিবাদ করবেন না।'

কিন্তু ডাক্তারের কাছে নির্দেশ চাওয়া যত সোজা, ডাক্তারের নির্দেশ পালন করা কি ঠিক তত সোজা ? স্বামীর কথার প্রতিবাদ করবেন না বরুণা লাহিড়ী ? তবে তাঁর এই পাগল হয়ে যাওয়াটা বন্ধ করবে কে ? কী অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে আজকাল লোকটা, ডাক্তার জানে সব ?

অবশ্য ভেবে দেখলে দেখাই যায়, চিরদিনই ওই এক রকম অদ্ভুত টাইপের লোক জিতেন লাহিড়ী। ওঁর এযাবৎ কালের যা কিছু কার্যকলাপ সবই যেন ইচ্ছের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে নয়। যেন সেই যে আড়ম্বরবহুল উত্তাল জীবন যাত্রার পদ্ধতি, সে সবই বরুণার বাসনা চরিতার্থ করতে। লাহিড়ী যে সেই আড়ম্বরের রসদ যোগাচ্ছেন, সে যেন কতকটা ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়ার মত। যোগাচ্ছেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে।

বরুণা যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেষ্টা করতে গেছেন স্বামীকে, স্বামী তাতে কর্ণপাত মাত্র না করে কথা থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'থাক না, অত বোঝাবার কি আছে ? কী চাই—টাকা তো ? কত ? পেনটা আর চেকবইটা দাও—'

হ্যাঁ, এই ভঙ্গী ছিল লাহিড়ীর। সংসারের সবটাই যেন বরুণার দরকারের, তিনি কৃপার দৃষ্টিতে সেই বালিকার বাল্যলীলার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অবশ্য নিজে কি তিনি কিছুই করেন কি ? তা' করছেন বৈ কি। হয়তো শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেছেন, সেখানে গালচেওলা এল, লাহিড়ী

বেপরোয়া বলে দিতেন, 'খান দুই রেখে দাও তো বেবি!'

আর সেই খান দুইটা প্রায়শঃ দামীই হতো।

বরুণা তাঁর মায়েব জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কিনতে গিয়ে একটু বেহিসেবী খরচ করে ফেলে হয়তো মনে মনে লজ্জিত হচ্ছেন। লাহিড়ী দরাজ গলায় বলেছেন, 'আচ্ছা বেবি, তোমার নজর এত ছোট কেন বলতো? নিজের মার জন্যে খরচা করতেও দ্বিধা করছো? সিল্কের শাড়ি কেন? 'বেনারসী' বলে কী যেন একটা শাড়ি আছে না? দিল্লীর বাজারে পাওয়া যায় না সে জিনিস?···টাকা নেই? না থাকে বললেই পারতে। ঠিক আছে, দেখি পেনটা আর চেকবুকটা!'

চেক বই! এ যাবৎকাল ওই চেকবুকের অহঙ্কারেই মটমট করেছেন। কিন্তু সেই অজস্র টাকা, সে কি কেবল মাত্র উচ্চ পদের ন্যায্য পদমর্যাদা বাবদ আসতো?

পাগল! তাই কি হয়? কত মাইনে দেয় সরকার যে তার থেকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব হবে? হয় না, চেক বইয়ের উৎস আলাদা।

কই, তখন তো ধর্মজ্ঞান হয়নি? এখন যত ধর্ম উথলে উঠছে! এখন উনি 'বুনো রামনাথে'র আদর্শ নিতে বসেছেন!

অথচ বরুণা লাহিড়ী চীৎকার করে উঠে তার প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না। বরুণা লাহিড়ী জব্দ হয়ে গেছেন! নিজের ছেলে মেয়েরাই তাঁকে জব্দ করে দিয়েছে।

বরুণা লাহিড়ীর শত প্রার্থনা বিফল হলো, শীলা সেই কাণ্ডই ঘটিয়ে বসলো। নেশার ঝোঁকে প্রায় বেসামাল সেই বর্মীটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল একদিন, হি হি করে হেসে বললো, 'মা এই হচ্ছে সেই শয়তানটা, যে তোমার বড় মেয়েটিকে লুঠ করে নিতে চায়।'

সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল ওরা দুজনে। বরুণার ইচ্ছে হ'ল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন, পড়ে যাক চূর্ণ হয়ে যাক! তবু আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি তো জিতু লাহিড়ীর মত রাগ প্রকাশ

করে গ্রাম্য হতে পারেন না? আর চেঁচামেচি করা মানেই তো লোক জানাজানি করে নিজের গালে চুণকালি মাখানো। আমার মেয়েকে আমি এঁটে উঠতে পারিনি, সে বিরক্তিকর একটা বাঁদরকে বিয়ে করেছে, বারণ মানে নি, একথা রাষ্ট্র করলে অগৌরবটা কার? সেই হতভাগা মেয়ের, না মিসেস লাহিড়ীর?

তাই ভিতরের আগুনকে ভিতরে দমন করে নীচু গলায় বাংলায় বলেছিলেন, 'এই নির্বাচনটাকে খুব ভাল মনে করছো তুমি?'

শীলা হেসে উঠে বলেছিল, 'ভাল মন্দর প্রশ্ন আর রইল কই? ও তো ছাড়বে না! বিয়ে না করলে খুন করবে বলে শাসিয়েছে!'

অবশ্য শীলার মুখ দেখে মনে হল না সেই শাসানিতে খুব কাতর সে। শীলার মারই বুকটা কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, তা ওদের অসাধ্য কাজ নেই। খুন শুধু ওকেই করবে, কি আরো কাউকে তারই বা ঠিক কি? শীলাকে লাহিড়ী বাড়ির দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চাইলে লাহিড়ী বংশটাই ঘুচিয়ে দেবে কি না কে জানে।

গলা নরম করে বলেছিলেন, 'তুমি তাহলে ভয়েই রাজী হয়েছ?'

শেলি আর সোমা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল শীলা। বলেছিল, 'শুনছিস মার কথা? শুধু শাসানির ভয়ে!'

সোমা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল 'অসহ্য' বলে।

কিন্তু সেই সোমাই সব চেয়ে নৃশংসতা করলো। খুন সে নিজে হাতেই করলো। বরুণা লাহিড়ীর প্রাণের একেবারে ভিতর ঘরে যে আশাটুকু, যে বিশ্বাসটুকু, সোমার মুখ চেয়ে জ্বলছিল, সেই বিশ্বাস আর আশাকে ছুরি বিঁধে হত্যা করল সোমা।

বরং শেলিই অপেক্ষাকৃত ভাল। শেলিই তবু মোটামুটি একটা বিয়ে করে সুখে আছে! যদিও সেই বিয়ের বরটা লাহিড়ী সাহেবেরই একটা নিতান্ত অধস্তন, তবু ভদ্র।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শীলার ওই মাতাল বর্মীটাকে বিয়ে করার চাইতে বেশি নিন্দনীয় হয়েছিল শেলির বিয়েটা। সবাই বলেছিল,

'ছি ছি, এটা কি করলো আপনার মেয়েটি? আপনারা অ্যালাউ করলেন কি করে?'

মেয়ে পুরুষে বলেছে একথা। বরুণা অবশ্য এ ক্ষেত্রেও আপন মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'একথা আপনারা কী করে বলছেন? শেলি তো বাচ্চা নয়? অবশ্যই নিজের জীবন সম্পর্কে ডিসিশান নেবার স্বাধীনতা ওর আছে। তাছাড়া প্রেম কি পাত্রাপাত্র বিচার করে ভাই? সে তো চিরকালই অন্ধ! শেলি আমার মেয়ে, অতএব আমার অধীন, আর অতএব আমি তার ভালবাসার মনটিকে ধ্বংস করে দেব, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

তখন ওরা ধন্য ধন্য করেছিল বরুণা লাহিড়ীকে। অন্ততঃ তাঁর সামনে তাকে প্রশস্তির সিঁড়িতে স্বর্গে তুলেছিল।

সবাই। সবাই বলেছিল, 'আপনার মত এমন অদ্ভুত ফরোয়ার্ড মহিলা সংসারে বিরল মিসেস লাহিড়ী!'

সব থেকে বেশি বলেছিল জীবেন সিংহী।

জীবেন সিংহীর ব্যবহারটা ভাবলে দুঃখে রাগে ক্ষোভে অভিমানে দিশেহারা হয়ে পড়েন বরুণা। জীবেন ছিল বরুণার সবচেয়ে বড় স্তাবক। বরুণার বাড়ির নিত্য অতিথি। বরুণা কথা বললে মুগ্ধ হতো, বরুণা হাসলে বিহ্বল হতো, জীবেনকে যা খুশি তাই বলতেন বরুণা, স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'সিংহী তোমার মতন এমন ইডিয়ট আমি দুটো দেখিনি। সারাজীবনটা শুধু একটা মরীচিকার পিছনে ঘুরলে, একটা বিয়ে পর্যন্ত করলে না, সত্যি এ ভারী অন্যায়। নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।'

জীবেন বলতো, 'কার জীবন যে কোথায় সার্থক হয়, সে কি বাইরে থেকে বোঝা যায় বেবি দি?'

হ্যাঁ, জীবেন 'বেবি' দিই বলতো।

কারণ জীবেন বরুণা লাহিড়ীর বাপের বাড়ির পাড়ার ছেলে। বয়েসে বছর চারেকের ছোট বরুণার থেকে। তা ছোট বড়য় কী এসে যায়? ছোট বলেই তো প্রশ্রয় আরো বেশি। কিন্তু?

সেই জীবেনই বরুণার ব্যবহৃত ডানলোপিলোর গদি দেওয়া খাটটা কিনে নিয়েছিল জলের দামে, আর—অবশ্য দাম বরুণা নিতে চাননি, দার্শনিক দার্শনিক উদাস গলায় বলেছিলেন, 'তোমার কাছেও দাম নেব জীবেন? আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছেন বলে আমিও তাই হয়ে গেছি ধরছো কেন? ওটা তুমি ব্যবহার কোরো, আমি উপহার দিচ্ছি।'

প্রায় সব কথাই অবশ্য ইংরেজিতে বলেছিলেন বরুণা, বলেও থাকতেন তাই, ভাবার্থটা ওই ধরনের ছিল।

জীবেন সিংহী তার বেশি উদাস গলায় বলেছিল, 'না বেবি দি, না; অমনি নেবার অনুরোধ আমায় করবেন না। তাহলে আমার আত্মার কাছে ধিকৃত হবো আমি।...আপনার এই খাট বিছানা এ আমার ঘরে দেবমূর্তির মত থাকবে তোলা। ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু এমনি উপহার নেব না।'

আত্মার কাছে ধিকৃত হবার ভয়ে নাম মাত্র মূল্য নিতে বাধ্য করেছিল জীবেন সিংহী বরুণা লাহিড়ীকে।

আর তারপর—তখনো দিল্লিতে রয়েছেন বরুণা, শুনতে পেলেন সেই খাট গদি মোটা দামে বেচে দিয়েছে জীবেন একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে। জীবেনের অত্যধিক সৌভাগ্যে যারা সবচেয়ে বেশি ঈর্ষিত হতো, তাদেরই একজন শুনিয়ে গেল কথাটা।

সংসারভাঙা পর্বে বরুণা লাহিড়ীর জ্ঞান চক্ষু অনেকটাই উন্মীলিত হয়েছিল, তবু একরকম সয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জীবেনের ব্যাপারটা যেন সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। জীবেনকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই অসহ্য জ্বালাটা প্রশমিত করবার বাসনায়।

কিছু করবার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক বরুণার, ধিক্কার দেবার ক্ষমতা তো আছে? সেই ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করবেন তিনি। এই দীর্ঘকালের জীবনের যত জ্বালা সব ছড়িয়ে দেবেন। পুড়িয়ে দেবেন তাঁর স্তাবককুলের প্রতিনিধি ওই জীবেনকে।

বসে বসে অস্ত্র শাণিয়েছিলেন বরুণা, কিন্তু জীবেন আসেনি।

বলেছিল, শরীর খারাপ যেতে পারছি না।

বরুণা দিল্লী ছেড়ে চলে আসবার সময় অনেকেরই 'শরীর খারাপ' হয়েছিল। স্টেশনে আসতে পারেনি।...অবশ্য বরুণা তাতে খুশিই হয়েছিলেন। হৃতগৌরব পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের মতো লাহিড়ীর এই অজ্ঞাতবাসের সাক্ষী যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

চরম লজ্জার সময় কে চায় সাক্ষী রাখতে?

দিল্লি ছেড়ে চলে আসার কারণটি তো কারো অজ্ঞাত ছিল না। সারা শহরের অভিজাত মহল তো জেনে ফেলেছিল লাহিড়ী সাহেবের ছোট মেয়েটা 'হেয়ার কাটিং সেলুনে'র সেই চুল ছাঁটিয়ে অ্যাংলো ছোকরাটার সঙ্গে পালিয়েছে। এবং শুধু নিজেকেই নিয়ে যায়নি, মায়ের চাবি চুরি করে, নিয়ে গেছে মায়ের যাবতীয় অলঙ্কারের সঞ্চয়, নিয়ে গেছে মোটা অঙ্কের নগদ টাকা।

আড়ালে বরুণা লাহিড়ীকে অনেকে 'রত্নপ্রসবিনী' বলেছে। বরুণা লাহিড়ী নিজেও কি বলছেন না একান্ত সঙ্গোপনে? এই তো নিজে তিনি কি জীবনকে উপভোগ করেননি? করেছেন, কিন্তু মাত্রা রেখে বুদ্ধিমানের মত। নিজেকে ঘিরে পতঙ্গদের জ্বলতে দিয়েছেন, নিজের পাখাকে আগুনে ফেলতে যাননি।

অথচ বরুণার ছেলেমেয়েগুলো? নির্বোধ, নির্বোধ, পয়লা নম্বরের নির্বোধ সব। ওরা নিজেরাই আগে আগুনে ঝাঁপ দিল। সেই আগুনে মা-বাপের মুখ পোড়ালো। কিন্তু এ তো একান্ত সঙ্গোপনের কথা। দোষারোপ তো সর্বদাই স্বামীর উপর।

লাহিড়ী সাহেবের কড়া মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই যে ছেলে-মেয়েদের বিদ্রোহী করে তুলেছে এতে আর সন্দেহ কি? আর সেই বিদ্রোহেই তারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই কথাই অজস্র সুরে বলেছেন বরুণা। হয়তো কথাটা খুব মিথ্যেও নয়। মা আর বাপ দুজনের মধ্যে যদি দুটো বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে, সন্তানদের উপর পরবেই তার প্রভাব। হয় তারা খুব বেশি বুদ্ধিমান হবে, নয় তারা বিদ্রোহী আর বিকৃত হবে।

লাহিড়ী দম্পতির ঘরের অঙ্কফল হচ্ছে ওই বিকৃতি।

সাধারণতঃ বিবোধের চেহারাগুলো ছিল এই ধরনের—

মেয়েরা যখন তরুণী হয়ে উঠেছে (তিনটে প্রায় এক সঙ্গেই হয়ে উঠেছে), লাহিড়ী সাহেব একদিন বললেন, 'ওরা তো এবার শাড়ি পরলেই পারে।'

বরুণা 'কাঁচের বাসনভাঙা' হাসি হেসে বলে উঠেছিলেন, 'শাড়ি? ওরা পরবে শাড়ি?'

'কেন, না পরবার কি আছে? শাড়ি পরার বয়েস হয়নি ওদের?'

বরুণা আরো হেসে বলে ওঠেন, 'মেয়েদের কোন বয়সে কিসের বয়েস হয়, সব জানো তুমি?'

'সাধারণ বুদ্ধি বলে একটা কথা আছে অবশ্যই?'

'আছে। তবে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে অন্ততঃ তোমার মধ্যে সেটা নেই।'

'ফ্রক পরলে ওদের দেখতে খারাপ লাগে আমার।'

'তোমার ভাল লাগা নিয়ে জগৎ চলবে না!'

লাহিড়ী সাহেব মুখে পাইপ ভরে বলেছিলেন, 'তা বটে। তবে আমার মনে হয় শাড়ি পরলে আরো অনেক 'লাভলি' দেখাতো।'

'ফ্রকেই যথেষ্ট' বরুণা মুখ টিপে হেসে বলে উঠেছিলেন, 'ওতেই তো তোমার মেয়েদের ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন।'

লাহিড়ী সাহেব স্ত্রীর সেই টেপাহাসির কারুকার্য আঁকা মুখটার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু আর একদিন ওই মৌমাছিদের কথা তুলেই ভুরু কোঁচকালেন।

'ড্রইংরুমে ওরা বসে কে?'

বরুণা বললেন, 'আর কে! প্রতিটি সন্ধ্যা যাদের আবির্ভাবে আমাকে ড্রইংরুম ছাড়তে হয়েছে। আমার বন্ধুদের অধিকাংশকেই ব্যালকনিতে নিয়ে বসাতে হচ্ছে!'

'সন্ধ্যায় তোমার মেয়েরা তাহলে বাড়ি থাকে?'

বরুণা লাল লাল মুখে বলেছিলেন, 'এটা ওদের প্রতি অপমানজনক কটাক্ষপাত!'

'তা' বেশ তো। 'পাতটা' যখন হয়েই গেছে, উত্তরটা দেবে আশা করি।'

'উত্তর দেবার কি আছে? ওদের ইচ্ছে হলে বেরোবে, ইচ্ছে হলে বাড়িতে থাকবে।'

'ইচ্ছেটা ক্রমশঃই যথেচ্ছাচার হয়ে যাচ্ছে না?'

'উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেলে অবশ্যই হচ্ছে।'

'দ্যাটস রাইট্। ছেলেমেয়েরা তোমার বিজনেস—' বলে আবার একমুঠো টোবাকো বার করে পাইপে ভরতে বসেছিলেন লাহিড়ী।

কিন্তু এ কথাটাও বরুণা লাহিড়ী অপমানকর মনে করেছিলেন! ক্রুদ্ধমুখে বলেছিলেন, 'কেন, ওরা আমার বিজনেস কেন? ওরা একা আমার?'

'লাহিড়ী পদবীটা বাদে, বাকী সবটাই তোমার!'

বরুণা ঝলসে উঠে গেছেন। স্বামীকে দেখিয়ে ফ্রিজিডেয়ার খুলে আইসক্রীম বার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের প্রেমিকদের জন্যে।

এই ভাবেই দেওয়ালের বালি ঝরছিল, জানলা দরজা নড়বড় করছিল, মেঝের চটা উঠছিল, তবু দুজনের কেউই বোধহয় গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। কিন্তু একদিন ছাত ভেঙে পড়ল হুড়মুড়িয়ে।

তিলে তিলে বিরক্ত বাঘ হঠাৎ ক্ষেপে উঠে গর্জন করে উঠলো, 'হোয়াই?' চাবুক হাতে নিয়ে পায়চারি করতে লাগল সিঁড়ির সামনে, 'কেন? কেন এই স্বেচ্ছাচার সহ্য করবো আমি? চাবকে বাড়ি থেকে বার করে দেব, রাস্তার কুকুরের মত দূর করে দেব।'

বরুণা এসে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

ব্রোঞ্জের পুতুলের মত চকচকে আর চাঁচাছোলা মুখে, বহু প্রচেষ্টায় রক্ষিত টান টান টাইট গড়নে, আর পাতলা রেশমি শাড়িতে তাঁকেও তরুণীর মত লাগছিলো। কিন্তু আগেই নিজেকে দেখেছেন বরুণা আর্শিতে, আর খানিকটা সাহস অর্জন করে নিয়েছেন।

তাই সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুর্‌মার রেখা টানা বিলোল দৃষ্টি তুলে বলতে পেরেছিলেন, 'আমাকে দুষ্টুমী করে ধরিয়ে, নিজে তো ড্রিঙ্ক করা ছেড়ে দিয়েছিলে, আজ আবার ধরলে বুঝি ?'

কিন্তু বিলোল কটাক্ষে কাজ হয়নি।

লাহিড়ী সাহেব চাবুক আস্ফালন করে তাঁকে সামনে থেকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েকে তিনি আজ বুঝিয়ে ছাড়বেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরিণাম কি ?

বরুণা দৃঢ় হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পাড়া জানিয়ে একটা সীন্ ক্রিকেট করতে দেব না আমি তোমায়।'

ক্রুদ্ধ বাঘ আবার গর্জন করে উঠেছিল, 'পাড়ার কারো কিছু জানতে বাকী আছে ?'

তারা জানে আমরা বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতার হাত দিই না, তারা জানে আমরা সেকালের চশমা নাকে এঁটে জগৎকে দেখি না, তারা জানে আমরা সভ্য, তাদের সেই সব 'জানা'গুলো তুমি এক মিনিটের অসহিষ্ণুতায় ধূলিসাৎ করে দিতে চাও ?'

'চাই!' জিতু লাহিড়ী হাতের চাবুকটা শূন্যে আস্ফালন করে বলেছিলেন, 'চাই! সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত ভূয়ো, সমস্ত ফাঁকিবাজিকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাই এবার!

কিন্তু সে রাত্রে লাহিড়ী সাহেবের চাওয়ার পূরণ হয় না। সে রাত্রে সোমা ফেরে না। পরদিন সকালে যখন ফেরে, তখন বাড়ি ভরে গেছে লোকে, ডাক্তার বসে আছে। হঠাৎ 'প্রেসার' বেড়ে উঠে 'স্ট্রোকের মত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন লাহিড়ী সাহেব, রাত তিনটেয় ডাক্তারকে ডাক দিতে হয়েছে।

সেই প্রথম ভয়ের শুরু।

পরিচিত ডাক্তার, মিসেস লাহিড়ীর প্রকৃতি তার অচেনা নয়, তাই আড়ালে ডেকে বলেছেন, 'ওঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করবেন না কিছুদিন। বেশ কিছুদিন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ওঁর প্রতি।'

বরুণা যখন সময় পেলেন, সোমাকে ডাকলেন, লাহিড়ী সাহেবের

আড়ালে। চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'জানো, আজ ওঁর ওই অবস্থার জন্য দায়ী কে?'

সোমার ভঙ্গী অবিকল তার বাপের মত। লাহিড়ী সাহেবের মতই তাচ্ছিল্যের একটা সুর প্রচ্ছন্ন রেখে উত্তর দেয় সে, 'দায়ী অবশ্য অনেক কিছুই, আবার হয়তো কিছুই নয়। অসুখ অসুখই? তবে তোমার 'টোন' শুনে মনে হচ্ছে দায়ী আমিই।'

'আলবাৎ!' বরুণা তেমনি চাপা তীব্রতায় বলেন, 'দায়ী তুমিই। কাল উনি তোমার জন্যে চাবুক নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন তা জানো?'

পাশের ঘরে লাহিড়ী সাহেব ঘুমের ওষুধের প্রভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন, ঘুম যাতে না ভাঙে সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা, তবু সোমা রীতিমত শব্দ করে হেসে ওঠে। বলে 'ইস! তাহ'লে তো কাল একটা অভূতপূর্ব স্বাদ 'মিস্' করেছি!'

'থামো অসভ্য মেয়ে!'

জীবনে যা কখনো করেন নি বরুণা লাহিড়ী, তাই করেন। নেহাৎ গাঁইয়াদের মত মেয়েকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। 'ভেবেছ কি তুমি? যা খুশি তাই করবে?'

'কী আশ্চর্য মা! এটা কী একটা প্রশ্ন?' সোমা আবার হাসে, 'যাতে খুশি সেটা না করে, যাতে দুঃখ তাই করতে বসবো না কি? আমি কি তোমার বোকা হাবা মেয়ে?'

বরুণা মেয়ের এই অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'তোমার এই অসভ্যতা আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি সোমা, এবার চুপ করো। বলো কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

'বাঃ সে তো এসেই বলেছি। ওদের ক্লাবের একটা ফাংশন ছিল, রাত হয়ে গেল অনেক, তখন আর বাড়ি ফেরবার কোনো মানে হয় না—'

'মানে হয় না! মানে হয় না! বেপরোয়া দুঃসাহসী মেয়ে, তুমি আমাদের মুখ ডোবাবে!'

সোমা হঠাৎ মার খুব কাছে সরে আসে, সন্দিগ্ধ গলায় বলে,

'তোমার মুখ ডোবাবার ক্ষমতা ধরবো তুচ্ছ আমি? ব্যাপার কি বলতো মা? কাল থেকে বুঝি পেটে এক ফোঁটাও পড়েনি? বুক মরুভূমি হয়ে আছে? তাই উল্টো পাল্টা কথা বলছো?'

বরুণার মনে হলো যেন লাহিড়ী সাহেবের সুর চুরি করে কথা বলছে এই নির্লজ্জ দুঃসাহসী মেয়েটা! পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠল যেন। তবু চেঁচালেন না, তেমনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'দেখ সোমা, তোমার বাবার হাতের সেই হান্টারটার কথা মনে পড়ছে আমার!'

এবার আর সামান্যতম রেখে ঢেকেও হাসে নি সোমা, ঠিক মার ভঙ্গীতে হেসে খান খান হয়ে বলেছিল, 'ওমা! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে রয়েছ! কোনো জোরালো ড্রামার কড়া ডায়লগ দেওয়া হয়েছে তোমায়—'

বরুণা এই অসহনীয় আর অভাবনীয় স্পর্দ্ধার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ওই মেয়েটা যে তাঁর সবচেয়ে আদরের সব ছোট মেয়েটা, তা যেন বুঝতে পারছিলেন না। ও যেন অচেনা কেউ।

তাই ভেবেছিলেন। কারণ নিজেকে কোনদিন দেখতে পান নি বরুণা। যদি কোনোদিন দেখতেন, হয়তো দেখতে পেতেন এই দুঃসহ স্পর্দ্ধার মূর্তিতে কার ছায়া?

কিন্তু নিজেকে কেই বা কবে দেখতে পায়? বরুণাও পান নি। তাই সোমাকে দেখে চমকে গেলেন, অবাক হলেন, যেন কোনো অপরিচিত আর ভয়াবহ কাউকে দেখলেন। যেন সাহস হারালেন।

অথবা বুঝলেন একে ধমকে দাবানোর চেষ্টা বৃথা। একদা যেমন বুঝেছিলেন লাহিড়ী সাহেব, আর সেই বোঝার মাশুল দিয়ে চলেছেন জীবনভোর। বরুণাকে মাশুল দিতে হবে। তাই অন্য পথ ধরলেন বরুণা। আবেগের গলায় বললেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি সোমা, তোমার ছেলেমানুষী দেখে। ব্যাপারটাকে যেন কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চাইছ না তুমি। ধর যদি তোমার ওই ব্যবহারে অসহ্য হয়ে তোমাদের

বাবা হার্টফেল করতেন ? ভাবতে পারছো সে কথা ?'

সোমা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলে, 'ভাবতে গেলে অবশ্যই খুবই খারাপ লাগবে, কিন্তু ভাববোই বা কেন বলতো ? 'অসহ্য' বলে কোনো শব্দ কি বাবার ডিকশনারিতে আছে ? থাকলে, বাবাকে হার্টফেল করতে নিজের মেয়ের ব্যবহারের জন্যে অপেক্ষা করতে হত না তাঁর শ্বশুরের মেয়েই যথেষ্ট ছিল।'

'কী ? কী বললি বেচাল বেয়াদপ মেয়ে !' বরুণা সহসা একেবারে গ্রাম্য মেয়েদের মত কপালে করাঘাত করে বসেছিলেন। বলেছিলেন, 'যা যা দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে !'

'যাবো।' সোমা একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'বাবা সচেতন থাকলে এ প্রশ্নটা তাঁকেই করে যেতাম, এখন এতকালেও তোমার নার্ভ এত উইক্ থাকলো কি করে বাবা ? জীবনভোর বেচাল অসভ্যতা তো কম দেখলে না ?'

সোমা তার কথা রেখেছিল। সোমা চলে গিয়েছিল। শুধু যাবার সময় বরুণার আলমারি থেকে গয়নার বাক্সটা আর একটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

না বলে নিয়ে যায়নি অবশ্য। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল, 'বিয়ের যৌতুকটা নিজেই নিয়ে গেলাম ! ওকে চাকরী ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো, সংসার চালাবার ভার কিছুদিন আমাকেই নিতে হবে !'

রোগশয্যায় শুয়ে এ চিঠি দেখলেন লাহিড়ীসাহেব, তারপর সংসার ভাঙতে শুরু করলেন।

কিন্তু শুধুই কি সংসার ? ভাঙছেন না সব কিছু ? অভ্যাস সংস্কার রুচি শিক্ষা ?···ভাঙছেন না বরুণার প্রাণটাকে আছড়ে আছড়ে ?

এখনও তাই করে চলেছেন।

বরুণার মনে হয় খুব জোরে একটা চীৎকার করে ওঠেন ? করেন না। শুধু বলেন, 'তোমার ন্যাকামির খোলস খোলো। আর সহ্য হচ্ছে না। আর নয়তো ছেড়ে দাও আমায়—'

কিন্তু ছেড়ে দেবার কথা বলবারই বা মুখ কোথায়? জিতু লাহিড়ী তো 'খোলা দরজার' আশ্বাস দিয়ে আসছেন গোড়া থেকেই।

আশ্চর্য! তবু বরুণাকে বন্ধ ঘরে এসে ঢুকতে হল। বরুণার মা দাদা পর্যন্ত বললেন না, 'ও পাগল হয়েছে তাই গারদে যাচ্ছে, তা বলে তুই কেন যাবি? তুই আমাদের কাছে চলে আয়।' কেউ বললেন না, এবং বরুণা যখন নিজে থেকেই মান খাটো করে কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকবার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন, তাঁরা একযোগে উপদেশ বর্ষণ করেছিলেন. 'না না, এসময় ওকে একা একা ছেড়ে দেওয়া আদৌ উচিত হবে না তোমার।'

অর্থাৎ?

অর্থাৎ 'পতিব্রতা' সতী কন্যা আমাদের, যাও পতির অনুগমন করো। যে মা দাদা 'বেবি' বলতে অজ্ঞান হতেন, 'বেবি' একদিন বেড়াতে গিয়ে দু'ঘণ্টা বসে গল্প করলে বিগলিত হতেন, তাঁরা চট করে বদলে গেলেন।

জিতু লাহিড়ীর পাগলামী বরুণার মা দাদা বৌদির বরুণার প্রতি-সহানুভূতি উদ্রেক করেনি, ব্যঙ্গ হাসির উদ্রেক করেছে। দাদা বলেছে 'তা একটা কন্ঠি আর তেলাই বা বাদ থাকে কেন? ও দুটো জোগাড় করে নিতে বল্ না? সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

বৌদি বলেছে, 'দেশের ভিটেয় গিয়েই প্রথম তোমার একটা কাজ করা উচিত ভাই, লাহিড়ী সাহেবের গলায় একটি যজ্ঞসূত্র ঝুলিয়ে দেওয়া। ওই বেশভূষার সঙ্গে ওটা দরকার। সম্পূর্ণতা আসবে।'

বেবি লাহিড়ী বা বরুণা তার উত্তরে বলেছিলেন 'আমার বেশ ভূষাটাই কি সম্পূর্ণতার পক্ষে সম্পূর্ণ নয়?'

বৌদি হেসে উঠেছিল, 'তা বটে, সীতা কি গান্ধারীর পর্যায়ে উঠলে বাবা তুমি!'

সেদিন বরুণার মনে হয়েছিল যুগ যুগ ধরে তো ওই সব পতি অনুগামিনী সতীদের পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তন করে আসা হচ্ছে, কিন্তু কে বলতে পারে তাঁরা তার মত নিরুপায় হয়েই পতিব্রতা

হয়েছিলেন কিনা।

কে জানে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এ কথা বলেছিলেন কিনা 'আমার সঙ্গে অন্ধত্ব গ্রহণ করতে পারো তো ভাল, নচেৎ তোমার দরজা খোলা রইল।'

কে জানে, স্বামীর ইচ্ছার শাসনে পীড়িতা সীতা পতিগৃহে পিতৃগৃহে কোথাও সস্নেহ আশ্রয়ের আশ্বাস না পেয়ে অবহেলিত লজ্জায় মুখ লুকোতেই বনবাসের আশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন। ভাজ যখন বরুণাকে সীতা গান্ধারীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, এই সবই ভেবেছিলেন বরুণা। আর নিজেও বনবাসের পথে পা দিয়েছিলেন।

আজ তাই আর 'ছেড়ে দাও' বলে চেঁচানো হ'ল না, চুপ হয়ে যেতে হল। শুধু সংকল্প করলেন, কিছুতেই স্বামীর ওই সব আত্মীয়দের আত্মীয় বলে গ্রহণ করবেন না।

কিন্তু জিতু লাহিড়ীর ছটফটিয়ে মরা আত্মা আত্মীয় খুঁজছিল।

অবোধ সেই ছটফটানি কি 'আত্মীয়' খুঁজে পাবে বিগতকালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে? মূঢ়তা আর কুসংস্কারের মধ্যে? বিচার-বোধহীন প্রাচীনতার মধ্যে?

হয়তো পাবেনা, তবু তাই খোঁজাই স্বাভাবিক।

প্রতিক্রিয়ার চেহারা এমনই বিকৃতই হয়। তাই জিতু লাহিড়ী যখন আশ্রয়প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর, তখন সেই 'আশ্রয়'ই আড়ালে হেসে বলে, 'তাই বল! মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

তাই বলছে তেঁতুলগোড়া। বলছে সত্যি, মাথা খারাপ না হলে কেউ সোনামুঠো ঝেড়ে ফেলে ছাইমুঠো কুড়িয়ে নেয়? হীরে পায়ে মাড়িয়ে কাঁচ নিয়ে আঁচলে বাঁধে? দিল্লির ময়ূর সিংহাসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসে তেঁতুলগোড়া গ্রামের ভাঙা ইটের বোঝার মধ্যে বাসা বাঁধে?'

ওইখানেই তো হয়ে গেছে প্রমাণ। তারপর—অহরহই প্রমাণিত হচ্ছে। তেঁতুলগোড়া গ্রামের তেরশো সত্তর সালের প্রথম এবং প্রধান খবরটা তাই প্রধান হয়েই রয়েছে এখনো, নিত্যই নতুনত্বে জোগান-দার হয়ে রয়েছে।

একে একে দুইয়ে দুইয়ে জনে জনে কৌতূহল চরিতার্থ করতে আসছে, আর নিঃসংশয় হয়ে ফিরে যাচ্ছে। 'গেছে, একেবারেই বিগড়ে গেছে মাথাটা লোকটার।'

একটা কেষ্টবিষ্টু লোক হয়েছিল মানুষটা, রিটায়ার করে দেশে এসে বসছে শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে আশা আনন্দও কম হয়নি। রিটায়ার করলেও, তা-বড় তা-বড় লোকের সঙ্গে দহরম মহরম তো ছিল, দু লাইন একখানা চিঠি লিখে দিলেও একটা বেকার ছেলের চাকরী হয়ে যেতে পারে, একটা লোয়ার ডিভিশনে ঘসটানো লোকের চাকরীর উন্নতি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া দায়ে অদায়ে গিয়ে দাঁড়ালে— সকলের আশাভঙ্গ করলেন জিতু লাহিড়ী।

প্রথম আশাভঙ্গ হলো হালচাল দেখে। ভাবল, কীরে বাবা এমন অবস্থা কেন? তবে কি সন্দেহ হয়েছে দেশটা চোর ডাকাত ঠ্যাঙাড়েয় ভর্তি, তাই ভিখিরির হাল করে দেশ বেড়াতে এসেছে?

তারপরই ওই মূল খবরটা ধরা পড়ল। ধরা পড়ে আগ্রহটা গেল। আশা আনন্দ বিস্ময়টাও গেল। রুচি ভক্তি সবই গেল। কৌতূহলটাই রইল শুধু। তা একটা মাথা বিগড়ানো লোকের মাথামুণ্ডুহীন কথা শোনার মজাও কম নয়।

তেঁতুলগোড়া গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এও একটা বৈচিত্র্য। কথা ফুরিয়ে যাওয়া স্তিমিত মানুষগুলোর কথা কইবার একটা বিষয়বস্তু।

গ্রামের যে সব ছেলেরা অন্নের ধান্ধায় শহরে চলে গেছে, অথচ, প্রাণপাখিটিকে রেখে গেছে, বাড়ি চলে আসে ছুটি পেলেই, তারা এলেই তরঙ্গটা নতুন করে ওঠে।

নিষ্কর্মা অথবা বুড়োরা যেখানে দিনের পর দিন শুধু জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি আর যুবোদের 'চাল' বৃদ্ধি ছাড়া কোনো আলোচ্য খুঁজে পেত না, এখন তারা পথে একে আর একজনকে দেখতে পেলেই জিতু লাহিড়ীর হাস্যকর পাগলামীর কথা তোলে।

'কালকে যে মন্টু গিয়েছিল—'

গিয়েছিল-র পিছনে ড্যাশ থাকে। যেটা অপর পক্ষের কৌতূহল

বৃদ্ধির সহায়ক। অতএব পরবর্তী প্রশ্নটা এই হয়—'গিয়েছিল নাকি? তারপর? খুব লেক্‌চার শুনে এল তো?'

'তাছাড়া আর কি! ও কোথায় ভেবে রেখেছিল একটা সুপারিশ টুপারিশ বাগিয়ে যদি কিছু উন্নতি করে নিতে পারে, তা নয় বেচারীকে বসে বসে শুনতে হলো, শহর ছেড়ে চলে এসো, পুরনো যুগে ফিরে যাও, প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ ধরে গ্রামকে আশ্রম করে তোলো', আত্মার উন্নতি সাধন করো—'

'আত্মার উন্নতি! হা হা হা! চাকরীর উন্নতির বদলে কিনা আত্মার! মগজ একেবারে গুবলেট!'

'আচ্ছা এরকম হল কেন বলতো হে?'

'কেন আবার? বুঝছ না?' একটু রহস্যময় ইঙ্গিতে কথাটা শেষ হয়, 'পয়সা ছিল দেদার, বোতল উড়িয়েছে দেদার, তারই প্রতিফল আর কি!'

'তাহলে বলছ তাই?'

'তবে আবার কি? নইলে লাহিড়ী বংশের সাতপুরুষে কারো মাথা খারাপ ছিল না—'

'সেদিন নরেশ তো দুকথা শুনিয়েই দিয়ে এল।'

'তাই নাকি? তাই নাকি?'

'হুঁ, ওরা ইয়ংম্যান, অসহ্য কথা সইবে কেন? বলে দিয়েছে—'আপনাদের পক্ষে এখন বৈরাগ্যের বুলি আওড়ানোটা খুবই সোজা কাকাবাবু। ভোগ করেছেন আশা মিটিয়ে, এখন গ্রামটাকে ঋষিদের তপোবন বানিয়ে শান্তিতে থাকতে ইচ্ছে করছে। আমাদের তো তা নয়! আমাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা।'

'তাই নাকি? নরেশের তো বেশ সাহস আছে? আর থাকবে নাই বা কেন? কে কার চালে বাস করছে? আরও একটু বলতে পারতো, 'সারা জীবনটা শহরের সেরা শহরে কাটিয়ে এখন ষাট বছরে ঠেকে বুঝি আপনার খেয়াল হল—শহরগুলো শুধু পচা নর্দমায় ভরা নরককুণ্ড। আর তার মানুষগুলো বিষাক্ত পঙ্কিল—'

'হা হা হা, এই সব বলে নাকি ?'

'তাইতো। ওখানে গেলেই তো ওই কথা—শহরের নিঃশ্বাসে কাল-কেউটের বিষ, যদি বাঁচতে চাও তো পালিয়ে এসো। শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রী করো না, পৃথিবীজোড়া দুর্নীতি আর ব্যাভিচারের দাঁতালো চক্র থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাও তো চলে এসো আকাশের নীচে, ঘাসের বুকে—'

'তোমার তো দেখছি দিব্যি মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'তা হয়েছে বৈ কি। শুনে শুনে হয়ে গেছে। পাগল জিনিসটা বেশ মজাদার তো!'

তা' সত্যি, 'পাগল' জিনিসটা বেশ মজাদার!

বিশেষ করে যে পাগল আঁচড়ায় না কামড়ায় না, শুধু কথা বলে। দার্শনিকের মত কথা, অধ্যাত্মজ্ঞানীর মত কথা, বিজ্ঞ বিচক্ষণের মত কথা, নীতিবাগীশের মত কথা। এমন পাগলকে নাচিয়ে নাচিয়ে ওই সব মজাদার কথা শুনতে সবাই চায়। ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, শহুরে গ্রাম্য, বুড়ো যুবো, সবাই। পাগলের মধ্যে থেকে কৌতুকরস আহরণ করে নেওয়ার মধ্যে দোষণীয় কিছু দেখে না কেউ।

তেঁতুলগোড়া গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে যদি এমন এক পাগল এসে জুটে থাকে, গ্রামটা কেন করবে না আহরণ সেই কৌতুক রস ?

'যদি মানুষ, একটা আসতো, ওরা বিনম্রচিত্তের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতো। 'পাগল' এসেছে, কৌতুক করে নেবে।

পরামর্শ করে তাই গেল কয়েকজন একদিন দল বেঁধে।

গেল ছুটির দিনে সকালবেলা। যেদিন তেঁতুলগোড়ার প্রাণপাখিরা আপন পিঞ্জরে পিঞ্জরে ফিরেছে। সেই পাখিরাই ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসার সময়টাকে একটু পিছিয়ে দিয়ে চলে এল লাহিড়ীবাড়ি হাসি চাপতে চাপতে। ওরা ইতিপূর্বে আসেনি, দু এক রবিবার বাড়ি এসে শুধু শুনেছে লাহিড়ীবাড়ির নতুন ঘটনা।

একসঙ্গে গুটি ছয় সাত ভদ্র সন্তানের আবির্ভাবে ভারি খুশি হয়ে উঠলেন জিতু লাহিড়ী! খুব সমাদর করে বসালেন। তারপর বললেন

'বোসো, তোমাদের জন্যে একটু আতিথ্যের আয়োজন করতে বলে আসি ?' ভিতরে ঢুকে গেলেন লাহিড়ী।

এরা গলা নামিয়ে বলাবলি করলো, 'শুধু চা দেবে, না 'টা'ও দেবে ? কি মনে হয় ?'

'কি জানি। অবস্থা তো দেখা যাচ্ছে ভাঁড়ে মা ভবানী।'

'পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস ? খড়ম।'

'তবে আর পাগল বলেছে কেন।'

'গিন্নীটি না কি ডাঁটুস আছে।'

'থাকলে কি হবে, পাগলার পাল্লায় পড়ে ডাঁট দেখাবার জুৎ পাচ্ছে কই ?'

'শুনি নাকি সব কাজ নিজে করে, ঝি রাখতে দেয় না পাগলা।'

'আরে দূর, মা বলছিল লুকিয়ে ঝি রেখেছে বাসন মাজতে। চিরটাকাল দিল্লিতে আরাম করে এল—'

'আচ্ছা অমন একটা কেষ্টবিষ্টু লোক হঠাৎ পাগলই বা হল কেন বলতো ?'

'আরে বাবা, তার উত্তর তো পড়েই আছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে। এই চুপ—আসছে। যাই বলিস চেহারাটা কিন্তু রাজসিকই। কে বলবে পাগল।'

'চুপ। পুরো পাগল তো নয়, বাতিকগ্রস্ত আর কি।'

'তুই আগে কথা বলবি, তুই পারিস খুব মজা করতে।'

মজা করবার জন্যে ভব্য হয়ে বসলো ওরা।

জিতু লাহিড়ী এসে বসলেন প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে।

বরুণাকে আদেশ দিয়ে এসেছেন, 'গেলাস আষ্টেক বেলের শরবৎ তৈরি করে ফেলতে, ছেলেরা এসেছে।'

বরুণা বেলের শরবতের মতই ঠাণ্ডা চোখে শুধু একবার তাকিয়েছিলেন।

'আহ হা'—লাহিড়ী কৌতুকের গলায় বলেছিলেন, 'তাইতো। বস্তুটা বোধহয় তোমার কাছে একেবারে অজানিত অভাবিত। আসলে

কিছু না, ওই বেলটাকে জলে গুলে টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি মত একটা পানীয়ে পরিণত করা, এই আর কি !' বলে চলে এসে বসলেন।

লাহিড়ীদেরই এক দূর জ্ঞাতির ছেলে অনিলই প্রথম কথা কইল, 'আপনি আমাব কাকা হন, না জ্যাঠামশাই হন, তা ঠিক জানি না, আমি হচ্ছি অভয় লাহিড়ীর ছেলে।'

জিতু লাহিড়ী অবশ্য 'অভয় লাহিড়ী' নামধাবী কাউকে মনে করতে পারলেন না, বললেন, 'আরে বাবা, ও জ্যাঠা কাকা তুই এক। বাপের ভাই তো। তা বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন, দেখলে চিনতে পারতাম।'

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসা! ভয়ানক যেন কৌতুকের কথা!

ডেঁপো ছেলেটা মুচকি হেসে বলে উঠল, 'বাবাকে সঙ্গে আনতে হলে তো কাকাবাবু আমাকে এই নরদেহ পরিত্যাগ করতে হতো—'

জিতু ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ও মারা গেছেন? তা'হলে বাবার নাম উচ্চাবণেব আগে 'ঈশ্বব' বলা উচিত ছিল তোমার। মহাশয় বলা উচিত ছিল।'

ছোকরা চরম বিনীত ভঙ্গীর নকল করে মাথা চুলকে বলে, 'আজ্ঞে কাকাবাবু, সেই কোনকাল থেকে দেশছাডা হযে এক ছোট লোকের অফিসে ঢুকেছি, উচিত অনুচিত শিক্ষা সহবৎ আর হল কবে?'

জিতুর ভুরু সোজা হয়। আস্তে বলেন, 'তা হোক, বংশ মর্যাদার কথা ভুললে চলবে না। লাহিড়ী বাড়ির ছেলে তুমি। শিক্ষা-দীক্ষা আচার-আচরণে যাঁরা এ তল্লাটে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা ছোটবেলায় আমাদের বাবা জ্যেঠামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছাড়া বসতে পাইনি।'

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই না পাওয়াটাই যে বালক জিতুর চিত্তে নিমপাতার আস্বাদ এনে দিত, সে কথা আর মনে পড়ে না জিতু লাহিড়ীর। লাহিড়ী বাড়ির 'মর্যাদার' ঠ্যালাই যে তাঁকে এই তেঁতুলগোড়া গ্রাম ছাড়িয়েছিল, তাও মনে পড়ে না। তবু বংশ মর্যাদার কথাই তোলেন।

বড়দের সামনে দাঁড়ানো ছোটদের সেই ভীত ত্রস্ত মুখগুলি অতীত থেকে চিত্তপটে ভেসে ওঠে জিতু লাহিড়ীর এবং সেইটাই এখন তাঁর কাছে 'আদর্শ' মনে হয়।

ছোকরা আরো বিনীত ভঙ্গীতে বলে, 'আজ্ঞে আপনারাই চলে গেলেন, গ্রামের মাথা বলতে আর কেউ রইল না, সভ্যতা ভব্যতা আর শিখবো কোথা থেকে ?'

অপর কয়েকজন সব পরস্পরকে অলক্ষ্য চিমটির দ্বারা উত্তেজিত করছিল, অতএব ভিতরে ভিতরে চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল, যেটা লাহিড়ীর চোখেও পড়ল। জিজ্ঞাসু হলেন, 'কি হলো ?'

'আজ্ঞে ও কিছু নয়—' মুখে ভোলালো ভাব আনে ছোকরারা, 'ছারপোকা।'

'ছারপোকা!' জিতু অবাক হয়ে তাকালেন।

ছোকরা মনে মনে বলে, তাকাচ্ছে দেখ, যেন ছারপোকা কথাটা শোনেনি জীবনে। ওরে আমার সাহেব এলেন রে।.. মুখে বলে 'আজ্ঞে হ্যাঁ ছারপোকা, চৌকির খাঁজে খাঁজে থাকে।'

'থাকে তা আমি জানি।' জিতু বলেন, 'ছারপোকা শব্দটা শুনে অবাক হইনি বাবা, অবাক হচ্ছি এই ভেবে এই দীর্ঘকালের পোড়ো বাড়িতে ওদের অস্তিত্ব টিঁকে রইল কি করে! কার রক্তপান করে!'

আর কি, এই তো পাগলার পাগলামীর ঘরের ঘুলঘুলি দেখা গিয়েছে, পিন চালানো যাক এইখান থেকে।

আর একটা ছেলে বলে ওঠে, 'আজ্ঞে স্যার—'

'স্যার নয় স্যার নয়, কাকাবাবু।'

'আচ্ছা তাই। মনে হচ্ছে কি, ওরা হচ্ছে রক্তবীজের ঝাড়, ওদের কি আর খাদ্যের অভাব ? এ যুগের বাতাসই ওদের খাদ্য জোগাচ্ছে। এ যুগে মানুষ মানুষের রক্তপান করছে, তাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—'

জিতু লাহিড়ী সহসা সোজা হয়ে বসেন।

উৎসুক আগ্রহী গলায় বলে ওঠেন, 'এ যুগে মানুষ যে মানুষের রক্তপান করছে, এ তোমরা অনুভব কর ?'

'করি বৈ কি স্যা—কাকাবাবু, চোখ রয়েছে, মন রয়েছে—'

জিতু তেমনি গলায় বলেন, 'সে তোমাদের এখনো এই গ্রামের চোখ আর গ্রামের মন রয়েছে বলে বাবা। শহর তোমাদের এখনো নষ্ট করতে পারেনি। নইলে রক্তপানের উল্লাসেই মেতে উঠতে।'

'সে যা বলেছেন কাকাবাবু, নেহাৎ অন্নদায় তাই পড়ে আছি সেখানে, নইলে কলকাতা কি একটা থাকবার মত জায়গা?'

বক্তা ছেলেটা সম্প্রতি কলকাতায় বাসা নিয়েছে। সামনের মাসেই বৌ ছেলেকে নিয়ে যাবে, কারণ বৌ এবং শাশুড়ীতে নিত্য ধুন্ধুমার চলছে। সেই বাসা ভাড়ার ইতিহাস এরা সবাই জানে। কিন্তু সেটাই তো মজা। কনুইয়ের গুঁতো প্রবল হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। জিতু লাহিড়ী ওটা ধরতে পারেন না।

ওঁর চোখ ঠিক এদের ওপরও নেই। হঠাৎই সামনের জানলার বাইরে চোখ ফেলে বাতাসে পাতা ঝিলমিল একটা তেতুল গাছের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। ঈষৎ অন্যমনা, ঈষৎ উদাস উদাস।

সেইভাবেই বলেন, 'তা' ও ঠিক সম্পূর্ণ নয় বাবা, শহর আমাদের দেয়ও অনেক! কিন্তু খাজনা নেয় বড্ড বেশি। সেই খাজনা যোগাতে যোগাতেই নিঃস্ব হয়ে যেতে বসেছি আমরা। সেই নিঃস্বতার দৈন্য ঢাকবার জন্যেই মানুষ ছদ্মবেশ পরছে, রং মাখছে, পালিশ ঘসছে, আর তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাপ উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে।...পাপের সাপ, কালকেউটে সাপ!'

ছেলেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'কী বলবো কাকাবাবু, আপনার মত এত চমৎকার করে বলতে আমরা পারি না, কিন্তু ঠিক ওই রকমই মনে হয়। লোভ, দুর্নীতি, অনাচার, অত্যাচার, ঘুষ, কালোবাজার—হাজার রকমের সাপ—'

জিতু লাহিড়ী ওদের মুখে বেদনার ছাপ দেখতে পান। জিতু লাহিড়ী আবার সোজা হয়ে বসেন, 'এটা যদি তোমরা অনুভব করতে পারো, তবে নগরজীবনের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে চলে এসো এই গ্রামের পবিত্রতায়, গ্রামের অনাড়ম্বর সারল্যে!'

ওরা এক যোগে পরস্পরকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে ইচ্ছে তো করেই। কিন্তু ওই যে বললাম অন্নদায়!'

জিতু লাহিড়ী গভীর স্বরে বলেন, 'কিন্তু বাবা অন্ন তো গ্রামেই। গ্রামই তো অন্নদাত্রী পালয়িত্রী! আমাদের আগের পুরুষ পর্যন্ত তো এই গ্রাম থেকেই অন্ন খুঁটে খেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। অথচ সবাই তাঁরা গরিবও ছিলেন না। কতজন কত দান-ধ্যান করেছেন, কত জনহিতকর কাজ করেছেন, দোল দুর্গোৎসব পূজো পার্বণ করেছেন, সবাইকে ডেকেছেন খাইয়েছেন—'

কথার মাঝখানে হঠাৎ ভিতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন বরুণা লাহিড়ী। আট গ্লাশ বেলের পানা নিয়ে নয়, খালি হাতে। শাড়িটা টান টান করে কোমরে বাঁধা—চুলগুলো টান করে মাথার পিছন দিকে বাঁধা, ব্রোঞ্জের পুতুলের মত চকচকে টান টান মুখ।

এসেই বিনা ভূমিকায় বলে ওঠেন, 'খাইয়েছেন! যাদের রক্তপান করে ভরাট হয়ে বসে থেকেছেন তাদেরই ওই বছরে দু'দিন ডেকে এনে উঠোনে বসিয়ে ভিক্ষান্নের ভোজ দিয়েছেন! রক্তপান! রক্তপান শুধু এ যুগই করে না, সব যুগ করে। করে আসছে। হয়তো যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য আর খাদকের সম্পর্ক বদলায়, আর কিছু না।

জিতু লাহিড়ী বিরক্তভাবে বলেন, 'তুমি আবার মাঝখান থেকে কি বলছ? তুমি তো গোড়া থেকে সব শোনোনি—'

বরুণা লাহিড়ী স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সামনে উপবিষ্টদের দিকে একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, 'শুনেছি বৈকি! গোড়া থেকেই শুনেছি। সব শুনেছি, সব দেখেছি।'

ওরা ঈষৎ জড়সড় হয়। এই দৃপ্ত মুখের সামনে উচিতমত উত্তর দেবে, এত সাহস ওদের নেই।

কবেই বা ছিল। দিল্লির সমাজের তা'রাও তো এমনি অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে যেত। অন্যের কথার মাঝখানে কথা বলা তো বরুণার চিরকালের অভ্যাস। তীব্র তীক্ষ্ণ কথা!

জিতু লাহিড়ী একদল মনের মত শ্রোতা আর একটি মনের মত

প্রসঙ্গ পেয়েছিলেন, আকস্মিক এই বাধায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, এবং সেটা চাপেনও না। গম্ভীর স্বরে বলেন, 'তোমাদের ওই বুলিটা নতুন নয়, শুনেছি ঢের। তবে বুলিটা ধার করা এই যা! ধার করা বলেই শুধু ধারই আছে ভার নেই। যদি অনুভবের হতো, হয়তো কিছু কাজ হতো! কিন্তু একটা কথা বলি। সেকালের শোষণটাই দেখেছ তোমরা, পোষণটা তো কই দেখতে পাওনি?'

'পাব না কেন?'—বরুণা তেমনি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলেন, 'কোনো 'কাল'টাই তো কোনো এক কালে শেষ হয়ে যায় না। সবকালেই থাকে সে অন্য পোশাক পরে। শুধু সেকালে কেন, একালেও শোষণ-পোষণ দুইই দেখতে পাচ্ছি। ঝুনঝুনওয়ালা ঠুনঠুনওয়ালাদের পোশাক পরে ঘুরে এসেছেন আমাদের সেই ধর্মজ্ঞানী জমিদাররা। যাঁরা পুকুর প্রতিষ্ঠা করতেন, জলসত্র খুলতেন, বিষয় দেবোত্তর করে দিয়ে ব্রাহ্মণ পুষতেন, তাঁদেরই উত্তরপুরুষ তো এঁরা! এই যাঁরা হাসপাতাল খুলে দিচ্ছেন, স্কুল খুলে দিচ্ছেন, মঠে মন্দিরে মোটা চাঁদা দিচ্ছেন—'

লাহিড়ী দম্পতি কি ভুলে যাচ্ছেন ওঁরা কেবলমাত্র দু'জনে নেই? বুঝতে পাচ্ছেন না, সামনে যে দলটি বসে আছেন তারা মজা দেখতেই এসেছে?

ভুলেই হয়তো গিয়েছেন, তাই তাদের আরো মজা পাবার সুযোগ দিয়ে তর্কে মাতছেন। অবশ্য তর্কে মাতছেন জিতু লাহিড়ীই।

নইলে বরুণার কথা শেষ হলেই তো শেষ হয়ে যেত সব। শেষ হতে দিলেন না জিতু, বলে উঠলেন, 'বড়লোক চিরকালই মুখোশ পরে কাটায়। বড়লোকের কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে গৃহস্থলোকের। যারা গরিব, যারা মধ্যবিত্ত, তারা চিরদিনই সৎ পবিত্র, অনাড়ম্বর। আজ তারা শহরের দিকে ছুটেছে গড্ডালিকা প্রবাহের মত। শহরের পঙ্কিল জীবনের স্বাদ পাচ্ছে তারা, আর ভাবছে এই ভাল! এই চমৎকার! এই সর্বোত্তম আধুনিক!···এই সর্বনাশা বুদ্ধিকে যদি বাঁধ দেওয়া না যায়, শহরের পঙ্কিলতা সম্পর্কে অবহিত করিয়ে না দেওয়া যায়, তাহলে কোন পথে ছুটবে ওরা কে জানে!'

'ভাল!' বরুণা বলেন, 'অবহিত করাও তবে বসে বসে! গ্রামে এসে ধর্মপ্রচারকের কাজটা যদি পেয়ে যাও মন্দ কি? যাক, আমি যা বলতে এসেছি বলে যাই, এতগুলি অতিথি সৎকার করতে পারি, এমন কোনো উপকরণ নেই এ বাড়িতে।'

বরুণা ঘুরে দাঁড়াল চলে যাবার জন্যে। জিতু লাহিড়ী এই ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত্য আর ক্রূর বুদ্ধির দিকে তাকিয়ে সহসা নিজেকে সম্পূর্ণ সংবরণ করে ফেলে হেসে উঠে বলেন, 'তুমি ভুল করছো বরুণা এ তোমার দিল্লীর সমাজের অতিথি নয় যে, অনেক দিতে না পারলে মান থাকবে না। এরা আমাদের ঘরের ছেলে গ্রামের ছেলে, এদের কাছে কুণ্ঠিত হবাব কিছু নেই, তোমার হাতের বেলের পানা এক গ্লাস পেলেই এরা তৃপ্তি পাবে—'

'ওঃ তাই বুঝি?' বরুণার ঠোঁটের কোণে ছুরির ধার ঝলসে ওঠে, 'বুনো রামনাথের বংশধর এঁরা? কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের তৃপ্তিদায়ক সেই তুচ্ছ বস্তুটায় আবার আমার অক্ষমতা।'

ঠিকরে ভিতরে ঢুকে যান বরুণা লাহিড়ী!

জিতু লাহিড়ী গম্ভীর বিষণ্ণকণ্ঠে বলেন, 'আড়ম্বর আর বিলাসিতা মানুষকে কি ভাবে ধ্বংস করে, দেখলে তো তার দৃষ্টান্ত? এই গ্রামীন সরল জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে ওঁর কত বছর লাগবে কে জানে! হয়তো পারবেনই না।'

নীরবে আবার সেই পাতা ঝিলমিল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন জিতু লাহিড়ী। যারা মজা দেখতে এসেছিল, তারা আর এই হতভম্ভ হয়ে বসে থাকার মধ্যে কোনো মজা পায় না, উঠে পড়ে বলে, 'আজ তাহলে আসি কাকা, আবার আসবো!'

জিতু মাথা নেড়ে সায় দেন।

ওরা এ বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে বলে ওঠে, 'দূর, সকালটা খানিক বরবাদ গেল! মজা জমল না! বাবাঃ গিন্নী বটে একখানা?'...বলে ওঠে, 'কেন যে লোকটা রাতদিন কাল কেউটের ছায়া দেখে বুঝতে পারছিস? নিজের ঘরেই যে ফণাধরা কেউটে!'

আবার হেসে ওঠে, 'আমাদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল ভেতর থেকে, বুঝতে পেরেছিস ?'

'তা' আবার পারিনি ? কী মর্মভেদী দৃষ্টি, বাপস্!'

তারপর সকলেই হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, লাহিড়ীর মাথার গণ্ডগোলের কারণ শুধু মদই নয়, এই ফণাধরা ফণিনীও!

মাথার গণ্ডগোলটা সম্পর্কেও মতভেদ থাকে না কারুর!

ওরা চলে যেতেই জিতু ভিতর বাড়িতে চলে এলেন। বাড়ির প্রথম দিনের ধূলি ধূসরিত চেহারাটা অবশ্য এখন আর নেই। জিতু লাহিড়ী যতই ইচ্ছে পোষণ করে থাকুন ঝি-চাকর রাখবেন না, সে ইচ্ছে কার্যকরী হয়নি। বরুণা লাহিড়ী রান্না বান্না কাজ কর্ম কোনো কিছুতেই হাত মাত্র না দিয়ে একটা চৌকি ঝেড়ে নিয়ে তাতে একটা চাদর বিছিয়ে চুপ করে শুয়েছিলেন পুরো তিনটে বেলা। এহেন অচল অবস্থার অবসান করতে লোক রাখা ছাড়া উপায় কি ?

জিতু নিজেই চেষ্টা করেছিলেন ঝাড়ামোছা করবার, কিন্তু ওই 'ঝাড়া' এবং 'মোছা'র যে দুটি প্রধান অস্ত্র ঝাঁটা এবং ন্যাতা, সেই পরম দুর্লভ বস্তু দুটির একটিও পেলেন না কোথাও।

দরজার পাশে, চৌকির তলায়, মাচার উপর, দেখলেন খোঁজাখুঁজি করে, তারপর হাল ছেড়ে ভাবলেন সরযূ যদি আবার আসে, তাকে জিগ্যেস করবেন কোথায় পাওয়া যায় ওই দুর্লভ বস্তু দুটিকে ?

হ্যাঁ, তখন সরযূর আবার আসাটা 'যদি'র মধ্যে ছিল। প্রথম দিনটি তো সরযূ এসেই নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল, এবং লাহিড়ী সে নিমন্ত্রণকে অবহেলা করেন নি। তবে জোড়ে যেতে পারেন নি। যেতে হয়েছিল একলাই। বরুণা লাহিড়ী যাওয়ার প্রস্তাবে শুধু একবার ভুরু কুঁচকে ছিলেন, তারপর দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন।

জিতু লাহিড়ী চলে গেলেন ভুবন লাহিড়ীর বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। যে বাড়িতে আপাততঃ পুরুষ বলতে শুধু সরযূর সেই লক্ষ্মী ছাড়া ভাইপো দুটো। আর সবই মেয়েমানুষ। যেন প্রমীলার রাজ্য।

জিতু লাহিড়ী কি তাতে একটু কুণ্ঠিত হবেন? একটু অস্বস্তিতে পড়বেন?

প্রশ্নের উত্তর এরাই দিল।

সরযূর পিসি, সরযূর মা, আর সরযূ নিজে। জিতু যে এখানে যুগ যুগান্তর পরে এসেছেন, জিতুর নাম যে এই তেঁতুলগোড়া থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা যেন ভুলেই গেল ওরা। যেন এই দু'চারটে বছর পরে বাড়ি এসেছেন জিতু লাহিড়ী, লাহিড়ী বাড়ির যিনি গৌরব! মৃত কর্তা ভুবন লাহিড়ীর যিনি ভাইপো, এ বাড়িতে যাঁর দাবি আছে।

পিসি একেবারে কলকল্লোলে এগিয়ে এলেন এবং নিতান্ত সহজে নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বলে উঠলেন, 'এত দিনে দেশকে মনে পড়লো বাবা? দেশে পদার্পণ করলে তাহলে? এসো, ঘরের ছেলে ঘরে এসো, বোসো! এ পুরী অন্ধকার হয়ে গেছে, তবু তুমি যে এসে বন্ধ ভিটের দোর খুললে এই তো পরম আনন্দের কথা। তা—হ্যাঁ বাবা, বৌমা এলেন না?'

কে ইনি,—কি সম্পর্ক এর সঙ্গে, ইতিপূর্বে দেখেছেন কিনা, কিছু মনে করতে পারলেন না জিতু লাহিড়ী, শুধু 'বৌমা' শব্দটা শুনে অনুমান করলেন পিসি খুড়ি কেউ হবেন।

নীচু হয়ে একটা প্রণামের ভঙ্গী করে বললেন, 'না, তিনি আসতে পারলেন না, কাউকে চেনেন না বলে অনিচ্ছে প্রকাশ করলেন।'

মুখে আসছিল 'তাঁর শরীরটা ভাল নয়,' কারণ ওইটাই সর্বপ্রধান অজুহাত। কিন্তু 'মিথ্যা'কে আর প্রশ্রয় দেবেন না, সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করবেন, এই সংকল্পে স্থির হলেন, তাই বললেন 'তিনি অনিচ্ছে প্রকাশ করলেন।'

পিসি হায় হায় করে ওঠেন, 'ওমা সে কি, চেনার আবার হাত পা আছে নাকি, দেখা হলেই তো চেনা! দেখ দিকি কাণ্ড! সরযূ তুই যা না একবার ছুটে, ডেকে নিয়ে আয় না!'

জিতু লাহিড়ী মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'থাক থাক, হবেই পরে

চেনা জানা। ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আপনি আমার কে হচ্ছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

পিসির বয়েস পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের কম নয়, তথাপি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, চটপটেও বিলক্ষণ।

কথা বলতে বলতেই তাড়াতাড়ি একবার তরকারিটাকে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটে রান্নাঘর ঘুরে এসে বলেন, 'বুঝতে পারছ না বলে লজ্জারও কিছু নেই বাবা, দোষেরও কিছু নেই। বুঝবে আর কোথা থেকে? বাড় ছাড়া কি আজকে? তবে আমি বুড়ো ঘাঁটি আগলে পড়ে আছি, আর একে একে সবাইয়ের পারের হিসাব করছ, তাই আমার সবই চোখের ওপর জ্বল জ্বল করছে। যেদিন বাড়ি থেকে পালালে, কি হৈ চৈ পড়ে গেল! বাইরের উঠোনে চৌকি পেতে তখন কর্তারা একসঙ্গে বসে গালগল্প করতেন, তেমনি করছেন, খবর হল জিতুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

'ব্যাস কী ছুটোছুটি হাঁটাহাঁটি কাণ্ড। ওবাড়ির বড়বৌদি, মানে তোমার মা তো একেবারে শয্যেধরা হয়ে পড়লেন, সাত দিন মুখে জলবিন্দুটি না, শেষে মন্দিরের ভটচায্যি মশাইকে ডেকে তাঁকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে—'

'পিসির স্মৃতিশক্তির তারিফ করে সরযূ। বাবাঃ এত কালকার কথা মনেও আছে। বলছে দেখ বুড়ি, যেন এই কাল পরশুর ঘটনা। হেসে উঠে বলে, 'নাও ঠেলা, পিসি এখন পঞ্চাশ বছর পূর্বের ঘটনাকে টেনে এনে গল্প ফাঁদতে বসলো! ও পিসি, ওসব কথা পরে হবে! মানুষটাকে একটু জল দাও, মিষ্টি দাও—'

'থাক থাক—' জিতু লাহিড়ী হাত নেড়ে থামান। পঞ্চাশ বছর পূর্বের কাহিনীই যে আজ তাঁর বড্ড প্রয়োজন। জিতু নামক একটা অবোধ উদ্ধত ছেলে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, এইটুকুই জানা ছিল জিতু লাহিড়ীর। ছেলেটা চলে যাবার পর তার উপস্থিতির ঠাঁইটুকুতে কতখানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে খবর তো জানা নেই!

সেই ছেলেটার মা পুত্র বিচ্ছেদে কাতর হয়ে বিছানা নিয়েছিল?

তার উপবাস ভঙ্গ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল ?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! সে খবরটা কেউ কোনদিন পৌঁছে দেয়নি জিতু লাহিড়ীর কানে! সমস্ত জগতের প্রতি অভিমানাহত, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিস্পৃহ, জিতু লাহিড়ী তাই মাতৃবিয়োগ সংবাদ-টাকেও ঔদাসীন্যের সঙ্গে সরিয়ে রেখেছেন!

কত কতদিন আগে সেই ছেলেটার মৃত্যু ঘটেছে, তবু তার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে বুকটা কেমন করে উঠল জিতু লাহিড়ীর। আস্তে বললেন, 'পুরনো কথাও শুনতে ভাল লাগে! আপনি তাহলে—'

'পিসি, পিসি!' সন্তু বলে ওঠে, 'ঈশ্বর ভুবন লাহিড়ীর সহোদর বোন তো ইনি—'

জিতু লাহিড়ী স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করতে থাকেন, ভুবন লাহিড়ীর সহোদরা।

'আপনি কি তা'হলে রাঙা পিসিমা ?'

বলে ওঠেন জিতু লাহিড়ী।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন পিসি। 'ওমা এইতো সব ঠায ঠিক মনে রেখেছো বাবা! কথায় বলে রক্তের সম্পর্ক আর বংশের টান! একি ভোলবার জো আছে? মনে আছে সেই তোমরা ছেলেপুলেরা ওই খিড়কি পুকুরে সাঁতার দিতে আসলে, আর আমি বকাবকি করতাম!'

'মনে পড়ে! স্থান কাল পাত্র মনে পড়িয়ে দিলে অনেক বিস্মৃতিই স্মৃতির জানালায় এসে উকি মারে। জিতু লাহিড়ী সামান্য কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, 'মনে পড়ছে! বকাবকি তো সাঁতার দেবার জন্যে করতেন না, বকাবকি করতেন আমরা পুকুর পাড়ের একটা জামগাছ থেকে জাম লুঠতাম বলে।'

'ও বাবা! দুষ্টু ছেলেটার যে সব মনে আছে দেখছি—' পিসি বিগলিত হাস্যে সায় দেন, 'যা দুরন্ত ছিলে বাবা!'

জিতু লাহিড়ী মৃদুহাস্যে বলেন, 'আশ্চর্য, মানুষের চেহারার কতই না পরিবর্তন হয়! কী ফরসা রং ছিল আপনার! কী রকম চমৎকার

দেখতে ছিলেন—'

'লাহিড়ী গুষ্টির মধ্যে মন্দটা কে শুনি?' সরযূ বলে ওঠে, 'খালি বাড়ির বৌরাই তেমন জুতের নয়, কি বল পিসি?'

সরযূ দুষ্টু হাসি পশ্চাৎবর্তিনী একজনের উদ্দেশ্যে ঠিক্‌রে ওঠে।

'এই হলো!' পিসি বলেন, 'এই এক রোগ মেয়ের। বুড়ো বয়স অবধি সারল না। কেন আমার জিতুর বৌ কি মন্দ?'

'মেজদার পাশে লাগে না।'

'হয়েছে, থাম্‌। যা তো, তুই ডেকে আন গে। বুড়ি পিসির হাতের দুটো ডাল ভাত খাক—'

'এই দেখ বুড়োর রোগ!' সরযূ হাসে, 'শুনলে না এখন থাক!'

'তা তো শুনলাম! তা হ্যাঁ বাবা, তোমার বাড়িতে তো আর আজ রান্নাবান্না সম্ভব নয়, বৌমার খাওয়ার তাহলে কি হবে?'

জিতু লাহিড়ী কথা বলার আগেই সরযূ উত্তর দিয়ে ওঠে। 'কি আবার হবে? সরযূ কি মরেছে? একটা মাত্র মানুষের ভাত-তরকারি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব না?'

তা' সেই পৌঁছেই দিয়ে এসেছিল সরযূ, বরুণা লাহিড়ীর জন্যে ভাত-তরকারি বেড়ে। কিন্তু বরুণা ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে তা' স্পর্শও করেনি।

জিতু লাহিড়ীই প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন পিসির হাতের রান্নার। কত যুগ যুগান্তর আগে এ ধরনের খাদ্য খেয়েছিলেন জিতু, ভাবতে শুরু করলেন, অবাক হলেন, বিষয় খেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই ভেবে আশ্চর্য হলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পূর্ণ অন্য স্বাদে অভ্যস্ত জিভ এসব জিনিস নিল কি করে? শুধু তিনি এই তেঁতুলগোড়ার ছেলে বলে।

প্রথম দিনের ইতিহাস ছিল এই। তারপরও কয়েকদিন ধরে এই একই নাটকের পুনরভিনয় হতে থাকলো। জিতুদের খাওয়ার দায়িত্বটা যেন সরযূরই।

বরুণা পরদিন থেকে অবশ্য আর ভাত ঠেলে রাখেন নি। যেন সরযূকে কৃতার্থ করছেন, এই ভাবে খেয়েছেন। পরে সরযূ তাঁর ক্ষমতা

অনুমান করে একটি বামুনের মেয়েকে রান্নার কাজে ভর্তি করে দিয়েছিল। না দিলে খাওয়াই জুটত না। বরুণা লাহিড়ী যে রান্না জানেন না তা নয়, গ্যাসের স্টোভে মাংস রান্না করেছেন কত দিন। কিন্তু এখানের ওই কাঠের উনুনে শাকপাতা রান্না করা? অসম্ভব!

এখানে বাস করাটাই তো একটা অসম্ভব ঘটনা। তার উপর এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ।

যে দুদিন ঝি জোটেনি, সরযূ এসে অবলীলায় এই বিরাট বাড়িটার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঝাঁট দিয়ে সাফ করে দিয়ে গেছে, বরুণা বেজার মুখে ঘরে বসে থেকেছেন।

জিতু লাহিড়ী প্রথমটা হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'এটা কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে?'

সরযূ হেসে উঠে বলেছিল, 'দোষের কিছুই না। বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের জঞ্জাল সাফ করছি।'

জিতু বলেছিলেন, 'তুমি একটি আশ্চর্য মেয়ে। এমন দিক থেকে কথা বললে, বাধা দেওয়ার আর পথ রাখলে না।'

সরযূ আবার হেসেছিল, 'বাধা' আর 'পথ' দুটো যে আলাদা বস্তু মেজদা! অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? যাঁর সংসার তিনি ঠিকই ভার নেবেন, তবে এখন হঠাৎ জলের মাছ ডাঙায় পড়েছেন, ভয় খাচ্ছেন। আর আমার তো এই কাজ। লাহিড়ীবাড়ির উঠোন ঝেঁটিয়েই তো জীবন কাটল! যারা গোত্তর পদবীর ভাগ দিয়েছিল, তারা তো আর ভাতের ভাগ দিল না জীবনে। সরুন কিন্তু, বড্ড ধুলো উড়ছে।'

দিন দুই পরে বাগদীদের একটা মেয়েকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, বাসন মাজা কাপড় কাচা বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য।

জিতু লাহিড়ী বলেছিলেন, 'দাসী-রাঁধুনী রেখে সংসার করবার ইচ্ছে আমার ছিল না সরযূ!'

সরযূ অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিল, 'তা মানুষের সব ইচ্ছে কি মেটে? মেজবৌদির যে ইচ্ছে ছিল বিলেত যাবার, আপনি নিয়ে এনে ফেললেন এই হতচ্ছাড়া তেঁতুলগোড়ায়। তবে? পেন্সিলকাটা

ছুরি দিয়ে গাছ কাটবার বায়না নিলেই বা চলবে কেন?'

মেয়েটার কথার যুক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন জিতু লাহিড়ী, আর বেবি লাহিড়ী ভেবেছিলেন, পুরুষ মজানোর বিদ্যেটা শুধু এক শহুরে মেয়েদেরই একচেটে নয়।

গ্রামের শান্তি আর পবিত্রতা দেখাতে এসেছেন সাহেব বরুণাকে!

বিষ। বিষ ওঠে এদের দেখে! গোড়া থেকেই।

আজও সেই বিষ মুখে নিয়ে বসেছিলেন বরুণা, ছেলেরা চলে গেলে জিতু লাহিড়ী ভিতর বাড়িতে এলেন।

বরুণার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা কি হল?'

বরুণা অবশ্য শুনতে পেলেন না।

জিতু আবার উচ্চারণ করলেন কথাটা।

বরুণা এবার সম্পূর্ণ অবোধের সুরে বললেন, 'কোনটা?'

'এই ছেলেগুলোর সামনে যে ব্যবহারটা করলে তার কি সত্যিই দরকার ছিল? এটা তো একরকম অসভ্যতা।'

বরুণা হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তীব্রকণ্ঠে বলেন, 'আরো কত বেশি অসভ্যতা তুমি করে ছিলে সে জ্ঞান তোমার আছে? তোমার এই 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে' গ্রামের ঐসব ছেলেদের তুমি বেলের শরবৎ খাইয়ে পরিতৃপ্ত করতে চাইছিলে, তাই না? বরুণা লাহিড়ীকে দিয়ে সেই শরবৎ বানাবার বাসনা হয়েছিল, কেমন? তাতে ওরা তোমাকে কি ভাবছিল জানো? পাগল! বুঝলে? পাগল! অবশ্য ঠিকই বলছিল। তোমার যদি এতটুকুও স্বাভাবিক বোধ থাকতো, তাহলে টের পেতে ওরা তোমায় নাচিয়ে মজা দেখতে এসেছিল।'

'মজা দেখতে এসেছিল!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই! ওরা হাসাহাসি করছিল, ব্যঙ্গ করে ভক্তি দেখাচ্ছিল তোমায় বুঝলে? এই তোমার নিজের সমাজ।'

ওই তিক্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ওঠেন

জিতু লাহিড়ী। বলেন, 'তাতেই বা আমি ঠকছি কোথায়? এতদিন তোমার সমাজ তোমায় নিয়ে মজা দেখেছে, এখন না হয় আমার সমাজ আমাকে নিয়ে তাই করবে!'

বরুণা তীব্রস্বরে বলেন, 'তর্কে হারলে ফিলজফার বনে যাওয়াই শেষ উপায়। তবে আমি তোমায় এই বলে দিচ্ছি—তোমার সাধের এই গ্রামের সরল গ্রামবাসীরা কেউ তোমার তপোবনের আদর্শের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই। সবাই ধরে নিয়েছে তুমি পাগল হয়ে গিয়ে দিল্লির বাস উঠিয়ে দিয়ে এখানে এসে পড়েছ। তুমি ভাবছ খড়ম পায়ে চাদর দিয়ে ভারতের ঐতিহ্যের ধারক আর বাহক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি, ওরা ভাবছে বদ্ধ একটা পাগল এলো বে?'... বরুণা সর্বাঙ্গে একটা মোচড় দিয়ে বলে ওঠেন, 'আর ভুলও বলে না!'

তা' ভুল ঠিক যাই হোক, বলছে তো বটেই। মেয়ে মহলেও এই আলোচনা এখন। জিতু লাহিড়ীই বিষয়বস্তু এ বছরের।

'উন্মাদ নয়, বদ্ধ পাগল। একটা বাতিককে বদ্ধমূল করে আঁকড়ে বসে থাকার নামই বদ্ধ পাগল। শুনেছিস তো, বলে কিনা—মানুষ আবার একশো বছর পেছনে ফিরে যাক তবেই শান্তি।'

'এক এক পাগলের এক এক বারা! মনে নেই আমাদের ঠাকুরবাড়ির বড় পুকুরের সেই ভাইপোটার কথা? রাতদিন একটা ঘটি নিয়ে জল ভরতো আর জল ঢালতো, জিগ্যেস করলেই বলতো, 'মা বসুমতীর মাথা জ্বলে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা করছি—'। মাথা কেন জ্বলছে রে? ··না, 'সন্তানদের দাপটে—'। হি হি এও তেমনি আর কি!

'মানুষ একশো বছর পেছনে ফিরে যাবে! এ যেন হাটতলার রাস্তায় হাঁটা। ইচ্ছে হল গেলাম, ইচ্ছে হল ফিরলাম! ভগবান মানুষকে পাঠাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে, তারা জন্মাচ্ছে মরছে, আবার নতুন ঝাঁক আসছে। এই তো ব্যবস্থা, উল্টোমুখে হাঁটার আইন আছে?'

'আহা, পাগলে কি না বলে!'

'কিন্তু অমন মানুষটা কিনা পাগল হয়ে গেল!'

'আচ্ছা সত্যিই কি মদ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়?'

'তা' পিপে পিপে খেলে হয় বৈকি!'

'কিন্তু ভজা তুলে যে হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি গেলে, কই—'

'আরে বাবা সে হলো গিয়ে দিশী, আর এ হলো বিলিতি—'

'স্মৃতিশক্তিটা একেবারে লোপ পেয়েছে! শুনতে পাই পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ে, লোকের কাছে বলে কিনা ওর ছেলেমেয়ে নেই, একটাও নেই। কখনো ছিল না, হয়ই নি।'

'পাঁচটা ছেলেমেয়ে সে কথা বললো কে? সরযূ বুঝি?'

'আবার কে! সাতদিন যে ও বাড়ি ছুটছে! গিন্নী তো অহঙ্কারে মটমট, কথা কইলে উত্তুর দিতে নাবাজ, তবু সেধে সেধে কথা কয়ে মরে সরযূবালা! ছেলেমেয়ে কি, কোথায় থাকে, কি বিত্তান্ত, নাম কি তাদের—এইসব প্রশ্নের জ্বালায় রেগেমেগে নাকি বলেছিল, 'মেয়েদের নাম শীলা শেলি সোমা, ছেলেদের নাম জয় আর সঞ্জয়। শুনলে? পাঁচটা-ই হলো!'

'সরযূটা তবু অত যায় কেন বলতো?'

'আর কেন? লাহিড়ী বংশ যে! মেজদা বলে অজ্ঞান একেবারে! ওরই মুখেই সব শুনি, দিল্লিতে নাকি রাজ্যপাট ছিল, সাহেবের মতন থাকতো, ছেলেমেয়েগুলোর সব বিয়ে হয়ে গিয়ে যে যার আপন আপন পথ দেখলো, এদিকে বুড়োও পাগল হয়ে সর্বস্ব বেচে দিয়ে টাকাটা নাকি রামকেষ্ট মিশনে না কোথায় দাতব্য করে দিয়ে ভিখিরির হাল করে দেশে এলো!'

'এও কি গিন্নী নিজে বলেছে নাকি? অত দেমাক—'

'না না, এ সব সেই ছোট লাহিড়ীর শালার বৌ গল্প করে বলেছে কলকাতায় অনন্তর বোনের কাছে। মুখে মুখে সাত কান।'

'দেশে এলি এলি, রবরবা থাকতে থাকতে একবার আয়? তা নয়, হাড়ির হাল করে এলেন ভিটেয় সন্ধ্যে দিতে।'

'সন্ধ্যে তো কতই দেয়। গিন্নী তো তেমনি। সরযূ নাকি একটা তুলসীগাছ নিয়ে পুঁতে দিতে গিয়েছিল, গিন্নী বলেছে, 'দেশে বুঝি

আপনাদের ছাগল নেই? এই কচি চারাগাছটা তাদের দিলে তো সদগতি হতো।'

'অ্যাঁ বলিস কি। হিন্দুর মেয়ে হয়ে এই কথা বললো? তাহলে পুঁততে দিল না?'

'ও বাবা—ও মেয়ে না পুঁতে ছাড়বে? বলে, ছাগলের অভাব কি? তবে নাকি মেজদা বলেছেন একটা তুলসীগাছ পুঁতে দিও তো সরযূ এ বাড়িতে। তাই আদেশ পালন করতে এসেছি।'

'গিন্নী দেবে উপড়ে।'

'দিতো, পাগলার ভয়ে পারে না। পাগলা যে আবার সময় সময় খুব মেজাজ করে। বলে, সব পুরনো ধারা বজায় রাখা চাই।'

'পুরনো ধারা! হুঁঃ! আমাদের ঘরের বৌ ঝিই এখন সকালবেলা বাসি কাপড়ে বসে ঢকঢক করে চা গিলছে!···পুরনো ধারা বজায় রাখতে এই আমরাই রেখে গেলাম! তবে সরযূর মতন আর কে পারবে? এই তেঁতুলগোড়ায় যেখানে যত বিগ্রহ আছেন, অশ্বত্থ-তলায় নুড়িটি পর্যন্ত সবাইকে দু'বেলা জল দেওয়া চাই সরযূর।'

'করবে না কেন, সংসার জ্বালা তো নেই! ঝিউড়ি মেয়ে। এই দেখ না পথে বেরোলেই তো নেয়ে মরবে, তবু চোদ্দবার ওবাড়ি ছুটছে হয়তো একটু শাকের ঘণ্ট নিয়ে, একটু মোচার ঘণ্ট নিয়ে, হয়তো বা দু'খানা পোস্তর বড়া নিয়ে, কিনা মেজদা ভালবাসেন।'

'ওমা' ছিল তো চিরটা কাল সাহেব হয়ে, এসব ভালবাসতে শিখলো কখন?'

'আহা এখনই শিখছে। জান না নোতুন বোষ্টম ডবল করে ফোঁটা কাটে!···হিঁদু হয়েছি, বোষ্টম হয়েছি, দিশী রান্না ভালবাসতেই হবে, এই আর কি?'

'গিন্নীটার হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে আর কি! সরযূর অত মেজদা মেজদা করাও নাকি পছন্দ করে না। সেদিন সুষমা গিয়েছিল ওর সঙ্গে, বললো—'মেজদার জন্যে কুমড়োর ফুল ভাজা নিয়ে এলাম।' শুনে সরযূর দিকে এমন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো গিন্নী যেন ভস্ম করে ফেলবে!'

'আ মরণ! বর তো ষাট বছরের বুড়ো!'

'তা'তে কি! বর বলে কথা! তাছাড়া এই বয়সেই ষাট কিন্তু চেহারাখানা দেখেছিস? যেন যুবো রাজা। বাপ-জ্যাঠার মতনই চেহারা পেয়েছে!'

'তা' ওই যে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো, সরযূ কি বললো?'

'সুষমা তো বলতে বলতে হেসেই খুন। বলে, সরযূ কিনা বলে উঠল, 'যাই ভাগ্যিস দিনে পঁচিশবার নেয়ে নেয়ে দেহটা জলের মাছের মতন হয়ে গেছে, তাই আর অগ্নিদগ্ধ হলাম না বৌ! নচেৎ ভস্ম হয়ে যেতাম! কুমড়োফুল তো আমি তোমায় খেতে বলিনি বাপু, বলেছি আমার দাদাকে!' ঠিকরে ঘরে ঢুকে গেলেন গিন্নী।'

'আর যেদিন আমি গিয়েছিলাম প্রথম? সেদিন?' ভব্যি করে জিগ্যেস করলাম, 'এলেন দিদি গ্রামে? শেষ অবধি মনে পড়ল?' কি উত্তর দিয়েছিল মনে আছে তো? বলিনি তোকে? বলেছিল— 'মজা দেখতে এলেন বুঝি? তা আসবেন বোধহয় মাঝে মাঝে? গাঁয়ে যখন সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, চিড়িয়াখানা নেই! আর এ মজা দেখতে টিকিটও লাগবে না।' বাবা সেই অবধি নাকে কানে খৎ দিয়েছি। আর যাচ্ছি না। সরযূর মতন মান অপমান জ্ঞানহীন কে হবে? কিছু গায়ে বয় না। পাঁকাল মাছ! নইলে ঘরে সংসারেও তো দেখেছ? বাক্যি যন্ত্রণা কি কম আছে? গ্রাহ্য করে না। বলে চোদ্দ বার বাগদী পাড়ই ছুটছে কিনা ওদের ছেলের জবাবকার!'

সরযূ ছিল এখানের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ, জিতু লাহিড়ীর সূত্রে সেটা আরো বেড়ে গেছে। বলতে কি, জিতু লাহিড়ীর অন্তঃপুরের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে ওই সরযূই! তবে সেই সূত্রে যে সরযূ লাহিড়ী গিন্নীর নিন্দে করে বেড়ায় তা নয়, সে শুধু রং রসান দিয়ে মজার টিপ্পনি কেটে গল্প করে।

জিতু লাহিড়ী যখন সকালবেলা স্নান সেরে ধোওয়া ধুতি পরে পূর্বাস্য হয়ে সূর্যপ্রণাম করেন, বরুণা লাহিড়ী যে তখন ঘাড়ের নীচে

দু'দুটো বালিশ দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকেন, এ কথা সরযূই প্রকাশ করে দিয়েছে। বলেছে, 'কী আর বলবো, দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারিনে সেদিন। আমি গিয়েছিলাম গাছের চাঁপা ফুল দিতে। মেজদা বললেন, 'কে পুজো করবে? তোদের বৌদি? তা' তোকে তো এতাদন বেশ বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল। ধারণাটা ভেঙে যাচ্ছে যে? যা দোতলায় উঠে যা, দেখে আয়!'

'উঠল দোতলায়? ওর তো সবেতেই শুচিবাই। ওদের সিঁড়ি ধোয়া নয় ফিরে এসে নাইতে বসবে হয়তো।'

'সে আর বলতে! তবু রাতদিন পাড়ারাজ্য প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। পাতলা ঝরঝরে শরীরটা নিয়ে নিমেষে মাঠ-ঘাট পার হয়ে যায় সরযূ, সাঁঝ সন্ধ্যে মানে না। দুলে বাগদীও মানে না, কারো শক্ত অসুখ শুনলে যাওয়াই চাই তার। শুধু ফেরার সময় খিড়কির পুকুরে একটা ডুব দিয়ে তবে বাড়ি ঢোকে।

বাগদীদের ওই ছেলেটার জ্বর বাড়ায় তদ্বির তদারক করতে ক'দিন রোজই যাচ্ছিল, আজ হঠাৎ একটা অদ্ভুত অভূতপূর্ব খবর কানে এল। সাপে কামড়ানর মত খবর।

চমকে উঠে সংবাদদাতার মুখের দিকে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সরযূ। তারপর প্রবল অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'পাগল হলি নাকি?'

অভিযুক্ত ব্যক্তিও দৃঢ়স্বরে জানালো,—'স্বচক্ষে দেখা দিদিমণি!'

'তোদের চোখের কথা বাদ দে নিধে, তোরা তো দিন দুপুরে স্বচক্ষে ভূত দেখিস! যা নয় তাই বললেই শুনবো আমি?'

'আচ্ছা দিদিমণি পেত্যয় না হয়, এই সন্ঝের ঝোঁকে একবার ভোলার ঘরের আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে দেখবেন।'

সরযূ দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, 'ছোট মুখে বড় কথা কসনে নিধে, আমি যাবো সন্ধ্যের আঁধারে ভোলার ঘরের আনাচে কানাচে উঁকি দিতে? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমার? সাবধান করে দিচ্ছি নিধে

তোদের, যা তা' কথা রটিয়ে বেড়াসনে, লাহিড়ী বাড়ির কর্তারা আজ নেই বলে সাপের পাঁচ পা দেখিস নি। যিনি এসেছেন, তিনিও যে সে মানুষ নয়, সেটা মনে রাখিস! আর লাহিড়ী বাড়ির এই মেয়েকেও মনে রাখিস।'

এহেন চোটপাট কথা যদি সরযূ ছাড়া আর কেউ বলতো, নিধুও চোটপাট করতো সন্দেহ নেই। কারণ তেঁতুলগোড়া গ্রামের বাহ্যিক চেহারায় যতই একশো বছরের ঘুমের প্রলেপ মাখানো থাকুক, আভ্যন্তরিক চেহারায় পরিবর্তন ঘটেছে বৈ কি।

সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে, 'কথা' নামক বস্তুটা এখন আর কেউ পরিপাক করে নেয় না। সঙ্গে সঙ্গে উচিত জবাব দিয়ে বসে। তা' সে বাপ জ্যাঠাই হোক, আর গুরুপুরুতই হোক, কি রাজা মহারাজাই হোক। বড়র সামনে মাথা হেঁট করে অপ্রতিবাদে কথা মেনে নেবে, এ অসম্ভব!

তবু সরযূর সম্পর্কে আলাদা সমীহ রাখে সবাই। ইতর ভদ্র সকলে। সরযূর শাণিত রসনা এবং দৃপ্ত চরিত্রই বোধকরি এর কারণ। সরযূকে কেউ কোনদিন অপ্রতিভ হতে দেখে নি, ইতস্ততঃ করতেও দেখেনি। তা' ছাড়া পরোপকার! ওটা একেবারে সরযূর মজ্জায় মজ্জায়। চেষ্টাকৃতও নয়, কর্তব্য বোধেও নয়, লোকের অসুবিধে দেখে চুপ করে থাকা সরযূর কুষ্ঠিতে লেখেনি। গরিব বড় লোক নেই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, এরা তাই সরযূর নিতান্ত অনুগত। অতএব উচিত জবাব দিয়ে বসল না নিধু। শুধু বিনীত দৃঢ়তায় বললো, 'তবে আর কেমন করে প্রমাণ দেব বলুন দিদমণি! তবে—নিধে কখনো বাজে কথা রটিয়ে বেড়ায় না। আর কেনই বা একটা মান্যিমান ঘরের কুচ্ছো করতে যাবো? তাতে লাভ কি আমার?'

যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করে সরযূ। সত্যিই তো? লাভ কি এদের? কিন্তু বিশ্বাস করাও তো অসম্ভব!

কী এ? ভাবতে ভাবতে সেই মান্যিমান মানুষটার বাড়ির দরজাতেই এসে দাঁড়ালো একবার। গেট থেকেই দেখা যাচ্ছে, বড়

ঝুল বারান্দার নীচে দাওয়ায় জলচৌকি পেতে বসে বই পড়ছেন জিতু লাহিড়ী, সামনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে। প্রদীপের সলতে পাকানোর জন্যে জিতুকে সরযূরই সাহায্য নিতে হয়। বলছিলেন এক দিন, 'তোর বৌদিকে ওই ভয়ঙ্কর কাজটা এক বার শিখিয়ে দিস তো?'

সরযূ হেসেছিল, 'হ্যারিকেন না জ্বেলে প্রদীপ জ্বালাবেন দাদা? ঝড় বাতাসকে ঠেকাবেন কি করে?'

'যেমন করে আমাদের পিতামহেরা ঠেকিয়েছেন।'

'তেনাদের আমলে ঝড়টা কম ছিল মেজদা', হেসে উঠেছিল সরযূ, 'এখন যে ঘরে বাইরে ঝড়! তা যাক ওটুকুর জন্যে আবার বৌদিকে কষ্ট পেতে হবে কেন? সরযূর হাতে কি ঘুণ ধরেছে?'

'বাঃ তুই কি বারমাস করে দিবি নাকি?'

'ক্ষয়ে যাব না। একদিন খানিকটা সময় নিয়ে বসলে ছ'মাসের কাজ মিটে যায়। আমি সলতে দিয়ে যাব।'

জিতু লাহিড়ী সহাস্যে বলেছিলেন, 'তার মানে মন্ত্রগুপ্তি! বিদ্যেটা অন্যকে শেখাবি না।'

সরযূও সহাস্যে উত্তর দিয়েছিল, 'তা যা বলেন। বিদ্যের মধ্যে তো ওই সলতে পাকানো, ঘর নিকোনো, সুপুরি কাটা, মুড়ি ভাজা, এই। সেটুকুর মহিমা ছাড়ি কেন? তবে বিজলী আলোর চোখে কেলে পিদ্দিম খাটবে তো? বইয়ের ওই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর দেখতে পাবেন?'

লাহিড়ী বলেছিলেন, বিজলী আলোয় চোখ ধেঁধে গেছে বলেই তো প্রদীপের কাছে পালিয়ে এসেছি সরযূ! এই প্রদীপের আলোতেই ছোট ছোট জিনিস দেখতে পাবো।'

আজও দেখল সরযূ, প্রদীপের কাছে এসে বসেছেন জিতু লাহিড়ী। ভাবলো, শুধু কি চোখ ধাঁধানো আলোর কাছ থেকেই পালানো মানুষটার? গৃহলক্ষ্মীটি যা, তাঁর কাছ থেকেও তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। উঃ! হাসতে যেন শেখেনি!

হ্যাঁ ওই কথাই ভাবে সরযূ। মিসেস লাহিড়ীর সেই কাচের গ্লাস ভাঙা শব্দের হাসি দেখবার সৌভাগ্য তো হয়নি তার। তারপর ভাবলো, কর্তার ধারে কাছে কি কখনো থাকতে নেই বাপু? এমন কিছু লজ্জাবতী নও। বুঝলাম উনি তোমাকে একেবারে আকাশ থেকে পাতালে টেনে এনেছেন, তবু একলা ঠেলে তো দেয়নি? সীতা যে বনবাসে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে!

তারপর ভুরু কুঁচকে আরও কিছু ভাবলো!

এবং একটু ভেবে হাঁক পাড়লো, 'মেজদা আজ বেরোন নি?'

জিতু চমকে মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকালেন। গেটের ওপরটা ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। দেখতে পেলেন না। কিন্তু গলাটা তো ভুল হবার নয়, এমন শাণানো আর ধারালো গলা কার আছে এখানে?

বলে উঠলেন, 'কে সরযূ নাকি? এমন সময়?'

'হ্যাঁ মেজদা? যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে তাই ভাবলাম একবার খবরটা নিয়ে যাই।'

'আয় আয়।' উঠে আসেন জিতু লাহিড়ী।

সরযূ হাঁক পেড়েই বলে, 'না মেজদা, এখন আর বসব না, ঘাটে যাচ্ছি।—বৌদি কোথায়?'

'আছেন কোথাও!'

'বাড়ি নেই?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, বাড়িতেই আছেন বৈকি!—তা' রাত হয়ে গেছে, এখন ঘাটে?'

সরযূ হেসে ওঠে, 'আমার আবার রাত! ভূতের আবার জন্মদিন! বসুন আপনি পড়াশুনো করুন, যাই।'

চলে গেল সরযূ আর ভাবতে ভাবতে গেল নিধুটা কোনো একটা গোলমাল করে ফেলেছে।

এক গা জল, ভিজে কাপড় সপ-সপিয়ে ঘরে ঢুকে, দড়ি থেকে গামছাখানা টেনে মাথা মুছতে মুছতে সরযূ দাওয়ায় মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়ে থাকা ভাইপো দুটোকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'এই অকাল

কুষ্মাণ্ড বামুনের গরু দুটো, এমন সময় অঙ্গ ঢেলেছিস যে?'

বলা বাহুল্য তারা সাড়া দেয় না। না দেবার কারণ, প্রয়োজন বিবেচনা করে না। পিসির এহেন মধুর সম্ভাষণেই তারা আজন্ম অভ্যস্ত।

কিন্তু সাড়া করে তাদের জননী।

যদিও ছেলেদের এই অসময়ে অঙ্গঢালা তারও খুব প্রীতিকর হয়নি। একটা কাজও ছেলেদের দিয়ে হয় না। ভোর থেকে সারাদিন বাইরে ঘোরে, আর সন্ধ্যেয় ফিরে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শোয়। তাদের মা যে বাপের বাড়িতে একটা চিঠি লিখে আজ তিনদিন ধরে খোসামোদ করছে ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিতে, সে সময় হচ্ছে না বাবুদের। এইমাত্র সেই কথা নিয়ে বকাবকি হয়ে গেছে।

তবু ননদের এই মন্তব্যে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে যায় তার। আর সেই দাহেই ছেলে দুটোরই পক্ষ সমর্থন করে বসে।

বলে, 'এ বাড়িতে আর কে কোন কাজটা সময়ে করেছে ঠাকুরঝি, তাই ওদের দুষছো? ওরাও তো উল্টে প্রশ্ন করতে পারে, 'এটাই কি পাড়া বেড়িয়ে ফেরার সময়? না ঘাটে ডুব দেবার সময়?'

'তাই নাকি? জোরে জোরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে সরযূ —'তোমার যে দেখছি সময় অসময় জ্ঞানটা বেশ জন্মেছে। তবে হিতাহিত জ্ঞানটাও জন্মালে আখেরে ভাল হতো এই যা! পিসি ছেলেদের দুটো সৎ উপদেশ দিতে এলে, জননী গর্ভধারিণী এলেন তার উপর থাবড়া দিতে।'

বৌ বেজার গলায় বলে, 'তা' পিসি যদি উঠতে বসতে উপদেশ ঝাড়ে, লাগে বৈকি! বলতেই হয় আপনার দিকে তাকিয়ে দেখ!'

'আহা মরে যাই, কী মাতৃস্নেহ! ওগো বুদ্ধিমতি, বলি পিসির আচার-আচরণে কি লাহিড়ীবাড়ির ধারা এগোবে পিছোবে? দোত্যি কুলে পেহ্লাদ তোমার গর্ভের ওই দুটিই যে এখন লাহিড়ীবাড়ির ধ্বজা। ভুবন লাহিড়ীর নামটা রাখতে, মুছতে, ওরাই!'

মাদুরে গড়িয়ে থাকা ছেলে দুটোর মধ্যে একটা ছেলে হঠাৎ হিহি করে হেসে ওঠে এ কথায়। বলে 'ভুবন লাহিড়ীর নাম না হয় মুছে

যাবে, শ্যাম লাহিড়ীর নামটা তো উজ্জ্বল থাকবে গো পিসি! রেড়ির পিদ্দিম জ্বেলে আজকাল আলো জ্বালাচ্ছেন যিনি ওনার ছেলেদের কথা জানো?'

সরযূ ভিজে কাপড়ের আগাটা নিংড়ে জল ঝরাতে ঝরাতে কড়াগলায় বলে, 'উনি বেঁচে থাকতে ওঁর ছেলেদের কথা জানতে যাবার আমার দরকার নেই জগা, কিন্তু পিদ্দিমের কথা বললি কেন? ওতে কি অপরাধ হল?'

অন্ধকার থেকেই কামড় দেয়, 'না অপরাধ আর কি? প্যাঁচাও তো কোটরে বসে থাকে, সে কি অপরাধী? তবে তুমি ওনাকে খুব একজন ভাবো কিনা তাই বলছি! উনিই বা লাহিড়ী বাড়ির কী মানটা বাড়াচ্ছেন? আমাদের অপেরা পার্টির জন্যে দল বেঁধে চাঁদা চাইতে গেছলাম, নাহক এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে এক ঘড়া উপদেশ গিলিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা ঠেকালেন। কি না আমি গরিব মানুষ, এর বেশি সামর্থ্য আমার নেই বাবা!—লজ্জায় মাথাটা কাটা গেল বন্ধুদের সামনে!'

সরযূ হেসে উঠে বলে, 'তাই বল, চাঁদা পাসনি বেশ তাই? তা' গরিব হয়েই তো এসেছেন উনি, সর্বস্ব দান ধ্যান করে এসে—.'

ছেলেটাও হেসে উঠে বলে, 'তা' এখন সেই গল্পই রটিয়েছেন, নইলে মান থাকবে কেন? সত্যি কথা বললে তো তেড়ে মারতে আসবে, ওনাদের সর্বস্ব দানে ধ্যানে যায়নি, গেছে মদে মাংসয়। নচেৎ এখনও ভেক নিয়ে বোষ্টম হয়ে—!'

'জগা! ছোটমুখে বড় বড় কথা কওয়ার অভ্যেসটা কমাবি?' তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে সরযূ, 'সাধে আর কুসঙ্গের দোষ কীর্তন করে শাস্ত্রে? যত রাজ্যের দুলে বাগ্দীর ছেলে হয়েছে সঙ্গী—'

জগার মা আর এক বার ফোঁস করে ওঠে, 'দুলে বাগ্দী তো এখন সব্বারই মাথার মণি হয়েছে গো? নিজেও তো এখন সেখান থেকে এলে? কে না যাচ্ছে সেখানে? শুধু যত দোষ, নন্দঘোষ! ঠিকই তো বলেছে জগা, দানধ্যানই যদি করতে বাসনা ছিল, টাকা-

গুলো নিয়ে এসে বাপ পিতামহর দেশে ছড়ালেই হতো। দেশটা যে দুঃখী-গরিবের দেশ তা তো আর অজানা ছিল না? সাহেবী-আনায় যদি অরুচি ধরেছে তো দেশটাকেই জমজমাটি করুন? কর্তাদের আমলের মতন দোল দুর্গোৎসব, অতিথিশালা, জলছত্তর, এসব করলেও হতো। তা নয় এক বস্তুরে একাগ্রে ধর্ম করছেন। এদিকে গিন্নী তো—'

সরযূ ভাজের যুক্তিটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। তবু অন্য নীতিতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, 'মানুষটা তোমার ভাসুর সেটা মনে রেখো বৌ—'

বৌ বেজারতম গলায় বলে, 'মনে খুবই রেখেছি! নিজে থেকে বলতেও কিছু আসিনি। তুমি আমার ছেলেদের ঠুকতে এলে তাতেই মুখ খুলতে হলো। তোমার মতন লতাপাতার সম্পর্ক তো নয়। জঠরে ধরেছি যে!'

'তা বটে!' সরযূ হেসে ওঠে, 'জঠর জ্বালা বড় জ্বালা! যাই বাবা ঠাকুর ঘরে মাথাটা একবার ঠুকে আসি, আমারও এদিকে জঠরজ্বালা প্রবল হয়ে উঠেছে—' বলে উঠোন পার হয়ে ঠাকুর ঘরের উদ্দেশে অদৃশ্য হয়ে যায় সরযূ।

মা চাপা গলায় বলে ওঠে, 'ওদের ইয়েতে তো পিসি একেবারে গদগদ! যা শুনে এলি তা' ফাঁস করে দিলি না কেন?'

'করতে গেলে বিশ্বাস করবে?' জগা একটা হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে বলে, 'বলবে তুই গেঁজেল তুই মাতাল—যাক গে বাবা, আমি ফাঁস না করলেও ফাঁস ঠিকই হবে! ধর্মের কল বাতাসে নড়বে।' বলে পাশ ফিরে ভাল করে শোয় জগা।

তা দেখা যাচ্ছে জগা আর যাই হোক সংসার অভিজ্ঞ। তাই পরদিন সন্ধ্যাতেই ধর্মের কল বাতাসে নড়লো।

কিন্তু সে তো সন্ধ্যায়। সকালের খবর আলাদা। সকালে সরযূ যখন ঠাকুরদের দোরে দোরে জল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন চমকে উঠলো পথে হঠাৎ জিতু লাহিড়ীকে দেখে।

দীর্ঘ উন্নত দেহ, পায়ে খড়ম, শাদা ধবধবে উত্তরীয়ে গাটা আবৃত, তবু আবৃত করতে পারেনি। সরযূ থমকে দাঁড়ালো। ভাবলো এই শিশিরভোরে উনি বেরিয়ে ফিরছেন?—না, আমি ভুল দেখছি? আসলে শ্যাম জ্যাঠার আত্মাটাই মূর্তি পরিগ্রহ করে তেঁতুলগোড়ায় এসেছে ঘর-পালানে ছেলেটাকে 'ঘরে' দেখতে। ছেলেবেলায় যখন এমনি অন্ধকার থাকতে শিউলিফুল কুড়োতে বেরোতাম, শ্যামজ্যাঠা ঠিক অমনিভাবে বেড়িয়ে ফিরতেন। অমনি দীর্ঘ শরীর, অমনি বেশ-ভূষা! অমনি চওড়া কপাল গড়িয়ে গেছে মাথার দিকে।

সরযূ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জিতু লাহিড়ীও সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর শান্ত প্রসন্ন গলায় বললেন, 'কি? সব ঠাকুরদের ঘাড়ে জল ঢালতে বেরিয়েছিস?'

সরযূও শান্ত হাসি হেসে বলে, 'ঘাড় আর পাচ্ছি কোথায়? ভট্‌চায্যির ঘুম ভাঙলে তবে তো সেই বেলা দশটায় 'বাছারা' ঘুম থেকে উঠতে পাবেন! আমি এই মন্দিরের চৌকাঠেই জল ঢেলে বেড়াই।'

জিতু লাহিড়ী গম্ভীর মৃদু হেসে বললেন, 'তাতে তোর মন মানে?'

'তা মানে!' সরযূ বলে, 'ঠাকুর তো আর সত্যিই ওদের তালা-চাবির মধ্যে বন্ধ হয়ে মশারির ভেতর পড়ে নেই।'

জিতু লাহিড়ী অবশ্য এই মেয়েটার কথায় অনেক সময়ই চমৎকৃত হন, তবু আজ এই সূর্য না ওঠা ভোরে ওই সদ্যস্নাতা বিধবা মূর্তির মধ্যে তিনি যেন একটা পরম বিশ্বাসের দীপ্তি দেখতে পেলেন। অভিভূত হলেন, চমৎকৃত হলেন।

জিতু লাহিড়ী যদি এখান থেকে না পালাতেন, যদি এখানেই থাকতেন, হয়তো জিতু লাহিড়ীর মেয়েরাও এমনি দীপ্ত বিশ্বাসের মুখ নিয়ে ঠাকুরতলায় এসে জল দিত। পবিত্রতার ছবি হয়ে ভোরের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তাদের বাবার চোখ মন সব জুড়িয়ে দিত!

কিন্তু জিতু লাহিড়ী নামের সেই ছেলেটা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। এখানকার শান্ত-ছন্দ জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেনি,

তাই তার মেয়েরা নরকের মধ্যে জীবনকে আহরণ করতে যায়, আর তার স্ত্রী নেশার বস্তুর অভাবে দেয়ালে মাথা ঠোকে।

সরযূ হাতের কমণ্ডলুটা একটা গাছের ফ্যাকড়া ডালে ঝুলিয়ে রেখে আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'একটু দাঁড়ান মেজদা, একটা প্রণাম করি।'

'সে কি, কেন?' সরযূ ততক্ষণে গড় হয়েছে।

উঠে মাথা তুলে বলে, 'গুরুজনকে প্রণামের আর কেন কি মেজদা। সর্বদাই করা যায়। তবে সত্যি বলতে, আছে এখন একটু কারণ। ওই দূর থেকে আপনি যখন আসছিলেন, হঠাৎ মনে হল শ্যাম জ্যাঠামশাই আসছেন বুঝি। ভাবলাম তাঁর আত্মা মূর্তি ধরে দেশ ঘাট দেখতে এলেন নাকি? তাই প্রণাম করতে ইচ্ছে হলো।'

সামান্য এই তুলনাটুকুতে হঠাৎ অতবড় দীর্ঘদেহ মানুষটার ভিতরে ভূমিকম্পের মত আলোড়ন উঠল কেন কে জানে। কে জানে কেন চোখ দুটো ভিজে উঠল। গলার স্বরেও সেই কাঁপনকে ঠেকাতে পারলেন না জিতু লাহিড়ী। বললেন, সত্যি বলছিস? বাবার মত দেখতে লাগলো আমায়?'

'অবিকল। ছেলেবেলায় ফুল তুলতে বেরোতাম তো অন্ধকার থাকতে, আর দেখতাম ওই দীঘির ওপাড় থেকে বেড়িয়ে ফিরছেন জ্যাঠামশাই, মনে হতো যেন রামায়ণ মহাভারতের গল্পের মুনি ঋষি কেউ আসছেন—।'

'সরযূ!' জিতু লাহিড়ী কম্পিত গলায় বলেন, 'অতটুকু বয়সে ওই কথা মনে হতো?'

'তা' হতো বাপু। তবে—।' সরযূ এবার একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'তবে বাপু হক কথা বলবো, আমাদের বাবা জ্যাঠারা ছিলেন যেন দুর্বাসা ঋষি। বিশেষ করে শ্যাম জ্যাঠামশাই। দেখলেই হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরতো। দূর থেকে দেখে ভক্তি জাগতো প্রাণে, কাছে আসবার আগেই দে ছুট। কোঁচড়ের ফুল থাকল আর গেল।'

জিতু লাহিড়ীর কণ্ঠের কাঁপনটা থেমে যায়। সহজ গলায় হেসে

বলেন, 'তার কারণ কি জানিস সরযূ, ওঁদের চারিধারে যারা ছিল তারা ওঁদের থেকে অনেক নীচুস্তরের। ওঁরা সঙ্গী পেতেন না। তাই ওঁদের ভিতরের দীপ্তি আলো হয়ে যত না ফুটেছে, আগুন হয়ে দাহ ছড়িয়েছে তার বেশি।'

সরযূ আস্তে বলে, 'আমার অবিশ্যি বলাটা শোভা পায় না, তবু বলি নীচুদের উঁচুতে টেনে তোলাই তো মানুষের কাজ মেজদা!'

'সে কি সম্ভব সরযূ?'

'কেন সম্ভব নয় মেজদা! মানুষেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই যে আপনি এলেন, এদের থেকে অনেক দূরের মানুষ হয়ে রইলেন, তা—নাহলে—'

জিতু লাহিড়ী ব্যথিত স্বরে বলেন, 'আমি তো দূরের মানুষ হতে আসিনি সরযূ, ওদের কাছাকাছিই তো থাকতে এসেছি। ওদের সকলের মত গরিব হয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে—'

সরযূ হেসে ওঠে, 'ওই ওইখানেই হয়েছে বিপদ। এরা দারিদ্র্য বোঝে, ত্যাগটা তেমন বোঝে না। ভাবে এটা আবার কি! অবস্থাপন্নের কাছে এরা অনেকটা প্রত্যাশা রাখে। আপনি নিজে হবিষ্যান্ন করুন, কৃচ্ছ্রসাধন করুন, সে ভাল, কিন্তু জাঁকজমকটা থাকলেই মঙ্গল ছিল। দেশগ্রামে পিতৃপিতামহদের মতন রবরবা দেখাতেন, দোল দুর্গোৎসব করতেন, অতিথশালা খুলে দিতেন, গরিবের কন্যেদায়ে সাহায্য করতেন, এরা আপনাকে নিজেদের মানুষ মনে করতো।'

জিতু লাহিড়ী সংশয়ের স্বরে বলেন, 'তাই কি ঠিক সরযূ!'

'আমার আবার ঠিক অঠিক জ্ঞান! আপনিও যেমন! যা মনে হয় বললাম!' সরযূ নিজেকে নস্যাৎ করে দিয়ে কথাটা শেষ করে— 'দারিদ্র্যে যাদের হাড় ভাজা-ভাজা, তারা 'দারিদ্র্য ব্রতর মাহাত্ম্য বুঝবে এ আশা বৃথা। পুজো পার্বন না করুন, দেশের মাটিতেই যদি টাকা ছড়াতেন, ভাল। মাটিও তো যুগযুগান্তর ধরে হাঁ করে পড়ে আছে প্রত্যাশা নিয়ে। ওই যে দেখুন না—'

সরযূ আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখায় যেখানে গরুর গাড়ির চাকা

মাটির বুকে গভীর বিদারণ রেখা এঁকে চলেছে বছরের পর বছর। বর্ষায় কাদায় পা বসে যায়, 'খরা'য় মাথায় ধুলো ওঠে।

সরযূ আবার বলে, 'এ 'হাঁ' বোজাবার খাদ্য তো শুধু টাকা। বস্তা বস্তা টাকা ঢালতে পারলে তবেই এ হাঁ বুজবে। মানুষ, মাটি সবাই যেখানে হাঁ করে আছে, সেখানে কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শ দাঁড়াতে পারে না মেজদা! ওরা হতাশ হয়ে বলছে, ভেবেছিলাম—দূর ছাই কি গল্প ফাঁদলাম এখন সকাল বেলা! পাগল ছাগল সরযূর কথা ধরবেন না। কতদূর বেড়িয়ে এলেন বলুন ?'

'সেই প্রায় স্টেশন অবধি !'

'স্টেশন অবধি ? বলেন কি! শুনি তো দুখানা গাড়ি ছিল, এত হাঁটতে শিখলেন কখন ?'

'আমার বিষয় এত সব শুনলি কখন বলতো ?' জিতু লাহিড়ী ধীরে ধীরে বলেন, 'আমি তো কই তোদের এখানের কোনো খবর কখনো—' বলেই থামেন জিতু লাহিড়ী। আরো আস্তে বলেন, 'হ্যাঁ কিছু খবর পেয়েছি। গুণদা সবকাব মাঝে মাঝে কিছু কিছু খবর পরিবেশন করতো, তা লাহিড়ী সাহেবের ওসব বাজে খবরে কান দেবার অবকাশ ছিল কোথায় ?'

সরযূ চকিত হয়ে তাকায়। ওই গভীর অনুতাপের ছবির দিকে তাকায়। আস্তে বলে, 'ভুলে ঠিকেই তো মানুষ মেজদা! আচ্ছা আপনার অনেক দেরী কবিয়ে দিলাম। সকালবেলা আপনাকে দেখে বড় ভাল লাগল, তাই খানিক বকবক করলাম। চলি !'

গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটা আবাব গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় সরযূ।

জিতু দাঁড়িয়ে থাকেন। আর হঠাৎ একটা অবাস্তব ছবি কল্পনা করতে থাকেন।...ভোরের সুষমা গায়ে মেখে, লালপাড় গরদশাড়ি পরে বেবি লাহিড়ী মন্দিরের দরজায় দরজায় জল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঘাসের আগায় আগায় গাছের পাতায় পাতায় শিশিরের মুক্তো, সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধবাহী বাতাস ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে সমস্ত মালিন্য,

সমস্ত ক্লেদ। ছবিটা ফুটল না। ঝাপসা হয়ে গেল।

হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী নিজের মনে। বেবি লাহিড়ী অন্তত আরো দুঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠবেন। বিশ্রস্ত চুল, বিশ্রস্ত বাস, চোখের কোলে গাঢ় কালি, এমনি একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিছানার কাছে একটা চৌকিতে গত রাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টটা পড়ে আছে, হয়তো বা সেটাকে ঘিরে মাছি উড়ছে, সেই চৌকিরই একধারে একটা কেরোসিন স্টোভে চা বানিয়ে নিয়ে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন বেবি লাহিড়ী পেয়ালার পর পেয়ালা।

রাঁধুনী মেয়েটা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করবে কি রান্না হবে, বেবি লাহিড়ী বিরক্তি বিজড়িত গলায় বলবেন, 'যা খুশি করগে। যা রাঁধবে সবই তো অখাদ্য হবে।'

তারপর আঁচল লুটিয়ে ঘুরে বেড়াবেন এঘর ওঘর, দেখবেন পুরনো বাক্স প্যাঁটরাগুলো খুলে খুলে, দেয়াল আলমারিগুলো টেনে টেনে, উইয়ে খাওয়া পুরনো শাল দোশালা, চেলির শাড়ি, টেনে বার করে সব আছড়ে আছড়ে ফেলবেন মাটিতে। তারপর বলবেন 'ন্যাষ্টি।'

স্নান! সে তো সেই ভাত খাবার সময়। তার আগে নয়।

এমনি বাসি কাপড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন উঁচু কুলুঙ্গী থেকে লক্ষ্মীর কৌটো পেড়ে বসেছিলেন বরুণা! জিতু লাহিড়ীর মায়ের শাশুড়ীর কি দিদিশাশুড়ীর হাতে পাতা লক্ষ্মী! তার রূপোর গাছ কৌটো, রূপোর প্যাঁচ্যা, বেতের কাঠা!

গাছ কৌটোগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, 'ভেরি নাইস্ তো', বলে ঝিয়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছিলেন বরুণা, মেজে চকচকে করে দেবার জন্যে। ঝিটা দেখে হাঁকপাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ মা ইকি কাণ্ড! এ যে লক্ষ্মীর কৌটো, এ তুমি আমায় মাজতে দেছ সকড়ি বাসনের সঙ্গে!'

ওর হৈ চৈ-তে জিতু এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

পঞ্চাশ বছর এই তেঁতুলগোড়া ছাড়া, তবু জীবনের একেবারে

গোড়ার দেখা বস্তুগুলো কি একেবারে ভুলে যাবার? এ জিনিস চিনতে পেরেছেন বৈকি জিতু।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কি রে দুগগা?'

'এই দেখুন বাবু, মা কী কাণ্ড করেছে, লক্ষ্মীর কৌটো মাজতে দেছে আমার কাছে ছিষ্টি সকড়ির সঙ্গে—' বলে দুগগা সভয়ে তাকিয়ে থাকে সেইদিকে।

'বরুণা, এটা কী হচ্ছে?' জিগ্যেস করেছিলেন জিতু।

বরুণা অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলেন, 'বুঝতে পারছি না হঠাৎ এত চমকাবার কি হলো? জিনিসগুলো ময়লা হয়ে গিয়েছিল, সাফ করতে দিয়েছি, এই তো ব্যাপার!'

'জিনিসগুলো কি, তা দেখেছ?'

'দেখবো না কেন? রুপোর বাসন!'

'বাসন? এটা বাসন?'

'বাসন নয় কৌটো। মশলা রাখবার বা পানের, হবে কিছু!' বরুণা ঠোঁট উল্টোন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার পায়ের নীচে ভূমিকম্প হচ্ছে!'

জিতু লাহিড়ী এই দুঃসাহসিক স্পর্ধার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলেন, 'মনে হচ্ছে? অনুভব করছো? আশ্চর্য অনুভূতিসম্পন্ন মহিলা তো? এগুলো কি তা জানো! আমার ঠাকুরমার লক্ষ্মীর কৌটো, বুঝলে? লক্ষ্মীর কৌটো! হৃদয়ের সমস্ত নিষ্ঠা আর পবিত্রতা দিয়ে এগুলি রক্ষা করে গেছেন তাঁরা, পুজো করে গেছেন জীবনের শেষ দিনটি অবধি। আমার মা, তাঁর শাশুড়ী, তাঁর শাশুড়ী,—অবিচ্ছিন্ন একটা নিষ্ঠার ধারা। সে ধারা থমকে গিয়ে ওইখানে আশ্রয় নিয়েছিল নতুন ধারার ধারকের অভাবে। তুমি সেই পবিত্রতাকে হত্যা করলে, সেই অক্ষয় সঞ্চয়কে নষ্ট করলে!— ঠিক করেছ, তোমার উপযুক্ত কাজই করেছ। তবে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, ওগুলো হঠাৎ মেজে সাফ করবার বাসনা হল কেন তোমার?

বেছে সাফ করে ফেলাই তো তোমার উপযুক্ত কাজ হতো। যা করছো! যার জন্যে এই লাহিড়ী বাড়ির কড়ি বরগা থেকে চোরা-কুঠুরী পর্যন্ত কেবল হাঁটকে বেড়াও।'

বরুণা আরক্তমুখে বলেন, 'কী? কী বললে?'

'যা বললাম সেটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগেনা! তুমি—'

'বাবু এগুলান কী হবে?' দুর্গা প্রশ্ন করে।

জিতু গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'সকড়িতে যখন নেমেছে, মেজে সাফ করে রাখ। লক্ষ্মীপুজো তো কেউ করবে না আর? এখন কেবল অলক্ষ্মীর পুজো!'

বরুণা তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। ঠিকই বটে, ভুল হয়েছিল তাঁর। মায়ায় পড়ে রাখতে গিয়েছিলেন, ওর মধ্যে রুপো বলতে যা কিছু ছিল সরিয়ে ফেলাই উচিত ছিল। কী কুৎসিত গ্রাম্য সেন্টিমেন্ট! লক্ষ্মীপুজো! তার জন্যে রাগে দুঃখে কান্না বেরিয়ে যাচ্ছে সাহেবের।

বরুণা লাহিড়ী যদি সেই লক্ষ্মীপুজোর-ঐতিহ্যের ধারক হয়ে ওই কৌটোগুলো নিয়ে ধান কড়ি এইসব সাজিয়ে 'খেলা' করতে বসতেন, তবেই বোধকরি ওই উন্মাদটা দু'হাত তুলে নৃত্য করতো।

ছি ছি! এ আর কিছুই নয়, ওই হাড়পাজী মেয়েটার প্রভাব! বোন! ভাই! অমন ভাইবোন ঢের দেখেছেন বরুণা। ওইটার মোহে পড়েই—নইলে এত এ রকম কক্ষণো হত না! কিছুতেই না। মানসিক একটা ধাক্কা খেয়ে খানিকটা বিকৃতি এসেছিল, এখানের অসহনীয় কষ্টের ধাক্কায় সে বিকৃতি পালাতে পথ পেত না, যে দেশের মানুস সে দেশে পালিয়ে বাঁচতেন। অন্ততঃ কলকাতায় থাকতেন।

কিন্তু ওই সরযূর ছলাকলা, এখানে একেবারে আটকে ফেলল ওকে। যা অসুবিধে হচ্ছে, বোন এসে তার বিহিত করে দিচ্ছেন। দু'বেলা এসে হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে বসছেন! 'মেজদা, মেজদা, মেজদা!' মদ ছেড়ে বুড়োবয়সে এখন এই 'ধেনো'য় মজছেন?

ওই সরযূটাই তো বরুণাদের আসার পর বলেছিল একদিন,

এইবার সামনের ভাদ্দরে বৌদিকে দিয়ে লক্ষ্মীপুজো শুরু করান মেজদা, ভিটের লক্ষ্মী কতদিন উপোসী হয়ে পড়ে রয়েছেন। সাজ-সরঞ্জাম সবই রয়েছে, শুধু নতুন ধান বদলে—'

সেদিন অবশ্য হতভাগাটা বলেছিল, 'তোর বৌদি করবে লক্ষ্মী-পুজো? তা হলেই হয়েছে!'

কিন্তু নির্ঘাৎ সেদিনেব সেই কথাটাই ওর মাথার মধ্যে পুঁতে গিয়েছিল। আজ তাই সেই পুজোব আসবার দেখে ফেন্ট হয়ে পড়ে যেতে বসেছিলেন। বরুণার তো মনে হচ্ছিল 'স্ট্রোক' হবে নাকি! প্রেসার তো অতিরিক্তই ছিল।

না, না, না—এইভাবে টিকে থাকতে পারবেন না বরুণা। এ কী জীবন একটা? খোঁয়াড়ের শূয়োরের মত মাথা গুঁজে পড়ে থাকা, আর যা হোক ছাইপাঁশ দিয়ে পেট ভরানো, তাব বাইরে আর কিছু নেই! তার ওপর আর কোনো কিছুর আশা নেই!

মানুষে বাঁচতে পারে এখানে?

বরুণা পালাবেন। যেমন করেই হোক পালাবেন এখান থেকে। পালিয়ে বরুণার সেই পাজী মেয়ে তিনটের কাছে গিয়ে বলবেন, 'তোদের কাউকে নিতেই হবে আমার ভার! কেন নিবি না? বিধবা মায়ের ভার মেয়েরা নেবে না তো কে নেবে? মনে কর মা বিধবা হয়েছে।'

একজনের বাড়ি চেপে থাকা সম্ভব না হয়, তিন মেয়ের সংসারে পালা করে থাকবেন বরুণা।

সে জীবন যে খুব একখানা গৌরবের, তা বলছেন না বরুণা, তবু সেটা জীবন তো! এমন অচল অবস্থা তো নয়! কবরে পুঁতে যাওয়া ফসিলের মত বোধশূন্য হয়ে পড়ে থাকা নয়।

তারপর—গিয়ে পড়লে—বরুণার বন্ধুরাও কি একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে? বরুণা চলে আসার পর অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে না কি তারা? হয়তো হচ্ছে তাই! বরুণা ফিরে গেলেই আবার নিজের সেই পুরনো জায়গাটি ফিরে পাবেন।

বরুণার বর্মি জামাইটা তো যথেষ্ট 'গায়ে পড়তে' এসেছিল। তখন

যদি বরুণা তাকে এমনভাবে 'এড়িয়ে তাড়িয়ে' না দিতেন, হয়তো সেইটাই বরুণাকে মাথার মণি করে সংসারে পুষতো। আর বরুণাও সেই আসনটি বজায় রাখতে পারতেন। বরুণার ওই বড় মেয়েটা তো বোকার ধাড়ি, বোকাকে নিয়ে কে কতদিন সুখে থাকতে পারে? বরুণার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, ক্ষুরধার বাচন, রুচি পছন্দ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুতে আকৃষ্ট হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়তো জামাইটা।

তখন ওকে অত অগ্রাহ্য না করলেই হতো।

চলে গিয়ে ওর ঘরেই প্রথম জায়গা সংগ্রহের চেষ্টা করবেন বরুণা। কৃতকার্য না হন, সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজী সোমাটার কাছে গিয়েই বলতে হবে, আমার গহনাগুলোর দাবিতেই অন্ততঃ আমার থাকার অধিকার আছে তোর সংসারে।

'মা' বলে ওকে ভালবাসতো একমাত্র ওই মেয়েটাই। সেটা কি একেবারেই ধুয়ে-মুছে যাবে? বিধবার মত মাকে দেখেও মমতা আসবে না?

আর কোথাও যদি জায়গা না জোটে, ঠেলে উঠবেন সেই তাঁর বাপের বাড়িতে। সুইসাইডের ভয় দেখাবেন, মাকে যাচ্ছেতাই করে শুনিয়ে দেবেন। যে মা-টি তার নিজের স্বামীর হাড় ভাজা ভাজা করেছিলেন আর মেয়েকে স্বামীভক্তি শেখাতে এসেছিলেন।

একখানা চৌকিতে লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকা ছাড়া সারাদিন বিশেষ কিছুই করেন না বরুণা। তেমনি শুয়ে শুয়েই ভাবতে লাগলেন, জানি সেই থাকায় সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না, তবু তো সকালবেলা ট্রে করে চা আসবে সামনে। সাজানো সুন্দর টেবিলে ভাত খেতে বসতে পাবেন, আর সে ভাতের উপকরণ হিসেবে দুখণ্ড মাংস, কি এক টুকরো মুরগী জুটবে! আর যদি অসহ্য অসম্মান আসে?

সত্যি সত্যি সুইসাইড করে দিল্লির সমাজে মা-ভাই আর মেয়ে জামাইদের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যাবেন। এখানে আর কিছুতেই নয়।—

মরতে ইচ্ছে তো অহরহ করছে। কিন্তু এখানের এই কুৎসিত সমাজে মরতেও ঘৃণা। এখানে কেই-বা বুঝবে বরুণা লাহিড়ীর দুরন্ত

যন্ত্রণা? আর মরবেনই বা কোন উপায়ে? জলে ডুবে? কেরোসিনে পুড়ে? গলায় দড়ি দিয়ে?

নিজের এই বীভৎস পরিণতির কথা ভাবতেই পারেন না বরুণা, ছটফটিয়ে ওঠেন। ছটফট করেন সন্ধ্যা আসার অপেক্ষায়।

বরুণার সেই লক্ষ্মীর গাছকৌটো দুর্গাকে মাজকে দেওয়ার গল্পটা এ বছরের সবচেয়ে রসালো গল্পের আর একটা নতুন সংযোজন হয়েছিল। যে যেখানে ছিল, গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কারণ দুর্গা তো আব সে কথা বলতে কাউকে বাকি রাখে নি।

শুধু যে মহিলা-সমাজই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, পুরুষরাও সবাই জটলা করেছিলেন জিতু লাহিড়ীর 'মেম স্ত্রী'র এই কল্পনাতীত দুঃসাহসে।

এবাড়ি ওবাড়ির বুড়ো কর্তারা, যাঁরা এখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারীর সুখস্বর্গচ্যুত হয়ে ঘরে এসে বসেছেন, তাঁরাই এই আলোচনায় প্রধান, যাঁরা চিরকাল এ গ্রামে আছেন, তাঁরাও আছেন। সকলের মুখে এক কথা—'জীবনে কখনো শুনিনি!'

কিন্তু সে তো সেদিন। গতকাল? যার জন্যে সরযূর ভাইপো দার্শনিক ভঙ্গিতে বলেছিল 'ফাঁস আপনিই হয়ে যাবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়বে!' আর যে কথাটা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরদিন সন্ধ্যায়। সেই খবরটা তেঁতুলগোড়ায় মজাদার অথবা রোমাঞ্চকর হয়ে এসে দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছিল একটা ঘৃণ্য ভয়ের মূর্তিতে।

পুরুষরা বুড়ো শিবতলায় জমায়েত হয়েছিলেন, একত্রে ঘোষণা করেছিলেন, 'এ চলবে না, এ চলতে দেওয়া হবে না!'

'এ কী মগের মুলুক পেয়েছে নাকি?' লাহিড়ীদের এক দৌহিত্র বংশের বংশধর অনন্ত ভাদুড়ী দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যা ইচ্ছে করবে? সমাজপতিরা না থাকুন আমরা তো আছি!'

অনন্তর এক ভগ্নিপতি চিরদিন ঘরজামাই, বয়েস কালে তাঁর নিজের [illegible] অবধি ছিল না, তিনি এসে আসরে দাঁড়ান, মৃদু হাস্তে

বলেন, 'লাহিড়ী বাড়ির লক্ষ্মীর কৌটোর তাহলে এতদিনে সদগতি হল। ভোলা বাগদির ঘরে গিয়ে উঠল।'

অনন্ত ধমকে ওঠেন, 'তুমি থামো তো বিপিন, এটা হাসি মস্করার কথা নয়। বংশ মর্যাদার কথা। লাহিড়ী বাড়ির সঙ্গে রক্তের যোগ আছে আমার, আমি কখনো ছেড়ে কথা কইব না। বাইরে বাইরে যা করতিস করতিস, কেউ দেখতে যেত না। ভিটেয় বসে এত অনাচার করবে? সাতপুরুষের বাস্তু দেবতা নেই ও ভিটেয়? কথায় আছে একের পাপে শতের দণ্ড! এ অনাচার চলতে থাকলে এই তেঁতুল-গোড়া গ্রাম উচ্ছন্ন যাবে না?'

শরৎ ঘোষ বলে ওঠেন, 'ভোলাটাও কম হারামজাদা নয়, ওটাকে ডাকিয়ে এনে আগাপাস্তলা জুতিয়ে লাট করা হোক।'

'সেকাল আর নেই শরৎ—' শ্রীপতি দত্ত বলে ওঠেন, 'এখন ছোটলোকরা আর দাঁড়িয়ে জুতো খায়না, উল্টে জুতো মারে। বলবে, 'আমার কি দোষ, উনি যদি—'

'ভুবন লাহিড়ীর মেয়েটা সর্বদা ও বাড়ি যাতায়াত করে না?' নিবারণ মুখুয্যে বলেন, 'ও জানে না এ খবর? গাঁ সুদ্ধ সবাইকে তো শাসন করে বেড়ায়—'

'জানে না টের পায়নি মনে হয়।'

'টের পায়নি? শুনছি তো এসব তলে তলে অনেকদিন ধরেই চলছে—'

'গোপনে গোপনে চলছিল। এই আমরাও তো গাঁয়ে রয়েছি, আমরাই কি টের পেয়েছি? ও মেয়ে যে খাণ্ডার, টের পেলে লাহিড়ী গিন্নীকে আস্ত রাখতো নাকি?—গোপনেই থাকতো, যদি না ভোলার বৌ ফাঁস করে দিত! সেই 'গাছ কৌটো নিয়ে আহ্লাদ করে দেখাতে গিয়েছিল নিধের বৌয়ের কাছে, তাতেই—'

'যাক যা হয়েছে তা হয়েছে, আর হতে দেওয়া হবে না—' অনন্ত ভাদুড়ী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'জিতু মামাকে গিয়ে 'কড়কে' দিতে হবে—'

'লাহিড়ী জানে?'

'জানে না, এ আবার হয় নাকি!'

'আমার তো মনে নেয় না। মাথার গণ্ডগোল থাক যাই থাক, লোকটা দেব চরিত্র। নিষ্ঠা কাষ্ঠা, আচার বিচার—সে যে জেনে শুনে চুপ করে থাকবে, এ মনে হয় না।'

'এঁটে উঠতে পারে না। পরিবার তো নয়, যেন শত্রুপক্ষ! শুনতে পাই তো—'

আরো অনেক আলোচনার পর শেষ সাব্যস্ত এই হয়, জিতু লাহিড়ীকে জানিয়ে সমঝে দিতে হবে, গ্রামে বসে এসব অনাচার চলবে না।

এই সভারই ধারে কাছে সরযূর ভাইপো। জগু ছিল, আর খবরটা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তেঁতুলগোড়ার তেরশো সত্তর সালের নতুন খবর জিতু লাহিড়ী যে এতখানি ভয়াবহ আর ক্লেদাক্ত খবরের জোগান দেবেন, একথা কেউ ভাবে নি। তবু গত কালও সরযূ এ খবরটা ঠিক শোনে নি। যেটুকু শুনেছিল নিধু বাগদীর মুখে, বিশ্বাস করেনি। বলেছিল 'ছোটমুখে বড় কথা বলিসনে নিধে!' আর আজ সকালে জিতু লাহিড়ীকে প্রণাম করে বলেছিল, 'অবিকল শ্যাম জ্যাঠামশাই!'

জিতু লাহিড়ী যখন বাড়ি ফিরলেন, বকুণা তখনও শুয়ে। একবার বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন, তারপর চলে গেলেন বড়দালানে। যেখানে পূবের রোদ এসে পড়েছে। আর প্রকাণ্ড দুখানা হাতাওয়ালা বড় একটা আরাম কেদারা পড়ে আছে বেতছেঁড়া অবস্থায়।

এই চেয়ারটাতেই জিতু লাহিড়ীর জ্যাঠামশাই কালী লাহিড়ী বসতেন। জিতুরা তখন এ দালান দিয়ে হাঁটতেন না। চেয়ারটায় বেত নেই, হাতাটার উপর বসলেন জিতু, পূবের জানালার দিকে মুখ করে। সরযূর কথাটা মনে পড়ল।...'পিতৃ পিতামহের মত রবরবা দেখাতেন, দোল, দুর্গোৎসব করতেন, অতিথিশালা খুলে দিতেন, এরা আপনাকে বুঝতো। এরা দারিদ্র্য বোঝে, 'দারিদ্র্য ব্রত' বোঝে না।'

জিতু লাহিড়ী কি তাহলে ভুলই করলেন? ভুলই করছেন? ওই

বেতছেঁড়া চেয়ারটা সেই ভুল দেখে ব্যঙ্গ হাসি হাসছে?

জিতু যে সমস্ত পৃথিবীতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্রামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে এলেন, এ হয়তো তাঁর পিতা-পিতামহের আত্মার কারসাজি! হয়তো তাঁরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন, এ বাড়িতে আবার পূজোর বাজনা বাজবে, আবার ঝাড় লণ্ঠনের আলো জ্বলবে, আবার হাজার মানুষের পাত পড়বে, এই আশায়।

হাজার!

তা তিনদিনে হাজারের বেশি বৈ কম পাত পড়ত না। সপ্তমীতে বাছা বাছা ব্রাহ্মণ-সজ্জন, আর বিধবা মহিলারা, অষ্টমীতে গ্রাম ঝেঁটিয়ে, আর নবমীতে কাঙাল গরিব দুলে বাগদী ইতরজন!

নিতান্ত অজ্ঞান শৈশবে গ্রাম ছাড়েননি জিতু। বছর বছর পূজো দেখেছেন। পূজোর সেই বাজনাটা যেন শুনতে পেলেন জিতু। দূর থেকে আসছে যেন। আসছে? না চলে যাচ্ছে। বাজনার স্বরূপটা কি? আবাহনের, না বিসর্জনের? জিতু লাহিড়ীর মনে হল—না, এ যেন আবাহনের!

ঢাকী ঢুলিদের সঙ্গে একদল ছেলেও আসছে দুলে পাড়ার দিক থেকে, ধুলিধূসরিত পা, খালি গা, ছোট করে ধূতি পরা। ওরা কিন্তু ঢাকী ঢুলীদের কেউ নয়। লাহিড়ীদের, মৈত্রদের, ভাদুড়ী, চক্রবর্তী, মুখুয্যেদের। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আসবে, এই গৌরবের আশায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দল বেঁধে।

ওদের মধ্যে একটা ছেলেকে চিনতে পারেন জিতু। ধবধবে রঙ, পাতলা লম্বা চেহারা, চুলগুলো ঈষৎ কটা। ও হিতু, শ্যাম লাহিড়ীর বড় ছেলে। জিতুর দাদা।

ছেলেবেলা থেকে ও যেন কেমন শান্ত আর অন্যমনস্ক ছিল। জিতুর মত উদ্ধত, অবিনয়ী, দুরন্ত নয়। জিতু দাদাকে বলতো 'ভাবুক!' কিন্তু এই পূজোর সময় দাদাও যেন তার শান্ত চেহারার খোলস ফেলে মেতে উঠতো। দিনের পর দিন ঠাকুরদালানে গিয়ে বসে থাকতো, ঠাকুর গড়া দেখতে। বাজনাদারদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো,

আর বামুনের ছেলের কেন ঢাকে কাঠি ছোঁয়াতে নেই, তাই নিয়ে প্রশ্ন করতো সিন্ধু ঢুলেকে। বাজনাদারদের সর্দার ছিল যে।

ওই ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন জিতু।

আরও একটা ছেলেকে দেখছেন। জিতু নামক ছেলেটার হাত ধরে ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দালানের সামনে, ঠাকুরের ঢাকা-খোলা দেখবার আশায়।

বাজনাদাররা এসে বাজনা বাজাতে শুরু করলে তবে বাড়ির কর্তা ঠাকুরের ঢাকা খোলেন, যে ঢাকাটা প্রতিমা গড়া শেষ করার পর কুমোররা দিয়ে যায়—কোরা লালপাড় শাড়ি একখানা। কার্তিক, গণেশের মাথা বরাবর তার কোণগুলো ঝুলে থাকে। এ শাড়ি বাজনদাররা পাবে।

ওই ছোট ছেলেটা যার নাম 'রিতু' সে ওই কাপড়টা হাতে করে ছুঁড়ে দেবে। এটা তার দাবি। শাড়িটা মাথায় জড়িয়ে ওরা নাচবে, সেই নাচের সঙ্গে রিতুও নাচবে।

জিতু লাহিড়ী কি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখছেন? নইলে তিনি ওই ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন কেন? ঘরের দেয়ালে যে গ্রুপ ফটোটা ঝুলে রয়েছে কালের ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে, তার মধ্যে ওরা বেঁচে আছে। জিতু লাহিড়ীর স্মৃতির মধ্যে নেই।

তবু মনে পড়ছে যেন, ঘরপালানে ছেলেটা ঘরের কথা যদি কখনো ভেবেছে তো ওই ছোট ছেলেটার কথাই ভেবেছে।

তারা আর কেউ নেই। ছোট বড় কেউ না।

এই লাহিড়ী বংশে এখন শুধু জিতু লাহিড়ীই আছেন। যিনি লাহিড়ী বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘকাল অনাচারে অনিয়মে কাটিয়ে এখন আচার নিয়মের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বাঁধতে এসেছেন, জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে।

তবু কি পিতা-পিতামহরা বংশের এই একমাত্র সন্তানের দিকে তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন? আবার এ ভিটের পুজোর বাজনা শুনবেন বলে কান পেতে আছেন?

কিন্তু সেই দেবী প্রতিমাকে বরণ করবে কে? বরুণা লাহিড়ী?

জিতু লাহিড়ীর মা-জ্যেঠাইমাকে কি দেখতে পেলেন জিতু লাহিড়ী? গাঢ় বেগুনী রঙা বেনারসী পরা ঘোমটাঢাকা দুটি মূর্তি? ঠাকুর বরণের সময় যাদের হাতের বাজু তাবিজের ঝুমকোগুলো ঝুলতো, আর প্রদীপ শিখা পড়ে ঝকমক করে উঠতো।

সেই সব তাবিজ বাজুবন্ধ কোথায় গেল? আর সেই মস্ত রুপোর বাটিটা? যাতে করে পিটুলি গুলে জিতুর মা সারা বাড়িতে আলপনা দিয়ে বেড়াতেন? জিতু কেন সকালের আলোয় স্বপ্ন দেখবেন? কেন ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে পিটুলির লতাপাতা দেখতে পাবেন?

রোদে কি চোখে বিভ্রান্তি এসেছে?

উঠে পড়লেন জিতু লাহিড়ী। আর একবার বরুণার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জেগেছেন বরুণা। যথারীতি এখন কেরোসিন স্টোভটায় চায়ের জল চাপিয়েছেন। চুলগুলো এলোমেলো, শাড়িটা বিশৃঙ্খল, ব্লাউসের বোতামগুলো আধখোলা, কাঁধের আঁচলটা পাশে লুটোচ্ছে। কেরোসিন শিখাটার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন স্থির হয়ে।

বরুণা লাহিড়ীও কি জিতু লাহিড়ীর মত অতীতের স্মৃতির মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন? যন্ত্রণা বোধ করছেন?—কী সেই স্মৃতি? সুন্দর টেবিলে সুন্দর ট্রে-বাহিত জাপানী ফুলকাটা পেয়ালায় সোনালা চা? সেই অতীতকে যদি স্বপ্ন দেখেন বরুণা, সে দেখা কি খুব একটা অপরাধ?

অন্যদিন হলে হয়তো জিতু লাহিড়ীর ঈষৎ ব্যঙ্গকণ্ঠ ধ্বনিত হতো, 'ঘুমটা তোমার এখানে এসে পর্যন্ত বেশ গভীর হচ্ছে, তাই না বরুণা?'

আজ আর হল না। সরে গেছেন, চোখ সরিয়ে নিলেন।

ভাবলেন, স্নানের আগে সকালবেলা মেয়েরা কী কুৎসিত!

গেটের সামনে একটা বকুল গাছ আছে, তার তলায় অজস্র ফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। দেখে অবাক হবার নয়, তবু যেন ভারী অবাক হলেন জিতু লাহিড়ী। এ বাড়িতে কেউ ছিল না, তবু গাছটা ছিল। এমনি অকৃপণ ঔদার্যে ফুল দিয়ে আসছে বছরের পর বছর। তাকিয়ে

দেখছে না, কেউ নিল কি নিল না।

এগিয়ে আসছিলেন মুঠোয় করে ছুটি তুলে নিতে, গেট ঠেলে ঢুকলেন অনন্ত ভাদুড়ী। বললেন, 'চিনতে পাছেন? আমি অনন্ত— আপনার ভাগ্নে। সেই প্রথম দিকে এসে ছলাম—

জিতু লাহিড়ী শশব্যস্তে 'আসুন আসুন' করলেন, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বড়দালানে।

অনন্ত বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলুন।'

'আমায় আর আপনি বলবেন না। সম্পর্কে আমি ভাগ্নে, আপনি মামা।'

'তা হোক। বলুন কি বলবেন?'

'সেই তো মুশকিল। কি যে বলবো তাই ভাবছি। মানে, আর তো কেউ আসতে চাইল না। আত্মীয় বলে আমাকেই ঠেলে দিল। ভেবে ছলাম সরযূ মাসী এখানে আসা যাওয়া করে, তাকে দিয়েই না হয় বলাব, যতই অপ্রিয় হোক কথাটা! তারপর মনের বল করে চলে এলাম। অপ্রিয় হলেও সত্য তো বটেই।'

জিতু ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলেন, 'কি বলবেন বলুন না?'

'হ্যা, তবে বলেই ফেলি। মানে কর্তব্যের দায় যখন আমার ঘাড়েই চেপেছে। মানে—বলছিলাম, ইয়ে—মানে আমার মামীর কথা।' ঘাড় চুলকোতে থাকেন অনন্ত।

জিতু গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমার স্ত্রীর বিষয় কিছু বলতে চান?'

আমার স্ত্রী! অনন্ত ভাদুড়ার 'মামী' নামক এই মানুষটা তাহলে নিতান্তই বায়বীয়? এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। এই জিতু লাহিড়ীর স্ত্রীর বিষয় আলোচনা করতে হবে। আর সেটা হবে এঁরই সঙ্গে।

অনন্ত ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ,—মানে সেটাই বক্তব্য। তবে এ দুরূহ কাজটি আমাকেই করতে হচ্ছে, এইটাই বড় আক্ষেপের বিষয়! সরযূ মাসী বললে—'

জিতু চৌকী থেকে উঠে দাঁড়ান। দু'হাত জোড় করে বলেন,

'আচ্ছা থাক, এতই যখন দুরূহ বোধ করছেন, আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। বরং সরযূকেই পাঠাবেন।'

অনন্তর ফ্যালফেলে দৃষ্টির সামনে থেকে গটগট করে চলে যান জিতু লাহিড়ী। এ বছরের খবরে আর একটি খবর যুক্ত হয়।

শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে বাপের মতই উন্নাসিক দুর্বিনীত অহঙ্কারী।

বাবার মত হবার সাধেই কি এই উন্নাসিকতা জিতু লাহিড়ীর? না মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত শোণিত কণিকাগুলি বহু বৎসরের অনাচারেও প্রকৃতি বিসর্জন দেয় না?

সরযূকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন জিতু, সরযূ কিন্তু সারাদিনেও এল না। বাগদীদের সেই ছেলেটার সারাদিন আজ এখন-তখন যাচ্ছে, দুপুরে আজ ভাত খেতেও আসেনি সরযূ! সেই সকালে ঠাকুর মন্দিরে জলঢালা সেরে সবে বাড়ি ঢুকেছে, পিসি বলে উঠল, 'হরের ছেলেটাকে কাল কিরকম দেখে এসেছিলি রে সরযূ?'

সরযূ তুলসীতলায় জল দিতে দিতে ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাড়াবাড়ি। কেন?'

'এতক্ষণে বোধহয় শেষ হয়ে গেল। হরের ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল, দিদিমণি, দিদিমণি করে। অসহ্য হল বাপু, বেশ একটু বকে দিলাম।'

'বকে দিলে?'

'আহা বকা মানে কি গালাগালি? বললাম—দিদিমণি কি বদ্যি তাই এই ভোরবেলাতেই ছুটে এসেছিস? দিদিমণির পুজোপাঠ নেই? গলায় এক ঘটি জলও তো ঢালবে—'

'পুজোপাঠ সেরে গলায় জল ঢেলে বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত যম বসে থাকবে ধৈয ধরে?'

ঘরের ভিতর থেকে, কথাটা ছুঁড়ে মারে সরযূ, পুজোর গরদের থানটা ছেড়ে সাদা থান পরতে পরতে।

পিসি বিরক্ত গলায় বলে, 'তা যম যখন যেখানে আসবে তখন তোমাকেই সেখানে দেখা করতে ছুটতে হবে তারই বা মানে কি

আছে? সত্যিই কি তুই বদ্যি?'

'বদ্যি না হই, মানুষ তো বটে।'

'দেশে আর তুই ছাড়া মানুষ নেই?'

'দেশের কথা জানি না, নিজের কথা জানি।' স্মৃতির সাদা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে উঠোনে নামে সরযূ।

পিসি বিদ্রোহের গলায় বলে ওঠে, 'চললি? অমনি পায়ে চাকা বেঁধে চললি? অ হতভাগী মেয়ে, দুখানা বাতাসা খেয়েও এক ঘটি জল গলায় ঢেলে গেলি না?'

'সাত সকালে গলা মরুভূমি হয়ে যায় 'ন।' বলে ছুট দিয়েছিল সরযূ। সারাদিনে আর ফেরা হয়নি।

ভেবেছিল ছেলেটাকে বোধকরি আজ আর যম ছাড়বে না। তবু যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল বৈকি! হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এনেছিল হরি, অক্সিজেন এনেছিল। সন্ধ্যার দিকে মানুষের জয় হল।

অন্ততঃ আজকের মতন হলই মনে হচ্ছে। সন্ধ্যা পার করে হরির বৌটাকে প্রবোধ দিয়ে ফেরার পথ ধরলো সরযূ।

সরযূ দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। একেই তো হালকা ধরনের শরীর। তাতে সারাদিনের উপোসে আরো হালকা লাগছে।

শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি একটা তিথি, মাঠে পথে আধা জ্যোৎস্নার আভা। সেই টুকু আলোতেই অচ্ছুৎ বস্তু সম্পর্কে সাবধান হতে হতে দ্রুতপায়ে বাগদীপাড়া থেকে বামুনপাড়ায় এসে যাচ্ছিল সরযূ, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মানে, দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ভূত!

স্রেফ ভূত! সামনে একটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের তলায়।

গাছের গোড়ার সঙ্গে নিজেকে যতটা সম্ভব লেপটে ছায়ার মত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ছায়ার মত কেন? ভূত তো ছায়াই।

ছায়াদেহী! ছায়ার মত গাছের গায়ে লেপটে যাবার চেষ্টা করার দরকার কি তবে? তাছাড়া ভয় কে কাকে করবে? ভূত মানুষকে—না মানুষ ভূতকে?

এখন অন্ততঃ ভূতই মানুষকে করল। যেই সরযূ তার ডাকসাইটে

গলায় হাঁক পাড়ল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?'

তৎক্ষণাৎ দ্রুত হেঁটে পাশের ধানের ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়বার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু সরযূর সঙ্গে হেঁটে পাল্লা দেবে, এমন জোরালো ভূতই বা কোথায় ? 'পালাচ্ছিস যে ? বলি চোর না ভূত ?'

বলে সরযূ তিন লাফে এগিয়ে তার পরনের শাড়ির একটা অংশ ধরে ফেলল। হ্যাঁ শাড়িই—লালপাড় শাড়ি। অর্থাৎ ভূত নয়, প্রেতিনী। আর নিতান্ত ছায়াময়ীও নয়, কায়াময়ী।

সরযূ মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়ে অস্ফুটে বলে, 'এ কী ?'

প্রেতিনী নীরব।

'এমন সময় আপনি এখানে কেন ?' সরযূ সভয়ে বলে।

হঠাৎ প্রেতকণ্ঠে স্বর ফোটে। তীব্র স্বর। মানুষের ভাষা, 'কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নাকি ?'

'না, বাধ্যর কি আছে ? কিন্তু—হাতে ওটা কি ? বোতল ? বোতল কিসের ?' সরযূর চিরকালের শাণানো কণ্ঠস্বর, হঠাৎ যেন স্খলিত হয়ে পড়ে। সে স্বরে আতঙ্কের তীব্রতা নয়, শিথিলতা।

কিন্তু প্রেতিনী সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। মুখোমুখি ধরা পড়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

অপরাধীদের মধ্যে সহসা যে উদ্ধত নির্ভীকতা জন্ম নেয়, সেই নির্ভীকতায় তীব্র ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে বলে ওঠে সে, 'বোতল কিসের হয়, কখনো শোনওনি বুঝি ? আহা-হা, ইনোসেন্ট গার্ল ! শুনবে কিসের বোতল ?—মদের। বুঝলে ? মদের। দেশী মদের। তোমাদের এই পবিত্র দেবস্থানে তো বাগদীপাড়ায় ছাড়া এ বস্তু জোটে না, তাই ডবল পয়সা ঢেলেও চোর সাজতে হয়েছে, কিংবা ভূত ! হো হো হো, ভূতটাই ঠিক।'

বোতলের মধ্যস্থিত বস্তুর কিছুটা বোধ করি পথেই গলায় ঢালা হয়েছে, হাসিটা তার প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সেটা সরযূর কল্পনার জগতের বাইরের। তাই সরযূর নিজস্ব

সন্দেহে আস্তে আস্তে বলে, 'বুঝেছি। জোর করে সব ছাড়তে বসলেও এই বিষের নেশাটা ছাড়তে পারছেন না মেজদা। সর্বনেশে জিনিস তো! একবার ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার হওয়া বড় কঠিন। কাল যখন আমায় নিধু বাগদী বলেছিল লাহিড়ীগিন্নীর এ পাড়ায় আনাগোনা আছে, তাকে মারতে বাকী রেখেছিলাম। কাজটা ভাল করি নি। কাল মাপ চাইতে হবে। কিন্তু নিজে তোমার এ সাহস করাটা উচিত হয়নি মেজবৌদি, সাপখোপের রাস্তা—'

ভয়, উত্তেজনা, আবেগ, সব কিছুর দাপটে 'আপনি'টা 'তুমি'তে এসে ঠেকে। গলা নামিয়ে কথা শেষ করে সরযূ, 'চুপি চুপি কাউকে বলে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেই ভাল হতো।'

আধা জ্যোৎস্নার ম্লান ছায়ায় সরযূর আহত ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না প্রেতিনীর মুখে একটু প্রসন্নতার আভা খেলে গেল।

হাসিটার ভাষা এই—বাঃ এটা তো মন্দ হল না। সন্দেহটা যে এই খাতে প্রবাহিত হতে পারে আগে তো খেয়াল হয়নি? স্বামীর জন্যে এই পবিত্র বস্তু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছি আমি। কী মজা!

ওর বেশি আর ভাবতে পেরে উঠল না। যাক, তাই ভাবুক। এতেই তো বেশ ঘায়েল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। মেজদাতে বড় ভক্তি গজিয়েছিল তো! সত্য ভাষণের পুণ্য অর্জন করে আরও বেশি ঘায়েল নাই করলাম। সত্যি কথাটা শুনলে হার্টফেল করে বসতেও পারে।

অতএব অন্য প্রসঙ্গ।

'সাপ বুঝি মানুষ চিনে কামড়ায়? নাকি আগে থেকে টের পায় কার রক্তের কী স্বাদ?'

সরযূ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মানুষ, তোমার এসব শক্ত শক্ত কথা বুঝি না মেজবৌদি, তবে সাপ মানুষ চিনে না কামড়ালেও মানুষের তো চেনা পথ অচেনা পথ আছে? আমার যে এ পথের সব জানা।'

পথে এগোতে এগোতেই কথা চলে। বড় লাহিড়ীবাড়ির বিরাট দেহটাকে অন্ধকারে দৈত্যের মত দেখা যাচ্ছে। ওই দৈত্য শরীরটার

মধ্যে কোথায় কোন এক কোটরে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে শক্তিসাধক শ্যাম লাহিড়ীর ঐতিহ্যের বাহক জিতু লাহিড়ী এখন বোধকরি উপনিষদের টীকা উলটে ঋষিদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির সূত্র খুঁজছেন।

অন্ধকার সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে উঠে ওই দৃশ্য চোখে পড়া মাত্র বরুণা লাহিড়ীর মনে দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগবে হাতের বোতলটার ধাক্কায় পুঁথির পাতায় ঝুঁকে পড়া মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে দিতে, পুঁথির পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। কিন্তু দুর্দান্ত সেই বাসনাটাকে সংহত করে নিতে হবে বরুণা লাহিড়ীকে। নিঃশব্দে—বিড়ালের মত মৃদু পদক্ষেপে ঢুকে যেতে হবে পাশের কোনো একটা অন্ধকার ঘরে, চুপি চুপি নিঃশব্দে নামিয়ে রাখতে হবে হাতের জিনিসটা। নিঃশ্বাস নিতে হবে আস্তে আস্তে। যেন বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যেন শুধু এমনি অনেকক্ষণ বেড়িয়েছেন বলেই ফিরে এলেন।

বুকের মধ্যে লোভ দাপাদাপি করবে এই মুহূর্তে বয়ে আনা জিনিসটা গলায় ঢালতে, কিন্তু সে লোভটাকে সামলাতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। যেন কিছুই না—এই ভাবে একটু পরে বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করতে হবে, ওই শয়তানটা কোনো কথা বললে তার উত্তরও দিতে হবে। না হলে সন্দেহ করবে ও।

কিন্তু ওকি সন্দেহ করে না? বরুণা বুঝতে পারেন না। মনে হয় যেন সব বোঝে। তবু না বোঝার ভান করে।

নইলে সেদিন খপ করে বলে উঠেছিল কেন, 'সেই সাফ করা রূপোর কৌটোগুলো আর দেখতে পাচ্ছি না কেন বরুণা? আরো সাফ হয়ে গেছে বুঝি?'

বরুণা ওর সব কথার উত্তর দেন না তাই। নইলে বলতে হতো কোথায় গেল! অনেকদিন পর্যন্ত কৌটো চারটেয় হাত দেন নি বরুণা। টেনে বার করে মাজতে দিতেই জিতু লাহিড়ী যা বিচলিত হয়েছিলেন, ভয় করেছিল। কিন্তু করবেনই বা কি? টাকা কোথায়?

সংসারে অনেক কাঁসা পেতল তামা আছে বহু বিচিত্র বাসনের

মূর্তিতে, কিন্তু সে বিরাট বড় বড়! সে সব কি লুকিয়ে বার বার নিয়ে যাওয়া যায়?

দুর্গা কিছু কিছু পৌঁছে দিয়েছে প্রথম প্রথম, তা সে সব ছোট ছোট ঘটিটা বাটিটা পিলসুজটা। বড় বড় কাঁসি গামলা, থালা পরাত জামবাটি, ঘড়া, পুষ্পপাত্র, বালতি, বোগনো, এসব পাচার করবার সাহস তারও হয়নি। রাজী হয়নি। হ্যাঁ দুর্গাই সন্ধানদাত্রী। দুর্গাই প্রথম বলেছিল, 'সর্বদা ভয়ে কাঁপি মা! আমার ভাসুর লুকিয়ে লুকিয়ে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করে, আর 'এ' বলে, য্যাখন হোক ত্যাখন পুলিশে এসে হাতে দড়া দে নে যাবে। তারা মেয়ে পুরুষ বাছবে না, সবাইকে নে যাবে? আমার কি অপরাধ বলতো মা? আমাকে ধরে নে যাবে কেন?'

বরুণার চোখ জ্বলে উঠেছিল। বরুণা যেন ঘন গভীর অন্ধকার অরণ্যের পথে সহসা বিদ্যুৎ শিখার আশ্বাস পেয়েছিলেন। বরুণা দুর্গার কাছাকাছি নেমে এসেছিলেন উঠোনে।

রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'সত্যিকার মদ? সে আবার মানুষে তৈরি করতে পারে নাকি?'

দুর্গা কৃপার হাসি হেসে বলেছিল, 'শোন কথা! মানুষে করে না তো কি ও দ্রব্যি দানোতে এসে করে দেয়? মানুষে কি না করে মা? বলে বাগদীপাড়া সুদ্ধ ওতেই মজে আছে।'

অহঙ্কারী মনিব গিন্নার সঙ্গে এই প্রথম এতগুলো কথা বলার সুযোগ পায় দুর্গা।

তারপর বহু কৌশল করে বরুণা কথাটা পেড়েছিলেন।...

দিল্লীতে থাকতে এক সময় ভারী অসুখ করেছিল বরুণার, বাঁচবার আশা ছিল না। গায়ে হাতে পায়ে কোনো শক্তি ছিল না। তখন ডাক্তারে বলেছিল শরীরে শক্তির জন্যে ওই বস্তু একটু একটু খাওয়া দরকার। সে অবিশ্যি ডাক্তারী দোকানের জিনিস, আসল বিলিতি, কিন্তু এখানে সে জিনিস কোথায় পাবে? অথচ এখন আবার বরুণার তেমনি অবস্থা ঘটেছে! হাতে পায়ে বল নেই, মাথা ঘুরে ঘুরে যায়।

অতএব দুর্গা যদি কিছু কিছু সরবরাহ করে!

দুর্গা কি ওই 'ঔষধার্থের' কথাটা বিশ্বাস করেছিল? বোকা বলে কি এতই বোকা? তাদের বাগদীদের ঘরে মেয়েপুরুষে কে খায় না ও বস্তু? তার নিজের ভাসুরের বৌ, খায় না বসে বসে?

সে যাক। যাই বুঝুক দুর্গা, প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হয় নি। বলেছিল, 'সে পারব না মা! 'ও' তাহলে মেরে হাড় গুঁড়ো করবে। বড় ভাইকে তো কিছু বলতে পারে না, যত শাসন পরিবারের ওপর। কেমন করে তৈরি করে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে গেলে ঠেঙিয়ে পাট করে। ওর ওতে বড় বিরাগ। বোষ্টম হয়েছে কিনা! পাঁঠা খায় না, মাছ মুরগী কিছু খায় না, গুগলিটি পর্যন্ত ত্যাগ দিয়েছে। বলে, কি করবো দাদা বড় ভাই, বলতে তো পারিনে কিছু, তবে এ ভিটেয় আর থাকতে ইচ্ছে করে না!'

দুর্গার বর, ভোলার ভাই রজনীর, তার সেই ভিটেয় আর থাকতে ইচ্ছে না করুক, সেই ভিটেখানা দেখবার ইচ্ছেটা বরুণাকে যেন ভূতের মত পেয়ে বসে। সহস্র বাহু বাড়িয়ে টানতে থাকে সেই অদৃশ্য জগৎ! অতএব অদৃশ্য আর অদৃশ্য থাকে না। দুর্গাকে পথ প্রদর্শিকা করে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই পথের দিকে পা বাড়ান বরুণা লাহিড়ী।

কিন্তু অবিশ্বাসের কি আছে? নেশা আর অবৈধ প্রেম এই দুই ক্রুর মনিব কী না করিয়ে নিতে পারে মানুষকে দিয়ে?

লাহিড়ী বাড়ির চারটি কাঁসা পিতলের বাসন, কি দুখানা পুরনো শাল দোশালা, অথবা উঁচু কুলুঙ্গী থেকে পেড়ে নামানো কটা রুপোর কৌটো যদি সেই হিংস্র মনিব লাহিড়ী বাড়ির গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলিয়ে থাকে বরুণা লাহিড়ীকে দিয়ে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উঁচু কুলুঙ্গী থেকে পেড়ে নামিয়েছেন তো বরুণা আরো বড় জিনিস! অনেক বড়! .

অন্ধকারে লাহিড়ীদের ওই ভগ্নোন্মুখ বিরাট বাড়িখানা যে একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন মনে পড়িয়ে দিতে চায় বরুণাকে —'বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো আমি কত বড়?'

বরুণা তাই সহজে তাকান না। দ্রুত এগিয়ে যান প্রেতিনীর লঘু পায়ে। আগে আগে দুর্গা খানিকটা পথ পৌঁছে দিয়ে যেত, এখন আর দরকার হয় না! দুটো মানুষই বরং আরো চোখে পড়তে পারে লোকের। ঝোপঝাড়ের মাঝে লুকানো এই পথটা শুধু চিনিয়ে দিয়েছে দুর্গা।

কিন্তু লুকনো কি থাকে? বরুণা জানেন, তবু লুকনো থাকবে না। যতই নিঃশব্দে ঢুকুন তিনি, উপনিষদের পাতা থেকে চোখ না তুলেই জিতু লাহিড়ী গম্ভীর হাস্যে বলে উঠবেন, 'তোমার সন্ধ্যাবেলা বাগানে বেড়ানোটা একটু কমালে ভাল করতে না? ক্রমশঃ ঠাণ্ডা পড়ছে, পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, সেটা ভুললে চলবে কেন?'

দিনের বেলা হলে, অন্য সময় হলে, নিশ্চয়ই বরুণা লাহিড়ী এই পঞ্চাশ পারের অপমানটা নীরবে হজম করতেন না, কিন্তু সন্ধ্যার এই সময়টা বরুণা লাহিড়ী নিঃশব্দে সব অপমান সহ্য করবেন। ঘরের মধ্যে থেকে সহজে আর বেরোবেন না। হয়তো অনেক রাত্রে রাতের খাওয়া খেতে উঠবেন, হয়তো উঠবেনও না। সে খাওয়ায় আকর্ষণই বা কী? সরযূ নিয়োজিত সেই বামুনের মেয়েটা বেলা থাকতেই রুটি তরকারি করে দোতলার দালানে চাপা দিয়ে রেখে যায়, সেইটা নিজেরা নিয়ে খাওয়া। জিতু লাহিড়ী অম্লান-বদনে খান। অধ্যয়ন শেষ হলে উঠে নিজেই নিয়ে খেয়ে নেন। শুধু একবার অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ডাক দেন, 'খাওয়ার সময় হলো মনে হচ্ছে।'

কোনোদিন সাড়া পাওয়া যায় না, কোনোদিন একটা জড়িত কণ্ঠের উত্তর আসে, 'খাব না। খাব কেন? ওই সব ধুলো কয়লা মাটি!'

একটু পরে এই পথ থেকে গিয়েই নিত্য অভিনীত ওই নাটকেরই পুনরভিনয় হবে। চিরকালের চেনা গণ্ডি থেকে ছিনিয়ে এনে জিতু লাহিড়ী বরুণা লাহিড়ীকে যে অচেনা পথে এনে ছেড়ে দিয়েছেন, সে পথের সামনে তো শুধু অন্ধকার! সেই দম আটকানো অন্ধকারের গ্রাস এড়াতেই না আর এক অন্ধকারের কাছে বেশি করে আশ্রয়

নেওয়া! আশ্রয় না নিয়ে উপায়ই বা কী? রক্তের মধ্যে অশান্ত পিপাসার যন্ত্রণা দিনের পর দিন নিজেকে নিজে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে। হাড়গুলোকে তীক্ষ্ণদাঁতে চিবিয়েছে।

অসহ্য সেই যন্ত্রণায় দেয়ালে শুধু মাথা ঠুকেছেন বরুণা লাহিড়ী, তারপর সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোনোর ছলে পথে বেরিয়ে—

দেউড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সরযূ, আস্তে বলল, 'তোমায় আর একবার বলছি মেজবৌদি, স্বামীভক্তি যত বড় জিনিসই হোক, তুমি নিজে আর এ লুকোচুরির মধ্যে যেও না। লোক জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জার শেষ থাকবে না। তাছাড়া কে কি ভাববে কে জানে, মানুষের মতন খল জাত তো আর নেই! এই এর যদি আমি না হয়ে আর কারো চোখে পড়তো, সারা তেঁতুলগোড়া রাষ্ট্র হতে বেশিক্ষণ লাগতো না।'

বরুণা লাহিড়ী তীক্ষ্ণ সুরে বলেন, 'এতেই যে বেশিক্ষণ লাগবে তার নিশ্চয়তা কি? শুনতে তো পাই তুমি একটি পাড়ার গেজেট!' তুমিই যে বলে বেড়াবে না—'

'তা বটে! বিশ্বাস কি! গাঁইয়া ভূত বৈ তো নয়! বলে মৃদু হেসে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায় সরযূ।

বরুণা লাহিড়ী মিনিট খানেক ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক্‌রে ঘুরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান।

কিছুতেই যেন এই মেয়েটার থেকে উঁচু হওয়া যায় না। কোথায় যে কি হার হয়, নিজেকে অপদস্থ আর পরাজিত মনে হয়!

ওর ওই বিনয়ের ছদ্মবেশের নীচে যেন বরুণার প্রতি একটা অবজ্ঞা আছে। কিন্তু কেন? কিসের অহঙ্কারে? সোনার মত সোনালী খানিকটা রঙের অহঙ্কারে? না ওই অদ্ভুত কিম্ভুত শুচিতার অহঙ্কারে?

কি দুঃসাহস! এ সাহসের কারণ আর কিছু নয়, বরুণারই স্বামী! জিতু লাহিড়ী যে উঠতে বসতে ওঁর ওই হঠাৎ পাওয়া আদরের ছোট-বোনের প্রশস্তিপত্র পাঠ করেন! খোলাখুলি সামনা-সামনিই করেন।

এই তো সেদিন, পঞ্জিকায় কতকগুলো ব্রতপুজো গেল বলে

মহিলাটি পর পর দিন তিনেক উপবাস করে পুজোর প্রসাদ নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য তিন দিন উপবাস করে মানুষ অমন খটখটিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বরুণার। বাড়ি গিয়ে তো দেখছে না কেউ, বলতে দোষ কি উপবাস! শুনতে যখন গৌরবের! সেই গৌরবের চরণে পুজো তো পড়ল।

জিতু লাহিড়ী সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বললেন, 'এই শক্তিটা কোথা থেকে আসে বুঝতে পার বরুণা? নাঃ, তুমি বুঝতে পারবে না। তবু এইটুকু অন্ততঃ স্বীকার করতে চেষ্টা কোরো, আমাদের এই হিংসা আর বিদ্বেষ, লোভ আব দুর্নীতি, ক্ষুধা আর প্রবৃত্তি-সর্বস্বতায় ভরা পরানুকরণের নেশায় উন্মত্ত দেশটা যে এখনো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি তাব কারণটা—এই। এই রকম এক একটি মেয়ে! এমন মেয়ে আজও আমাদের দেশে আছে বলেই সমাজ এখনো টিঁকে আছে। এরা যদি শেষ হয়ে যায়, এই পচা গলা সমাজ খসে পড়ে যাবে, মনুষ্যাকৃতি কতকগুলো প্রাণী জানোয়ারের ঐতিহ্য নিয়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

বরুণা অবশ্য এই গদগদ ভাবালুতায় নাক কুঁচকে ছিলেন, আর এর কারণও খুঁজে পেয়েছিলেন।

রূপ আছে যে! আর সংসারে সন্তানে খরচ হয়ে না যাওয়ায় যৌবন আছে খানিকটা। শুনতে খারাপ হলেও ওইটাই আসল কথা।

"আদর্শ হিন্দু বিধবা-টিধবা' ওসব বাজে বুলি, স্রেফ রূপজ মোহ। নইলে ওই মুর্খ মুখরা সভ্যতাজ্ঞানহীন মেয়েটার মধ্যে জগতের যত ভাল বস্তু দেখতে পান জিতু লাহিড়ী? ইনি পান।

উনিও পান। উনিও মেজদা বলতে মূর্ছাহত হন। এ ভক্তিরও আর কোনো অর্থ নেই। বরুণা লাহিড়ী তাঁর মেয়েদের মত বিদূষী না হলেও ফ্রয়েড পড়েছেন। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা আধা প্রৌঢ়া মেয়েমানুষের এই গদগদ ভক্তির মানে বোঝেন।

বয়সের তফাৎ? ফোঃ! বরুণা লাহিড়ীর নিজেরই পঁচিশ বছরের ছেলেটা একটা চল্লিশ বেয়াল্লিশের মাগীর সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচে

বেড়াচ্ছে না? তার তো কোনো অভাবও ছিল না? আর এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। আজীবন তৃষ্ণার্ত। অভাবের প্রতিক্রিয়া যে কী সে তো বরুণা লাহিড়ী নিজেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বাগদীপাড়ায় গিয়ে বেআইনি মদ চোলাইয়ের আড্ডা আবিষ্কার করবার কথা দুঃস্বপ্নেও কখনো ভেবেছেন বরুণা লাহিড়ী? অথচ—

কিন্তু—হঠাৎ সচেতন হলেন বরুণা, কিন্তু ও কেন ওদিকে গিয়েছিল এই সন্ধ্যার অন্ধকারে—একা?

নিজের ব্যাপারে একটু বিপর্যস্ত বোধ করছিলেন বলে জিগ্যেস করতে মনে পড়ল না তখন। নইলে মুখোমুখি একবার জিগ্যেস করতে পারলেই বোঝা যেত। আচ্ছা, এ একটা হাতিয়ার রইল বরুণার হাতে। জিতু লাহিড়ী যখন বালবিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্যের মহিমা দেখাতে আসবেন তাঁর 'পতিত' স্ত্রীকে, বরুণা লাহিড়ী বলবেন, ওকে জিগ্যেস কর তো সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে পাড়া ছাড়িয়ে কোথায় যান উনি।

যাক, আপাতত তাড়াতাড়ি অন্ধকারের আশ্রয়ে ঢুকে পড়তে না পারা পর্যন্ত—হল না। বিড়ালের মৃদুতা কার্যকরী হল না।

অধ্যয়নরত তাপস মুখ তুলে চাইলেন।

মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বেড়াবার জায়গাটা হয়তো ভালই নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু বেড়ানোটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না বরুণা?'

বরুণা লাহিড়ী বিনা বাক্যে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, এ সময় বাদ প্রতিবাদ অসহ্য। কিন্তু যাওয়া হ'ল না, উঠে এলেন জিতু লাহিড়ী। সামনে দাঁড়িয়ে স্থির গলায় বললেন, 'দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ কাঁচা কচুর ডাঁটা খায় শুনেছি, কিন্তু খেয়ে বাঁচতে শুনিনি।'

একবার বোধহয় কেঁপে উঠলেন বরুণা লাহিড়ী, তারপরই তাঁর ঝুলে পড়া মুখটা সেই আগের মত পাথর পাথর দেখালো, গলার স্বরে সেই ধাতব শব্দ ধ্বনিত হলো, 'বাঁচবার সাধনা করছি এ ধারণাই বা হ'ল কেন তোমার?'

'কি জানি কেন। তবে মনে হচ্ছিল বুঝি বাঁচবার আশাতেই।

কিন্তু মরার সাধনার তো আরো বহুবিধ পথ আছে, এই পথটাই পছন্দ করে ফেললে কেন বল তো? শ্যাম লাহিড়ীর পুত্রবধূ পচাই গিলে লিভার পচে মারা গেলেন, গ্রামে এ খবরটা একটু কড়া খবর হয়ে যবে না?'

অসহ্য ক্রোধে মুহূর্তকাল গুম্ হয়ে থেকে বরুণা লাহিড়ী বলে ওঠেন, 'হলে আর কি করা যাবে? তবে ওর কাছাকাছি পৌঁছয় এমন কড়া খবরের অভাবও তো নেই তোমাদের দেশে। ব্রহ্মচারিণী সরযূবালার বাগদীপাড়ায় অভিসারলীলা—'

'শাট্ আপ!' মাত্রাহারা ক্রোধে বিদেশীভাষা বর্জনের প্রতিজ্ঞা ভুললেন জিতু লাহিড়ী। লাহিড়ী সাহেবের গলায় প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন, 'শাট্ আপ! দ্বিতীয়বার যেন ওরকম ইতর-কথা না শুনি।'

'ধমকে চুপ করাতে পারবে না আমাকে। নিজের চোখে যদি না দেখতাম—'

'চুপ! চুপ করো বলছি।'

'করবো না চুপ! তোমার ওই ভণ্ডামীর খোলস খুলে দেব। তোমার বিধবা বোনের কীর্তি চোখ বুজে অস্বীকার করতে পারবে না তুমি!'

'বরুণা, সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, থামতে হবে তোমায়।'

'থামবো না!' বরুণা উদ্ধত গলায় বলেন, 'যারা ডুবে ডুবে জল খায়, তারাই বড় সতী পুণ্যবতী! তোমার ওই সাধের বোনকে রোজ আমি যেতে দেখি বাগদীপাড়ায়। বুঝলে?...আমি মদ নিতে ছুটি, আর তিনি হয়তো আরো কিছু জোরালো মদের আশায়—।'

'বরুণা!' জিতু লাহিড়ী বাঘের মত গর্জন করে ওঠেন, 'আমাকে তুমি এখনও চেননি! আর বেশি বাড়ালে তোমার বাক্‌শক্তি চিরতরে লোপ করে দিতে পারি আমি, বুঝলে, মনে রেখো!'

বরুণা বসে পড়েন। কারণ বরুণা ভয় খান!

ওই মরীয়া মূর্তিটাকে আর ঘাঁটাতে সাহস পান না। অন্য পথ ধরেন। হয়তো ইচ্ছে করেও ধরেন না। অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্টের উত্তাল ঢেউ তোলপাড় করে তোলে তাঁকে, তাই বসে

পড়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'তুমি? তুমি এই কথা বললে আমায়? বলতে পারলে? তোমার দু'দিনের পাওয়া বোনের জন্যে?'

জিতু লাহিড়ী বুকের উপর হাত দুটো আড় করে পায়চারি করতে করতে বজ্রগর্ভ স্বরে বলেন. 'দু'দিনের পাওয়া ভেবেই ভুল করছ বরুণা, লাহিড়ী বাড়ির মেয়ে সরযূ। সে সম্পর্ক দু'দিনের নয়।'

'তোমাদের লাহিড়ী বাড়ির মেয়েরা কেউ খারাপ হতে পারে না?'

'না না না।' তেমনি স্বরে উত্তর দেন জিতু লাহিড়ী।

আর বরুণা সেই কান্নাভেজা গলায় অদ্ভুত একটা প্রতিহিংসার উল্লাস আমদানি করেন, 'তোমার নিজের মেয়েরা? শীলা, শেলি, সোমা, ওদেরকে তুমি বোধহয় লাহিড়ী বংশের বলে ধরছ না? কিন্তু না ধরেই বা উপায় কি? বেবি লাহিড়ী আর যাই হোক, তার মেয়েরা তার বিবাহিত স্বামীরই!'

জিতু লাহিড়ী হঠাৎ স্ত্রীর খুব কাছে এসে দাঁড়ান। ভয়ঙ্কর একটা চাপাস্বরে বলে ওঠেন, 'বিশ্বাস কি? দলিল তো শুধু তোমার নিজের মুখের কথা? তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তো তোমাদের হাতে মামলার সব কাগজ তুলে দিয়ে রেখেছেন! কে বলতে পারে ওরা সত্যিই এই তেঁতুলগোড়ায় লাহিড়ী বাড়ির কি না। হয়তো নয়, তাই ওদের রক্তে নরকের তৃষ্ণা!'

কী অপমান! কী অপমান!

বরুণা লাহিড়ী ওই অতি ভয়ঙ্কর অতি সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ের ধাপ পার হয়ে যান। মরীয়া হয়ে ওঠেন।

কী করবে ও? বড়জোর বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দেবে?

বরুণা নিজেও তো পারেন সে কাজ করতে! তাই করবেন। নিশ্চয়! তবে আর শেষ প্রতিহিংসা নিয়ে নেবেন বা কেন?

কেন বলবেন না! হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠেন, 'ধরে ফেললে? শেষ অবধি ধরেই ফেললে? হায় হায়! এতদিন চেপে রেখেছিলাম খবরটা। ধরেই যখন ফেলেছ—হি হি হি, তখন বলি—'

কথাটা কী ভাবে শেষ করতেন বরুণা লাহিড়ী কে জানে? আর

শেষ করলে তার প্রতিক্রিয়া কি হতো কে জানে!

হয়তো ঈশ্বরের অনুগ্রহেই শেষ করা হল না।

ঈশ্বর রক্ষা করলেন! দেউড়ীর বাইরে থেকে একটা চাষাড়ে পুরুষ গলা আর একটা শাণানো মেয়ে গলা একসঙ্গে ডেকে উঠলো, 'দরজাটা খুলুন! দরজাটা—'

ওই শাণানো গলাটি চিনতে ভুল হবার কথা নয়, তারস্বরে আরো ডাকছে সে, 'মেজদা, একটু তাড়াতাড়ি নামুন, বড় বিপদ!'

পুরুষ গলাটা সাইকেল রিকশাওয়ালার।

সন্ধ্যা পার হওয়া অন্ধকারে রিকশা-গাড়িতে চড়িয়ে কোন্ বিপদ বয়ে আনল সরযূ, লাহিড়ীর বাড়ির দরজায়? বয়ে এনেছে সত্যিই।

কিন্তু বিপদটা সরযূর বয়ে আনবার কথাই নয়। এল শুধু ওই রিকশাওয়ালাটার ভুলে। অথবা এমন কিছু ভুলও নয়। বড় লাহিড়ী বাড়ি তো বহুদিন পোড়ো হয়েছিল, কবে যে তার তালা খোলা হয়েছে ডাহুকী স্টেশনের রিকসাওয়ালাটা তার কি খবর রাখে? যে তার গাড়িতে এসেছিল, সে বলেছিল 'লাহিড়ী বাড়ি চেন? নিয়ে চল।' তাই নিয়ে গিয়েছিল সে ভুবন লাহিড়ীর বাড়ির দরজায়।

সরযূ তখন বাগদীপাড়া থেকে ফিরে স্নান করে এসে সন্ধ্যাপুজোয় বসেছে। খুড়ি, পিসি দুজনে হাঁক পেড়ে ডাকল, 'অ সরযূ, তোর আহ্নিক শেষ হয়েছে? এই দেখ কী বিপদ!'

ঝিউড়ি-মেয়ে সরযূ আজন্মই এ সংসারে পুরুষ অভিভাবকের ধাক্কা ধরে। বিপদ সম্পদ সবেতেই। ইশারায় প্রশ্ন করল সরযূ, 'কী?'

ঠাকুর ঘরের প্রদীপের আলোয় সে ইশারা ধরা পড়ল না।

ওঁরা আবার ব্যস্ত ডাক দিলেন, 'দেখ্ এসে বাইরে। একটা রিকশা এসে কী সব বলছে বাপু! শুনে তো ভয়ে পেটের মধ্যে হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'

ইষ্টদেবতাকে তাকে তুলে ফেলে বেরিয়ে আসতে হল। বেরিয়ে এসে একটু জিজ্ঞাসাবাদেই ব্যাপার বুঝে ফেলে সরযূ, রিকশায় চড়ে বসে তার আর এক দেবতাকে তুলে নিল কোলের কাছে। বলল,

'বড়বাড়ি চল্। শ্যাম লাহিড়ী মশায়ের বাড়ি। আস্তে চল্, ঝাঁকুনি দিবিনা খবরদার—'

ঝাঁকুনি দেওয়ার সাবধান করল সরযূ, মেঠো রাস্তার উঁচু নীচু থেকে। কিন্তু জিতু লাহিড়ীর উঁচু গলার তীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁকুনি?

না, তার থেকে রক্ষা করতে পারল না সরযূ আর্ত জীবটাকে।

অন্ধকারকে কেটে কেটে জিতু লাহিড়ীর উচ্চকণ্ঠ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল, 'কে? কী নাম বলেছে? সোমা লাহিড়ী? লাহিড়ী বাড়িতে ও নামে আবার কে আছে। কেউ নেই, কেউ নেই, না না। ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বাড়ি ভুল হয়েছে।'

সরযূ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে 'ভুল হয়নি মেজদা, আমি ভাল করে জিগ্যেস করেছি। এখন হিমে ঠাণ্ডায় আর অবস্থার গতিকে মুখ দিয়ে ওর কথা বেরোচ্ছে না। মেজবৌদিকে বলুন তাড়াতাড়ি একটা আলো ধরে—

'আলো! হা হা হা! বলেছ ভাল সরযূ, তোমার মেজবৌদি ধরবেন আলো! আলোর সন্ধান কোথায় ওর কাছে? নেই নেই। তিনি এখন অন্ধকারে বসে মৃত্যুর সাধনা করছেন। দু-দুটো ছেলে আর তিন-তিনটে মেয়ের মৃত্যুশোক সামলাতে পারেন নি ভদ্রমহিলা—'

সরযূ অবাক হয়। তারপর সরযূর খেয়াল হয়। যেন বুঝতে বাকী থাকে না ব্যাপারটা। নিশ্চয় সেই বোতলের প্রতিক্রিয়া।

সরযূ শুনেছে মাতালকে ভয় খেতে নেই, ধমক দিতে হয়। তাই মনে জোর করে তীব্র স্বরে ধমকে ওঠে, 'কী বকছেন আবোল-তাবোল? এই তো একটু আগে মেয়েটা বলল, আপনার মেয়ে। বোধ হয় ছোট মেয়ে। এখন আর কথা বলতে পারছে না। এভাবে এসে পড়েছে কেন বুঝতে পারছি না, কিন্তু বোঝাবুঝি পরের কথা, মেয়েকে আগে তাওত করুন···মেজবৌদি, অ মেজবৌদি—'

'মেজবৌদি! হা হা হা, ভুল করছো সরযূ, তাঁকে পাবে না। তিনি কি এখন মরজগতে আছেন? হয়তো এতক্ষণে বেহেস্তেই পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আমার বাড়িতে রাস্তার জঞ্জাল তুলতে এসেছ

কেন সরযূ? পেলে কোথায়? দূর করে দাও, দূর করে দাও।'

'বাবু আমায় ছেড়ে দিন।' রিকশওয়ালা বিরক্তি জানায়।

জিতু লাহিড়ী বলেন, 'তোমায় তো বাপু ধরে রাখিনি আমি! যেতে পারো। তোমার মালপত্র নিয়ে চলে যেতে পারো।'

'মেজদা! যদি ভুলও হয়ে থাকে, মেয়েটাকে তো এখন আর নিয়ে যাবার উপায় নেই। নইলে আমার ওখানেই নিয়ে চলে যেতাম। আর চলবে না। এমন জানলে কি আমি আমার ওখান থেকে এতটা আনি? ছি ছি, অবস্থাটা দেখুন!···রিকশওআলা, আলোটা একটু ধরতো বাবা, দেখুন উনি ভাল করে।'

'আলোর দরকার নেই সরযূ, আলো ধরে দেখবার বস্তু ওটি নয়। আলো না ধরেও বুঝতে পারছি'—কটু বিস্বাদ একটা স্বর যেন সমস্ত পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'কিন্তু তুমি দুঃসাহসী মহিলা, তুমি হঠাৎ লাহিড়ীবাড়ির পরিচয় বানিয়ে এখানে ঠেলে উঠতে চাইছ কেন বল তো? তুমি মিসেস ডেভিড না? দিল্লীর সেই চুল ছাঁটাই দোকানের নোংরা ছোকরাটার ওই রকমই কী যেন একটা নাম ছিল যেন। তা কী হল মিস্টার ডেভিডের? গয়না টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? না খেতে পেয়ে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছ ভাতের জন্যে?'

সরযূ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা আর অস্পষ্ট থাকে না। কিন্তু তাই যদি হয়, যদি কুলে কালি দেওয়া মেয়েই হয়, এই চরম ক্ষণে তো তার বিচার করতে বসা চলে না। সন্দেহ নেই, মেজদা ওর অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। পুরুষ মানুষকে আর কী ভাবে বোঝানো যাবে? আশ্চর্য, মা মাগী নামছে না কেন? করছে কি ওপরতলায় বসে? মদ কি তিনিও খাচ্ছেন নাকি? দুর্গা দুর্গা! মরুকগে, সরযূ তো আছে।

স্তব্ধতা ঝেড়ে ফেলে দৃঢ়স্বরে বলে, 'আপনি পুরুষ, কী আর বোঝাবো? ওর অবস্থা শোচনীয়। এমন অবস্থায় কুকুরটা বেড়ালটাকে মানুষ ঠাঁই দেয়, সেই ভেবেই না হয়—'

'রিকশওয়ালা'—স্নায়ু ছিঁড়ে পড়া একটা তীব্র যন্ত্রণার আর্তনাদ শূন্যে আছড়ে পড়ে, 'ফিরিয়ে নিয়ে চল আমায়। স্টেশনে—'

রিকশাওয়ালার দায় পড়েনি। ভাল এক আরোহী জুটেছে তার। চড়িয়ে পর্যন্ত তো ভয় করছিল গাড়ির মধ্যেই বুঝি মরে যাবে। যদি বা জ্যান্ত নিয়ে এনে ফেলে, এখন এ কী ঝামেলা!

'ছেড়ে দিন বাবু আমায়,' বলে আর একবার হামলা করে ওঠে সে, আর এই সময় বরুণা লাহিড়ী এসে দাঁড়ান, নিঃশব্দে অন্ধকারে।

প্রথমে গ্রাহ্য করেন নি। তখন সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তকে কে ঠেলে দিল দেখতে এসেছিলেন।

দেখলেন সেই সরযূ, দেখে হাড় জ্বলে গিয়েছিল তার। রাতদুপুরে বিপদ নিয়ে ছুটে আসবার জায়গাটা এটাই নির্বাচিত হল কেন, সেটা জিগ্যেস করবার জন্যে গলাটাকে বাড়িয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। 'চুলোয় যাক', বলে বোতলটা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকেছিলেন। লিভার পচিয়ে মরে লাহিড়ীদের ওপর উচিত প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে ভেবে তীব্র একটা উল্লাসও অনুভব করছিলেন যেন। নীচের তলার বাদ প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নি। কেউ একটা কিছু তর্ক করছে। করুকগে! হঠাৎ চমকে উঠলেন। সমস্ত স্নায়ুগুলোর ওপর দিয়ে যেন তীক্ষ্ণ একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল! এ গলা কার?

যন্ত্রণাকাতর ক্ষুব্ধ ওই আর্তনাদের গলা? যুগ যুগান্তর পার থেকে কোনো মায়াহরিণ কি ওই গলার ছলনা করল?

ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে এলেন। ওদের পিছনে থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে বোধকরি রিকশওয়ালাকেই উদ্দেশ করে বললেন, 'দাঁড়াও, চলে যেও না। আমিও যাবো।'

'তুমি যাবে?' জিতু লাহিড়ী বিদ্রুপের হাসি হেসে ওঠেন, 'কোথায় যাবে? তোমার সেই ছোট জামাইয়ের বাড়ি? কিন্তু সে তো তোমার মেয়েকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'মেজদা!' সরযূ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মেয়েটার জীবন মরণ সমস্যা, আর এখনও তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে নাটক করতে বসলে। স্পষ্ট

করে না বলে তো বোঝাতে পারলাম না দেখছি, মেয়েটা যে প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। দরজা আগলে রেখে তু-তুটো কেষ্টর জীবকে মারবে নাকি? কুকাজ যদি কিছু করে থাকে তো সে তোমাদেরই সুশিক্ষার অভাবে। নিম পুঁতলে নিমগাছই হয়, আমগাছ হয় না। সরো, দোর ছাড়ো, এ আমারও জ্যাঠা-দাদার বাড়ি। এ বাড়ির একখানা ঘর দখল করবার দাবী অবিশ্যিই আছে আমার। তোমরা না ছোও আমি একাই নিয়ে যাচ্ছি, সে শক্ত রেখেছে ভগবান!'

'সরযূ!' বরুণা লাহিড়ীর পাথুরে মুখটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে, আর গলাটা নিতান্ত বুড়ির মতই কাঁপা কাঁপা ভাঙা ভাঙা শোনায়, 'সরযূ, ডাক্তার!'

কোথা থেকে যেন একটা বালিশ এনে অচৈতন্য মেয়েটার মাথার তলায় গুঁজে দিয়ে সরযূ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ডাক্তার! ডাক্তার এখন স্বপ্নকথা মেজবৌদি, ডাক্তার আছে ডাহুকীতে। সকাল না হলে—'

'ডাক্তার নেই? তোমাদের এই তেঁতুলগোড়ায় ডাক্তার নেই?'

'না নেই! সরযূ ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ গভীর একটা অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, 'কোথা থেকে থাকবে? গাঁয়ে কি আর মানুষ আছে? যেই কেউ এতটুকু মানুষ হয়ে ওঠে, তক্ষুনি তো সে দেশ ভিটেকে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়ে শহরে ছোটে। সেখানে এক ছটাক জায়গার মধ্যে তিনটে সংসার মাথা গুঁজে থাকবে, তবু কেউ দেশে এসে বাস করবে না, কারণ দেশে কলের জল নেই, বিজলীর আলো নেই, রোগে ডাক্তার নেই, মরণ বাঁচনে ওষুধ নেই! কিন্তু কেন নেই? তার কি প্রতিকার নেই? একথা কি কেউ কোনদিন ভেবে দেখে? শহরে সুখ, তাই মশামাছির মত দল বেঁধে সবাই শহরের দিকেই ছুটেছে। তার থেকে সুখগুলোকেই চেষ্টা করে গাঁয়ে নিয়ে আয় না কেন সবাই মিলে! তা করবে না! নাক উল্টে বলবে, ছি ছি এখানে আবার মানুষ থাকে? ডাক্তারের স্বপ্ন ছাড়ো মেজ বৌ, নিজেরাই যা পারা যায় করি। হাত পা তো হিম হয়ে গেছে মেয়ের, হ্যারিকেনেই কাপড় তাতিয়ে তাতিয়ে সেঁক দাও দিকি একটু।...আর মেজদা'—একটু ঠাট্টার মত শোনায়

সরযূর গলাটা, 'তোমাদের ওই বোতলের ছাইভস্ম দু-চার ফোঁটা দিয়ে দেখ দিকি, যদি চাঙ্গা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে গরলই অমৃত!'

কিন্তু অমৃত প্রয়োগেরও কাল আছে বৈকি। সে কাল যদি উত্তীর্ণ হয়ে থাকে, সে রসায়ণ আর কোন কাজ দেবে?

তবু সামান্যতম একটু কাজ হয়তো হয়েছিল! হয়তো তারই জোরে তেঁতুলগোড়া গ্রামের বড় লাহিড়ীবাড়ির নীচের তলায় একটা ভাঙা ঘরে শুয়ে সোমা ডেভিড তার শেষ বক্তব্যটুকু বলে নিতে পেরেছিল। অথবা তাও নয়—নিববার আগে প্রদীপ না কি বলে, হয়তো তাই!

কারণটা যাই হোক, অচৈতন্য সোমা ডেভিড সামান্য সেই এক মুহূর্তের চৈতন্যে, পৃথিবীর বাতাসে সদ্য শিউরে ওঠা এক অসহায় আত্মার তীব্র ক্রন্দন শুনতে পেয়েছিল। সেই কান্নার মধ্যেই নিজের কথা বলে নিয়েছিল সে, 'জানতাম তাড়িয়ে দেবে, তবু তোমাদের কাছেই আসতে ইচ্ছে হয়েছিল। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্ট পেয়েছি, তবু মরতে পারিনি। ওকে তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম, এবার মরে বাঁচবো।'

বরুণা লাহিড়ী সমস্ত সভ্যতা ভুলে সমস্ত অহঙ্কার ভুলে নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, 'মরবার জন্যেই তুই আমার কাছে এলি সোমা—'

সোমার মুখটায় বুঝি একটু হাসির আভাস ফুটেছিল। থেমে থেমে বলেছিল, 'মরে তো অনেক দিন আগেই গিয়েছিলাম মা, শুধু কোনো একদিন তোমাদের মেয়ে ছিলাম, এই টুকুর জোরে প্রার্থনা করছি, ওকে একেবারে ডাস্টবিনে ফেলে দিও না, একটু আশ্রয় দিও। ও অন্যায়ের নয়, অবৈধ নয়।'

ডাক্তার এসেছিল।

রাত্রের সেই 'সাইকেল' রিকশাতেই ডাহুকীতে চলে গিয়েছিলেন জিতু লাহিড়ী। যে মেয়ের জন্য একদা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'রাস্তায় পড়ে মরতে হবে, কবরে দেওয়ার খরচও জুটবে না'—আর এই ক্ষণকাল আগেও যাকে এ বাড়ির দরজা থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে

দিচ্ছিলেন, তার জন্যে দশগুণ ফী দিয়ে রাত্রেই এনেছিলেন ডাক্তার, কিন্তু তখন আর ডাক্তারের দরকার ছিল না।

তখন বরুণা লাহিড়ী উন্মত্তের মত একটা প্রাণহীন বুকের উপর পড়ে কাঁদছিলেন। আর সরযূ শান্ত চেষ্টায় একটা প্রাণ-কণিকাকে চেপে ধরে কান্না ভোলাচ্ছিল, বোধশক্তিহীন যে অন্ধ ক্রন্দন শুধু পৃথিবীর রূঢ় স্পর্শে ই উদ্দাম হয়ে ওঠে।

তেরশো সত্তর সালটা তেঁতুলগোড়ার একটা খবরের বছর। একই বছরের মধ্যে এতগুলো জমকালো জমকালো খবর তেঁতুলগোড়ার সারা জীবনেও বোধহয় ঘটেনি।

বছরের প্রথম আর প্রধান খবরটা ম্লান হয়ে গেল বছরের মাঝ-খানের ওই নতুন খবরটায়। যে শুনলো সেই স্তম্ভিত হয়ে গালে হাত দিল। কেউ কেউ বিশ্বাসই করল না। তবে নিজের চোখে দেখলে আর অবিশ্বাসের পথ কোথায়? নিজের চোখে দেখতে এলো সবাই একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, দল বেঁধেও।

কিন্তু এ খবরে বিস্ময় আর আনন্দ নয়। বিস্ময় আর আক্ষেপ সত্যি এর থেকে আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? সমস্ত বয়েস কালটা পার করে এসে বুড়ো বয়সে এই মতিচ্ছন্ন হল সরযূর!

চিরদিনের শুচি শুদ্ধ নির্মল পবিত্র মানুষটা পারলোই বা কি করে এই নোংরার মধ্যে নামতে?

ওর হাতে অবিশ্যি আর কেউ কখনো খাবে না। খুড়ি পিসি মরলে সরযূই হেঁসেলের ভার নিতে বাধ্য হবে, সরযূর ভাজের সে আশায় ছাই পড়ল, কিন্তু ও নিজেই বা খাচ্ছে কি করে? চান করলেই কি শুদ্ধ হল? জাত যাওয়া অশুচিতা স্নানে শুদ্ধ হয় না, এ জ্ঞান নিতান্ত মূর্খেরও থাকে।

সরযূর হিতৈষীরা অনেক বুঝিয়েছিল ওকে, কিন্তু কাজ হল না। মতিচ্ছন্ন হয়েছে তবু স্বভাবটি ঠিক আছে। পরের কথায় কখনই সরযূ হেলে দোলে না, পরের উপদেশ কানে নেয় না। এখনও নিল না।

জিতু লাহিড়ীর একটা ট্যাস ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া কুলটা মেয়ের ঘৃণ্য নোংরা বাচ্চাটাকে নিয়ে মত্ত হয়ে রইল।

তাই কি বাচ্চাটা ছেলে? যে ভবিষ্যতে কখনো কোন কাজে লাগবে? মেয়ে একটা! কালে ভবিষ্যতে আবার সে মেয়ে মায়ের মতই হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আর কী হবে? কিন্তু যাতে না মায়ের মত হয়, তার জন্যই তো সরযূর কাছে দেওয়া।

বরুণা লাহিড়ী যে সরযূর হাত ধরে বলেছিলেন, 'টের পেয়েছি আমার মানুষ করার মধ্যে কোথাও ভয়ানক একটা ভুল আছে। হয়তো সেই ভুল আবার করবো আমি। আমি নেব না, তুমি ওর ভার নাও।'

হ্যাঁ, তেমন আশ্চর্য ঘটনাই ঘটেছিল। সরযূর হাত ধরেছিলেন বরুণা লাহিড়ী। আরো আগেই ধরেছিলেন। সেই সেদিন প্রথম।

যে দিন সোমা নামের একটা দলিত বিধ্বস্ত কাঞ্চন ফুল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ ছিটকে এসে ভোরের বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। বরুণা লাহিড়ী সরযূর হাত চেপে ধরেছিলেন।

বলেছিলেন, 'সরযূ তুমি মহৎ, তুমি পুণ্যবতী, তুমি পরোপকারী, জীবনে আর একটা পুণ্য কাজ কর তুমি, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে দাও। ওকে আগুনে দাও, কবরে দাও, যা তোমাদের ধর্মে হয় কর। শুধু ওর কাছে আমায় একটু জায়গা নিতে দাও।'

সরযূ সে হাতের উপর হাত রেখে বলেছিল, 'তা বললে চলবে কেন মেজবৌদি! ও যে তোমার কাছেই ওর জিনিস গচ্ছিত রাখতে মরণপণ করে ছুটে এসেছিল। এমন পণ না করলে হয়তো এমন করে বেঘোরে মরতে হত না ওকে। সেই গচ্ছিত বস্তুর ভার ফেলে রেখে পালাবে তুমি?'

'তোমার দাদা আছেন সরযূ, তুমি আছো, আমায় যেতে দাও।'

একেবারে সাধারণের মত, গরিব দুঃখী ভিখিরী মেয়েদের মত করে কেঁদেছিলেন বরুণা লাহিড়ী, 'আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না।' জিতু লাহিড়ী চেয়ে দেখে আস্তে কাছে সরে এসেছিলেন।

জিতু লাহিড়ীর চির নিঃসঙ্গ কঠিন আবরণে ঢাকা প্রাণটা কি এই শোক-বিবশ মাতৃহৃদয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এল? জিতু লাহিড়ীর আত্মা কি চিরদিন এই হৃদয়কেই চেয়েছিল? আর না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শুধু আঘাত হেনেছিল? এতদিনে সে আত্মা শান্ত হলো? তাই সে আত্মা ওই যন্ত্রণা-জর্জরিত হৃদয়ের উপর গভীর একটি মমতার স্পর্শ রাখলো? নইলে সহসা অমন শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেলেন কি করে বরুণা লাহিড়ী?

জিতু লাহিড়ী যখন কাছে সরে এসে ওঁর পিঠে আলতো একটু হাত রেখে বললেন, 'তবু পারতেই যে হবে বেবি, নইলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কেন?' তখন তো সে হাতটা ঠেলে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল বরুণার পক্ষে! কিন্তু ঠেলেন নি, শুধু সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

জিতু লাহিড়ী আরো বলেছিলেন, 'চোখ মোছ বেবি, ভাল করে তাকিয়ে দেখ কত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার সোমাকে, আমার সোমাকে, আমাদের সোমাকে। দেখ আকাশ কত আলো ঢেলে দিয়েছে ওর ওপর, কত ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে সরযূ। ওর সব ভুল ওই ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে।'

বরুণা কি এই গভীর মমতার স্পর্শের মধ্যে পারা'র মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন? সারাজীবন যে বস্তু পাননি বরুণা, যার অভাবে এলোমেলো করেছেন জীবনকে, সেই বস্তু কি পেলেন এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে? চরম এক ক্ষতির বিনিময়ে এল পরম এক ঐশ্বর্য?

এই গভীর নিবিড় মমতার স্পর্শ কবে পেয়েছেন বরুণা?

অথবা এমন করে ঠিক চাওয়ার মুহূর্তও আসেনি, তাই পাননি। কোথায় কখন চলে চাওয়া আর পাওয়ার হিসেব, কোথায় কখন চলে ভাঙাগড়ার খেলা, কে বলতে পারে? বরুণা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বরুণা শান্ত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর সবচেয়ে আদরের সবচেয়ে ছোট মেয়ের নিথর শান্ত মুখের দিকে।

তারপর এক সময় বলেছিলেন, 'সরযূ, বাচ্চাটাকে দেখ। বোধহয় দুধ খাবে।'

আর তারও কদিন পরে বলেছিলেন, 'তুমিই ওর ভার নাও সরযূ।'

আশ্চর্য! নিষ্ঠাবতী এক বিধবাকে এ অনুরোধ করার সাহসও তো হয়েছিল বরুণা লাহিড়ীর।

তা সরযূ রাগও তো করে নি। একটুখানি হেসেছিল বরং। বলেছিল, 'শুধু আমার মত হলেই তো চলবে না মেজবৌদি, তা হলে তো নাতনীটা জগতের ওঁচা হয়ে থাকবে। তোমাদেরটাও চাই। শুধু কোনটা কতটুকু চাই, সেটাই বিচার করা দরকার। আমার মুখে শোভা পায় না, তবু বলি সন্তান মানুষ করা তোমার গিয়ে রান্নারই মত। মশলাগুলো শুধু তো ঢেলে দিলেই চলবে না, পরিমাণ পরিমিতি জ্ঞান নিয়ে ঢাললে তবে না? একেলে সেকেলে দুই-কালের দিদিমার হাতে গড়া মেয়ে যেন একটা মেয়ের মত মেয়ে হয়, তাই চেষ্টা করতে হবে।'

'না সরযূ, আমি হাত দেব না। আমার ভুলের হাত ঠেকাব না। আমার ছোওয়ায় শুধু ধ্বংসই আছে', বলেছিলেন বরুণা।

সরযূ একটু হেসে বলেছিল, 'তোমরা কত লেখাপড়া জানো, তোমাদের কথার আর কি উত্তর দেব? তবু অভয় দাও তাই বলি, ভুল আর ঠিক, এ তো ভগবানেরই লীলা, আদি অন্ত কাল তো মানুষে ভগবানে এই লীলাই চলছে। মানুষ পৃথিবীর মাথায় চড়ে বসে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অন্ধকারে ছোটে, ঠিক ভুল দেখে না, ভগবান তখন সেই ভুলের খাজনা চায়। বলে, তোকে জ্ঞান দিয়েছি বুদ্ধি দিয়েছি, বিচার দিয়েছি, বিবেক দিয়েছি, তবু এই কাজ? ভোগ ভবে! ভুগে মর! দিশেহারা হয়ে তখন মানুষ ঠিক পথের সন্ধান করে মরে। এই লীলা! মানুষ যদি নির্ভুল হয়ে বসে থাকবে, ভগবানের কী কাজটা থাকবে বল? স্রেফ বেকার হয়ে যাবে তো? নইলে দেখ, মেজদা জ্ঞানী বিদ্বান মানুষ, এক ভুলের যন্ত্রণার ছটফটিয়ে আর এক কী মস্ত ভুল নিয়ে পড়লেন! যেকালে মানুষ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক করে বেড়াচ্ছে, সেকালে উনি খড়ম আর গরুরগাড়ি ভজতে বসলেন। যে বাঘকে চিরদিন মাংস খাইয়ে এসেছেন, তাকে

হঠাৎ বললেন, 'তুই আজ দুধ খা।' এ কি কোনো কাজের কথা? সেকালটাই ভাল ছিল বলে পিছু হেঁটে সেকালে ফিরে যেতে চাইলে পাগলামিই হয়। সেই ভালটা যে কী, সেইটাই বরং ভেবে দেখে তাকে নিয়ে এসো একালে।'

'তা কী হয় সরযূ?'

'হবে না কেন মেজবৌদি? তোমরা লেখাপড়া জানা মানুষ, তোমরা চেষ্টা করবে যাতে সেটা হয়। একালের সঙ্গে যাতে তার ভাব হয়। তোমরাই যদি ভেসে যাবে, মুখ্যুরা কার দেখে শিখবে?'

কিন্তু লেখাপড়া না জানলেই কি মুখ্যু হয়? লেখাপড়া শিখলেই পণ্ডিত? কেষ্টবিষ্টু জিতু লাহিড়ী তবে গোবর গঙ্গাজল ছড়ানো, আর নুড়ি পাথরে মাথা ঠুকে বেড়ানো, মুখ্যু সরযূর পরামর্শ তুলে নিলেন কেন? তেঁতুলগোড়া থেকে আবার কেন ত্যাগ করে আসা রাজধানীর দেশে পা বাড়ালেন? যেখানে জীবনে আর যাব না বলেছিলেন?

না, সরযূ রূপসী বলে সরযূর কথা গ্রহণ করেছেন জিতু লাহিড়ী, একথা এখন আর বরুণা লাহিড়ীও বলেন না। বরং বলেন, ঠিক কথাই তো বলেছে সরযূ! সরযূ বলেছিল, 'বড্ড যে ঠেকি মেজদা, তাই ওই ঠিক কথা মাথায় আসে। তুমি তোমার টাকার পাহাড় ত্যাগ করে এসে এখানে ন্যাকড়া গায়ে দিয়ে বেড়াবে, এর মধ্যে কোনো মহিমা নেই। ঐশ্বর্য হল ভগবানের দান, তাকে ত্যাগই বা করবে কেন? কাজে লাগাতে হবে। তেঁতুলগোড়ার ধুলো মাথায় মাখবো বলে ফকিরগিরি না করে, তেঁতুলগোড়ার ধুলোটা ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর তো! দেখি একবার চোখ মেলে! ছেলেবেলা থেকে এই হতভাগা দেশটা ছাড়া আর তো কিছু দেখিনি, তাই এইটা নিয়েই জল্পনা-কল্পনা করেছি চিরকাল। ভাবতাম কী জানো? আমার যদি অনেক টাকা থাকতো, সব আগে তেঁতুলগোড়ায় এই মাঠ-ময়দান কেটে কালো চকচকে পীচের রাস্তা বানিয়ে দিতাম।'

জিতু লাহিড়ী বলে উঠেছিলেন, 'ওই কালো চকচকে রাস্তা ধরেই

তো যত চকচকে পাপের কালি এসে জমা হয় সরযূ! আসে যন্ত্রণা বীভৎসতা, লোভ, অনাচার—'

সরযূ হেসে উঠে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিল, 'তেমনি আসে ওষুধ ডাক্তার, বই-ইস্কুল, আসে সুবিধে সাহস! পাছে পাপ বস্তু আসে বলে পথ বন্ধ করে রাখাটা তো পাপ দৃশ্য দেখতে হবে ভেবে চোখ বন্ধ করে রাখার সামিল। রাস্তাটা করো আগে, তারপর ভেবো কী আসতে দেবে, আর কী আসতে দেবে না।'—আমাদের তেঁতুল-গোড়ার শ্মশানে যাবার রাস্তাটা দেখেছ? কাউকে বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে শ্মশানযাত্রীরাও যে কি করে সেই পথের পথিক না হয়ে ফিরে আসে তাই ভাবি। আমার তো নিজের ছেলে নেই, ভাবি আমায় যাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে, কত শাপমন্যি দিতে দিতে যাবে তারা। রাস্তার যদি একটু উন্নতি সাধন করেতে পারো মেজদা, তবে আমিও মরে গালাগাল খাই না, তোমারও পয়সাটা সার্থক হয়!'

বাক্যবাগীশ সরযূ কথার কথাই বলেছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি তার কথায় কান দিতে বসবেন তার থেকে বিশ বছরের বড় দাদা জিতু লাহিড়ী! কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনে নিথর হয়ে বসে থাকল সরযূ, জিতু লাহিড়ী দিল্লি গেছেন, ফিরছেন টাকা আর এঞ্জিনিয়ার নিয়ে, রাস্তা বানিয়ে দেবেন পিতৃপুরুষের গ্রামের। অনেক টাকা আগে বিলিয়ে ছিলেন, কিন্তু লাইফ ইনসিওরের মোটা টাকাটা ছিল খাতায় কলমে। সেই টাকা নিয়ে আসছেন।

'হ্যাঁ, ওই টাকাটাই, ওই লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাটাই—তখনও হাতের মুঠোয় এসে পড়েনি বলে হাত থেকে মুঠো মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন নি।' বলেছিলেন বরুণা 'যখন সংসার ভাঙার খেলায় মাতলেন, টাকাগুলোকে যেন একটা অশুচি অস্পৃশ্য জিনিসের মত দেখেছেন। বলেছেন,' 'পাপ আসে ওই টাকার ঘাড়ে চেপে।' বলেছেন, 'যারা শয়তান, যারা ভণ্ড, তারাই বানিয়েছে 'টাকা লক্ষ্মী'। আসলে টাকাই পাপ, টাকাই অলক্ষ্মী! এ মানুষের কাছে কোন কথা দাঁড়াবে বল?'

'মনটা বিগড়ে গিয়েছিল আর কি!' সরযূ নিশ্বাস ফেলেছিল, 'সন্তান নেই, জানি না সে কী বস্তু, তবু আন্দাজে তো বুঝতে পারি, কতটা দাগা লেগেছিল। অবিশ্যি তোমাকে এ কথা বলা শোভা পায় না, মায়ের প্রাণ আরো কত ফেটেছে। তবু কি করবে, ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থনা, যে যেখানে আছে সুখে থাক, শান্তিতে থাক! কার দোষ কার ভুল, এ তর্কে লাভ তো আর কিছু নেই!'

বরুণা এই বিশ্বাস আর ক্ষমার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন, আর ভেবেছেন, 'একথা আমরা বললেও পারতাম হয়তো! কিন্তু পারিনি। বলেছি, 'কষ্টে পড়বি, টের পাবি, রাস্তায় পড়ে মরবি।'

জিতু লাহিড়ীও দিল্লি যাবার প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'লাভ আর লোকসানের হিসেব-নিকেশ করতে বসাই ভুল বেবি। মনে করতে চেষ্টা করছি—শুধু তুমি আর আমি দুজনে যখন সংসার শুরু করে-ছিলাম, সেই আমরাই যেন আছি শুধু। অতীত আমাদের জীবনের উপর পাথরের মত চেপে নেই। 'মুক্তি'কে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি!'

মুক্তি! সোমার মেয়ে! তাকে নিয়েই তিনটে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ।

সরযুর বিধবা খুড়ি বসেছিলেন, 'এ বাড়িতে ওই নরক তুললে তো চলবে না সরযূ—'

সরযূ অম্লানবদনে বলেছিল, 'বাড়ির পাটা-দলিলখানা খুলে দেখোতো খুড়ি, কার বাপের নাম আছে তাতে?'

খুড়ি ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিলেন, 'তুই আমার বাপ তুললি?'

'তুমিই তোলালে—' সরযূ বলেছিল, 'কথা কইবার সময় বুঝে সমঝে বলতে হয়।'

বিধবা ভাজ বলেছিল, 'আমার ছেলে দুটি তো বাড়ির মালিক, না কি তাও উড়িয়ে দেবে?'

সরযূ বলেছিল, 'ঠাকুর্দা জীবিত থাকতে বাপ গেলে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হয় না বৌ, জিগ্যেস করো আইন জানা পুরুষদের।'

'ওই আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালটায় জন্যে সবাইয়ের সঙ্গে বিরোধ

করবে তুমি ?'

'সবাই যদি তাই চায়, উপায় কি ? কেষ্টর জীবটাকে যখন নিয়েছি, তখন লড়তে হবে বৈ কি তার জন্যে !'

তাই লড়েছে সরযূ। লড়ছে। দুটো লাহিড়ীবাড়িকে এক করে মেয়েটাকে নাচাচ্ছে। আর ক্রমশঃ সবাই এলে যাচ্ছে।

হয়তো এই নিয়ম পৃথিবীর। যে কোনো অসহনীয়কেই জোরের সঙ্গে চালালে, চালিয়ে চললে, একদিন সেটাই সহনীয় হয়ে আসে, সহজ হয়ে আসে। এমনি করেই আসে নতুন যুগ, নতুন সমাজ।

যে প্রথমটায় জোর করে, তার নিন্দে রটে। সে নিন্দেয় কান না দিয়ে খাল কাটলেই কাটা খাল দিয়ে আসে নতুনের জোয়ার।

ক্রমশঃ নাইতে যাবার সময় পিসি এসে মেয়েটাকে কোলে করেন, খুড়ি কাছে এসে বলেন, 'রূপ পেয়েছে দেখ মেয়েটা, যেন ফোটা ফুল ! একে তো লাহিড়ী বংশের ছাঁট, তাতে আবার সাহেবের রক্ত গায়ে !' —বলে 'জাত জন্ম আর রইল না ঠাকুরঝি, হামা দিতে শিখে ইস্তক কী না ছুঁচ্ছে মেয়েটা !'

'শিশু নারায়ণ !' পিসি বোধকরি নিজের অনাচারের প্রমাণের পথে কাঁটা দেন।

নরকের কীট মুক্তি এখন 'নারায়ণের' পর্যায়ে পড়ছে। সরযূকে এঁটে উঠবে কে ? সরযূ বলে, 'আমি যখন পুষ্যি নিয়েছি, আমার জাতে রাখতে হবে ওকে, ব্যস্।'

ভাজ বলে, 'রাখলেই কি আর 'জাত' হয়ে যায় ?'

'যাওয়ালেই যায় ! মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। জাত কেউ গায়ে লিখে নিয়ে আসে না।'

সরযূর এই চোট পাটটা এ বছরের একটা বিশেষ খবর। মেয়ে একটা পুষে ফেলেছিস, বেশ করেছিস, কিন্তু তাকে নিয়ে এত চোটপাট কিসের ?

কিসের ? এ প্রশ্ন মুখোমুখি কেউ করে না। এদিকে মুক্তি হামা

দিয়ে সর্বস্ব ছুঁয়ে বেড়ায়! ভাজ বলে, 'ওই মেয়েই যখন সব ছুঁচ্ছে, ঠাকুরঝির আর ভাত রাঁধতে বাধাটা কি?'

সরযূ বলে, 'বাধা হচ্ছে সময়ের অভাব। তিন তিনটে মেয়েমানুষ রয়েছ তোমরা, ভাত রাঁধা এত কষ্টকর হচ্ছে কেন?'

'একটা তো আশী বছরের বুড়ো।'

'ওই আশীতেই তো ভেলকি খেলাচ্ছে! তোমরা তার নখের কোণেও লাগ না!'

বলে আর ঘাটে ডুব দিয়ে এসে বলে, 'ও পিসি, ভাত পাথরটা তাড়াতাড়ি দাওগে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে! বুড়ো বয়সে একটা দামাল মেয়ে বওয়া কি সোজা গো?'

তেঁতুলগোড়ার খবরের বছর তেরশো সত্তর সালের শেষ খবর —গাড়ি গাড়ি পাথরকুচি আসছে, আসছে চূণ-সুরকি-বালি। রাস্তা হবে, হাসপাতাল হবে। সরকারের স্নেহদৃষ্টিও হয়তো আনিয়ে নিতে পারবেন, অনেকদিন সরকারের উঁচু চেয়ারে বসে থাকা জিতু লাহিড়ী!

গ্রামের বেকার ছেলেরা আশা করছে, এই রাস্তার রাস্তা ধরে যদি তাদের কোন সুরাহা হয়। কাজ হলেই কাজ আছে।

তবু—প্রতিকূলতা কি আর আসছে না? নিশ্চয় আসবে।

খুব আসবে। কেউই সহজে নিজের জমির এককোণ ছাড়বে না, কেউ নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে বালি পাথরের গাড়ি নিয়ে যেতে দিতে চাইবে না, কেউ 'রাজী আছি' বলে সই স্বাক্ষর দিতে চাইবে না।

তবুও হবেই। প্রতিকূলতাই তো শক্তির জোগানদার। এক জনও যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একশজন রুখতে পারবে না।

তেরশো একাত্তরটা এখনো অলক্ষ্যে আছে। কে জানে পৃথিবী কোন মোড় নেবে! কে জানে, থাকবে কি যাবে। কোথায় নাকি যুদ্ধ বাধছে। কে জানে খবরটা সত্যি কিনা। তবে এখানে কেউ বলছে শুধু রাস্তা হবে, কেউ বলছে শুধু রাস্তা নয়, হাসপাতালও হবে। কেউ কেউ বলছে মেয়ে-ইস্কুল নাকি হবে।

না হবে কেন? হওয়াই তো উচিত।

শহরের এত কাছাকাছি বাস করেও তেঁতুলগোড়া গ্রাম একশো বছরের চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে?

সরযূ তো ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে কোলে করে পাড়া বেড়াতে শুরু করেছে। আর জোর দিয়ে দিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, আমার খুকু-সোনা এই তেঁতুলগোড়ায় বসেই ইংরিজি ইস্কুলে পড়বে। তেঁতুল-গোড়ায় তখন রেল স্টেশন হবে। কু-ঝিকঝিক দেখবে খুকু তার পাড়া থেকে।

তবে সরযূ, তোমার সেই পুণ্যিপুকুর? হরির চরণ? তোমার পুষ্যিমেয়ে করবে না সে সব? তাও করবে। করতে বাধা কি? সরযূ বলে, 'ভগবান তো মানুষকে দুদিকে দুটো হাত দিয়েছে, একটা জিনিস ফেলে না দিলে আর অন্য একটা ধরতে পারবে না?'

অবশ্যি কথার ভট্‌চায সরযূর কথায় কে আর অত কান দেয়?

তবে গ্রামে মেয়েদের জন্যে একটা ইংরিজি স্কুল হবে, এই আশায় মেয়েগুলো আর মেয়েদের মায়েরা কম্পিত পুলকিত চিত্তে দিন গুনছে। বুড়োরাও হয়তো খুব অরাজী নয়। দেখছে তো গো-মুখ্যু মেয়েগুলোকে নিয়ে বিয়ের বাজারে কী কষ্ট এ যুগে!

তবু কোনো নতুনকেই অপ্রতিবাদে পথ ছেড়ে দেওয়া বুড়োদের কুষ্ঠিতে লেখে না। কোনো যুগের কোনো দেশের কোনো বুড়োরই না। তারা বলতে থাকে, 'হবে আর কি। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েগুলো ধিঙ্গী অবতার হয়ে উঠবে!' বলে, তেরশো সত্তরেও একথা বলে।

তবু নতুন আসে। কোথাও বন্যার বেগে, কোথাও নববধূর মৃদুতায়। যারা প্রবল প্রতিবাদ জানায় তারাই সহজে মেনে নেয়।

এই চিরন্তন লীলা!

সভ্যতার জ্বালায় জর্জরিত, পৃথিবী ছটফটিয়ে উঠে হঠাৎ এক সময় ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের শীতলতায় শান্তি খোঁজে, আবার এক সময় সেই ছায়ায় অন্ধকার গ্রাস করে বসে অনেক শুভ, অনেক সুখ। সেই অন্ধকারই তখন আবার আলোর পিপাসায় ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে

যায় সামনের পথে। কিন্তু এগিয়ে কি সত্যিই যায় পৃথিবী? পৃথিবীর চলার পথটা কি দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পথ? নাকি সে শুধু একটা বৃত্তরেখাকে ঘিরে ঘিরে দৌড়য় আর ভাবে এগোচ্ছি?

হয়তো তাই। এগিয়ে যাবার জন্যে দীর্ঘ অজানা অন্তহীন পথ থাকলে পৃথিবী নতুন কিছু পেত হয়তো। কিন্তু কোথায় সেই নতুন? গড়া আর ভাঙা, সভ্যতা আর যন্ত্রণা, আর অন্তহীন অশান্ত পিপাসা, এই চেনা মহলের পথ দিয়ে দিয়েই পৃথিবীর অন্তহীন পাক খেয়ে চলা!

জিতু লাহিড়ী আবার বিশ্রামের নিভৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন কাজের কঠিন মাটিতে, সুষুপ্তির অন্ধকার থেকে আলোর আহ্বানে রোদে দাঁড়িয়ে জলে ভিজে মিস্ত্রী খাটাচ্ছেন, কণ্ট্রাক্টারের লোককে ধমক দিচ্ছেন, ছুটোছুটি করছেন।

রাস্তা হচ্ছে তেঁতুলগোড়ায়। ডাহুকী থেকে টানা চলে আসবে তেঁতুলগোড়ায় বুড়ো অশ্বত্থের গোড়া অবধি। সরকারি আশ্বাস আছে পরে ওই রাস্তা কালো চকচকে পীচে মোড়া হয়ে যাবে, যেখান দিয়ে বাস যাবে, মোটর যাবে অনায়াস আরামে। আর যেখান দিয়ে আসবে ডাক্তার, আসবে ওষুধ, আসবে সুবিধে আর সভ্যতা!

কিন্তু আর কিছু কি আসবে না? কালো চকচকে মসৃণদেহী পাপ?

হয়তো আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে বৈ কি সবাইকেই। আসতে দিতে হবে। শুধু সতর্ক প্রহরা দেওয়া দরকার, পাপ কোথাও বাসা বাঁধছে কি না! ভুলের মধ্যে, অসাবধানতার মধ্যে, অন্ধ স্নেহের মধ্যে, অশুভবুদ্ধির মধ্যে!

খবরের বছর তেঁতুলগোড়ার আগামী খবরটা আরো নাকি জোরালো। নাকি বড়লাহিড়ী বাড়িটার ভোল বদলে যাচ্ছে, প্রসূতি সদন হয়ে যাবে বাড়িটা। ঠাকুর দালানটাকে আউটডোর বানিয়ে ডাক্তার বসবে। এই তেঁতুলগোড়ার কোনো মেয়েও যদি ভুল করে বসে, তার জন্যে খোলা থাকবে সদনের দরজা। সামনের বছরেই ওটা করে তোলবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বরুণা লাহিড়ী,

ছুটোছুটি করছেন কলকাতা আর গ্রাম! পাগল হয়ে উঠেছেন কাজের নেশায়! শুধু সন্ধ্যাটি থাকে তাঁর নিজস্ব!

সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে যান বরুণা, একা চলে যান গ্রাম প্রান্তরে সেই পরিচিত পথ ধরে বরুণা লাহিড়ী, অনেক সন্ধ্যা বিলীন হয়েছে যে মাঠে আর মাঠের পথে।

ভোলা নিধু ভুগগাদের পাড়া পার হয়ে এগিয়ে যান একেবারে গ্রামের সীমান্ত রেখায়। যেখানে সোমা ডেভিড ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট একটু কবরের কোটায়।

বড় লাহিড়ী বাড়ির বৌ বরুণা লাহিড়ী সেই কবরের উপর রেখে আসেন একমুঠো ফুল! হয়তো বকুল, হয়তো শিউলি, হয়তো বেল মল্লিকা চাঁপা।

তেঁতুলগোড়ার লোক কিন্তু এর জন্যে পতিত করেনি বরুণা লাহিড়ীকে। বরং ওর কথা উঠলে গলা নামিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'আশ্চর্য। প্রতিদিন পারে কি করে?'

কিন্তু আশ্চর্যের কী আছে? সরযূ পারে না প্রতিদিন গ্রামসুদ্ধ বিগ্রহের দরজায় জল ঢালতে?